ভগবান বুদ্ধ

ধর্মানন্দ কোসম্বী

ত্রিপিটকের একই জায়াগয় বুদ্ধের সম্পূর্ণ জীবনকাহিনী পাওয়া যায় না। মহাযান সম্প্রদায়ের গ্রন্থ *ললিতবিস্তর* খৃষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দী বা তার কিছু পূর্বে লেখা হয়েছে। পঞ্চম শতাব্দীতে লেখা *জাতক-অট্‌ঠ-কথায়* বর্ণিত বুদ্ধের জীবনচরিত *ললিতবিস্তরের* ভিত্তিতে রচিত হয়েছে। এই রকম বিভিন্নস্তরে নানা কাল্পনিক কাহিনী বুদ্ধের জীবনকাহিনীতে জুড়ে দেওয়া হয়েছে।

বিভিন্ন কাহিনী থেকে বুদ্ধচরিত্র সম্বন্ধে বিশ্বাসযোগ্য বিবরণ লিপিবদ্ধ করা এই গ্রন্থের লক্ষ্য। গবেষণার যে প্রণালী এখানে অবলম্বন করা হয়েছে তাতে বুদ্ধচরিত্রের সঙ্গে সঙ্গে তৎকালীন ইতিহাসের উপর বিশেষ আলোকপাত করা হয়েছে।

বুদ্ধের জন্মতারিখ সম্বন্ধে নান বাদবিবাদ রয়েছে। একেবারে নির্ভুল নির্ধারণ সম্ভবও নয়। এ গ্রন্থে জন্মতারিখ নির্ধারণ গুরত্বপূর্ণ নয়, বুদ্ধের জন্মের পূর্বে সমাজের অবস্থা কী রকম ছিল এবং তা থেকে বুদ্ধ কী ভাবে নতুন ধর্মমার্গ আবিষ্কার করলেন সেদিকেই বেশি নজর দেওয়া হয়েছে। জন্মতারিখ নির্ধারণ করবার জন্য অনেক পৃষ্ঠা ব্যয় না করে, বুদ্ধের চরিত্রের উপর যা দ্বারা আলোকসম্পাত হবে, এমন সব তথ্যের দিকে বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে।

জনসমাজে প্রসিদ্ধ হবার জন্য এই পুস্তক লেখা হয়নি, শুধু সত্য অন্বেষণের উদ্দেশ্যেই এ গ্রন্থের আয়োজন। পক্ষপাত না করে প্রাচীন ইতিহাসের আলোচনা যাঁদের লক্ষ্য সেই সুবিবেচক পাঠকের উদ্দেশেই ধর্মানন্দ কোসম্বীর এই গ্রন্থ নিবেদিত হয়েছে।

মূল্য : ১০০ টাকা
ISBN : 978-81-260-2504-6

ভগবান বুদ্ধ

ধর্মানন্দ কোসম্বী

অনুবাদ

চন্দ্রোদয় ভট্টাচার্য

সাহিত্য অকাদেমি

সূচীপত্র

গ্রন্থকারের প্রস্তাবনা

পালি সাহিত্যে তিপিটক (ত্রিপিটক) নামক গ্রন্থসমূহের স্থান সকলের উপরে। উহাতে সুত্তপিটক, বিনয়পিটক এবং অভিধম্মপিটক, এই তিনটি ভাগ আছে । সুত্তপিটকে প্রধানতঃ বুদ্ধ এবং তাঁহার বড়ো বড়ো শিষ্যদের উপদেশগুলি সংগ্রহ করা হইয়াছে। বিনয়পিটকে ১. ভিক্ষুদের আচরণীয় বুদ্ধকৃত নিয়মসমূহ, ২. এইসব নিয়মের হেতু, ৩. নিয়মগুলিতে বিভিন্ন সময়ে প্রবর্তিত পরিবর্তন এবং ৪. উহাদের ব্যাখ্যা বা টীকা—এ-সব সংগ্রহ করা হইয়াছে। অভিধম্মপিটকের সাতটি পরিচ্ছেদ। ইহাতে বুদ্ধের উপদেশে যে-সব মূল কথা আছে, তাহাদের ভিতর কয়েকটির আলোচনা আছে। সুত্তপিটকে বড়ো বড়ো পাঁচটি বিভাগ। ইহাদের নাম দীঘনিকায়, মজ্ঝিমনিকায়, সংযুত্তনিকায়, অঙ্গুত্তরনিকায় এবং খদ্দকনিকায়। দীঘকনিকায় বড়ো বড়ো চৌত্রিশটি সুত্তের সংগ্রহ। দীর্ঘ মানে বড়ো (সুত্ত)। ইহাতে এতগুলি বড়ো বড়ো সুত্তের সংগ্রহ থাকায়, ইহাকে দীঘনিকায় বলে।

মজ্ঝিমনিকায় মাঝারি আকারের কতগুলি সুত্ত সংগৃহীত হইয়াছে। এইজন্য ইহার নাম মজ্ঝিম (মধ্যম) নিকায়। সংযুত্তনিকায়ের প্রথমদিকে গাথামিশ্রিত কতকগুলি সুত্ত দেওয়া হইয়াছে; এবং ইহার পর, বিভিন্ন বিষয়ের উপর কতকগুলি ছোটো বড়ো সুত্ত সংগৃহীত হইয়াছে। এইজন্য ইহার নাম সংযুত্তনিকায় অর্থাৎ মিশ্রনিকায়। অঙ্গুত্তরনিকায় শব্দের অর্থ "যাহাতে একটি একটি করিয়া অঙ্গ অথবা অংশ বাড়ানো হইয়াছে।" ইহাতে 'একক' হইতে 'একাদসক' পর্যন্ত মোট এগারোটি নিপাতের সংগ্রহ আছে। এককনিপাত মানে যাহাতে একই বিষয়ে বুদ্ধের উপদেশগুলি সংগৃহীত হইয়াছে। এই ভাবেই 'দুকনিপাত', 'তিকনিপাত' প্রভৃতি শব্দের অর্থ বুঝিতে হইবে।

খুদ্দকনিকায় মানে ছোটো ছোটো কয়েকটি পরিচ্ছদের সংগ্রহ। ইহাতে নিম্নলিখিত পনেরোটি পরিচ্ছদ আছে ঃ খুদ্দকপাঠ, ধম্মপদ, উদান, ইতিবুত্তক, সুত্তনিপাত, বিমানবত্থু, পেতবত্থু, থেরগাথা, জাতক, নিদ্দেস, পটিসংভিদামগ্‌গ, অপদান, বুদ্ধবংস এবং চরিয়াপিটক। সুত্তপিটকের এইটুকু পরিসর। বিনয়পিটকের পাঁচটি বিভাগ। যথাক্রমে ইহাদের নাম পারাজিকা, পাটিত্তিয়াদি, মহাবগ্‌গ, চুল্লবগ্‌গ এবং পরিবার-পাঠ।

তৃতীয় গ্রন্থ হইল অভিধম্মপিটক। ইহাতে ধম্মসঙ্গণি, বিভঙ্গ, ধাতুকথা, পুগ্‌গল-পঞ্‌ঞত্তি, কথাবত্থু, যমক এবং পট্‌ঠান—এই সাতটি পরিচ্ছেদ আছে।

বুদ্ধঘোষের সময়ে অর্থাৎ প্রায় চতুর্থ শতাব্দীতে এইসব গ্রন্থের বাক্যগুলিকে অথবা তাহা হইতে উদ্ধৃত অংশগুলিকে পালি বলা হইত। বুদ্দঘোষের গ্রন্থে ত্রিপিটকের বচনগুলি "অয়মেত্থ পালি (ইহা এখানে পালি)" অথবা "পালিয়ং বুত্তং (পালিভাষায় বলা হইয়াছে)" এইরকম শব্দে নির্দেশ করা হইয়াছে। পাণিনি যেমন "ছন্দসি" শব্দদ্বারা বেদের এবং "ভাষায়াম্" শব্দদ্বারা তাহার সমকালীন সংস্কৃতভাষার উল্লেখ করিতেন, তেমনি বুদ্ধঘোষাচার্য "পালিয়ং" শব্দদ্বারা ত্রিপিটকের বচন এবং "অট্‌ঠকথায়ং" শব্দে তৎকালে সিংহলীভাষায় প্রচলিত "অট্‌ঠকথা"র বচন নির্দেশ করিতেন।

অট্‌ঠকথা মানে অর্থযুক্ত কথা। সিংহলদেশে ত্রিপিটকপাঠের সময়, উহার বাক্যগুলির অর্থ বলিয়া যাওয়া, এবং প্রয়োজনবোধে ঐ সম্বন্ধে দুই-একটি গল্প বলা, এইরূপ প্রথা ছিল। পরে এইসব অর্থকথা লিখিয়া রাখা হইত। কিন্তু ইহাতে খুব পুনরুক্তি হইত; তাহা ছাড়া, এগুলি সিংহলদ্বীপের বাহিরে অন্যদেশীয় লোকের বিশেষ কাজে লাগিবার মতোও ছিল না। এইজন্য বুদ্ধঘোষাচার্য এই অট্‌ঠকথার প্রধান অংশগুলি, সংক্ষিপ্ত আকারে ত্রিপিটকের ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন। তাহার এই সারসংগ্রহ এত ভালো হইয়াছিল যে, ইহাকে লোকে ত্রিপিটকের মতনই সম্মান করিতে লাগিল। ("পালিং বিয় তমগ্‌গহুং")। সুতরাং এই অট্‌ঠকথাকেও লোকে পালি নামই দিতে থাকিল। আসলে, পালি শব্দটি কোনো ভাষার নামই নয়। উক্ত ভাষার মূল নাম ছিল মাগধী, আর এইভাবেই তাহা এই নূতন পালি নামটি লাভ করিয়াছিল।

উপরে ত্রিপিটকের যে বিভাগগুলির কথা বলা হইয়াছে, সেইগুলি রাজগৃহে সম্মিলিত বৌদ্ধদের প্রথম সভায় পরিগৃহীত হইয়াছিল। ইহাই বুদ্ধঘোষের মত। ভগবান্ বুদ্ধের পরিনির্বাণের পর, ভিক্ষুরা সব শোকে অধীর হইয়া গিয়াছিল। তখন সুভদ্র নামক জনৈক বৃদ্ধ ভিক্ষু কহিল, "আমাদের শাসক যে পরিনির্বাণ পাইয়াছেন, ইহা ভালোই হইয়াছে। তোমরা অমুক করিবে ও তমুক করিবে না, এইভাবে তিনি আমাদিগকে সর্বদাই নিয়মের বন্ধনে রাখিতেন। এখন যাহার যেরকম ইচ্ছা সেরকম আচরণ করিবার স্বাধীনতা পাইয়াছি।" এই কথা শুনিয়া মহাকাশ্যপ মনে মনে ভাবিলেন, "যদি এখন ধর্মের নিয়মগুলি সংগ্রহ করিয়া না রাখা হয়, তাহা হইলে সুভদ্রের মতন ভিক্ষুরা স্বৈরাচার করিবার সুবিধা পাইবে; সুতরাং যত শীঘ্র সম্ভব, ভিক্ষুসংঘের সভা ডাকিয়া সেখানে ধর্ম ও বিনয়ের নিয়মগুলি সংগ্রহ করিয়া রাখিতে হইবে।" তদনুসারে চাতুর্মাস্য ব্রতের[১] সময়, মহাকাশ্যপ রাজগৃহে সভা ডাকিয়া পাঁচশো ভিক্ষু একত্র করিলেন; এবং ঐ সভায় প্রথমত 'উপালি'কে জিজ্ঞাসা করিয়া, বিনয়ের নিয়মগুলি সংগ্রহ করা হইল। তাহার পর, আনন্দকে জিজ্ঞাসা করিয়া, সুত্ত ও অভিধম্ম, এই দুইটি পিটক সংগৃহীত হইল। কাহারো কাহারো মতে, অভিধম্মপিটকেই খুদ্দকনিকায় গ্রন্থটি অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছিল। কিন্তু অপর কেহ কেহ বলেন যে, উহা সুত্তপিটকের অন্তর্ভুক্ত।

উপরে যে-সব তথ্য দেওয়া হইয়াছে, সেগুলি সুমঙ্গলবিলাসিনী গ্রন্থের নিদান কথা হইতে লওয়া হইয়াছে। এইরকম তথ্যই সমন্তপাসাদিকা নামক অট্‌ঠকথার নিদানকথাতেও দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু তিপিটক গ্রন্থের কোথাও ইহার কোনো নিদর্শন নাই। ভগবান্ বুদ্ধের পরিনির্বাণের পর, রাজগৃহে হয়তো ভিক্ষুসংঘের প্রথম সভা হইয়াছিল; কিন্তু ঐ সভাতে যে অধুনালব্ধ পিটকের বিভাগগুলি অথবা পিটক এই নামটিও নির্ধারিত হইয়াছিল, এরকম মনে হয় না। অশোকের কাল পর্যন্ত, বুদ্ধের উপদেশগুলি ধর্ম এবং বিনয় এই দুই ভাগে ভাগ করা হইত। ইহার মধ্যে, ধর্মে নয়টি অঙ্গ আছে বলিয়া ধরা হইত। অঙ্গগুলি

---

১. ইহা মোটামুটি আষাঢ় হইতে আশ্বিন পর্যন্ত চলে। এই কালাবধিকে চাতুর্মাস্য কহে।—অনুবাদক

এইরকম ঃ সুত্ত, গেয্য, বেয্যাকরণ, গাথা, উদান, ইতিবুত্তক, জাতক, অব্‌ভুতধম্ম এবং বেদল্ল। এই অঙ্গগুলির উল্লেখ মজ্ঝিমনিকায়ের অলগদ্দুপমসুত্তে এবং অঙ্গুত্তরনিকায়ে সাত জায়গায় পাওয়া যায়।

'সুত্ত' এই পালি শব্দটি সংস্কৃত সূক্ত অথবা সূত্র, ইহার যে-কোনো একটি হইতে উদ্ভূত হইয়াছে,' এইরকম বলা যাইতে পারে। কেহ কেহ বলেন যে, বেদে যেরকম সূক্ত আছে, তেমনই এইগুলি পালিসূক্ত। কিন্তু মহাযানসম্প্রদায়ের গ্রন্থগুলিতে ইহাদিগকে সূত্র বলা হইয়াছে। হয়তো, ইহাই সুত্ত শব্দের প্রকৃত অর্থ। আজকাল সূত্র বলিলে, পাণিনির অথবা ঐরকম অন্য কাহারো সূত্র বুঝায়। কিন্তু আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্র প্রভৃতি সূত্রগুলি এই-সব সংক্ষিপ্ত সূত্র হইতে কিয়ৎপরিমাণে বিস্তৃত। খুব সম্ভবত, পালি ভাষায় প্রথম এই অর্থেই সূত্রগুলি রচিত হইয়াছিল। এই-সব সূত্র দেখিয়াই কি আশ্বলায়ন প্রভৃতি নিজ নিজ সূত্র রচনা করিয়াছিলেন, না বৌদ্ধরা আশ্বলায়নাদির সূত্র অনুসরণ করিয়া নিজেদের সূত্র রচনা করিয়াছিলেন, এই বিবাদের আবশ্যকতা নাই। এইটুকু মাত্র নিশ্চিত যে অশোকের পূর্বে, বুদ্ধের উপদেশ-বাণীগুলি সুত্ত নামে অভিহিত হইত; এবং এই বাণীগুলি আকারে দীর্ঘ ছিল না।

গাথাবদ্ধ সূত্রকে গেয্য বলে। অলগদ্দসুত্তের অট্‌ঠকথাতে ইহা বলা হইয়াছে এবং গেয্যের উদাহরণস্বরূপ সংযুক্তনিকায়ের প্রথম বিভাগটির উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু গাথা নামে যাহা-কিছু আছে, সে সবই গেয্যের ভিতর গণনা করা হয়। সুতরাং গাথা নামে এক পৃথক্‌ বিভাগ কেন করা হইল, তাহা বলিতে পারা যায় না। তবে জানি না, গেয্য বলিতে অমুক বিশিষ্ট প্রকারের গাথাই বুঝা যাইত কিনা।

বেয্যাকরণ মানে ব্যাখ্যা। কোনো সূত্রের সংক্ষিপ্ত কিংবা বিস্তৃতভাবে অর্থ বলিয়া যাওয়া—ইহাকেই বেয্যাকরণ বলে। (অবশ্যই এই শব্দটির সহিত সংস্কৃত 'ব্যাকরণ' শব্দের কোনো সম্বন্ধ নাই।)

বুদ্ধঘোষাচার্য বলেন যে, ধম্মপদ, থেরগাথা এবং থেরীগাথা, এই তিনটি গ্রন্থ, গাথা নামে অভিহিত। কিন্তু থেরগাথা ও থেরীগাথা বুদ্ধের পরিনির্বাণের তিন-চারি শত বৎসরের ভিতরে রচিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না; আর ধম্মপদও একেবারেই ক্ষুদ্রগ্রন্থ। সুতরাং গাথা বলিয়া কোনো একটি বিশেষ গ্রন্থ ছিল কিনা, অথবা অন্য কতকগুলি গাথারই এই বিভাগে সমাবেশ করা হইত কিনা; এ সম্বন্ধে নিশ্চিতভাবে কিছু বলা কঠিন।

উপরে খুদ্দকনিকায় হইতে যে তালিকা দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে উদানের নির্দেশ আছে। বুদ্ধঘোষাচার্যের মন্তব্য এই যে, এই উদানগুলির এবং সুত্তপিটকের তৎসদৃশ অন্যান্য বচনগুলিকে উদান বলে। কিন্তু অশোকের সময়, এই উদানগুলির মধ্যে কয়টির অস্তিত্ব ছিল, তাহা বলা সম্ভব নয়। পরবর্তী কালে ইহাদের মধ্যে যে অনেক নূতন উদান সংযোজিত হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই।

ইতিবুত্তক নামক প্রকরণে একশত বারোটি ইতিবুত্তকের সংগ্রহ আছে। তাহাদের ভিতর কয়েকটি অশোকের সময়েও কিংবা তাহার এক-আধ শতাব্দীর মধ্যেও বিদ্যমান ছিল। পরবর্তী কালে হয়তো ইহাদের সংখ্যা বাড়িয়া থাকিবে।

জাতক নামক কথা সুপ্রসিদ্ধ। এই-সব কথাতে বর্ণিত কয়েকটি ঘটনা সাঁচী এবং বর্হুতের স্তূপগুলির আশেপাশে খোদিত রহিয়াছে। অতএব অনুমান করা যাইতে পারে যে, জাতকের অনেক গল্পই অশোকের সময়ে বৌদ্ধ সাহিত্যে স্থান পাইয়াছিল।

অব্ভুতধম্ম মানে অদ্ভুত বা আশ্চর্যজনক ঘটনা। এই রকম মনে হয় যে, প্রাচীনকালে এমন কোনো-এক গ্রন্থ ছিল, যাহাতে ভগবান্ বুদ্ধ এবং তাঁহার প্রধান শ্রাবকদের দ্বারা কৃত অলৌকিক ঘটনাগুলির বর্ণনা ছিল। কিন্তু এই গ্রন্থের কিছুই এখন অবশিষ্ট নাই। খুব সম্ভবত, ইহার সবটাই অধুনালব্ধ সুত্তপিটকের সহিত মিশিয়া গিয়াছিল। অদ্ভুত ধর্ম মানে কী, ইহা বলিতে পারা বুদ্ধঘোষাচার্যের পক্ষেও কঠিন হইয়া পড়িয়াছিল। তিনি বলিয়াছেন, "চত্তারোমে ভিক্খবে অচ্ছরিয়া অব্ভুতা ধম্মা আনন্দে তি আদিনয়পবত্তা সব্বে পি অচ্ছরিয়ব্ভুত ধম্মপটিসংযুত্তা সুত্তন্তা অব্ভুতধম্মং তি বেদিতব্বা।" ("হে ভিক্ষুগণ, এই চারিটি আশ্চর্য অদ্ভুত ধর্ম আনন্দের মধ্যে বাস করে, এইভাবে অদ্ভুত ধর্মের দ্বারা আরম্ভ হইয়াছে, আশ্চর্য-কর—অদ্ভুত ধর্মের দ্বারা যুক্ত হইয়াছে, এইরূপ সর্বসূত্রই অব্ভুতধম্ম বলিয়া বুঝিবে।") কিন্তু এই অদ্ভুত-ধর্ম এবং মূল অব্ভুত ধম্মগ্রন্থ—এই দুইয়ের মধ্যে কোনো সম্বন্ধ দেখা যায় না।

মহাবেদল্ল ও চূলবেদল্ল, এই সূত্র দুইটি মজ্ঝিমনিকায়ে আছে। ইহা হইতে বেদল্ল নামক প্রকরণটি কিরূপ ছিল, তাহা আন্দাজ করা যায়। ইহার প্রথম সুত্তে মহাকোট্ঠিত 'সারি-পুত্ত'কে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে, আর সারিপুত্ত ঐ প্রশ্নের যথাযোগ্য উত্তর দেয়। দ্বিতীয় সুত্তে, ধম্মদিন্না নামক ভিক্ষুণী এবং তাহার পূর্বাশ্রমের পতি বিশাখ, এই দুইজনের মধ্যে প্রশ্নোত্তররূপে কথোপকথন রহিয়াছে। এই দুইটি সুত্তের কোনোটিই স্বয়ং বুদ্ধের বাণী নয়। কিন্তু এই ধরনের কথোপকথনকে বেদল্ল বলা হইত। শ্রমণ, ব্রাহ্মণ এবং অন্যান্য লোকের সহিত ভগবান্ বুদ্ধের যে-সব কথোপকথন হইয়াছিল, তাহাদের একটি পৃথক্ সংগ্রহ ছিল, এবং উহাকেই বেদল্ল নাম দেওয়া হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়।

এই নয়টি ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ অস্তিত্ব লাভ করিবার পূর্বে, সুত্ত ও গেয্য, এই দুইটি অঙ্গের মধ্যে বাকি সব অঙ্গের সমাবেশ করা হইত, ইহা মহাসুঞ্ঞতাসুত্তের নিম্নলিখিত বিবরণটি হইতে বুঝিতে পারা যায় ঃ ভগবান্ বুদ্ধ আনন্দকে কহিলেন, "ন খো আনন্দ অরহতি সাবকো সত্থারং অনুবন্ধিতুং যদিদং সুত্তং গেয্যং বেয্যাকরণস্স হেতু। তং কিস্স হেতু। দীঘরত্তং হি বো আনন্দ ধম্মা সুতা ধাতা বচসা পরিচিতা......" ("হে আনন্দ, সুত্ত ও গেয্য, এই দুইটির ব্যাখ্যার জন্য গুরুর সহিত এখানে-সেখানে ঘোরা ঠিক নয়; কারণ তোমরা তো এ-সব কথা পূর্বেই শুনিয়াছ; আর এইগুলি তো তোমাদের পরিচিতই।") অর্থাৎ সুত্ত ও গেয্য, শুধু এই দুইটি স্বয়ং বুদ্ধের দেওয়া উপদেশ ছিল, আর বেয্যাকরণ অথবা ব্যাখ্যারূপ কাজটি শ্রাবকদের উপর ন্যস্ত হইয়াছিল। দেখিতে দেখিতে, ইহাদের সঙ্গে আরো ছয়টি অঙ্গ জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল; এবং পরে, উহাদের মধ্যে এক অঙ্গ অন্য অঙ্গের সঙ্গে মিশাইয়া, অনেক সুত্ত তৈয়ার করা হইয়াছিল। ইহার ভিতর, বুদ্ধের নিজস্ব উপদেশ কোন্‌গুলি এবং পরে অন্যের দ্বারা রচিত উপদেশ কোন্‌গুলি, তাহা বলিতে পারা কঠিন

হইলেও, অশোকের ভাব্রা অথবা ভাব্রূশিলালিপির সাহায্যে পিটকের পুরতন অংশটুকু কি রকম ছিল, তাহা অনুমান করা সম্ভবপর।

অশোকের ভাব্রূশিলালিপিতে ভিক্ষু, ভিক্ষুণী, উপাসক এবং উপাসিকাগণকে বুদ্ধের নিম্নলিখিত সাতটি উপদেশ বার বার শ্রবণ ও পাঠ করিতে বলা হইয়াছে। উপদেশগুলি এই ঃ

১. বিনয়সমুকসে, ২. অলিয়বসানি, ৩. অনাগতভয়ানি, ৪. মুনিগাথা, ৫. মোনেয়সূতে, ৬. উপতিসপসিনে, ৭. লাঘুলোবাদে, মুসাবাদং অধিগিচ্য ভগবতা বুদ্ধেন ভাসিতে।

ওল্ডেনবার্গ ও সেনার নামক দুইজন পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিত প্রমাণ করিয়াছেন যে, এই সাতটি উপদেশের ভিতর, সপ্তমটি মজ্ঝিমনিকায়ের রাহুলোবাদ সুত্ত (সংখ্যা ৬১)। বাকি উপদেশগুলি সম্বন্ধে সঠিক খবর দেওয়ার চেষ্টা অধ্যাপক রিস্ ডেভিড্স্ করিয়াছেন। কিন্তু সুত্তনিপাতের মুনিসুত্ত ছাড়া, তিনি অন্য যে-সব সুত্তের কথা তুলিয়াছেন, তাহার সবগুলি ভ্রান্তিমূলক। আমি ১৯১২ সালের 'ইণ্ডিয়ান অ্যান্টিকোয়েরি' পত্রিকার ফেব্রুয়ারি সংখ্যায়, দ্বিতীয়, তৃতীয়, পঞ্চম এবং ষষ্ঠ, এই চারটি সুত্ত কী ছিল, এই সম্বন্ধে চর্চা করিয়াছিলাম। তাহাতে আমি যে-সব সুত্ত নির্ধারণ করিয়াছিলাম, সেগুলি এখন সকলেই মানিয়া লইয়াছেন। শুধু প্রথম সুত্তটির কোনো হদিস আমি তৎকালে পাই নাই। "বিনয়সমুকসে (বিনয়সমুৎকর্ষ)" এই শব্দটির বিনয়-গ্রন্থের সহিত একটা-কিছু সম্বন্ধ থাকিতে বাধ্য, আমার এইরকম মনে হইয়াছিল; কিন্তু এইরকম উপদেশ কোথাও বাহির করিতে না পারায়, এই সুত্তটি যে আসলে কী, তাহা আমি নির্ধারণ করিতে পারি নাই।

কিন্তু বিনয় শব্দের অর্থ বিনয়-গ্রন্থ, এইরূপ মানিয়া লইবার কোনো কারণ নাই। "অহং খো কেসি পুরিসদম্মং সন্হেন পি বিনেমি ফরুসেন পি বিচনমি।" (অঙ্গুত্তর চতুক্কনিপাত, সুত্ত সংখ্যা ১১১); "তমেনং তথাগতৌ উত্তরিং বিনেতি' (মজ্ঝিম, সুত্ত সংখ্যা ১০৭); "যন্নুনাহং রাহুলং উত্তরিং আসবানং খয়ে বিনেয্যং তিঁ' (মজ্ঝিম, সুত্ত সংখ্যা ১৪৭) ইত্যাদি স্থলে বি-পূর্বক নী ধাতুর অর্থ শিক্ষা দেওয়া; এবং এইজন্যই পরে, 'বিনয়ের' অর্থাৎ 'শিক্ষার নিয়মগুলিকে বিনয়পিটক বলা হইতে থাকিল। বুদ্ধ যখন ভিক্ষুধর্মে দীক্ষা দিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, তখন বিনয়গ্রন্থের আদৌ কোনো অস্তিত্ব ছিল না। যাহা-কিছু উপদেশ ছিল, সে সবই সুত্তের আকারে ছিল। বুদ্ধ যে-পাঁচজন ভিক্ষুকে সর্বপ্রথম শিষ্য করিয়াছিলেন, তাহাদিগকে "ধম্মচক্কপবত্তন-সুত্ত" নামক উপদেশ দিয়াই শিষ্য করিয়াছিলেন সুতরাং বিনয় শব্দের মূল অর্থ শিক্ষা, এই রকমই ধরিয়া লইতে হইবে; এবং এই বিনয়ের-সমুৎকর্ষ মানে বুদ্ধের সর্বোৎকৃষ্ট ধর্মোপদেশ। যদিও পালিসাহিত্যে "সমুক্কংস" শব্দটি বুদ্ধোপদেশের বাচকরূপে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায় না, তবু ঐ অর্থে "সামুক্কংসিকা ধম্মদেসনা" এই কথাগুলি পালিসাহিত্যের বহু জায়গায় দেখিতে পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ, দীঘনিকায়ের অম্বঠ্‌ঠসুত্তের শেষদিকে যে-কয়েকটি কথা আছে তাহা লক্ষ্য করুন—"যদা ভগবা অঞ্ঞাসি ব্রাহ্মণং পোক্‌খরসাতিং কল্লচিত্তং মুদুচিত্তং পসন্নচিত্তং, অথ যা বুদ্ধানং সামুক্কংসিকা ধম্মদেসনা তং পকাসেসি দুক্‌খং সমুদয়ং নিরোধং মগ্‌গং" ("ভগবান্ বুদ্ধ

যখন জানিতে পারিলেন যে, পৌষ্করস প্রভৃতি ব্রাহ্মণদের চিত্ত সময়োচিত, মৃদু, আবরণমুক্ত, একাগ্র এবং প্রসাদগুণসম্পন্ন হইয়াছে, তখন তিনি তাঁহার সর্বোৎকৃষ্ট ধর্মোপদেশ প্রকাশ করিলেন। ঐ ধর্মোপদেশ কি? তাহা হইতেছে দুঃখ, দুঃখসমুদয়, দুঃখনিরোধ এবং দুঃখনিরোধের উপায়")।

শুধু এই সুত্তেই নয়, অধিকন্তু মজ্ঝিমনিকায়ে উপালিসুত্তের মতন অন্যান্য সুত্তেও এবং বিনয়পিটকের অনেক স্থলেই, এই বাক্যগুলি রহিয়াছে। তাহাদের মধ্যে কেবল এইটুকু পার্থক্য দেখা যায় যে, এখানে উক্ত বাক্যগুলি পোক্খরসাতি ব্রাহ্মণকে উদ্দেশ করিয়া বলা হইয়াছে, এবং সেখানে উপালি প্রভৃতি গৃহস্থদিগকে উদ্দেশ করিয়া বলা হইয়াছে। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, বিনয়সমুৎকর্ষ শব্দের অর্থ নিম্নলিখিতরূপ করিতে হইবে। বিনয় মানে উপদেশ এবং তাহার সমুৎকর্ষ মানে এই সামুৎকর্ষিকা ধর্মদেশনা। ইহাতে কোনো সন্দেহ নাই যে, এককালে এই চারটি আর্যসত্যের উপদেশকে বিনয়সমুক্কংস বলা হইত। "ধম্মচক্কপবত্তনসুত্ত", এই নামটি অশোকের অনেক কাল পরে প্রচলিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। খুব সম্ভবত চক্রবর্তী রাজার কথা লোকপ্রিয় হওয়ার পর, বুদ্ধের উক্ত উপদেশগুলিকে এই জমকাল নামখানা দেওয়া হইয়াছিল।

"বিনয়সমুকসে" মানে ধম্মচক্কপবত্তনসুত্ত, এইরূপ মানিয়া লইলে, ভাব্রূশিলালিপিতে লিখিত উপদেশসাতটির মূল বৌদ্ধসাহিত্যে পরিদৃষ্ট হয়; এবং তাহা নিম্নলিখিতরূপে পরিদৃষ্ট হয় ঃ

১. বিনয়সমুকসে = ধম্মচক্কপবত্তনসুত্ত
২. অলিয়বসানি = অরিয়বংসা (অঙ্গুত্তর চতুক্কনিপাত)
৩. অনাগতভয়ানি = অনাগতভয়ানি (অঙ্গুত্তর পঞ্চকনিপাত)
৪. মুনিগাথা = মুনিসুত্ত (সুত্তনিপাত)
৫. মোনেয়সুতে = নালকসুত্ত (সুত্তনিপাত)
৬. উপতিসপসিনে = সারিপুত্তসুত্ত (সুত্তনিপাত)
৭. লাঘুলোবাদ = রাহুলোবাদ (মজ্ঝিমসুত্ত নং ৬১)

এই সাতটির ভিতর ধম্মচক্কপবত্তন যত্রতত্র উপলব্ধ হয়। অতএব ইহার যে বিশেষ গুরুত্ব আছে, তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন; আর অশোকও উহাকে সর্বাপেক্ষা উচ্চাসন দিয়াছিলেন। বাকিগুলির মধ্যে, তিনটি একখানা ছোট্ট সুত্তনিপাতে পরিদৃষ্ট হয়। ইহাতে সুত্তনিপাতের প্রাচীনতা প্রমাণিত হয়। তাহার শেষের দুইটি বগ্গের উপর, এবং খগ্গবিসাণসুত্তের উপর 'নিদ্দেস' নামক একটি বিস্তৃত টীকা রহিয়াছে এবং তাহাও এই খুদ্দকনিকায়েই সমাবিষ্ট। সুত্তনিপাতের এই অংশটি নিদ্দেশের একশো-দুইশো বৎসর পূর্বেও বিদ্যমান ছিল বলিয়া মানা উচিত। এবং ইহা হইতেও সুত্তনিপাতের প্রাচীনত্ব প্রমাণিত হয়। ইহার সবগুলি সুত্তই যে অত্যন্ত প্রাচীন, এমন নহে; তথাপি ইহার অধিকাংশ সুত্তই নিঃসংশয়ে বেশ পুরাতন। বর্তমান গ্রন্থে বুদ্ধচরিত্র সম্বন্ধে, অথবা বুদ্ধের উপদেশ সম্বন্ধে, যে আলোচনা করা হইয়াছে, তাহা এইপ্রকার প্রাচীন সুত্তেও উপর নির্ভর করিয়াই করা হইয়াছে।

এখন স্বয়ং বুদ্ধের জীবন সম্বন্ধে দুই-এক কথা বলা যাউক। ত্রিপিটকের একই স্থলে বুদ্ধের সম্পূর্ণ জীবনকাহিনী পাওয়া যায় না। উহা জাতক-অট্‌ঠ-কথার নিদানকথাতে পাওয়া যায়। এই অট্‌ঠকথা বুদ্ধঘোষের সময় অর্থাৎ পঞ্চম শতাব্দীতে লিখিত হইয়া থাকিবে। তৎপূর্বে যে-সব সিংহলদেশীয় অট্‌ঠকথা ছিল, তাহাদের অনেক বিষয়বস্তুই এই অট্‌ঠকথাতেও গৃহীত হইয়াছে। বুদ্ধের এই জীবনচরিত মুখ্যত ললিতবিস্তরের ভিত্তিতে রচিত হইয়াছে। ললিতবিস্তর খৃষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে অথবা তাহারও কয়েকবৎসর পূর্বে লিখিত হইয়া থাকিবে। উহা মহাযান সম্প্রদায়ের গ্রন্থ; আর উহারই উপর নির্ভর করিয়া জাতক-অট্‌ঠকথার রচয়িতা বুদ্ধজীবনী লিখিয়াছেন। ললিতবিস্তর গ্রন্থটিও দীঘনিকায়ের মহাপদানসুত্তের অবলম্বনে রচিত হইয়াছিল। এই সুত্তে বিপস্‌সী বুদ্ধের জীবনী অত্যন্ত বিস্তারের সহিত দেওয়া হইয়াছে; এবং এই জীবনীর ভিত্তিতেই ললিতবিস্তরের লেখক তাহার পুরাণ রচনা করিয়াছেন। এইভাবে, গৌতমবুদ্ধের জীবনচরিতে অনেক বাজে জিনিস ঢুকিয়াছে।

মহাপদানসুত্তের কোনো কোনো অংশ সুত্তপিটকেই গৌতমবুদ্ধের জীবন-কাহিনীতে জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। উদাহরণস্বরূপ তিন প্রাসাদের কাহিনীটি ধরা যাউক। বিপস্‌সী রাজকুমারের থাকিবার জন্য তিনটি প্রাসাদ ছিল, তদনুসারে গৌতমবুদ্ধেরও থাকিবার জন্য ঐরকম প্রাসাদ আবশ্যক ভাবিয়া, গৌতমবুদ্ধের মুখ দিয়া এইরূপ কথা বলানো হইয়াছে যে, তাঁহারও থাকিবার জন্য তিনটি প্রাসাদ ছিল এবং তিনি ঐ প্রাসাদগুলিতে অত্যন্ত বিলাসিতায় দিনযাপন করিতেন। অবশ্য, আমি স্পষ্টভাবে দেখাইয়াছি যে, এই কাহিনী সত্য হইতে পারে না (পৃ. ৭২)। কিন্তু এই কাহিনী অঙ্গুত্তরনিকায়ে আছে; এবং ঐ নিকায়েই অশোকের ভাব্রূ শিলালিপির দুইটি সুত্ত দেখিতে পাওয়া যায়। এইজন্য আমি এককালে ভাবিয়াছিলাম যে, এই কাহিনীটির ঐতিহাসিক সত্যতা আছে; কিন্তু বিচার করিয়া বুঝিতে পারিলাম যে, এই অঙ্গুত্তরনিকায়ের অনেক অংশই পরবর্তী কালে ঢোকানো হইয়াছিল। তিনটি বস্তুর সম্বন্ধে যত-সব কাহিনী আছে, সে-সব তিকনিপাতে সংগ্রহ করা হইয়াছে। তাহাতে প্রাচীন কিংবা আধুনিক, এই দুইয়ের মধ্যে কোনো পার্থক্য করা হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না।[১]

এইরকম কাহিনী হইতে বুদ্ধচরিত্র সম্বন্ধে বিশ্বাসযোগ্য কথা কী করিয়া বাহির করা যায়, তাহা দেখাইবার উদ্দেশ্যেই, আমি এই পুস্তক লিখিয়াছি। হয়তো, এইরকম কোনো কোনো খাঁটি কথা আমার দৃষ্টিতে ধরা পড়ে নাই; এবং যে-সব কথার তেমন মূল্য নাই আমি তাহাদের উপরও গুরুত্ব আরোপ করিয়াছি। তথাপি গবেষণা করিবার প্রণালীতে আমার কোনো ভুল হইতে পারে, এরকম আমার মনে হয় না। আমার বিশ্বাস, এই প্রণালী অবলম্বন করিলে, বুদ্ধচরিত্রের উপর ও তৎকালীন ইতিহাসের উপর, বিশেষ আলোকপাত হইবে; এবং এই উদ্দেশ্যেই আমি বর্তমান পুস্তক লিখিয়াছি। এই পুস্তকের কোনো কোনো

---

১. মহাপদানসুত্তে বিপস্‌সী বুদ্ধের যে পৌরাণিক কাহিনী আছে, তাহা ক্রমশ গৌতমবুদ্ধের চরিত্রে কি করিয়া ঢুকিল এবং তাহাদের ভিতর কোন্ কোনটি সুত্তপিটকে পাওয়া যায়, তাহা দ্বিতীয় খণ্ডের শেষে পরিশিষ্টে পাঠক দেখিতে পাইবেন।

অংশ কয়েক বৎসর পূর্বেই ‘পুরাতত্ত্ব’ নামক ত্রৈমাসিক পত্রিকাতে এবং ‘বিবিধ জ্ঞানবিস্তার’ নামক মাসিক পত্রিকায় ছাপা হইয়াছিল। তথাপি ঐ-সব অংশ যে বর্তমান পুস্তকে অপরিবর্তিত অবস্থায় গৃহীত হইয়াছে, তাহা নহে। উহাতে অনেক পরিবর্তন হইয়াছে। ঐ-সব প্রবন্ধের অনেক তথ্যই বর্তমান পুস্তকেও গৃহীত হইয়াছে বটে, তথাপি এই পুস্তক একেবারে নূতন, এইরকম বলিলেও আপত্তি নাই।

এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি যখন নবভারত গ্রন্থমালার সম্পাদক পড়িয়া দেখিলেন, তখন তিনি, এই গ্রন্থে বিশেষভাবে আলোচিত হয় নাই, এমন কয়েকটি বিষয়ের দিকে, আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করিলেন। তৎসম্বন্ধে, এখানেই স্বল্পপরিসরে, দুই-এক কথা বলা সমীচীন হইবে মনে করিয়া, এখানেই তাহা বলিতেছি—

১. বুদ্ধের জন্মতারিখ সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন মত পাঠকের সম্মুখে রাখিয়া, তাহাদের সপক্ষে কিংবা বিপক্ষে কী প্রমাণ আছে, তৎসম্বন্ধে উহাপোহ করিয়া, বর্তমান গ্রন্থে আলোচনা করা উচিত ছিল না কি? আমাদের পুরাতন অথবা মধ্যযুগীয় ইতিহাসের রাজনৈতিক নেতা, ধর্মগুরু, গ্রন্থকার, প্রমুখের চরিত্র-বর্ণনা করিতে হইলে, প্রথমে তাহাদের কালনির্ণয়ের জন্য পণ্ডিতদিগকে যথেষ্ট তথ্য কাজে লাগাইতে হয়; এই গ্রন্থে সেরকম কিছু করা হইয়াছে বলিয়া লক্ষিত হয় না।

এই বিষয়ে আমার বক্তব্য এই ঃ মধ্যযুগীয় কবি ও গ্রন্থকারগণ, কোনো সন প্রতিষ্ঠা করেন নাই। তাঁহাদের জন্মতারিখ সম্বন্ধে যতই না বাদবিবাদ করা যাউক, তাহা একেবারে নির্ভুলভাবে নির্ধারণ করা যাইবে বলিয়া আমার মনে হয় না। বুদ্ধের কথা পৃথক্। তাঁহার পরিনির্বাণ হইতে আরম্ভ করিয়া আজ পর্যন্ত তাঁহার নামে প্রচলিত সন চলিয়া আসিতেছে। মাঝে পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতরা বাদবিবাদ করিয়া বুদ্ধের জন্মদিনের তারিখে ছাপ্পান্ন হইতে পঁয়ষট্টি বৎসর পর্যন্ত তফাত আছে, এইরকম প্রমাণ করিবার, চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু পরিশেষে ইহা স্বীকৃত হইল যে, সিংহল দ্বীপে তাঁহার জন্মতারিখ সম্বন্ধে যে পরম্পরা চলিয়া আসিয়াছে, তাহা নির্ভুল। কিন্তু ধরা যাউক যে, বুদ্ধের জন্মতিথিতে সামান্য কিছু, অল্প বা বেশি, তফাত আছে। তবুও উহাতে বুদ্ধের চরিত্রের মূল্য কিছু কমিয়া যাইবে এমন মনে হয় না। এখানে গুরুত্বপূর্ণ কথা জন্মতারিখ নয়, কিন্তু তাঁহার জন্মের পূর্বে সমাজের অবস্থা কি রকম ছিল এবং তাহা হইতে বুদ্ধ কি করিয়া নূতন ধর্মমার্গ আবিষ্কার করিলেন, তাহা; আর ইহা স্পষ্টভাবে বুঝিতে পারিলে, আজকাল বুদ্ধ সম্বন্ধে যে অনেক ভ্রান্ত ধারণা আছে, সেগুলি দূর হইবে এবং আমরা তৎকালীন ইতিহাস ঠিক ঠিক ভাবে বুঝিতে পারিব। সুতরাং জন্মতারিখ নির্ধারণ করিবার জন্য পুস্তকের অনেকগুলি পৃষ্ঠা খরচ না করিয়া, বুদ্ধের চরিত্রের উপর যাহার দ্বারা আলোকসম্পাত হইবে, এমন সব তথ্যের দিকেই বিশেষ লক্ষ্য দেওয়া হইয়াছে।

২. অনেক স্থলে, এই রকম মত প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, বুদ্ধের উপদিষ্ট অহিংসা-ধর্মের দ্বারা ভারতবর্ষের জনসমাজ ভীতু ও দুর্বল হইয়াছে, ও তজ্জন্যই বিদেশী লোকেরা ভারতবর্ষ জয় করিতে পারিয়াছে। আমার সমালোচকের বক্তব্য এই যে, বর্তমান গ্রন্থে এই মতের সমালোচনা এবং জবাব দেওয়া উচিত ছিল।

উত্তর—বুদ্ধের চরিত্রের সহিত উক্ত মতের কিছুমাত্র সম্বন্ধ আছে বলিয়া আমার মনে হয় না। খৃস্টপূর্ব ৫৪৩ সনে বুদ্ধ পরিনির্বাণ লাভ করিয়াছিলেন। ইহার দুই শতাব্দী পর, চন্দ্রগুপ্ত নিজে জৈনধর্মাবলম্বী ছিলেন। তথাপি তাঁহার গ্রীকদিগকে এই দেশ হইতে বাহির করিয়া দেওয়ার কাজে, জৈনদের অহিংসাধর্ম কোনোরকম অন্তরায় হয় নাই। চন্দ্রগুপ্তের পৌত্র অশোক পুরাপুরি বৌদ্ধ হইয়াছিলেন। তথাপি তিনি মস্ত বড়ো সাম্রাজ্য শাসন করিতেন।

৭১২ খৃস্টাব্দে মহম্মদ ইবন্ কাসিম সিন্ধুদেশ আক্রমণ করিয়াছিল। কিন্তু তখন পশ্চিম ভারতবর্ষ হইতে বৌদ্ধ ধর্ম বিলুপ্ত হইয়াছিল এবং ব্রাহ্মণ্যধর্মের আধিপত্য বাড়িয়া যাইতেছিল। এই রকম অবস্থাতেও, খলিফার এই অল্পবয়স্ক সর্দার, দেখিতে-না-দেখিতে, সিন্ধুদেশ জয় করিয়া ফেলিল; এবং সেখানকার হিন্দুরাজাকে বধ করিয়া, তাঁহার কন্যাকে নিজ খলিফার নিকট উপঢৌকনরূপে পাঠাইয়া দিল।

মুসলমানরা সিন্ধুদেশ এবং পাঞ্জাবের কিয়দংশ নিজেদের অধীনে আনার একশত বৎসরের ভিতর, শঙ্করাচার্যের উদয় হইয়াছিল। তাঁহার বেদান্তের একটি প্রধান কথা এই ছিল যে, শূদ্ররা কখনো বেদ অধ্যয়ন করিতে পারিবে না। যদি কোনো শূদ্র দৈবাৎ বেদবাক্য শুনিয়া ফেলে, তাহা হইলে তাহার কান সীসা কিংবা লাক্ষা দিয়া ভরিয়া দিবে; সে যদি বেদবাক্য উচ্চারণ করে, তাহা হইলে তাহার জিভ কাটিয়া দিবে; আর যদি সে বেদমন্ত্র মুখস্থ করে তাহা হইলে তাহাকে একেবারে মারিয়া ফেলিবে। ইহাই তো হইল শঙ্করাচার্যের বেদান্ত। আমাদের এই সনাতনপন্থী আচার্য কি ভারতবর্ষের বিজেতা মুসলমানদের নিকট হইতে এই শিক্ষা গ্রহণ করিলেন? বুদ্ধ তো তাঁহার শত্রুই, শত্রুর নিকট শিখিবার মতই কিই বা ছিল?

রাজপুতরা বেশ ভালো সনাতনপন্থী, তাহারা আদৌ অহিংসাধর্ম মানিত না। সুযোগ পাইলেই তাহারা পরস্পরের সঙ্গে ইচ্ছামত যুদ্ধ করিত। হিংসাধর্মের এইসব বীর ভক্তদিগকে মহমুদ গজনী কি করিয়া ঘোড়ার পায়ের নীচে ধুলার মতো মাড়াইয়া উদ্বাস্ত করিল? তাহারা বুদ্ধের অহিংসাধর্ম মানিত বলিয়াই কি তাহাদের এই দুরবস্থা হইয়াছিল?

আমাদের পেশবা-রাজত্ব তো নিশ্চয়ই ব্রাহ্মণদের হাতেই ছিল। শেষের বাজীরাও খুবই আচারসম্পন্ন বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। পেশবারাজ্যে হিংসার পরাকাষ্ঠা হইয়াছিল। অন্যের সহিত যুদ্ধের কথা তো দূরেই থাকিল; একবার নিজেদের দেশেই দৌলতরাও শিন্দে পুণাশহর লুণ্ঠন করিয়াছিলেন ও দ্বিতীয়বার যসবন্তরাও হোলকর পুণা-শহর লুণ্ঠন করিয়াছিলেন। এইভাবে যাহারা হিংসাধর্মের অসীম ভক্ত ছিল, তাহাদের সাম্রাজ্য সমস্ত ভারতবর্ষে ছড়াইয়া পড়া উচিত ছিল না কি? তাহাদের চেয়ে শতগুণ অহিংসক যে ইংরাজ, সেই ইংরাজের অধীনতা তাহাদিগকে কেন গ্রহণ করিতে হইল? একের পর এক করিয়া, সব মারাঠী সর্দারই কেন ইংরাজের অধীন হইল? তাহারা বুদ্ধের উপদেশ মানিত, এইজন্যই কি?

জাপান হাজার-বারোশত বৎসর যাবৎ আজ পর্যন্ত বৌদ্ধধর্মাবলম্বী। ১৮৫৩ সালে তাহাদের দিকে কমোডোর পেরী যখন কামান রাখিয়া তাহা দাগাইবার জন্য প্রস্তুত হইল, তখন তাহারা সজাগ হইয়া কেমন করিয়া একতাবদ্ধ হইল? বৌদ্ধধর্ম তাহাদিগকে দুর্বল ও ভীরু বানাইতে পারিল না কেন?

লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যাখ্যাকারদিগকে অবশ্যই এই প্রশ্নের জবাব দিতে হইবে। "নিজের দোষ অন্যের গায়ে আরোপ করিয়া বিজ্ঞতার বড়াই করে।" কবি মোরোপন্তের এই কথাটি যেন এই সকল লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যেই লিখিত হইয়াছিল! ইহারা এবং ইহাদের পূর্বপুরুষেরা যে পাপ করিয়াছিল, সে-সব বুদ্ধের মাথায় ভাঙিয়া, তাহারা নিজেরা নির্দোষ ও বুদ্ধিমান, এই দাবি করিয়া বিচরণ করিতেছে!

৩. সম্বোধিজ্ঞান লাভের পর, কালক্রমের সহিত, বুদ্ধের জীবনচরিতের একটি মোটামুটি নক্‌শা কেন দেওয়া হইল না?

উত্তর—বর্তমানে যেটুকু প্রাচীন সাহিত্য পাওয়া যায়, তাহার উপর নির্ভর করিয়া, এইরূপ নক্‌শা তৈয়ার করা সম্ভবপর নয়। বুদ্ধের উপদেশগুলি, তাহাদের কালক্রম প্রদর্শনপূর্বক, কোথাও দেওয়া হয় নাই। শুধু তাহাই নহে, যে-সব উপদেশ আমাদের কাছে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, সেগুলির ভিতরও যথেষ্ট প্রক্ষিপ্ত অংশ রহিয়াছে। তাহাদের ভিতর হইতে সত্য সন্ধান করিয়া আবিষ্কার করা বেশ কঠিন। আমি এই গ্রন্থে তাহা করিবার চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু বুদ্ধের জীবনচরিতের কালক্রমানুযায়ী নক্‌শা তৈয়ার করা সম্ভবপর হয় নাই।

৪. "বৈদিক সংস্কৃতি" ভারতবর্ষে আর্যদের আসার পর উৎপন্ন হইয়াছিল এবং তাহার পূর্বে "দাসদের" অর্থাৎ ব্রাহ্মণদের সংস্কৃতি বিদ্যমান ছিল—এই কথার প্রমাণ কি?

উত্তর—এই প্রশ্নের আলোচনা আমি 'হিন্দী, সংস্কৃতি, আণি, অহিংসা' নামক গ্রন্থের প্রথম পরিচ্ছেদে করিয়াছি। বর্তমান পুস্তকের সহিত ঐ গ্রন্থ পড়িলে, অনেক সমস্যার সমাধান হইয়া যাইবে। আমার কথা সকলেই গ্রহণ করুক, আমরা মোটেই এইরূপ দুরাগ্রহ নাই। এই মতটি বিচারের যোগ্য মনে করিয়া, আমি তাহা পাঠকের সম্মুখে রাখিয়াছি। বুদ্ধের জীবনচরিতের সহিত দাস ও আর্যের সংস্কৃতির সম্বন্ধ খুবই অল্প। এই দুই সংস্কৃতির সংঘর্ষ হইতে যে-বৈদিক সংস্কৃতির উৎপত্তি হইয়াছিল, তাহা বুদ্ধের সময় সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছিল—শুধু এইটুকু দেখাইবার জন্য, আমি বর্তমান গ্রন্থের প্রথম পরিচ্ছেদটি লিখিয়াছি।

৫. উপনিষদ্ এবং গীতা যে বুদ্ধের সময়ের পরি চরিত হইয়াছিল, ইহার প্রমাণ কি?

উত্তর—এই প্রশ্নেরও বিস্তৃত আলোচনা আমি 'হিন্দী, সংস্কৃতি, আণি, অহিংসা' নামক পুস্তকে করিয়াছি[১]; সুতরাং এই বিষয়ের পুনরুক্তি বর্তমান পুস্তকে করা হয় নাই। উপনিষদ্ কেন, আরণ্যক-ও যে বুদ্ধের পরে লিখিত হইয়াছিল, তাহা আমি বেশ সবল যুক্তির সাহায্যে দেখাইয়া দিয়াছি। শতপথ ব্রাহ্মণে ও বৃহদারণ্যক উপনিষদে, যে-বংশাবলী দেওয়া আছে, তাহা হইতে বুঝা যায় যে, বুদ্ধের পর পয়ত্রিশ পুরুষ পর্যন্ত তাহাদের পরম্পরা চলিয়াছিল। হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী প্রত্যেক পুরুষে ত্রিশ বৎসর গণনা করিয়া থাকেন। কিন্তু কমের পক্ষে, পঁচিশ বৎসর গণনা করিলেও, বুদ্ধের পর এই পরম্পরা ৮৭৫ বৎসর পর্যন্ত চলিয়াছিল, এই রকম বলিতে হয়। অর্থাৎ সমুদ্রগুপ্তের কাল পর্যন্ত, এই পরম্পরা চলিয়াছিল, এবং ঐ সময় ব্রাহ্মণ ও উপনিষদ্ একটা স্থির আকার ধারণ করিল। তৎপূর্বে যে

---

১. দ্রষ্টব্য পৃ. ৪৮-৫০ এবং ১৭০-১৭২।

যথাযোগ্যস্থানে ইহাদের ভিতর কোনো পরিবর্তন হয় নাই, এমন নহে। পালিসাহিত্যেও ঐরকমই ঘটিয়াছিল। বুদ্ধঘোষের পূর্বে মোটামুটি দুই শত বৎসরের মধ্যে, পালি সাহিত্য স্থির আকার ধারণ করিয়াছিল; এবং বুদ্ধঘোষ অট্ঠকথা (টীকা) লেখার পর, পালি সাহিত্যের উপর শেষ ছাপ পড়িয়াছিল। উপনিষদের টীকা তো শঙ্করাচার্য নবম শতাব্দীতে লিখিয়াছিলেন। তৎপূর্বে গৌড়পাদের মাণ্ডুক্যকারিকা লিখিত হইয়াছিল; তাহাতে তো যেখানে-সেখানে বুদ্ধের স্তুতি রহিয়াছে। বেশিদূর যাওয়ার প্রয়োজন কি? আকবরের রাজত্বকালে লিখিত অল্লোপনিষদ্ও উপনিষদ্ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে!

উপনিষদ্গুলি যে উহাদের আত্মবাদ ও তপশ্চর্যা শ্রমণসম্প্রদায়গুলির নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছিল, তৎসম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কোনো কারণ নাই। কেননা, এই দুইটি বিষয়ের কোনোটিরই যজ্ঞসংস্কৃতির সহিত কোনো সম্বন্ধ নাই। আজকাল যেমন আর্য-সমাজ ও ব্রাহ্ম-সমাজের লোকেরা বাইবেলে প্রচারিত একেশ্বরবাদ বেদ কিংবা উপনিষদের উপর আরোপ করিতে চায়, তেমনই উপনিষদ্গুলিও বেদের উপর আত্মবাদ ও তপশ্চর্যার আরোপ করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। শুধু এইসব গ্রন্থে শ্রমণদের অহিংসাধর্ম স্বীকার করা হয় নাই; এবং ঐটুকুর জন্যই উপনিষদ্গ্রন্থ বৈদিক রহিয়া গেল। ইহা সত্ত্বেও আজও বৈদিক কর্মে শ্রদ্ধাশীল মীমাংসকরা উপনিষদ্গুলিকে বেদের অন্তর্গত বলিয়া মানিতে রাজী নয়।

যাঁহাদের পক্ষে পালিসাহিত্য কিংবা তাহার ইংরেজী অনুবাদ পড়া সম্ভবপর, তাঁহারা বৌদ্ধযুগের ইতিহাস সম্বন্ধে গবেষণা করিবার সময়, আমার এই পুস্তকটি কাজে লাগাইতে পারিবেন, আমি এইরূপ আশা পোষণ করি। কিন্তু যাঁহাদের পক্ষে তাহা সম্ভবপর নয়, তাঁহারা অবশ্যই অন্তত নিম্নলিখিত পাঁচটি পুস্তক পড়িবেন ঃ ১. বুদ্ধ, ধর্ম, আণি সংঘ। ২. বুদ্ধলীলা সার সংগ্রহ। ৩. বৌদ্ধ সংঘাচা পরিচয়। ৪. সমাধি মার্গ। ৫. হিন্দী সংস্কৃতি আণি অহিংসা।

জনসমাজে প্রসিদ্ধ হইবার জন্য এই পুস্তক লেখা হয় নাই; শুধু সত্য অন্বেষণের উদ্দেশ্যেই ইহা লিখিত হইয়াছে। লোকেদের নিকট এই পুস্তক কতখানি ভালো লাগিবে, সে সম্বন্ধে আমার সন্দেহ আছে। ইহা সত্ত্বেও, "সুবিচার প্রকাশন মণ্ডলের" সঞ্চালকরা এই পুস্তক তাঁহাদের গ্রন্থমালায় গ্রহণ করিলেন, ইহার জন্য আমি তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ। পক্ষপাত না করিয়া, প্রাচীন ইতিহাসের আলোচনা করে, এই রকম বহু মহারাষ্ট্রীয় পাঠক আছেন এবং আমি আশা করি যে, তাঁহারা এই গ্রন্থটিকে আশ্রয় দিয়া "সুবিচার প্রকাশন মণ্ডলের" প্রযত্ন সফল করিবেন।

অধ্যাপক শ্রীনিবাস নারায়ণ বনহট্টি প্রুফ্ দেখার কাজে সাহায্য করায়, আমি তাঁহাকে ধন্যবাদ জানাইতেছি।

ধর্মানন্দ কোসম্বী

প্রথম পরিচ্ছেদ

আর্যদের জয়

উষাদেবী সূক্তসমূহ

ঋগ্‌বেদে উষাদেবীর যে-সব সূক্ত দেখা যায়, তাহাদের উপর নির্ভর করিয়া লোকমান্য তিলক তাঁহার *The Arctic Home in the Vedas* পুস্তকে প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, এককালে আর্যগণ উত্তরমেরুর নিকট বসবাস করিতেন। "সদৃশীরদ্য সদৃশীরিদু শ্বো দীর্ঘং সচন্তে বরুণস্য ধাম।"— ঋ ১।১২৩।৮ (আজ ও আগামীকাল উভয়ে একই রকম। উহারা দীর্ঘকাল পর্যন্ত বরুণের গৃহে গিয়া থাকে।)[১] লোকমান্যের মতে, বর্তমান ও তৎসদৃশ অন্যান্য ঋক্‌সমূহ উত্তরমেরুস্থ উষাকালকে উদ্দেশ করিয়া রচিত হইয়াছে। দীর্ঘকাল পর্যন্ত উষা বরুণগৃহে গিয়া থাকে, অর্থাৎ ঐদেশে ছয়মাস অন্ধকার থাকে এইরূপ অর্থ করিতে হইবে। কিন্তু এই সূক্তের দ্বাদশ ঋকে উষাদেবীর সম্বন্ধে "অশ্বাবতী গোমতী বিশ্ববারা" এইরকম বিশেষণ দেখা যায়। ইহার অর্থ যাহাদের নিকট অনেক ঘোড়া ও গোরু আছে[২] কিন্তু আজকাল উত্তর মেরুর দিকে ঘোড়া ও গোরু নাই; আর হাজার হাজার বৎসর আগে যে সেখানে এইসব পশু ছিল, তাহারও কোনো প্রমাণ নাই। শুধু এই সূক্তটিতেই নয়, অধিকন্তু উষাদেবীর অন্যান্য সূক্তগুলিতেও তিনি যে অশ্ব ও গোরুর প্রদাত্রী ছিলেন, তাহার যথেষ্ট নিদর্শন দেখা যায়। ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে, এইসব ঋক্ ও সূক্ত উত্তর মেরুর নিকটস্থ দেশে রচিত হয় নাই।

ইশ্‌তর

তাহা হইলে উষা দীর্ঘকাল পাতালে গিয়া থাকে, ইহার কিরকম ব্যাখ্যা করা উচিত? বহু প্রাচীন কাল হইতে ব্যাবিলন দেশের লোকদের ভিতর ইশ্‌তর নামক কোনো-এক দেবতার সম্বন্ধে যে পৌরাণিক কথা চলিয়া আসিয়াছে,[৩] তাহার সাহায্যে উক্ত ঋক্‌টির অর্থ সহজেই বুঝা যাইতে পারে। পৌরাণিক গল্পটি এই ঃ তম্মুজ অথবা দমুৎসি (বৈদিক দমূনস) নামক একজন দেবতার সহিত ইশ্‌তর প্রেমে বাঁধা পড়ে। কিন্তু তম্মুজ হঠাৎ মারা যায়। তাহাকে আবার বাঁচাইবার উদ্দেশ্যে অমৃত আনিবার জন্য ইশ্‌তর পাতালে প্রবেশ করে। সেখানকার রানী অল্লতু ইশ্‌তরের বোন; আর এই রানী ইশ্‌তরকে নানা ভাবে যন্ত্রণা দেয়। ক্রমশঃ তাহার সব গহনাপত্র তাহার নিকট হইতে কাড়িয়া লওয়া হইল; তাহার পর, তাহকে কোনো কঠিন রোগে ভোগাইয়া, কারাগারে বন্দী করিয়া রাখা হইল। চারি কিংবা ছয়মাস

---

১. "Arctic Home in the Vedas" পৃ. ১০৩ দ্রষ্টব্য।

২. এখানে 'উষা' শব্দ বহুবচনে ব্যবহৃত হইয়াছে।

৩. Lewis Spence : Myths and legends of Babylonia and Assyria (1926) pp. 125-131.

দুঃখ ও কারাবাস ভোগ করার পর, অল্লতুর কাছ হইতে ইশ্‌তর অমৃত পাইল। ইহার পর, সে পুনরায় পৃথিবীতে ফিরিয়া আসিল। ইশ্‌তর সম্বন্ধে আরো অনেক পৌরাণিক গল্প আছে; কিন্তু ইহাদের মধ্যে এইটিই মূখ্য বলিয়া মানা হয়। ব্যাবিলনীয় সাহিত্যে সর্বত্র ইশ্‌তরের বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের আলোচ্য ঋক্‌গুলি এই পৌরাণিক কাহিনীর সহিত সম্বন্ধ। ইহাতে সন্দেহ করিবার কারণ নাই।

যে ঋতুতে ইশ্‌তর পাতাল হইতে উপরে উঠিয়া আসে বলিয়া কথিত আছে সেই ঋতুতে তাহার একটি উৎসব করা হইত ও লাল রঙের গোরুর গাড়িতে তাহার রথযাত্রা হইত। ঘোড়া আবিষ্কারের পর, ইশ্‌তরের রথ ঘোড়া দিয়া টানা হইত। "এষা গোভি বরুণভির্য্যুজানা।"—ঋ ৫।৮০।৩ (এই উষা, যাহার রথে লাল রঙের বলদ জোড়া হইয়াছে)। "বিতদ্যযুররুণযুগ্‌ভি রশ্বৈঃ"—ঋ ৬।৬৫।২ (অরুণ রঙের ঘোড়ার রাথে উষাদেবী আসিলেন)।

যুদ্ধে ঘোড়ার ব্যবহার

খৃস্টপূর্ব দুই হাজার সনে ব্যাবিলন দেশে ঘোড়ার ব্যবহার আদৌ জানা ছিল না। রথে বলদ অথবা গাধা জোড়া হইত আর ঐ দেশের লোকেরা ঘোড়াকে বন্য গাধা বলিত। ব্যাবিলন দেশের উত্তর দিকে পার্বত্য অঞ্চলে, কেশী নামক এক জাতীয় লোক বাস করিত। ইহারাই প্রথমে মাল বহনের কাজে ঘোড়ার ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। বৎসরের যে-সময় শস্য কাটা ও সংগ্রহ করা হয়, সে-সময় কেশীরা এইসব বন্য গাধার মুখে লাগাম লাগাইয়া, তাহাদের পিঠে চড়িয়া ব্যাবিলন দেশে আসিত; এবং সেখানকার চাষীদের কাজে সাহায্য করিয়া, পারিশ্রমিকরূপে যে শস্য পাইত, তাহা নিজ নিজ ঘোড়ার পিঠে চাপাইয়া স্বদেশে ফিরিয়া যাইত। কেশীরা যুদ্ধবিদ্যার সহিত মোটেই পরিচিত ছিল না। তাহারা ব্যাবিলনীয়দের নিকটেই এই বিদ্যা শিখিয়াছিল এবং তাহারাই সকলের আগে যুদ্ধে ঘোড়া ব্যবহার করিয়াছিল।[১]

এই অশ্বারোহী সৈন্যের জোরে গদশ নামক কেশীদের এক রাজা খৃস্টপূর্ব ১৭০ অব্দে ব্যাবিলন দেশে সার্বভৌম রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। তাহার পর, গদশের বংশধররাও বহুকাল সেখানে রাজত্ব করেন।[২] বর্তমান প্রসঙ্গে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে খৃস্টের জন্মের ১৮০০ বৎসর পূর্বে, যুদ্ধে ঘোড়ার ব্যবহার কোথাও হইয়াছে বলিয়া কোনো প্রমাণ উপলব্ধ হয় না। কিন্তু বেদে যত্রতত্র ঘোড়ার গুরুত্ব বর্ণিত হইয়াছে, এবং কেশী ও ঘোড়াদের মধ্যে যে বিশেষ সম্বন্ধ আছে, তাহা নানা স্থানে প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহা হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, আর্যদের সপ্তসিন্ধুদেশ আক্রমণ কিছুতেই খৃস্টপূর্ব ১৭০০ অব্দের আগে হইতে পারে না।

---

১. L. W. King : A History of Babylon (1915), P 125.

২. ঐ পৃ. ২১৪

দাস

আর্যরা সপ্তসিন্ধুদেশে (অর্থাৎ সিন্ধু ও পাঞ্জাবে) আসার আগে, সেখানে দাসরা রাজত্ব করিত। বর্তমান কালে দাস শব্দের অর্থ চাকর বা গোলাম হইয়া গিয়াছে। কিন্তু বেদে দাস্ ও দাশ্ এই দুইটি ধাতু 'দেওয়া' অর্থে ব্যবহৃত হইত এবং এইরূপ অর্থই আধুনিক অভিধানগুলিতেও দেওয়া হয়। অর্থাৎ দাস শব্দের মূল অর্থ দাতা, উদার—নিশ্চয়ই এইরূপ ছিল। আবেস্তাগ্রন্থের ফর্বদীন যস্তে দেখা যায় যে ঐ দাসদের দেশে পিতৃপুরুষদের পূজা হইত। সেখানে এইসব দেশকে "দাহি" নামে দেওয়া হইয়াছে। (We worship the Fravashis of the holy men in the Dahi countries.)

প্রাচীন পার্শীভাষায় সংস্কৃত 'স'-এর 'হ' উচ্চারণ হইত; উদাহরণস্বরূপ আবেস্তাতে সপ্তসিন্ধুকে হপ্ত-হিন্দু বলা হইয়াছে। এই নিয়ম অনুসারে, দাসী অথবা দাস 'দাহি'তে রূপান্তরিত হইয়াছে।

আর্য

আর্য শব্দটি ঋ ধাতু হইতে আসিয়াছে; আর বিভিন্ন গণে যে ঋ ধাতু দেখিতে পাওয়া যায় তাহাদের অধিকাংশগুলির অর্থ গতি। সুতরাং আর্য শব্দের অর্ত হইতেছে যাযাবর। মনে হয়, ঘর সংসার করিয়া থাকা আর্যদের ভালো লাগিত না। মোগলরা যে-রকম তাঁবুতেই বসবাস করিত, খুব সম্ভবত আর্যরাও তেমনই তাঁবু অথবা শামিয়ানা খাটাইয়া বাস করিতেন। এক বিষয়ে তাঁহাদের এই প্রাচীন রেওয়াজ আজও বিদ্যমান আছে। ব্যাবিলন দেশে যাগযজ্ঞের স্থান ছিল বড়ো বড়ো মন্দিরের প্রাঙ্গণ। বিশেষজ্ঞদের মত এই যে, হরপ্পা ও মহিঞ্জোদারো এই দুই জায়গায় যে প্রাচীন নগরের ভগ্নাবশেষ পাওয়া গিয়াছে তাহাতেও দাহি লোকদের যাগযজ্ঞের স্থান তাহাদের মন্দিরগুলিই। আর্যগণ এই চিরাচরিত রীতি ভঙ্গ করেন। যাগযজ্ঞ করিতে হইলে তাহা মণ্ডপেই করিতে হইবে, আর্যরা এই নূতন প্রথা প্রবর্তন করিলেন। আর তাহাদের বংশধররা তাঁবুতে থাকা ছাড়িয়া দিয়া ক্রমে গৃহনির্মাণ করিয়া গৃহে থাকিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু মণ্ডপ ব্যতীত যজ্ঞ করা চলে না, এই নিয়ম অদ্যাবধি বর্তমান আছে।

দাসদের পরাজয় হইল কেন ?

এইরূপ যাযাবর লোকরা দাসদের মতন উন্নত জাতিকে কি করিয়া পরাভূত করিল ? ইতিহাস, বিশেষত ভারতবর্ষের ইতিহাস, বারবার এই প্রশ্নের উত্তর দিয়াছে। প্রথমে কোনো এক রাজার সুশাসনে লোক সুখী ও ধনী হয়, তাহার পর সমাজের সর্ব শক্তি ছোটো কোনো-একটি শ্রেণীর হাতে কেন্দ্রীভূত হয়; তখন এই ক্ষমতাধারী শ্রেণীর লোকেরা শুধু আরামে ও বিলাসিতায় দিন কাটায়, এবং ক্ষমতার জন্য একের সহিত অন্যে কলহ করিতে থাকে। ইহাতে প্রজাদের উপর করের বোঝা বাড়িয়া যায় ও এইসব ক্ষমতাশালী লোকের প্রতি তাহাদের বিদ্বেষ হয়। এইরকম সময়েই অনুন্নত জাতিরা বেশ সুযোগ পায়। তাহারা

তখন সম্মিলিতভাবে এইরূপ সাম্রাজ্যবাদী একাধিপত্যের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাইয়া উহার পরাভব ঘটায়। ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে, অসভ্য মোগলদিগকে একত্র করিয়া চিঙ্গিশ খাঁ কত-না সাম্রাজ্যের ধ্বংস সাধন করেন! সুতরাং পরস্পরের সহিত কলহরত দাসদিগকে আর্যরা যে সহজেই জয় করিতে পারিতেন ইহাতে বিস্ময়ের কোনো কারণ নাই।

নগরভঞ্জক ইন্দ্র

দাসরা ছোটো ছোটো শহরে বাস করিত। মনে হয় যে, এইসব শহরের পরস্পরের ভিতর শত্রুতা চলিত। কারণ দাসদের মধ্যে দিবোদাস নামক এক ব্যক্তি ইন্দ্রের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিল, এই কথা ঋগ্‌বেদের নানাস্থলে দেখিতে পাওয়া যায়। দাসদের নেতা ছিলেন বৃত্র নামে এক ব্রাহ্মণ। ত্বষ্টা এই বৃত্রের আত্মীয়; ত্বষ্টা ইন্দ্রকে একরকম যন্ত্র (বজ্র) নির্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। এই যন্ত্রের সাহায্যেই ইন্দ্র দাসদের শহরগুলি ভাঙিয়া চুরমার করিয়া দিয়াছিলেন এবং শেষটায় বৃত্র-ব্রাহ্মণকে হত্যা করিয়াছিলেন। ঋগ্‌বেদের বহুস্থলে ইন্দ্রকে পুরন্দর এই বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে; আর পরন্দর মানে নগরভঞ্জক বা শহরের ধ্বংসকারী।[১]

রাজ্যশাসনে ইন্দ্রের পরম্পরা বা ইন্দ্রপদ্ধতি

ইন্‌ ও দ্র এই দুই শব্দের সংযোগে ইন্দ্র শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। ইন্‌ মানে যোদ্ধা। উদাহরণস্বরূপ,[২] "সহ ইনা বর্ততে ইতি সেনা" অর্থাৎ যোদ্ধার সহিত যে থাকে, তাহাকে সেনা বলে। ব্যাবিলনীয় ভাষায় শিখর অথবা মুখ্য অর্থে 'দ্র' শব্দের ব্যবহার দেখা যায়। সুতরাং ইন্দ্র মানে সেনার অধিপতি অথবা সেনাপতি। দেখিতে দেখিতে, এই শব্দটি রাজার বাচক হইয়া গেল। যথা, দেবেন্দ্র, নগেন্দ্র, মনুজেন্দ্র ইত্যাদি। পূর্বে ইন্দ্রের নাম ছিল শত্রু! ইহার পর ইন্দ্রের পরম্পরা নিশ্চয়ই বহুবৎসর চলিয়াছিল। পুরাণে নহুষকে ইন্দ্র করার কাহিনী তো দেখিতে পাওয়া যায়ই। "অহং সপ্তহা নহুষো নহুষ্টরঃ," এইরূপ উল্লেখ ঋগ্‌বেদে লক্ষিত হয়। এই পৌরাণিক গল্পে কিছু সত্যাংশ থাকিতে বাধ্য।

ইন্দ্রপূজা

ব্যাবিলন দেশে সার্বভৌম রাজাকে যজ্ঞে নিমন্ত্রণ করিয়া, তাহাকে সোম দেওয়ার রেওয়াজ ছিল। ঐ সময় সার্বভৌম রাজাকে স্তুতি করিয়া অনেক স্তোত্র গাওয়া হইত। ইন্দ্র-সম্বন্ধে যে-সব সূক্ত আছে, তাহার অধিকাংশগুলিই এইরকমের। ইন্দ্র-পরম্পরা নষ্ট হইয়া যাওয়ার পরও, এইসব স্তোত্র অপরিবর্তিত আকারেই রহিয়া গেল; আর লোকে এইগুলির মনগড়া অর্থ করিতে লাগিল। লোকের এইরূপ ধারণা হইয়া বসিল যে, ইন্দ্র আকাশের দেবতাদের রাজা। বহুস্থলেই এইসব সূক্তের অর্থ সর্বসাধারণের অগম্য হইয়া পড়িল। এবং এইরূপ

১. এই সম্বন্ধে খুঁটিনাটি খবরের জন্য হিন্দী 'সংস্কৃতি আণি অহিংসা', পৃ. ১৭-১৯ দ্রষ্টব্য।

২. সেনা শব্দের ব্যুৎপত্তিতে ইন ধাতুর এই অর্থই গৃহীত হয়।

মানা হইতে লাগিল যে, উহাদের ভিতর যে-সব শব্দ আছে, শুধু সেই শব্দগুলির মধ্যেই বিশেষ কিছু মন্ত্রশক্তি রহিয়াছে।

ইন্দ্রের স্বভাব

সপ্তসিন্ধুদেশে রাজ্যস্থাপনকারী ইন্দ্র যে মানুষ ছিল, ঋগ্‌বেদে তাহার যথেষ্ঠ প্রমাণ পাওয়া যায়। কৌষীতকি উপনিষদে তাহার স্বভাবের একটা মোটামুটি বর্ণনা আছে। তাহা এইরূপ—

দিবোদাসের ছেলে প্রতিদিন যুদ্ধে পরাক্রম দেখাইয়া ইন্দ্রের প্রিয় প্রাসাদে গেল। ইন্দ্র তাহাকে বলিলেন, "হে প্রতর্দন, তোমাকে আমি বর দিতেছি।" প্রতর্দন কহিল, "আমাকে এমন বর দিন, যাহাতে মানুষের কল্যাণ হয়। ইন্দ্র ঃ "অপরের জন্য কেহ বর লয় না, নিজের জন্য বর চাহিয়া লও।" প্রতর্দন ঃ "আমার জন্য আমি বর চাই না।" তখন ইন্দ্র তাহাকে যাহা সত্য তাহাই কহিলেন। কারণ ইন্দ্র সত্যস্বরূপ। তিনি বলিলেন, "আমাকে ঠিকভাবে বুঝিয়া লও। যাহার দ্বারা মানুষ আমাকে জানিতে পারে, উহাই মানুষের কল্যাণকর। ত্বষ্টার ছেলে ত্রিশীর্ষকে আমি হত্যা করিয়াছি। অরুর্মগ নামক যতিকে আমি কুক্কুর দ্বারা ভক্ষণ করাইয়াছি। যুদ্ধের অনেক সন্ধি ভঙ্গ করিয়া আমি দিবালোকে প্রহ্লাদের অনুচরদিগকে, অন্তরীক্ষে পৌলোমদিগকে এবং পৃথিবীতে কালকাশ্যদিগকে বধ করিয়াছি। এইসব কাজ করিতে আমার একটি কেশও বাঁকিয়া যায় নাই। যে আমাকে এইভাবে জানিবে, সে যদি মাতৃবধ, পিতৃবধ, চুরি, ভ্রূণহত্যা ইত্যাদি মহাপাতকও অতীতে করিয়া থাকে, তবু আমার মনে কিছুমাত্র অনুশোচনা হইবে না, অথবা বর্তমানেও এইসব পাপ করিবার সময় তাহার মনে কোনো দুঃখ হইবে না, অথবা তাহার মুখের উজ্জ্বলতা কিছুমাত্র কমিয়া যাইবে না।"

উপরের উদ্‌ধৃত অংশটিতে যে-সব অত্যাচারের বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে, ইন্দ্র যে নিজ সাম্রাজ্য স্থাপন করিবার সময় সে-সব অত্যাচার করিয়াছিলেন, তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ ঋগ্‌বেদেই পাওয়া যায়। কিন্তু শুধু ইন্দ্র কেন, যে-কোনো ব্যক্তির পক্ষেই সাম্রাজ্য স্থাপন করিতে গেলে দয়া, মায়া, নিজ, পর ইত্যাদি ভেদ মানিয়া চলা সম্ভবপর নয়; তখন সন্ধির শর্ত ভাঙিতে দ্বিধাবোধ করিলে চলে না। শিবাজী যে চন্দ্রারাও মোরেকে হত্যা করিয়াছিলেন, তাহা ন্যায়সংগত হইয়াছিল কিনা, এই বিচার বৃথা। তিনি যদি ন্যায়-অন্যায়ের বিচার করিতেন, তাহা হইলে শিবাজী সাম্রাজ্য-স্থাপনেই অসমর্থ হইতেন। সাম্রাজ্যের প্রজারাও এইরূপ ছোটোখাটো ন্যায়-অন্যায়ের কথা ভাবে না। তাহারা শুধু এইটুকুই দেখে যে, নূতন সাম্রাজ্য-স্থাপনে সর্বসাধারণের মোটামুটি লাভ হইল কিনা।

আর্যদের আধিপত্য হেতু জনসাধারণের লাভ

এই দৃষ্টিতে বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, ইন্দ্র কিংবা আর্যদের দ্বারা স্থাপিত সাম্রাজ্য হইতে সপ্তসিন্ধুদেশের প্রজারা খুব লাভবান হইয়াছিল। ঐ সাম্রাজ্য স্থাপিত হইবার পূর্বে,

---

১. পুণা শহরের বিভিন্ন অঞ্চলগুলি 'শনিবার-পেঠ', "রবিবার-পেঠ' ইত্যাদি নামে অভিহিত হয়।—অনুবাদক

সপ্তসিন্ধুর ছোটো ছোটো শহরগুলির মধ্যে অনবরত যে-সব যুদ্ধ লাগিয়া থাকিত, এখন সে-সব বন্ধ হইয়া যাওয়াতে প্রজারা একরকম শান্তি ও সুখ লাভ করিল। এখানে বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, পেশবাদের আত্মীয়গণই শনিবার-অঞ্চলের[১] প্রাসাদে ইংরাজের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করিয়াছিল। এইরূপ কথিত আছে যে, পেশবা-রাজত্ব অস্ত যাওয়ার পর, অন্যান্য হিন্দুরা নাকি বড়ো রকমের উৎসব করিয়াছিল। তেমনই যদিও বৃত্র জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন, তথাপি তাহাকে হত্যা করিয়া ইন্দ্র সপ্তসিন্ধুদেশের গৃহকলহ বন্ধ করায়, সেখানকার প্রজারা যে ইন্দ্রকে দেবতার মতো সম্মান করিয়াছিল, ইহা খুবই স্বাভাবিক। দাস এবং আর্যের সংঘর্ষ হইতে যে-সব ভালো ফল ফলিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে প্রথমটি হইতেছে এই যে, ইহাতে সপ্তসিন্ধুদেশে একপ্রকার শান্তি বিরাজ করিতে থাকিল। দ্বিতীয় ফলটি হইতেছে এই যে, রাজ্যশাসনে ব্রাহ্মণদের প্রাধান্য নষ্ট হইয়া গেল। ইন্দ্র ত্বষ্টার পুত্র বিশ্বরূপকে পৌরোহিত্যের পদ প্রদান করিয়াছিলেন; আবার হয়তো সে বিদ্রোহ করিতে পারে এই ভয়ে তাহাকেও বধ করিয়াছিলেন—ঋগ্‌বেদে ও অথর্ববেদে এইরূপ উল্লেখ আছে।[১] তথাপি পৌরোহিত্য-পদটি কোনো-না-কোনো ব্রাহ্মণের হাতেই রহিয়া গেল। কিন্তু রাজনৈতিক ব্যাপার হইতে দূরে থাকায়, ব্রাহ্মণরা এখন সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদন করিতে সমর্থ হইল।

বৈদিকভাষা

দাস ও আর্যের সংঘর্ষে নূতন ভাষা গঠিত হইয়াছিল; ইহাই বৈদিকভাষা। মুসলমান ও হিন্দুর সংঘর্ষে যেমন উর্দুনামক নূতন ভাষার সৃষ্টি হইল, সংস্কৃত ভাষার উৎপত্তিও তদনুরূপ। কিন্তু বৈদিক ভাষার ন্যায় উচ্চস্থান উর্দুভাষা কখনো লাভ করিতে পারে নাই; আর তাহার কোনো সম্ভাবনাও নাই। বৈদিকভাষা একেবারে দেবভাষা হইয়া গেল।

এই বৈদিকভাষার অর্থ ঠিক ঠিক ভাবে বুঝিতে হইলে, ব্যাবিলনীয় ভাষা জানা অত্যাবশ্যক। কতকগুলি মূল শব্দের অর্থ কী করিয়া একেবারে মূল অর্থের বিপরীত হইয়া গেল, তাহা দাস ও আর্য এই শব্দ দুইটি হইতেই বুঝিতে পারা যায়। দাস শব্দের মূল অর্থ ছিল দাতা বর্তমানে উহা বদলাইয়া ভৃত্য অথবা গোলাম এইরূপ হইয়াছে। আবার আর্য শব্দের অর্থ ছিল যাযাবর; তাহা এখন বদলাইয়া মহৎ, উদার, শ্রেষ্ঠ এইরূপ হইয়াছে।

আর্যদের বিজয়ে সমাজের লোকসান

দাস ও আর্যের দ্বন্দ্বের ফলে যে প্রকাণ্ড লোকসান হইল, তাহা এই যে, দাসদের গৃহ বা নগর নির্মাণের উন্নত শিল্পটি প্রায় লুপ্ত হইয়া গেল। সিন্ধু ও পাঞ্জাবে যে-সব প্রাচীন নগর বা গৃহের ভগ্নাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে, সেইরূপ গৃহ ও নগর নির্মাণের পদ্ধতি ভারতবর্ষ হইতে একেবারে উঠিয়া গেল। দ্বিতীয়ত, অরণ্যবাসী যতিদের আচার-ব্যবহার কিরূপ ছিল, তাহা বুঝিবার আর উপায় রহিল না। উপরের উদ্‌ধৃত অংশটিতে বর্ণিত হইয়াছে যে,

১. ‘হিন্দী সংস্কৃতি আণি অহিংসা’, পৃ. ১৯-২০ দ্রষ্টব্য।

ইন্দ্র তাহাদিগকে কুকুর দ্বারা ভক্ষণ করাইয়াছিলেন। কুকুরের জন্য সেখানে যে শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা হইতেছে "সালাবৃক"। ইহার অর্থ কুকুর অথবা নেকড়ে বাঘ, এই দুইয়ের যে-কোনোটি হইতে পারে। টীকাকার সালাবৃক মানে নেকড়ে বাঘ এইরূপই লিখিয়াছেন। কিন্তু ইহাই অতি সম্ভবযোগ্য বলিয়া মনে হয় যে, ইন্দ্রের নিকট বহু শিকারী কুকুর ছিল ও উহাদিগকে তিনি যতিদের উপর লেলাইয়া দিয়াছিলেন। সমাজের উপর এইসব যতির যথেষ্ট প্রভাব না থাকিলে ইন্দ্রের পক্ষে তাহাদিগকে হত্যা করিবার কোনো কারণ দেখা যায় না। কিন্তু ইহাদের রীতিনীতি কিরূপ ছিল, লোকে তাহাদিগকে কেন মানিত, আজকাল এইসব কথা জানিবার আর কোনো উপায় থাকিল না।

আর্যসভ্যতার কৃষ্ণের বিরোধিতা

সপ্তসিন্ধুদেশে ইন্দ্রের আধিপত্য সম্পূর্ণ স্থাপিত হওয়ার পর, তাহার বিজয় অভিযানের গতি যে মধ্যভারতের দিকে ফিরিবে, তাহাতে আশ্চর্যান্বিত হইবার মতো কিছুই নাই। কিন্তু সেখানে তাহাকে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীর সম্মুখীন হইতে হইল। দেবকীনন্দন কৃষ্ণ সামান্য গোপালক রাজা ছিলেন। তিনি ইন্দ্রের যজ্ঞসংস্কৃতি ও আধিপত্য মানিয়া লইতে প্রস্তুত হন নাই। এইজন্য তিনি তাহাকে আক্রমণ করিলেন। কৃষ্ণের নিকট অশ্বারোহী সৈন্য ছিল না। তথাপি তিনি যুদ্ধের জন্য এমনই উত্তম ও সুরক্ষিত স্থল বাছিয়া লইলেন যে, ইন্দ্রের কোনো কৌশলই তাহার বিরুদ্ধে কার্যকর হইল না। বৃহস্পতির সাহায্যে কোনোরকমে প্রাণ বাঁচাইয়া ইন্দ্র পিছে হটিয়া গেলেন। ঋগ্‌বেদের (৮।৯৬।১৩-১৫) কয়েকটি ঋক্ হইতে এবং ভাগবত ইত্যাদি পুরাণের কাহিনী হইতে আমাদের এই মতের বেশ ভালো সমর্থন পাওয়া যায়।[১]

কৃষ্ণ যজ্ঞসংস্কৃতি মানিতে প্রস্তুত ছিলেন না। তবে তিনি কী মানিতেন? আঙ্গিরস-ঋষি তাঁহাকে যজ্ঞের একটি সহজ প্রণালী শিখাইয়াছিলেন, এই যজ্ঞের দক্ষিণা হইতেছে তপস্যা, দান, সরলতা (আর্জব), অহিংসা ও সত্যবাদিতা। "অথ যত্তপো দানমার্জবমহিংসা সত্যবচনমিতি তা অস্য দক্ষিণাঃ।" (ছা. উ. ৩।১৭।৪-৬)। ইহা হইতে দেখা যায় যে, আর্য ও দাসের সংঘর্ষে যতিদের যে সংস্কৃতি সপ্তসিন্ধুদেশ হইতে বিলুপ্ত হইয়াছিল, তাহার কিয়দংশ তখনও গঙ্গাযমুনার সংলগ্ন দেশগুলিতে বর্তমান ছিল। তপস্যার অহিংসাব্রতাবলম্বী মুনিদিগকে এইসব দেশে কৃষ্ণের মতো রাজারা সম্মান করিতেন—ইহা উপরে উদ্‌ধৃত বাক্যটি হইতে লক্ষ্য করা যাইতে পারে।

বৈদিক সংস্কৃতির বিকাশ

কিন্তু এই অহিংসাত্মক সংস্কৃতির বিশেষ উন্নতি হয় নাই। ব্রাহ্মণরা রাজনীতি হইতে সরিয়া যাওয়ার পর, সাহিত্য ও অন্যান্য জনহিতকর কার্যের দিকে মনোনিবেশ করিয়াছিল। তক্ষশীলার বিশ্ববিদ্যালয়কেই সর্বপ্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয় বলিতে হইবে। সেখানে ব্রাহ্মণরা

১. 'হিন্দী সংস্কৃতি আণি অহিংসা', পৃ. ২২-২৫ দ্রষ্টব্য।

বেদ তো শিখাইতই, তদুপরি ধনুর্বিদ্যা, চিকিৎসা শাস্ত্র ইত্যাদিও শিখাইত। সপ্তসিন্ধু হইতে ইন্দ্র-পরম্পরার সাম্রাজ্য লুপ্ত হইল বটে কিন্তু তাহা হইতে একটি নূতন 'সংস্কৃতির রাজ্য' উৎপন্ন হইল এবং ক্রমে তাহা প্রসার লাভ করিল।

মধ্যদেশে বৈদিক সংস্কৃতির জয়

কৃষ্ণ ইন্দ্রকে পরাভূত করার পর, প্রায় ছয়-সাতশত বৎসরের মধ্যে পরীক্ষিৎ ও তৎপুত্র জনমেজয়, এই দুই জন পাণ্ডবকুলোৎপন্ন রাজা, সপ্তসিন্ধুদেশের আর্যসংস্কৃতি গঙ্গাযমুনার দেশে প্রবর্তন করিয়াছিলেন। অবশ্য, পাণ্ডবগণ যে বৈদিক সংস্কৃতির সমর্থন করিতেন, বৈদিক সাহিত্যে তাহার প্রমাণ দেখা যায় না। কৃষ্ণ ও পাণ্ডবদের মধ্যে অন্তত ছয়শত বৎসরের ব্যবধান মানা আবশ্যক। মহাভারতে যে-কৃষ্ণের কথা পাওয়া যায় তাহা বিশেষ তলাইয়া না দেখিলেও, প্রক্ষিপ্ত বলিয়া মনে হয়। অন্তত ইহা অবশ্যই মানিতে হইবে যে, ইন্দ্রের সহিত যুদ্ধরত কৃষ্ণ আর মহাভারতের কৃষ্ণ এক নহে। পাণ্ডববংশীয় পরীক্ষিৎ ও জনমেজয়, এই দুই ব্যক্তি, যে বৈদিক সংস্কৃতিকে সম্পূর্ণ আশ্রয় দিয়াছিলেন, এই কথা কিন্তু অথর্ববেদ হইতে ভালোভাবেই প্রমাণিত হয়।[১]

সপ্তসিন্ধুদেশে যতিদের সংস্কৃতি নষ্ট হইয়া গেলেও উহা যে মধ্যভারতে বিশেষভাবে জীবন্ত ছিল, তাহা পূর্বে ছান্দোগ্য উপনিষদ্ হইতে উদ্ধৃত বাক্যটি হইতে এবং পালি সাহিত্যে সুত্তনিপাতের ''ব্রাহ্মণ ধাম্মিক' নামক সুত্ত হইতে প্রতীয়মান হয়[২] সপ্তসিন্ধুদেশেই চাতুর্বর্ণ্য ব্যবস্থা মধ্যভারতেও স্থায়ী হইয়াছিল। উভয়ের মধ্যে শুধু একটু পার্থক্য ছিল যে, আর্যরা সপ্তসিন্ধুদেশ জয় করায়, সেখানে যে-যাগযজ্ঞের পদ্ধতি উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহা ঐ দেশের ব্রাহ্মণরা সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করিয়াছিল; কিন্তু মধ্যভারতের হিন্দুরা অগ্নিপূজা করিলেও, তাহাদের পূজায় প্রাণিহত্যা অথবা পশুবলি হইত না। কিন্তু পরীক্ষিৎ ও জনমেজয় যখন যাগযজ্ঞ শুরু করিলেন, তখন এই প্রাচীন অহিংসামূলক ব্রাহ্মণসংস্কৃতি প্রায় লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। আর তাহার পরিবর্তে হিংসামূলক যাগযজ্ঞের প্রথাই প্রবলবেগে বিস্তার লাভ করিতেছিল। আর সপ্তসিন্ধুর পরিবর্তে গঙ্গা-যমুনার মধ্যবর্তী দেশই আর্যাবর্ত নামে খ্যাত হইল।

অহিংসা কোনপ্রকারে টিকিয়া থাকিল

অহিংসামূলক অগ্নিহোত্রের পুরাতন প্রথা মৃতপ্রায় হইয়া গিয়াছিল সত্য, তবু তাহা সম্পূর্ণ নষ্ট হইয়া যায় নাই। অহিংসার প্রভাব রাজসভা ও অভিজাত শ্রেণীর মধ্য হইতে দূরীভূত হইলেও তাহা বনে আশ্রয় পাইল, অর্থাৎ যাহারা অহিংসামূলক সংস্কৃতি আঁকড়াইয়া থাকিল, তাহারা বনে জঙ্গলে ফলমূল খাইয়া নিজেদের তপস্যাব্রত রক্ষা করিল। জাতক অট্‌ঠকথাতে এই প্রকারের লোকদের সম্বন্ধে অনেক গল্প আছে। হিংসামূলক নূতন যজ্ঞপদ্ধতির উপর

১. 'হিন্দী সংস্কৃতি আণি অহিংসা' পৃ. ৩৭-৩৮

২. 'হিন্দী সংস্কৃতি আণি অহিংসা', পৃ. ৩৯-৪০

বিরক্ত হইয়া বহু ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য শ্রেণীর লোকও বনে গিয়া আশ্রম নির্মাণ করিয়া তপস্যা করিত। বৎসরের ভিতর কোনো কোনো সময়, ইহারা টক ও লোনা পদার্থের আস্বাদ লইবার জন্য লোকালয়ে আসিত; ও পরে আবার আশ্রমে ফিরিয়া যাইত মোট কথা এই যে, সপ্তসিন্ধুর যতিদের মতো মধ্যভারতের মুনিঋষিরা একেবারে লুপ্ত হইয়া যায় নাই। তাহারা অরণ্যের আশ্রয়ে তপস্যা করিতে করিতে কোনোরকমে বাঁচিয়া থাকিল।

আধুনিক দৃষ্টান্ত

বর্তমান ইতিহাস হইতে এইরূপ ঘটনার একটি উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। পর্তুগীজরা যখন সিংহলদ্বীপের পশ্চিমাংশ দখল করিল, তখন তাহারা সেখানকার বুদ্ধ-মন্দিরগুলি এবং ভিক্ষুদের বিহারগুলি ভূমিসাৎ করিয়া বলপ্রয়োগে সকলকে রোমান ক্যাথলিক ধর্মে দীক্ষিত করিল। এই বিপদে সিংহলের রাজা বুদ্ধের পবিত্র দন্ত-ধাতু সঙ্গে লইয়া, ক্যাণ্ডির জঙ্গলে পলাইয়া গেলেন; আর সেখানে পাহাড়ের আড়ালে নিজের নূতন রাজধানী বসাইলেন। পশ্চিম সিংহলের যে-সব ভিক্ষু পর্তুগীজদের হাত হইতে প্রাণে বাঁচিয়া গেল, তাহারা যতগুলি সম্ভব বৌদ্ধগ্রন্থ সঙ্গে লইয়া পার্বত্য অঞ্চলে ক্যাণ্ডির রাজার আশ্রয়ে গিয়া থাকিল। গোয়াতেও কিয়ৎপরিমাণে এইরূপ ঘটনাই ঘটিয়াছিল। পর্তুগীজরা প্রথম সাষ্টী, বার্দেশ ও তিসবাড়া, এই তিনটি মহাকুমা জয় করিল; আর কয়েক বৎসরের মধ্যেই এ-সব জায়গার মন্দিরগুলি ভূমিসাৎ করিয়া সর্বসাধারণ লোকদিগকে বলপূর্বক রোমান ক্যাথলিক করার কাজ চালাইতে থাকিল। এই সময় হিন্দুদের ভিতর কেহ কেহ নিজ নিজ ঘর দ্বার ছাড়িয়া গৃহদেবতা সঙ্গে লইয়া পলাইল এবং নিকটস্থ সংবদেকর নামক করদ রাজার রাজ্যে আশ্রয় লইল। আজও সাষ্টী প্রভৃতি মহকুমার প্রাচীন হিন্দু দেবদেবীর মূর্তিগুলি এই সংবদেকর পরগণায় রহিয়াছে। পরে এই পরগণাটিও পর্তুগীজরা জয় করিল; কিন্তু এবার তাহারা হিন্দুদের ধর্মে হস্তক্ষেপ করিল না। মধ্যভারতে অহিংসামূলক ধর্মের অবস্থাও কিয়দংশে এইরূপই হইয়াছিল, এইরূপ বলিলে আপত্তির কারণ নাই।

অহিংসার প্রভাব

অবশ্য, বলিসহ যাগযজ্ঞের প্রথা পরীক্ষিৎ ও জনমেজয় জোর করিয়া লোকেদের উপর চাপান নাই। তথাপি এই প্রথা রাজার আশ্রয় ও সমর্থন পাওয়াতে, ব্রাহ্মণরা আপনা হইতেই তাহা গ্রহণ করিয়াছিল। আর যাহারা কিছুতেই ইহা সমর্থন করিতে পারিল না, তাহারা তাহাদের প্রাচীন সংস্কৃতি বজায় রাখিবার জন্য অরণ্য ও তপস্যার আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইল। যে-সব বৌদ্ধ ও হিন্দুকে পর্তুগীজরা খৃস্টান করিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে যেমন আজও বৌদ্ধ ও হিন্দু সংস্কৃতির প্রভাব বিদ্যমান রহিয়াছে, তেমনই ভারতের জনসাধারণের উপর এখানকার প্রাচীন অহিংসামূলক সংস্কৃতির প্রভাবও অল্পবিস্তর পরিমাণে অদ্যাবধি টিকিয়া রহিয়াছে। বনবাসী মুনিঋষিরা গ্রামে কিংবা শহরে আসিলে, জনসাধারণ তাহাদিগকেও সম্মানের সহিত অভ্যর্থনা করিত, আবার অন্য সময় যাগযজ্ঞ ও বলিদান, এইসবও চলিত।

যজ্ঞসংস্কৃতির প্রসার

সমাজে মুনিঋষিদের যথেষ্ঠ সম্মান ছিল বটে, তবু তাহাদের অহিংসামূলক সংস্কৃতির কিছুই উন্নতি হয় নাই। সপ্তসিন্ধুদেশে তক্ষশিলার মতো যে-সব বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল, এইগুলিই শিক্ষার কেন্দ্র হইয়া উঠিল। জাতক অট্‌ঠকথার অনেক গল্প হইতে প্রতীয়মান হয় যে, বেদাধ্যয়ন করিবার জন্য ব্রাহ্মণকুমার ও ধনুর্বিদ্যা শিখিবার জন্য রাজপুত্র সুদূর সপ্তসিন্ধুদেশে তক্ষশিলার মতো জায়গায় যাইত।

সপ্তসিন্ধুদেশেই বা কি, আর মধ্যভারতেই বা কি, কোথাও আর ইন্দ্রের সাম্রাজ্যের মতো ঐক্যবদ্ধ শক্তিশালী সাম্রাজ্য রহিল না। ইন্দ্রের রাজ্যের সহিত পরীক্ষিৎ কিংবা জনমেজয়ের রাজ্যের কোনো তুলনা চলে না। তাহারা বলিসহ যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠানে উৎসাহ দিত, এবং তাহাদের চেষ্টায় গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্তী দেশ আর্যাবর্তে পরিণত হইল, শুধু এইটুকুই তাহাদের সম্বন্ধে বলা চলে। পরীক্ষিৎ ও জনমেজয়ের রাজত্বের পর খুব সম্ভবত সপ্তসিন্ধু ও মধ্যভারত কতকগুলি ছোট ছোট রাজ্যে বিভক্ত হইয়াছিল। তথাপি আর্য ও দাসের সংঘর্ষে যে বলিসহ যাগযজ্ঞের সংস্কৃতি উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহা ক্রমশ সুদৃঢ় ও শিক্তশালী হইল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সমসাময়িক রাজনৈতিক অবস্থা

ষোলোটি রাজ্য

"যো ইমেসং সোলসন্নং মহাজনপদানং পহূতসত্তরতনান ইস্সরাধিপচ্চং রজ্জং কারেয্য, সেয্যথীদং—১. অঙ্গানং ২. মগধানং ৩. কাসীনং. ৪. কোসলানং ৫. বজ্জীনং ৬. মল্লানং ৭. চেতীনং ৮. বংসানং ৯. কুরূনং ১০. পঞ্চালানং ১১. মচ্ছানং ১২. সূরসেনানং ১৩. অস্সকানং ১৪. অবন্তীনং ১৫. গন্ধারানং ১৬. কম্বোজানং।"

উপরের উদ্ধৃত অংশটি অঙ্গুত্তরনিকায়ের চারি জায়গায় পাওয়া যায়। ললিতবিস্তরের তৃতীয় অধ্যায়েও এইরূপ লিখিত আছে যে, বুদ্ধের জন্মের পূর্বে জম্বুদ্বীপে (অর্থাৎ ভারতবর্ষ) ভিন্ন ভিন্ন ষোলোটি রাজ্য ছিল; কিন্তু সেখানে এই সব রাজ্যের মধ্যে শুধু আটটিরই রাজবংশের বর্ণনা পাওয়া যায়। এই সব দেশের নামগুলি বহুবচনে উল্লিখিত হইয়াছে। ইহা হইতে প্রতীয়মান হয় যে, এই রাজ্যগুলি গণ কিংবা গোষ্ঠীমূলক ছিল। এই সকল দেশে জনসাধারণকে রাজা এবং তাহাদের অধ্যক্ষকে মহারাজা বলা হইত। বুদ্ধের সময়, এই মহাজনতান্ত্রিক শাসনপদ্ধতি দুর্বল হইয়া প্রায় নষ্ট হওয়ার পথে যাইতেছিল; আর তাহার পরিবর্তে একচ্ছত্র রাজতন্ত্রের শাসনপদ্ধতি দ্রুতগতিতে প্রচলিত হইতেছিল। এই পরিবর্তনের কারণ কী হইতে পারে, তাহা বিচার-করিবার পূর্বে উপরি-উক্ত ষোলোটি রাজ্য সম্বন্ধে যে খবর পাওয়া যায়, তাহা এখানে সংক্ষেপে বলা সমীচীন বলিয়া মনে হয়।

১. অঙ্গ

অঙ্গদের দেশ মগধের পূর্বদিকে ছিল। ইহার উত্তরভাগের নাম ছিল অঙ্গুত্তরা। মগধদেশের রাজা অঙ্গদেশ জয় করাতে, সেখানকার মহাজনতন্ত্র অথবা গণমূলক শাসনপদ্ধতি লুপ্ত হইয়াছিল। পূর্বের মহাজন অথবা রাজাদের বংশধররা বিদ্যমান ছিল বটে, তথাপি তাহাদের স্বাধীন ক্ষমতা আর থাকিল না। কিছুকাল পরে "অঙ্গ-মগধ" এইভাবে মগধদেশের সহিত দ্বন্দ্ব সমাস করিয়া ইহার নাম নির্দেশ হইতে থাকিল।

ত্রিপিটক গ্রন্থের বহুস্থলে দেখা যায় যে, ভগবান বুদ্ধ এই দেশের ধর্মের উপদেশ দিতেন এবং উহার প্রধান শহর চম্পানগরীতে গগ্‌গরা নামক রানী যে দীঘি কাটাইয়াছিলেন, তাহার পাড়ে অবস্থান করিতেন। কিন্তু এই চম্পানগরীও আগেকার দিনের রাজাদের ভিতর কাহারো শাসনাধীনে ছিল না। রাজা বিম্বিসার উহা সোণদণ্ড নামক এক ব্রাহ্মণকে দান করিয়াছিলেন। এই ব্রহ্মোত্তরের আয়ের দ্বারা সোণদণ্ড মাঝে মাঝে বড়ো বড়ো যাগযজ্ঞ করিতেন।[১]

২. মগধ

বুদ্ধের সময় মগধ ও কোসল, এই দুই দেশের অবিরত শ্রীবৃদ্ধি হইতেছিল; আর উভয়রাজ্যই

১. "দীঘনিকায় শোণদণ্ডসুত্ত" দ্রষ্টব্য

সম্পূর্ণ একচ্ছত্র শাসনের অধীন ছিল। মগধের রাজা বিম্বিসার ও কোসলের রাজা পসেনদি (প্রসেনজিৎ), উভয়েই উদার-হৃদয় ছিলেন বলিয়া, তাঁহাদের একাধিপত্য প্রজাদের সুখাবহ হইয়াছিল। তাঁহারা উভয়েই যাগযজ্ঞে উৎসাহ দিতেন সত্য, কিন্তু তাঁহাদের রাজ্যে শ্রমণদের (পরিব্রাজকদের) স্বীয় ধর্ম প্রচার করার পূর্ণ স্বাধীনতা ছিল। শুধু তাহাই নহে, রাজা বিম্বিসার আবার তাহাদের থাকা খাওয়া প্রভৃতির ব্যবস্থা করিয়া, তাহাদিগকে উৎসাহও দিতেন। গৌতম যখন সন্ন্যাস লইয়া রাজগৃহে আসেন, তখন রাজা বিম্বিসার পাণ্ডব পর্বতের পাদদেশে গিয়া তাঁহার সহিত দেখা করেন এবং তাঁহাকে স্বীয় সৈন্যদলে একটি উচ্চস্থান গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন। কিন্তু এই অনুরোধ সত্ত্বেও তিনি তপস্যা করিবার সংকল্প হইতে বিচলিত হন নাই। গয়ার নিকট উরুবেলা নামক স্থানে গিয়া তিনি তপস্যা আরম্ভ করেন; এবং সেখানে তিনি সত্যোপলব্ধির মধ্যম মার্গ আবিষ্কার করেন। তাহার পর বারাণসীতে গিয়া তিনি তাঁহার প্রথম ধর্মোপদেশ দেন। সেখানে হইতে নিজের পাঁচজন শিষ্যের সহিত তিনি যখন রাজগৃহে ফিরিয়া আসিলেন, তখন রাজা বিম্বিসার তাহাদিগকে থাকিবার জন্য বেলুবন নামক একটি উদ্যান দিয়াছিলেন। এই উদ্যানে যে কোনো বিহার ছিল, এমন কথা কোনো গ্রন্থে পাওয়া যায় না। বেলুবন দেওয়ার এই গল্পটি হইতে শুধু ইহাই বুঝিতে হইবে যে, রাজা বিম্বিসার বুদ্ধ ও তাঁহার ভিক্ষুসংঘকে এই উদ্যানে নির্বিঘ্নে থাকিতে অনুমতি দিয়াছিলেন। অবশ্য, এই ঘটনা হইতে ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, বিম্বিসারের মনে ভিক্ষুসংঘের প্রতি বেশ শ্রদ্ধা ভক্তি ছিল।

এই রাজা শুধু বুদ্ধের ভিক্ষুসংঘকেই নয়, অধিকন্তু তৎকালে অন্যান্য যে-সব বড়ো বড়ো শ্রমণসংঘ ছিল, সেগুলিকেও আশ্রয় দিতেন। দীঘনিকায়ের সামঞ্‌ঞফলসুত্তে এবং মজ্‌ঝিমনিকায়ের (সংখ্যা ৭৭) মহাসকুলুদায়িসুত্তে পাওয়া যায় যে, একই সময় এই সব শ্রমণসংঘ রাজগৃহের আশেপাশে থাকিত।

রাজা বিম্বিসারের পুত্র অজাতশত্রু নিজের অমাত্যদের সহিত পূর্ণিমা রাত্রিতে নিজ প্রাসাদের ছাদে বসিয়া আছেন, এখন সময় তাঁহার মনে এই ইচ্ছা উৎপন্ন হইল যে, তিনি কোনো বড়ো শ্রমণনায়কের সহিত দেখা করিবেন। তখন অমাত্যদের প্রত্যেকে কোনো এক সংঘনায়কের প্রশংসা করিয়া রাজাকে তাহার নিকট যাইতে অনুরোধ করিল। রাজার গৃহচিকিৎসক জীবক চুপ করিয়া বসিয়াছিলেন। অজাতশত্রু যখন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন তিনি ভগবান্ বুদ্ধের প্রশংসা করিয়া রাজাকে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে সম্মত করিলেন। যদিও বুদ্ধ শ্রমণনেতাদের মধ্যে বয়সে সকলের ছোটো ছিলেন, এবং যদিও তাঁহার সংঘ মাত্র অল্প কিছুকাল পূর্বে স্থাপিত হইয়াছিল, তথাপি অজাতশত্রু মনস্থ করিলেন যে, তিনি বুদ্ধের সহিতই দেখা করিবেন। এবং বুদ্ধের সহিত সাক্ষাৎ করিবার উদ্দেশ্যে রাজা সপরিবারে জীবকের আম্রবনে গমন করিলেন।

অজাতশত্রু নিজের পিতাকে বন্দী ও হত্যা করিয়া তাহার রাজ্য দখল করিয়াছিলেন, তথাপি তাঁহার পিতা শ্রমণদিগকে যতখানি সম্মান করিতেন তিনি তাহা অপেক্ষা কিছুমাত্র

কম সম্মান করিতেন না। বিম্বিসারের মৃত্যুর পর, ভগবান্ বুদ্ধ খুব কম সময়েই রাজগৃহে আসিতেন। উপরে এইরূপই একটি প্রসঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে। বিনয়পিটকে লিখিত আছে যে, অজাতশত্রু রাজপদ পাওয়ার পূর্বে দেবদত্ত নামক এক ব্যক্তি তাহাকে নিজদলে আনিয়া তাহার সাহায্যে বুদ্ধের উপর নালগিরি নামক একটি পাগলা হাতি ছাড়িয়া দেওয়ার ষড়যন্ত্র করিয়াছিল। এই কাহিনীতে কতটুকু সত্যতা আছে বলা যায় না। তবু এই কথা ঠিক যে, অজাতশত্রু দেবদত্তের খুব বড়ো সহায়ক ছিলেন। আর বোধ হয়, এইজন্যই ভগবান্ বুদ্ধ রাজগৃহ হইতে দূরে থাকিতেন। তথাপি লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, বুদ্ধ যখন রাজগৃহে আসিলেন, তখন অজাতশত্রু তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে কিছুমাত্র পশ্চাৎপদ হন নাই, আর ঠিক ঐ সময়েই রাজগৃহের চারি দিকে বড়ো বড়ো শ্রমণসংঘের ছয়জন নেতা বসবাস করিতেন, এই কথা বিবেচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, অজাতশত্রু তাঁহার পিতা হইতেও শ্রমণদিগকে অধিক সম্মান করিতেন। বেশি কথা বলার প্রয়োজন কি—অজাতশত্রুর রাজত্বকালে মগধদেশ হইতে যাগযজ্ঞ প্রায় লুপ্ত হইতে চলিয়াছিল, এবং তাহার পরিবর্তে শ্রমণসংঘগুলি সমৃদ্ধ হইতেছিল।

মগধের রাজধানী রাজগৃহ। এই স্থান বর্তমান বিহারের তেলয়্যা নামক স্টেশন হইতে যোলো মাইলের ভিতর অবস্থিত। চারিদিকে পাহাড়, আর তাহারই মধ্যভাগে এই শহর গড়িয়া উঠিয়াছিল। শহরে যাইবার জন্য, পাহাড়ের ভিতর দিয়া, শুধু দুইটি রাস্তা থাকায় শত্রুর আক্রমণ হইতে সহজে নগরের সংরক্ষণ করা যাইবে মনে করায়, এখানে এই শহরটি নির্মিত হইয়া থাকিবে। কিন্তু অজাতশত্রুর ক্ষমতা এত বাড়িয়া গিয়াছিল যে, নিজের সংরক্ষণের জন্য এই গিরিগোশালায় (গিরিব্রজে) থাকা তাঁহার আবশ্যক মনে হয় নাই। বুদ্ধের পরিনির্বাণের পূর্বেই এই রাজা পাটলিপুত্রে এক নূতন শহর নির্মাণ করিতেছিলেন, আর হয়তো পরে সেখানেই তিনি নিজের রাজধানী উঠাইয়া লইয়াছিলেন।

অজাতশত্রুকে বৈদেহীপুত্র বলা হইয়াছে। ইহা হইতে প্রথম দৃষ্টিতে মনে হয় যে, তাঁহার মাতা বিদেহ দেশের মেয়ে। জৈনদের "আচারাঙ্গ" প্রভৃতি সূত্রে এইরূপ উল্লিখিত আছে যে, তাহার মা বজ্জী রাজাদের মধ্যে কাহারও কন্যা। কিন্তু কোসলসংযুত্তে দ্বিতীয় বগ্‌গের চতুর্থ সূত্রের অট্‌ঠকথাতে অজাতশত্রুকে পসেনদির ভাগিনেয় বলা হইয়াছে। সেখানে বৈদেহী শব্দের অর্থ করা হইয়াছে "পণ্ডিতাধিবচনমেতং, পণ্ডিতিত্থিয়া পুত্তোতি অত্থো।" ললিতবিস্তর গ্রন্থে মগধদেশের রাজকুলকেই বৈদেহী নাম দেওয়া হইয়াছে। ইহা হইতে মনে হয় যে, এই কুলের পিতৃবংশটি প্রসিদ্ধ ছিল না; এবং পরে এই বংশের কোনো রাজার বিদেহদেশস্থ কোনো রাজকন্যার সহিত বিবাহ হওয়াতে, উহার বৈদেহী-কুল এই নাম হইয়াছিল, ও বংশের কোনো কোনো রাজপুত্র নিজেদের বৈদেহীপুত্র নামে পরিচয় দিতে লাগিল।

অজাতশত্রু নিজ পিতা বিম্বিসারকে হত্যা করিয়াছেন, এই সংবাদ পাইয়া, অবন্তীর রাজা চণ্ডপ্রদ্যোত অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন এবং অজাতশত্রুর বিরুদ্ধে অভিযান করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। তাহার ভয়ে অজাতশত্রু রাজগৃহের দুর্গপ্রাচীর মেরামত ও দৃঢ়তর করিলেন।[১] পরে চণ্ডপ্রদ্যোত অভিযানের সংকল্প ত্যাগ করিয়া থাকিবেন। অজাতশত্রুর

১. মজ্ঝিমনিকায়ে গোপকমোগ্‌গল্লান সুত্তের অট্‌ঠকথা দ্রষ্টব্য।

এই নির্মম আচরণে চণ্ডপ্রদ্যোতের মতো ভিন্ন দেশের রাজাও ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন। কিন্তু লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, মগধের প্রজারা ইহাতে বিন্দুমাত্র বিক্ষুব্ধ হয় নাই। ইহা হইতে এই দেশে একচ্ছত্র রাজতন্ত্র যে কতখানি দৃঢ়মূল হইয়া বসিয়াছিল, তাহা ভালোভাবে অনুমান করিতে পারা যায়।

৩. কাসী

কাসী কিংবা কাশী রাজ্যের রাজধানী বারাণসী। জাতক আট্‌ঠকথা হইতে বুঝা যায় যে, সেখানকার অনেক রাজাকেই ব্রহ্মদত্ত নামে নির্দেশ করা হইত। ইহাদের শাসনপদ্ধতি সম্বন্ধে বিশেষ কোনো সংবাদ পাওয়া যায় না। তবু ইহা জানিতে পারা যায় যে, কাশীর রাজারা খুব উদার-হৃদয় (মহাজন) ছিলেন। তাঁহাদের রাজ্যে শিল্পকলার যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল। বুদ্ধের সময়েও উৎকৃষ্ট জিনিসকে “কাসিক” বলা হইত। কাসিক বস্ত্র, কাসিক চন্দন প্রভৃতি শব্দ ত্রিপিটক সাহিত্যে অনেক স্থলে দৃষ্টিগোচর হয়। বারাণসীর রাজা অশ্বসেনের রানী বামার গর্ভে ত্রয়োবিংশ তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি গৌতম বুদ্ধের জন্মের প্রায় ২৪৩ বৎসর পূর্বে ধর্মোপদেশ দিতে আরম্ভ করেন। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, কাশীর মহাজনরা যে শুধু শিল্পকলার ব্যাপারেই অগ্রণী ছিলেন তাহা নহে, উপরন্তু তাঁহারা ধর্মবিচারেও অগ্রগামী ছিলেন, এইরূপ স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু বুদ্ধের সময় এই দেশের স্বাধীনতা সম্পূর্ণ নষ্ট হইয়া গেলে, উহা কোসল দেশের অন্তর্ভূত হইয়া গিয়াছিল। এবং অঙ্গ-মগধ এই সমাসবদ্ধ শব্দের ন্যায়, কাশীকোসল এই শব্দটিও প্রচলিত হইয়াছিল।

৪. কোসল

কোসল রাজ্যের রাজধানী শ্রাবস্তী। ইহা অচিরবতী (বর্তমান রাপ্তী) নদীর তীরে অবস্থিত ছিল; আর সেখানে রাজা পসেনদি (প্রসেনজিৎ) রাজত্ব করিতেন। এই রাজা বৈদিক ধর্মের সম্পূর্ণ অনুগামী ছিলেন ও বড়ো বড়ো যজ্ঞ করিতেন—এই কথা কোসলসুত্তের একটি সুত্ত হইতে বুঝা যায়। তথাপি তাহার রাজ্যেও শ্রমণদের সম্মান রক্ষিত হইত। সেখানকার একজন বড়ো শ্রেষ্ঠী অনাথপিণ্ডিক নামে লোকসমাজে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন।[১] এই ব্যক্তি বুদ্ধের ভিক্ষুসংঘের জন্য শ্রাবস্তীতে জেতবন নামক একটি বিহার নির্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। বিশাখা নামক একজন উপাসিকাও ভিক্ষুদের জন্য পূর্বারাম নামক একটি প্রকাণ্ড প্রাসাদ নির্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। এই দুই স্থানেই বুদ্ধ তাঁহার ভিক্ষুসংঘের সহিত মাঝে মাঝে থাকিতেন। বুদ্ধের অনেকগুলি চাতুর্মাসই এই দুই জায়গায় কাটিয়া থাকিবে। কারণ ত্রিপিটক সাহিত্যে এইপ্রকার নিদর্শন পাওয়া যায় যে, বুদ্ধ অনাথপিণ্ডিকের বাগানে যাইতেন। বুদ্ধ তাঁহাকে অনেকবার উপদেশ দিয়াছিলেন। এইসকল উপদেশের সংগ্রহ কোসলসুত্তে পাওয়া যায়।[২]

---

১ ইহার প্রকৃত নাম ছিল সুদত্ত। অনাথদিগকে তিনি অন্ন (পিণ্ড) দিতেন বলিয়া তাঁহাকে অনাথপিণ্ডিক বলা হইত।

২ এই সংযুত্তের প্রথম সুত্তেই বলা হইয়াছে যে, পসেনদি বুদ্ধের ভক্ত ও উপাসক হইয়াছিল ; কিন্তু নবম সুত্তে পসেনদির একটি মহাযজ্ঞের বর্ণনাও রহিয়াছে। সুতরাং পসেনদি যে বুদ্ধের খাঁটি উপাসক হইয়াছিলেন তাহা বলা চলে না।

ললিতবিস্তরে এই রাজবংশের যে বর্ণনা আছে, তাহা হইতে বুঝা যায় যে, এই রাজা মাতঙ্গ নামক কোনো হীন জাতি হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। ধম্মপদ অট্‌ঠকথাতে বিড়ূড়ভের (বিদুর্দভের) যে একটি গল্প দেখা যায়, তাহা দ্বারা ললিতবিস্তরের কাহিনীটি সমর্থিত হয়।

রাজা পসেনদি বুদ্ধদেবকে খুব মান্য করিতেন। তিনি বুদ্ধের শাক্যবংশের কোনো এক রাজকন্যাকে বিবাহ করিতে মনস্থ করিলেন। কিন্তু শাক্য রাজারা কোসলরাজবংশকে ছোটো মনে করায়, সেই বংশে নিজ কন্যা দেওয়া সংগত মনে করিতেন না। তথাপি শাক্যরা কোসলরাজার শাসনাধীন ছিল বলিয়া, তাঁহার অনুরোধ একেবারে প্রত্যাখ্যান করিতে পারিল না। তাহারা এইরূপ একটি কৌশল অবলম্বন করিবে বলিয়া মনে মনে ঠিক করিল যে, মহানাম নামক শাক্য রাজপুত্রের দাসীকন্যা বাসভখত্তিয়াকে মহানাম নিজের কন্যা বলিয়া পরিচয় দিয়া, কোসলরাজকে দিবেন। কোসলরাজার অমাত্যরা এই কন্যা মনোনীত করিল। মহানাম এই মেয়ের সহিত একসঙ্গে বসিয়া আহার করায়, সে যে তাহারই কন্যা, সে সম্বন্ধে কোসল-রাজ নিঃসন্ধিগ্ধ হইলেন। তাহার পর, নির্দিষ্ট দিনে শুভ মুহূর্তে বাসভখত্তিয়ার সহিত কোসলরাজের বিবাহ হইল। রাজা তাহাকে পাটরানী করিলেন। বাসভখত্তিয়ার ছেলে বিড়ূড়ভ ষোল বৎসরের হইলে, নিজের মাতামহ শাক্যদের নিকট গেল। শাক্যরা তাহাকে সংস্থাগারে (নগর-মন্দিরে) যথাযোগ্য সম্মানের সহিত অভ্যর্থনা করিল। কিন্তু সে চলিয়া যাওয়ার পর, তাহার আসনটি ধৌত করা হইল ও বিড়ূড়ভের কানে এই কথা পৌঁছিল যে, সে দাসীপুত্র। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর, বিড়ূড়ভ বলপূর্বক কোসলরাজ্য অধিকার করিয়া বৃদ্ধ পসেনদিকে শ্রাবস্তীপুর হইতে তাড়াইড়া দিল। পসেনদি নিজ ভাগিনেয় অজাতশত্রুর আশ্রয় লইবার জন্য অজ্ঞাত বেশে রাজগৃহের দিকে রওনা হইলেন এবং পথে নানা কষ্ট পাইয়া শেষে রাজগৃহের বাহিরে একটি ধর্মশালায় প্রাণত্যাগ করিলেন। পিতার মৃত্যুর পর, বিড়ূড়ভ শাক্যদের বিরুদ্ধে অভিযান করিবার সংকল্প করিল। ভগবান বুদ্ধ তাহাকে উপদেশ দিয়া দুইবার এই অভিযান হইতে পরাবৃত্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু তৃতীয়বার তিনি এই ভাবে মধ্যস্থতা করার অবকাশ পান নাই; তাই বিড়ূড়ভ এইবার নিজ সংকল্প কার্যে পরিণত করিতে পারিল। সে শাক্যদিগকে আক্রমণ করিয়া তাহাদের উপর ভয়ংকর অত্যাচার করিল। যাহারা তাহার শরণাপন্ন হইল অথবা দূরে পলাইয়া গেল, তাহাদের ছাড়া আর সকলকেই সে স্ত্রীপুত্রসহ হত্যা করিয়া তাহাদের রক্তে নিজের আসন ধোয়াইয়াছিল।

শাক্যদিগকে নিপাত করিয়া, বিড়ূড়ভ শ্রাবস্তীতে ফিরিয়া অচিরবতী নদীর তীরে সসৈন্যে শিবির ফেলিয়া অবস্থান করিতে থাকিল। এদিকে শ্রাবস্তীপুরের আশেপাশে ভয়ানক অকালবৃষ্টি হইয়া অচিরবতী নদীতে ভীষণ প্লাবন আসিল, আর বিড়ূড়ভ তাহার কিছু সৈন্যের সহিত এই প্রচণ্ড প্লাবনে ভাসিয়া গেল।

মগধদেশের মতো কোসলদেশেও একচ্ছত্র রাজতন্ত্র শক্তিশালী হইতেছিল। বিড়ূড়ভের

কাহিনী হইতে ইহা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, যদিও সে বলপূর্বক তাহার জনপ্রিয় পিতার সিংহাসন ছিনাইয়া লইয়াছিল, তথাপি কোসলদেশের প্রজারা তাহার বিরুদ্ধে একটি কথাও কহে নাই।

৫. বজ্জী

গণমূলক রাজ্যগুলির মধ্যে শুধু তিনটি রাজ্যই স্বাধীন থাকিয়া গেল। প্রথমটি হইল বজ্জীদের, আর বাকি দুইটি হইল পাবা ও কুশিনারা এই দুই জায়গার মল্লদের। ইহাদের মধ্যে বজ্জীদের রাজ্য শক্তিশালী ও সমৃদ্ধিশালী ছিল; কিন্তু ইহাও অস্ত যাইবার সময় দূরে ছিল না। তথাপি উষার শুকতারার কিরণের ন্যায় তাহা উজ্জ্বল দেখাইতেছিল। বুদ্ধ এইরকমই একটি গণতান্ত্রিক রাজ্যে জন্মাইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার জন্মের পূর্বেই শাক্যদের স্বাধীনতা নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। বুদ্ধের জীবদ্দশায় বজ্জীরা তাহাদের একতা ও পরাক্রমের বলে স্বাধীনতা অক্ষুন্ন রাখিতে সমর্থ ছিল বলিয়া, বুদ্ধের মনে যে তাহাদের প্রতি শ্রদ্ধা ছিল, ইহা খুবই স্বাভাবিক। মহাপরিনিব্বানসুত্তে লিখিত আছে যে, দূর হইতে আসিতেছে এমন একদল লিচ্ছবীর দিকে তাকাইয়া, ভগবান্ বুদ্ধ তাঁহার ভিক্ষুদিগকে বলিয়াছিলেন, "হে ভিক্ষুগণ, যাহারা ঠাকুর দেবতা দেখে নাই, তাহারা এই লিচ্ছবীদের দলটি দেখুক।"

বজ্জীদের রাজধানী ছিল বৈশালী। উহার আশেপাশে যে সব বজ্জী থাকিত, তাহাদিগকে লিচ্ছবী বলা হইত। তাহাদের পূর্ব দিকে বিদেহদের রাজ্য। সেখানে এককালে জনকের মতো উদারচেতা রাজার আবির্ভাব হইয়াছিল। ললিতবিস্তরে দেখা যায় যে, বিদেহদের শেষরাজা সুমিত্র মিথিলা নগরীতে রাজত্ব করিতেন। সুমিত্রের পর, বিদেহরাজ্য বজ্জীদের রাজ্যে মিলিত হইয়া থাকিবে। মহাপরিনিব্বান সুত্তের আরম্ভে ও অঙ্গুত্তরনিকায়ের সত্তকনিপাতে দেখা যায় যে, ভগবান্ বুদ্ধ বজ্জীদিগকে সাতটি নিয়ম বলিয়াছিলেন। মহাপরিনিব্বানসুত্তের অট্‌ঠকথাতে এই নিয়মগুলির উপর বিস্তৃত টীকা রহিয়াছে। এই নিয়মগুলি দেখিয়া অনুমান হয় যে, বজ্জীদের রাজ্যে ন্যায়-অন্যায়ের বিচারের জন্য জুরি-পদ্ধতির মতো একপ্রকার বিচার প্রণালী প্রচলিত ছিল ও এইজন্য সেখানে সহসা নিরপরাধ ব্যক্তির শাস্তি হইতে পারিত না। তাহারা তাহাদের আইন-কানুন লিখিয়া রাখিত এবং তদনুসারে সমাজব্যবস্থা চালাইবার মতো তাহাদের দক্ষতাও ছিল।

৬. মল্ল

মল্লদের রাজ্য বজ্জীদের রাজ্যের পূর্বে ও কোসলদেশের পশ্চিমে অবস্থিত ছিল। বজ্জীদের মতোই সেখানেও গণমূলক শাসনতন্ত্র প্রচলিত ছিল। কিন্তু আভ্যন্তরীণ কলহহেতু তাহারা 'পাবার মল্ল' ও 'কুশিনারের মল্ল', এই দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছিল। মগধদেশ হইতে কোসলে যাইবার রাস্তা মল্লদের রাজ্যের ভিতর দিয়া গিয়াছিল বলিয়া, ভগবান্ বুদ্ধ এই দেশের মধ্যে দিয়া বারবার যাতায়াত করিতেন। পাবাবাসী চুন্দ নামক এক কর্মকারের বাড়িতে ভগবান্ বুদ্ধ আহার করিয়াছিলেন। ইহার পর তাঁহার অসুখ হইয়াছিল এবং

সেখান হইতে কুশিনারা গিয়া সেই রাত্রিতেই তিনি পরিনির্বাণ লাভ করেন। আজও সেখানে একটি ছোটো স্তূপ ও মন্দির আছে। তাহা দর্শন করিবার জন্য বহু বৌদ্ধযাত্রী সেখানে যায়। পাবা অথবা পড়বণা, এই গ্রামটিও এখান হইতে নিকটেই। ইহা হইতে মনে হয় যে, পাবা ও কুশিনারার মল্লরা কাছাকাছি বাস করিত। এই উভয় রাজ্যেই বুদ্ধের অনেক শিষ্য ছিল। রাজ্য দুইটি স্বাধীন ছিল বটে, তথাপি বজ্জীদের গণমূলক রাজ্যের মতো প্রভাবশালী ছিল না। কিংবহুনা, বজ্জীদের শক্তিশালী রাজ্যটি কাছে থাকাতেই, হয়তো মল্লদের রাজ্য দুইটি বাঁচিয়া থাকিতে পারিয়াছিল।

৭. চেতী

এই রাষ্ট্রটির খবর চেতিয় জাতক ও বেস্সন্তর জাতকে পাওয়া যায়। চেতিয় জাতকে (নং ৪২২) লিখিত আছে যে, এই রাজ্যের রাজধানী ছিল সোত্থিবতী (স্বস্তিবতী)। সেখানে এই রাষ্ট্রের রাজাদের বংশাবলীও দেওয়া আছে। শেষ রাজার নাম উপচর অথবা অপচর। ইনি মিথ্যা কথা বলায়, নিজ পুরোহিতের শাপে নরকে গিয়াছিলেন। তাঁহার পাঁচ ছেলে পুরোহিতের শরণাপন্ন হইল। পুরোহিত তাহাদিগকে ঐ রাজ্য ছাড়িয়া অন্যত্র যাইতে বলিলেন। তদনুসারে তাহারা বিদেশে গিয়া, পাঁচজনে পাঁচটি ভিন্ন ভিন্ন শহর স্থাপন করিলেন। এইসব কথা উক্ত জাতক দুইটিতে পাওয়া যায়। বেস্সন্তরের স্ত্রী মদ্দী (মাদ্রী) মদ্দ (মদ্র) রাজ্যের রাজকন্যা। বেস্সন্তর জাতকের কাহিনী হইতে মনে হয় যে, এই রাষ্ট্রটিকে চেতিয় রাষ্ট্র বলা হইত। আর বেস্সন্তরদের দেশ 'শিবি' এই চেতিয় রাজ্যের সংলগ্ন ছিল। সেখানকার রাজা শিবি এক ব্রাহ্মণকে নিজের চক্ষুদান করিয়াছিলেন, জাতকে এইরূপ একটি গল্প বেশ প্রসিদ্ধ।[1] বেস্সন্তর জাতকে এই কথাও বর্ণিত আছে যে, বেস্সন্তর রাজকুমার তাঁহার মঙ্গলহস্তী, দুই পুত্র এবং পত্নী ব্রাহ্মণদিগকে দান করিয়াছিলেন। এইসব গল্প হইতে খুব জোর হয়তো, ইহাই প্রমাণিত হয় যে, শিবি ও চেতিদের (চৈদ্যদের) রাজ্যে ব্রাহ্মণদের খুব অধিপত্য ছিল। সুতরাং এই রাজ্য দুইটি ভারতবর্ষের পশ্চিম দিকে কোথাও ছিল বলিয়া অনুমান করা যায়। বুদ্ধের সময় শিবি ও চেতি এই দুই রাজ্যের শুধু নামই লোকের নিকট পরিচিত ছিল, কিন্তু বুদ্ধ এসব দেশে কখনো গিয়াছিলেন বলিয়া, অথবা অঙ্গরাজ্য যেমন মগধের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল সেই রকম এই দুইটি রাষ্ট্র অন্য কোনো রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল বলিয়া কোনো নিদর্শন পাওয়া যায় না। সে যাহাই হউক, ইহা নিশ্চিত যে, ভগবান্ বুদ্ধের জীবনের সহিত এই দুইটি রাজ্যের কোনো প্রকার সাক্ষাৎ সম্বন্ধ হয় নাই।

৮. বংস (বৎস)

কোসম্বী (কৌশাম্বী) ইহার রাজধানী ছিল। এইরূপ মনে হয় যে বুদ্ধের সময় এখানকার গণমূলক শাসনতন্ত্র নষ্ট হইয়া গেলে, উদয়ন নামক একজন অত্যন্ত আরামপ্রিয় ও বিলাসী

---

১. শিবিজাতক (নং ৪৯৯) দ্রষ্টব্য।

রাজা এখানকার সর্বক্ষমতার অধিকারী হইয়াছিল। ধম্মপদ অট্‌ঠকথাতে এই রাজার সম্বন্ধে একটি গল্প আছে। তাহা এইরূপ ঃ

উদয় ও উজ্জয়িনীর রাজা চণ্ডপ্রদ্যোত, এই দুইজনের মধ্যে শত্রুতা ছিল। উদয়নকে যুদ্ধে পরাস্ত করা সম্ভবপর ছিল না, তাই প্রদ্যোত মনে মনে স্থির করিলেন, কোনো কৌশলে উদয়নকে বন্দী করিতে হইবে। রাজা উদয়ন হাতি ধরিবার মন্ত্র জানিতেন, আর জঙ্গলে হাতি আসিবামাত্র তিনি শিকারীদিগকে সঙ্গে লইয়া হাতির পিছনে ছুটিতেন। চণ্ডপ্রদ্যোত একটি কৃত্রিম হাতি বানাইয়া, সেটিকে বৎস দেশের সীমান্তে আনিয়া রাখিয়া দিলেন। নিজ দেশের সীমান্তে নূতন হাতি আসিয়াছে, এই খবর পাওয়া মাত্র, উদয়ন তাহার পিছনে লাগিলেন। কৃত্রিম হাতির ভিতরে একটি মানুষ লুকাইয়া ছিল। সে কল টিপিয়া হাতিটিকে চণ্ডপ্রদ্যোতের রাজ্যে লইয়া গেল। উদয়ন যখন হাতির পিছু পিছু ছুটিতেছিলেন, তখন পূর্ব হইতেই আক্রমণের জন্য প্রস্তুত প্রদ্যোতের সৈন্যরা তাঁহাকে ধরিয়া উজ্জয়িনীতে লইয়া গেল।

চণ্ডপ্রদ্যোত তাঁহাকে বলিলেন, "যদি তুমি আমাকে হাতি ধরার মন্ত্র শিখাও, তাহা হইলে তোমাকে ছাড়িয়া দিব; তাহা না হইলে, এখনই তোমাকে মারিয়া ফেলিব।" কিন্তু উদয়ন এই প্রলোভনে অথবা শাস্তির ভয়ে বিচলিত হইলেন না। তিনি বলিলেন, "আমাকে প্রণাম করিয়া, শিষ্যরূপে আমার নিকট মন্ত্র পাঠ কর তো, তোমাকে আমি মন্ত্র শিখাইব, তাহা না হইলে, তুমি যাহা করিতে চাও, তাহাই করিতে পার।" প্রদ্যোত অত্যন্ত অহংকারী ছিলেন বলিয়া, এই প্রস্তাব তাঁহার মনঃপূত হইল না। কিন্তু উদয়নকে হত্যা করিয়া চিরকালের জন্য মন্ত্রটিকে নষ্ট করিয়া ফেলা তাঁহার নিকট ভালো মনে হইল না। সুতরাং তিনি উদয়নকে বলিলেন, "অন্য কাহাকেও তুমি এই মন্ত্র শিখাইতে রাজী আছ কি? আমার স্নেহভাজন ও বিশ্বাসী ব্যক্তিকে যদি তুমি এই মন্ত্র শিখাও, তাহা হইলেও আমি তোমাকে ছাড়িয়া দিব।"

উদয়ন কহিলেন, "স্ত্রী হউক, পুরুষ হউক, যে-কেহ আমাকে প্রণাম করিয়া আমার নিকট মন্ত্র পাঠ করিবে, তাহাকেই আমি এই মন্ত্র শিখাইব।"

চণ্ডপ্রদ্যোতের কন্যা বাসুলদত্তা (বাসবদত্তা) খুব বুদ্ধিমতী ছিল। মন্ত্র গ্রহণ করিবার ক্ষমতা তাহার অবশ্যই ছিল; কিন্তু উদয়ন ও সে পরস্পরকে দেখুক, ইহা প্রদ্যোত ভালো মনে করেন নাই। তিনি উদয়নকে বলিলেন, "আমার বাড়িতে একটি কুব্জাদাসী আছে। সে পর্দার আড়ালে থাকিয়া তোমাকে প্রণাম করিবে এবং তোমার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া, তোমার কাছে মন্ত্র শিখিবে। তাহার মন্ত্রসিদ্ধি হইলে, আমি তোমাকে বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া, তোমার নিজ রাজ্যে পাঠাইয়া দিব।"

উদয়ন এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। এদিকে প্রদ্যোত বাসবদত্তাকে বলিলেন, "এক ব্যক্তি হাতি ধরিবার মন্ত্র জানে; কিন্তু তাহার শ্বেতকুষ্ঠ আছে। তাহার মুখের দিকে না তাকাইয়া, তাহাকে প্রণাম করিয়া, তোমাকে তাহার নিকট এই মন্ত্র শিখিতে হইবে।" তদনুসারে বাসবদত্তা পর্দার আড়ালে থাকিয়া, উদয়নকে নমস্কার করিয়া মন্ত্র শিখিতে

আরম্ভ করিল। শিখিবার সময়, সে মন্ত্রের কোনো কোনো অক্ষর অবিকল উচ্চারণ করিতে পারিতেছিল না। তখন উদয়ন রাগিয়া তাহাকে বলিলেন, "ওগো কুব্জে, তোমার ঠোঁটগুলি নিশ্চয়ই খুব মোটা আর ভারী"। ইহা শুনিয়া বাসবদত্তা খুব চটিয়া গেল এবং কহিল, "ওহে শ্বেতকুষ্ঠী, তুমি রাজকন্যাকে কুব্জা বলিতেছ বুঝি!"

উদয়ন ব্যাপারখানা ঠিক কী বুঝিতে না পারিয়া প্রকৃত ঘটনা জানিবার জন্য, হঠাৎ এক পাশে পর্দা সরাইয়া দিলেন। তখন উভয়েই প্রদ্যোতের অভিসন্ধি বুঝিতে পারিল। তৎক্ষণাৎ তাহারা পরস্পরের প্রেমে পড়িয়া গেল ও অবন্তী হইতে কি করিয়া উভয়ে পলাইয়া যাইবে, তাহার ফন্দি আঁটিল। মন্ত্রসিদ্ধির শুভমুহূর্তে কিছু গাছগাছড়া আনিতে হইবে, এই অজুহাতে বাসবদত্তা তাহার বাবার কাছে ভদ্রাবতী নামক একটি মাদি-হাতি চাহিয়া লইল। এদিকে প্রদ্যোত উদ্যান-ক্রীড়া করিতে গিয়াছে দেখিয়া, সে ও উদয়ন ঐ হাতির উপর বসিয়া অবন্তী হইতে পলায়ন করিল। উদয়ন তো হাতি চালাইতে ওস্তাদ ছিলই, তবু তাহাদের পিছনে যে-সব সৈন্য পাঠানো হইয়াছিল, তাহারা উহাদের কাছাকাছি পৌঁছিয়া গেল। বাসবদত্তা পিতার রাজকোষ হইতে যথাসম্ভব কয়েকটি ঝুলি সোনার টাকাপয়সায় ভরিয়া সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিল। সে তখন একটি থলির মুখ খুলিয়া উহার ভিতরের সব টাকাপয়সা রাস্তায় ছড়াইয়া দিল। সৈন্যরা সেগুলি কুড়াইতে ব্যস্ত হইয়া পড়িল। ততক্ষণে, উদয়ন জোরে হাতি হাঁকাইয়া অনেক দূরে চলিয়া গেলেন। কিন্তু সৈন্যরা আবার তাহাদিগকে প্রায় ধরিয়া ফেলিল; তখন বাসবদত্তা আবার একই উপায় অবলম্বন করিল। এইভাবে তাহারা উভয়ে কৌশাম্বী আসিয়া পৌঁছিল।

উদয়ন সেই যে একবার উদ্যানে খেলা করিতে গিয়াছিলেন, সেখানেই ঘুমাইয়া পড়িলেন। পিণ্ডোল ভারদ্বাজ নামক একজন ভিক্ষুক নিকটেই গাছের নীচে বসিয়াছিলেন। রাজা নিদ্রা যাইতেছেন দেখিয়া, তাহার সঙ্গে যে-সব স্ত্রীলোক আসিয়াছিল তাহারা পিণ্ডোল ভারদ্বাজের নিকট গেল এবং সেখানে বসিয়া তাহার উপদেশ শুনিতে থাকিল। এদিকে রাজার ঘুম ভাঙিল। এবং তিনি রাগিয়া ভারদ্বাজের শরীরে লাল রঙের পিঁপড়া ছুঁড়িয়া ফেলিতে চেষ্টা করিলেন। সংযুত্তনিকায়ের অট্‌ঠকথাতে এই গল্পটি পাওয়া যায়। কিন্তু পরে পিণ্ডোল ভারদ্বাজের উপদেশেই রাজা উদয়ন বুদ্ধের শিষ্য হইয়াছিলেন।

অঙ্গুত্তরনিকায়ের অট্‌ঠকথাতে এবং ধম্মপদ অট্‌ঠকথাতে এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায় যে, কৌশাম্বীনগরে ঘোষিত, কুক্কুট ও পাবারিক নামক তিনজন শ্রেষ্ঠী বুদ্ধের ভিক্ষুসংঘের জন্য ক্রমান্বয়ে ঘোষিতারাম, কুক্কুটারাম এবং পাবারিকারাম নামক তিনটি বিহার নির্মাণ করাইয়াছিলেন। উদয়নের এক প্রধানা রানী সামাবতী ও তাহার দাসী খুজ্জুওরা (কুব্জা উত্তরা) এই দুই জন, বুদ্ধের দুই প্রধান ভক্ত ছিল। ইহা হইতে অনুমান হয় যে, যদিও উদয়ন নিজে জনসাধারণের ধর্মের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাশীল ছিলেন না, তথাপি কৌশাম্বীর জনসাধারণদের মধ্যে বুদ্ধের অনেক ভক্ত ছিল। আর তাহারা ভিক্ষুদের অন্নবস্ত্রের ব্যবস্থা করিতে সর্বদাই আগ্রহান্বিত থাকিত।[১]

---

১. 'বৌদ্ধ সংঘাচা পরিচয়', পৃ. ২৩৭-৪৫ দ্রষ্টব্য।

৯. কুরু

এই দেশের রাজধানী ছিল ইন্দ্রপ্রস্থ। বুদ্ধের সময় সেখানে পৌরব্য নামে এক রাজা রাজত্ব করিতেন, আমরা শুধু এইটুকু সংবাদই পাই। কিন্তু সেখানকার শাসনপদ্ধতি কিরূপ ছিল, তাহার খবর কোথাও পাওয়া যায় না। এই দেশে বুদ্ধের সংঘের জন্য একটি মাত্র বিহারও ছিল না। ভগবান্ বুদ্ধ যখন প্রচারের জন্য এই দেশে যাইতেন, তখন তিনি কোনো গাছের নীচে অথবা এইরূপই অন্য কোনো জায়াগায় আড্ডা গাড়িতেন। তথাপি এই দেশেও বুদ্ধের উপদেশ শুনিতে উৎসুক বহুলোক ছিল বলিয়া মনে হয়। তন্মধ্যে রাষ্ট্রপাল নামক এক ধনী যুবক ভিক্ষু হইয়াছিল, এই কথা মজ্ঝিমনিকায়ে বিস্তারের সহিত বর্ণিত হইয়াছে। সুত্তপিটকে দেখা যায় যে, কুরুদেশের কম্মাসদম্ম (কল্মাষদম্ম) নামক নগরের নিকট ভগবান্ বুদ্ধ সতিপট্ঠানের মতো কয়েকটি ভালো ভালো সুত্তের উপদেশ দিয়াছিলেন। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, সর্বসাধারণ লোক বুদ্ধকে শ্রদ্ধাভক্তি করিলেও সেখানকার ক্ষমতাশালী লোকেদের মধ্যে তাঁহার কোনো ভক্ত ছিল না ও সেখানে বিদিক ধর্মের খুবই প্রাধান্য ছিল।

১০-১১. পঞ্চাল (পাঞ্চাল) ও মচ্ছ (মৎস্য)

জাতক অট্ঠকথায় অনেক স্থলে দেখা যায় যে, উত্তর পঞ্চালের রাজধানী ছিল কম্পিল্ল (কাম্পিল্য); কিন্তু মৎসদের রাজধানী যে কী ছিল, তাহার কোনো খবর নাই। ইহা হইতে মনে হয় যে, বুদ্ধের সময়, এই দুইটি দেশের তেমন গুরুত্ব ছিল না এবং বুদ্ধ এই-সব দেশে না যাওয়ায়, সেখানকার জনসাধারণ কিংবা নগরসম্বন্ধে বৌদ্ধগ্রন্থে বিশেষ সংবাদ পাওয়া যায় না।

১২. সূরসেন (শূরসেন)

ইহার রাজধানী মধুরা (মথুরা)। এখানে অবন্তীপুত্র নামে এক রাজা রাজত্ব করিতেন। এই রাজার সহিত মহাকাত্যায়নের বর্ণাশ্রম ধর্ম সম্বন্ধে যে কথোপকথন হইয়াছিল, তাহা মজ্ঝিমনিকায়ের মধুরসুত্তে বর্ণিত আছে। এই দেশে বুদ্ধ বড়ো বেশি যাইতেন না। নিম্নলিখিত সুত্ত হইতে মনে হয় যে, মধুরার প্রতি তাঁহার মনে বিশেষ প্রীতি ছিল না ঃ

পশ্চিমে ভিক্খরে আদীনবা মধুরাং। কতমে পঞ্চ? বিসমা, বহুরজা, চণ্ডসুনখা, বালযক্খা, দুল্লভপিণ্ডা। ইমে খো ভক্খবে পঞ্চ আদীনবা মধুরায়ং তি। (অঙ্গুত্তরনিকায় পঞ্চক-নিপাত)

হে ভিক্ষুগণ, মধুরাতে পাঁচটি অবগুণ আছে। সেই পাঁচটি কি? উহার রাস্তাগুলি উঁচুনীচু, সেখানে খুব ধুলা, সেখানকার কুকুরগুলির স্বভাব উগ্র, যক্ষরা অত্যন্ত ক্রুর, আর সেখানে ভিক্ষা অতি দুর্লভ। হে ভিক্ষুগণ, মধুরাতে এই পাঁচটি অবগুণ আছে।

১৩. অস্সক (অশ্মক)

সুত্তনিপাতে পারায়ণবগ্গের প্রারম্ভে যে-সব বত্থুগাথা আছে, সেগুলি দেখিয়া মনে হয় যে,

অস্‌সকদের রাজ্য গোদাবরী নদীর আশেপাশে কোথাও ছিল। শ্রাবস্তী নিবাসী বাবরী নামক একজন ব্রাহ্মণ তাঁহার ষোলোটি শিষ্যসহ এ-রাজ্যে আসিয়া বসতিস্থাপন করেন।

সো অস্‌সকস্‌স বিসয়ে অলকস্‌স সমাসনে
বসী গোদাবরীকূলে উঞ্ছেন চ ফলেন চ॥

তিনি (বাবরী) অস্‌সকের রাজ্যে এবং অলকের রাজ্যের নিকট গোদাবরী তীরে ভিক্ষা করিয়া এবং ফল খাইয়া উদরনির্বাহ করিয়া বাস করিতেন। অট্‌ঠকথার রচয়িতার বক্তব্য এই যে, অস্‌সক ও অলক নামে দুইজন অন্ধ্রদেশীয় (অন্ধক) রাজা ছিলেন; এবং তাঁহাদের রাজ্যের নিকটে বাবরী তাঁহার ষোলো জন শিষ্যসহ বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন এবং সেখানে তাঁহার ভিক্ষুদের সংখ্যা ক্রমেই বাড়িয়া গিয়াছিল। বৈদিক ধর্ম প্রচারের জন্য দাক্ষিণাত্যে ইহাই প্রথম উপনিবেশ, এইরূপ বলিলে আপত্তির কারণ দেখা যায় না। বুদ্ধ অথবা তাঁহার সমকালীন কোনো ভিক্ষু এত দূর পর্যন্ত না আসায়, রাজ্য দুইটি সম্বন্ধে বিশেষ সংবাদ বৌদ্ধসাহিত্যে পাওয়া যায় না। তথাপি স্বীকার করিতে হইবে যে, বুদ্ধের খ্যাতি এই দেশে আসিয়া পৌঁছিয়াছিল। বুদ্ধের খ্যাতি শুনিয়া বাবরী নিজের ষোলোটি শিষ্যকেই বুদ্ধের দর্শন লইবার জন্য পাঠাইয়া দিলেন। তাহারা ভ্রমণ করিতে করিতে মধ্যদেশে গেল ও সর্বশেষে রাজগৃহে গিয়া বুদ্ধের দর্শন পাইল। সেখানে তাহারা যে বুদ্ধের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিল, তাহা উপরিলিখিত পারায়ণবগ্‌গেই দেওয়া আছে। কিন্তু তাহারা সেখান হইতে ফিরিয়া গিয়া গোদাবরীর দেশে জনসাধারণকে বুদ্ধধর্ম সম্বন্ধে উপদেশ দিয়াছিল বলিয়া কোথাও উল্লেখ দেখা যায় না।

১৪. অবন্তী

অবন্তীর রাজধানী উজ্জয়িনী ও তাহার রাজা চণ্ডপ্রদ্যোতের সম্বন্ধে অনেক কথাই পাওয়া যায়। চণ্ডপ্রদ্যোতের একবার খুব কঠিন রোগ হইয়াছিল। তখন তিনি মগধের প্রখ্যাত চিকিৎসক জীবক কৌমারভৃত্যকে ডাকিয়া পাঠান। এই চিকিৎসকও তাঁহার রোগ ভালো করিয়া দিবার জন্য উজ্জয়িনীতে আসিলেন। প্রদ্যোতের স্বভাব অত্যন্ত ক্রূর ছিল বলিয়া তাহার নামের আগে চণ্ড এই বিশেষণটি লাগানো হইত। জীবক তাঁহার এই স্বভাবের কথা ভালো করিয়া জানিতেন। তাই তিনি রাজাকে ঔষধ দেওয়ার আগে, বন হইতে ঔষধ আনিতে হইবে, এই ছলে, প্রথম তাঁহার নিকট ভদ্দাবতী নামক একটি মাদি হাতি চাহিয়া লইলেন ও রাজাকে ঔষধ দিয়াই তিনি ঐ হাতির পিঠে সেখান হইতে পলাইয়া গেলেন। এদিকে ঔষধ খাইবামাত্র প্রদ্যোতের খুব বমি হইতে লাগিল। ইহাতে তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া জীবককে ধরিয়া আনিবার জন্য আদেশ দিলেন। কিন্তু জীবক সেখান হইতে আগেই বাহির হইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহাকে ধরিয়া আনিবার জন্য রাজা কাক নামক এক ভৃত্যকে পাঠাইলেন। কাক কৌশাম্বী পর্যন্ত পিছনে পিছনে ছুটিয়া জীবককে ধরিল। জীবক তাহাকে একটি আমলকীর ঔষধ খাইতে দিলেন। তাহা খাইয়া কাকের বড়ো দুর্দশা হইল; জীবক এই অবসরে ভদ্দাবতীর পিঠে চড়িয়া নিরাপদে রাজগৃহের দিকে রওনা হইলেন। এদিকে

প্রদ্যেত সম্পূর্ণ ভালো হইয়া গেলেন। কাকও ভালো হইয়া উজ্জয়িনীতে ফিরিয়া আসিল। রোগ ভালো হইয়া শরীর যথাপূর্ব সুস্থ হওয়ায়, প্রদ্যোত জীবকের উপর খুব সন্তুষ্ট হইয়া গেলেন, এবং তাহাকে উপহার দেওয়ার জন্য সিবেয্যকে নামক এক জোড়া অতি উৎকৃষ্ট কাপড় রাজগৃহে পাঠাইয়া দিলেন।[১]

ধম্মপদের অট্ঠকথাতে যে গল্পটি আছে, আর উপরে যে গল্পটি দেওয়া হইল. ইহাদের মধ্যে বেশ সাদৃশ্য আছে। কিন্তু ইহাদের একটি অপরটি দেখিয়া রচিত হইয়াছিল কিনা, অথবা গল্পগুলিতে বর্ণিত ঘটনা দুইটি ভিন্ন ভিন্ন কালে ঘটিয়াছিল কিনা, ইহা বলা যায় না। উভয় গল্প হইতেই প্রদ্যোতের উগ্র স্বভাব স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়, ও তিনি যে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন, তাহা বুঝিতে পারা যায়।

ভগবান্ বুদ্ধ কখনো প্রদ্যোতের রাজ্যে যান নাই। কিন্তু তাঁহার একজন প্রধান শিষ্য মহাকাত্যায়ন প্রদ্যোতের পুরোহিতের পুত্র ছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর, মহাকাত্যায়ন পুরোহিতের পদ পাইলেন। কিন্তু ইহাতে তিনি তৃপ্তিলাভ করেন নাই। তাই তিনি মধ্য দেশে গিয়া বুদ্ধের নিকট ভিক্ষুর দীক্ষা লইলেন। তিনি স্বদেশে ফিরিয়া আসিলে, প্রদ্যোত ও দেশের অন্যান্য লোকেরা তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়াছিল।[২] মথুরার রাজা অবন্তীপুত্রের সহিত মহাকাত্যায়নের জাতিভেদ বিষয়ে যে কথোপকথন হইয়াছিল, তাহা মজ্ঝিমনিকায়ের মধুর কিংবা মধুরিয়সুত্তে পাওয়া যায়। যদিও মথুরা ও উজ্জয়িনীতে মহাকাত্যায়ন একজন বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন, তথাপি বুদ্ধের জীবিতকালে সেখানে বৌদ্ধ মত বিশেষ প্রসার লাভ করিয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। বুদ্ধের ভিক্ষু শিষ্য অল্পসংখ্যক ছিল বলিয়া, তিনি এই দেশে তাঁহার পাঁচজন ভিক্ষুকে এইরূপ অনুমতি দিয়াছিলেন যে, তাহারা অপরকে ভিক্ষুমন্ত্রে দীক্ষা দিয়া সংঘের ভিতর লইতে পারিবেন।[৩] এই কাজের জন্য মধ্যদেশে কমপক্ষে কুড়িজন ভিক্ষুর প্রয়োজন ছিল।

১৫. গন্ধার (গান্ধার)

ইহার রাজধানী তক্কসিলা (তক্ষশিলা)। এখানে পুক্কুসাতি নামে এক রাজা রাজত্ব করিতেন। তিনি শেষ বয়সে রাজ্য ছাড়িয়া, রাজগৃহ পর্যন্ত পায়ে হাঁটিয়া গিয়াছিলেন, এবং ভিক্ষুসংঘেও যোগদান করিয়াছিলেন। তাহার পর, তিনি যখন [ভিক্ষার] পাত্র ও চীবরের [বস্ত্রের] অন্বেষণে বাহির হইলেন, তখন একটি পাগলা গোরু তাহাকে মারিয়া ফেলে। এই কাহিনী মজ্ঝিমনিকায়ের ধাতুবিভঙ্গসুত্তে দেওয়া আছে। তিনি যে তক্ষশিলার রাজা ছিলেন এবং তাহার সহিত কি করিয়া বিম্বিসার রাজার বন্ধুত্ব হইয়াছিল, তাহার বিস্তৃত বিবরণ এই সুত্তের অট্ঠকথাতে পাওয়া যায়। কাহিনীটির সারমর্ম এই ঃ

---

১. মহাবগ্গ, অষ্টমভাগ দ্রষ্টব্য।

২ বিশেষ খবরের জন্য দ্রষ্টব্য ঃ 'বৌদ্ধ সংঘাচা পরিচয়', পৃ. ১৬৫-৬৮

৩. মহাবগ্গ, অষ্টম ভাগ ; 'বৌদ্ধ সংঘাচা পরিচয়', পৃ. ৩০-৩১

তক্ষশিলার কয়েকজন বণিক রাজগৃহে আসিল। রাজগৃহের রীতি অনুসারে, রাজা বিম্বিসার তাহাদিগকে অভ্যর্থনা করিলেন এবং তাহাদের দেশের রাজার স্বভাব ও চরিত্র সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেন। উহাদের মুখে তিনি যখন জানিতে পারিলেন যে, উহাদের রাজা খুব ভালো মানুষ ও বিম্বিসারের সমবয়স্ক, তখন রাজা বিম্বিসারের মনে তাহার সম্বন্ধে প্রেম ও শ্রদ্ধা উৎপন্ন হইল; এবং তিনি এইসব বণিকের শুল্ক মাপ করিয়া তাহাদের মারফত পুক্কুসাতি রাজাকে নিজের বন্ধুত্ব জ্ঞাপন করিলেন। ইহাতে পুক্কুসাতি বিম্বিসারের উপর খুব প্রসন্ন হইলেন। তিনিও মগধদেশ হইতে যেসব বণিক গান্ধারে বাণিজ্য করিতে আসিত, তাহাদের শুল্ক মাপ করিয়া দিলেন; এবং তাহাদের সঙ্গে নিজের ভৃত্যদ্বারা রাজার জন্য আটটি পাঁচ রঙের বহুমূল্য শাল পাঠাইলেন। রাজা বিম্বিসার এই উপহারের বিনিময়ে একটি সোনার কাপড় সুন্দর একটি পেটরাতে ভরিয়া পুক্কুসাতির নিকট পাঠালেন। এই সুবর্ণবস্ত্রে উত্তম হিঙ্গুল দিয়া, বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের গুণাবলী অঙ্কিত ছিল। এইগুলি পাঠ করিয়া পুক্কুসাতি বুদ্ধের চিন্তায় মগ্ন হইয়া গেলেন ও শেষে নিজের রাজ্য ছাড়িয়া পায়ে হাঁটিয়া রাজগৃহে চলিয়া আসিলেন।

সেখানে এক কুম্ভকারের বাড়িতে বুদ্ধের সহিত তাহার দেখা হয়। কি করিয়া দেখা হইল, তাহাকে বুদ্ধ কী উপদেশ দিলেন এবং শেষে একটি উন্মত্ত গোরুর দ্বারা তিনি কিভাবে নিহত হইলেন, এইসব সংবাদ উপরে নির্দিষ্ট ধাতু-বিভঙ্গ-সুত্তেই পাওয়া যায়।

গান্ধার ও তাহার রাজধানীর (তক্ষশিলার) উল্লেখ জাতক অট্ঠকথার বহুস্থলে পাওয়া যায়। যেমন শিল্পকলা ও কারুকলায়, তেমনই বিদ্যার ব্যাপারেও তক্ষশিলা সকলের অগ্রগামী ছিল। ব্রাহ্মণকুমার বেদাভ্যাস করিবার জন্য, ক্ষত্রিয় ধনুর্বিদ্যা ও রাজ্যশাসন শিখিবার জন্য এবং তরুণ বৈশ্য শিল্পকলা ও অন্যান্য ব্যবসায় শিখিবার জন্য, বহু দূর দেশ হইতে তক্ষশিলায় আসিত। রাজগৃহের প্রসিদ্ধ চিকিৎসক জীবক কৌমারভৃত্য এখানেই আয়ুর্বেদ শিক্ষা করিয়াছিলেন। এই তক্ষশিলার বিশ্ববিদ্যালয়ই ভারতবর্ষের অত্যন্ত প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়।

১৬. কম্বোজ (কাম্বোজ)

ইহাদের রাজ্য ভারতের বায়ুকোণে ছিল; আর রাজধানী ছিল দ্বারকা—ইহা অধ্যাপক রিজ্ ডেভিড্স-এর মত।[১] কিন্তু মজ্ঝিমনিকায়ের অস্সলায়ন সুত্তে ‘যোন-কম্বোজেসু’ এইভাবে যবনদের সহিত এই দেশের উল্লেখ থাকায়, প্রতীয়মান হয় যে, ইহা গান্ধার দেশ পার হইয়া, তাহারও অপর দিকে অবস্থিত ছিল। এই সুত্তেই বলা হইয়াছে যে, যবন কম্বোজদেশে শুধু আর্য ও দাস, এই দুইটি জাতি বাস করে এবং তাহাদের মধ্যে কখনো আর্য দাস হয়, আবার কখনো দাস আর্য হয়। কোনো কোনো জাতক-কথা হইতে স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, গান্ধারদের দেশে বর্ণাশ্রম ধর্ম দৃঢ়মূল হইয়া গিয়াছিল। তক্ষশিলাতে তো অধিকাংশ গুরুগণই

১. Buddhist India পৃ. ২৮

ব্রাহ্মণ জাতির লোক ছিল। কিন্তু কম্বোজদেশে চাতুর্বর্ণ্যের প্রবেশ হয় নাই। তাহা হইলে বলিতে হইবে যে, ঐ দেশ গান্ধার দেশেরও অপর পার্শ্বে অবস্থিত ছিল।

এই দেশের লোকেরা বন্য ঘোড়া ধরিতে বিশেষ পারদর্শী ছিল—কুণালজাতকের অট্‌ঠকথা হইতে ইহা বুঝা যায়। ঘোড়া যেখানে জল খাইতে যায়, ঘোড়া ধরার লোকেরা সেখানে জলের শেওলায় ও তার কাছাকাছি ঘাসে মধু ছড়াইয়া দিত। ঘোড়াগুলি ঐ ঘাস খাইতে খাইতে পূর্ব হইতেই ঘেরাও করা একটা বড়ো জায়গাতে আসিয়া পড়িত। তখন ঘোড়া ধরার লোকেরা বেষ্টনের দরজা বন্ধ করিয়া দিত ও ধীরে ধীরে ঘোড়াগুলিকে আয়ত্তে আনিত। (আজকাল ইহারই মতো কোনো কৌশলে মহীশূরে হাতি ধরা হয়, ইহা সকলেই জানে।) বন্য ঘোড়াগুলির মুখে লাগাম লাগাইয়া, সেগুলি কম্বোজের ব্যবসায়ীদের নিকট বিক্রয় করা হইত। ব্যবসায়ীরা ঘোড়াগুলিকে সেখান হইতে মধ্যদেশে বারাণসী প্রভৃতি স্থানে আনিয়া বিক্রয় করিত।[১]

কাম্বোজ দেশের সাধারণ লোকেরা মনে করিত যে, কীটপতঙ্গ প্রভৃতি প্রাণীদের মারিলেই আত্মশুদ্ধি হয়।

কীটা পতঙ্গা উরগা চ ভেকা
হন্ত্বা কিমিং সুজ্ঝতি মক্‌খিকা চ।
এতে হি ধম্মা অনরিয়রূপা
কম্বোজকানং বিতথা বহুন্নং॥[২]

'কীট, পতঙ্গ, সাপ, ব্যাঙ্, কৃমি ও মাছি মারিলে মনুষ্য প্রাণী শুদ্ধ হয়, এইরূপ অনার্য ও মিথ্যা ধর্ম কাম্বোজের সাধারণ লোকেরা মানিয়া থাকে।'

ইহা হইতে মনে হয় যে, আজকাল উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের অধিবাসিগণ যেমন অশিক্ষিত ও অনুন্নত, তেমনই কাম্বোজবাসিগণও ছিল।

মনোরথপূরণী অট্‌ঠকথাতে মহাকপ্পিনের কাহিনী আছে। মহাকপ্পিন সীমান্তপ্রদেশের কুক্কুটবতী নামক রাজধানীতে রাজত্ব করিতেন। পরে বুদ্ধের সদ্‌গুণের কথা শুনিয়া, তিনি মধ্যদেশে আসেন। চন্দ্রভাগা নদীর তীরে ভগবান্ বুদ্ধের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হয়। সেখানে বুদ্ধ কপ্পিনকে ও তাহার অমাত্যদিগকে ভিক্ষুসংঘে গ্রহণ করিলেন ইত্যাদি।[৩]

মহাকপ্পিন যে রাজা ছিলেন, এবং তিনি যে কুক্কটবতীতে রাজত্ব করিতেন, ইহার প্রমাণ সংযুত্তনিকায়ের অট্‌ঠকথাতে পাওয়া যায়। কিন্তু এই কুক্কটবতী রাজধানী কাম্বোজেই ছিল, অথবা তাহার নিকটস্থ অন্য কোনো পার্বত্য রাজ্যে ছিল, তাহা কিছু ঠিক বুঝা যায় না। এই কথা কিন্তু সত্য যে, বুদ্ধের জীবদ্দশাতেই তাঁহার কীর্তি ও প্রভাব সীমান্তপ্রদেশের বন্য লোকদের ভিতর ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। বর্তমান যুগ হইতে ইহার মতো একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। পাঞ্জাবের প্রাদেশিকতাপন্ন লোকদের ভিতর গান্ধীজীর যতখানি

---

১. উদাহরণস্বরূপ, তণ্ডুলনালিজাতক দ্রষ্টব্য।

২. ভূরিদত্তজাতক, শ্লোক ৯০৩

৩. 'বৌদ্ধ সংঘাচা পরিচয়.' পৃ. ২০৩

প্রভাব আছে, তাহা অপেক্ষা কতগুণ বেশি প্রভাব উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের পাঠানদের ভিতর দেখা যায়। বুদ্ধের ক্ষেত্রেও এইরকমই একটা-কিছু ঘটিয়াছিল, ইহাতে আশ্চর্যান্বিত হইবার কিছুই নাই।

ললিতবিস্তরে ষোলোটি রাজ্যের উল্লেখ

ললিতবিস্তরে যে ষোলোটি রাজ্যের কথা পাওয়া যায়, ইহা উপরে বলা হইয়াছে। যে প্রসঙ্গে ইহাদের কথা উঠিয়াছে, তাহা এই—তুষিত-দেবভবনে থাকাকালে বোধিসত্ত্ব মনে মনে ভাবিতেছেন, 'কোন্ রাজ্যে জন্ম গ্রহণ করিয়া লোকের উদ্ধার করিব?' তখন বোধিসত্ত্বকে ভিন্ন ভিন্ন দেবপুত্র আসিয়া ভিন্ন ভিন্ন রাজকুলের গুণকীর্তন করিল; আবার অন্য কোনো কোনো দেবপুত্র ঐসব কুলের দোষও দেখাইল।

মগধ রাজকুল

১. এক দেবপুত্র বলিল, 'মগধদেশে বৈদেহীকুল অত্যন্ত ধনী এবং উহাই বোধিসত্ত্বের জন্মধারণ করিবার যোগ্য স্থান।' ইহার উপরে অন্য দেবপুত্র কহিল, 'এই বংশ মোটেই তাহার যোগ্য নহে। কারণ এই বংশের মাতৃকুল ও পিতৃকুল শুদ্ধ না হওয়ায়, তাহার স্বভাব চঞ্চল; উহা বিপুল পুণ্যদ্বারা অভিষিক্ত হয় নাই। উদ্যান, দীঘি প্রভৃতি দ্বারা উহার রাজধানীও সুশোভিত নয় বলিয়া উহা অসভ্য লোকেরই উপযুক্ত স্থান।'

কোসল রাজকুল

২. দ্বিতীয় দেবপুত্র বলিল, 'কোসলদের বংশ সৈন্য, বাহন ও ঐশ্বর্য যুক্ত হওয়ায়, উহা বোধিসত্ত্বেরই প্রতিরূপ।' ইহার উপরে অন্য একজন কহিল, 'এই বংশ মাতঙ্গচ্যুতি হইতে উৎপন্ন হওয়ায়, ইহার মাতৃপিতৃকুল শুদ্ধ নয়। এবং ইহারা হীনধর্মে বিশ্বাসী। সুতরাং এই বংশ বোধিসত্ত্বের যোগ্য নয়।'

বংশ রাজকুল

৩. অপর দেবপুত্র কহিল, 'এই বংশরাজকুল উন্নতির উচ্চশিখরে পৌঁছিয়াছে। উহার সংরক্ষণ-ব্যবস্থা উত্তম। উহাদের দেশ অতি সমৃদ্ধিসম্পন্ন। এই কারণে, উহা বোধিসত্ত্বের উপযুক্ত।' ইহার উপরে অন্য দেবপুত্র কহিল, 'না, এই বংশের লোকেরা অশিক্ষিত ও বড়ো ক্রোধী। এই কুলের অনেক রাজাই পরপুরুষের ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। আর এই কুলের বর্তমান রাজা ধর্মের ব্যাপারে উচ্ছেদবাদী (নাস্তিক); তাই এই বংশ বোধিসত্ত্বের যোগ্য নহে।

বৈশালীর রাজগণ

৪. অন্য এক দেবপুত্র কহিল, 'বৈশালী মহানগরী খুব সমৃদ্ধিশালী ও সুরক্ষিত। সেখানে ভিক্ষা বড়ো সুলভ। শহরটি সুদর্শন নাগরিকে পরিপূর্ণ, সুন্দর গৃহ ও প্রাসাদে সুশোভিত,

আর পুষ্পবাটিকা ও উদ্যানে প্রফুল্লিত। মনে হয় যেন বৈশালী নগরী দেবতাদের রাজধানীর অনুকরণ করিতেছে। সুতরাং উহা বোধিসত্ত্বের জন্মগ্রহণের অনুরূপ জায়গা।' ইহার উপরে অপর একজন কহিল, 'সেখানকার রাজাদের পরস্পরের প্রতি ব্যবহার ন্যায়সংগত নহে। তাহারা ধর্মাচরণে বিমুখ। তাহারা উত্তম, মধ্যম, বৃদ্ধ এবং জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিদিগকে সম্মান করে না। প্রত্যেক ব্যক্তিই মনে করে যে, সে নিজেই রাজা। কেহ কাহারও শিষ্য হইতে চায় না। কেহ কাহাকেও গ্রাহ্য করে না। অতএব এই নগরী বোধিসত্ত্বের পক্ষে অনুপযুক্ত।'

অবন্তি রাজকুল

৫. আর এক দেবপুত্র বলিল, 'প্রদ্যোতের বংশ অত্যন্ত বলশালী বহু বাহনসম্পন্ন ও উহারা শত্রুসৈন্যদের উপরে সর্বদাই জয়লাভ করে। এইজন্য উহা বোধিসত্ত্বের যোগ্য।' ইহার উপরে দ্বিতীয় দেবপুত্র বলিল, 'এই কুলের রাজারা ক্রোধী, ক্রুর ও কর্কশভাষী। ইহারা দুঃসাহসী। ইহারা কর্মফলে বিশ্বাস করে না। সুতরাং এই বংশ বোধিসত্ত্বকে মানাইবার মতো নয়।'

মথুরা রাজকুল

৬. অন্য এক দেবপুত্র বলিল, 'মথুরা নগরী সমৃদ্ধ ও সুসংরক্ষিত। এখানে সহজেই ভিক্ষা পাওয়া যায়। শহরটি বহুলোকে পরিপূর্ণ। ইহা কংস কুলের শূরসেনদের রাজা সুবাহুর রাজধানী। ইহা বোধিসত্ত্বের যোগ্য স্থল।' ইহার উপরে অন্য একজন কহিল, 'এই রাজা যে কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাহা সত্যদ্রষ্টা নহে। তাই এই নগরীও বোধিসত্ত্বের উপযুক্ত নয়।'

কুরুরাজকুল

৭. অন্য দেবপুত্র কহিল 'হস্তিনাপুরে পাণ্ডবকুলোৎপন্ন, বীর ও সুদর্শন এক রাজা রাজত্ব করিতেছেন। এই বংশ শত্রুসৈন্য-পরাভবকারী। অতএব উহা বোধিসত্ত্বের যোগ্য।' ইহার উপরে দ্বিতীয় একজন কহিল, 'পাণ্ডবকুলের রাজারা নিজেদের বংশ খারাপ করিয়া ফেলিয়াছে। এইরকম কথিত আছে যে, যুধিষ্ঠির ধর্মের, ভীমসেন বায়ুর, অর্জুন ইন্দ্রের, এবং নকুল ও সহদেব এই দুইজন অশ্বিনীর পুত্র। এই নিমিত্ত এই রাজকুলও বোধিসত্ত্বের অযোগ্য।

মৈথিল রাজকুল

৮. অপর দেবপুত্র বলিল, 'মৈথিলরাজ সুমিত্রের রাজধানী মিথিলানগরী অতি রমণীয় স্থান। রাজার অনেক হাতি, ঘোড়া ও পদাতিক আছে। তাহার নিকট সোনা, মুক্তা ও অন্যান্য বহুমূল্য রত্ন আছে। তাহার পরাক্রমে সামন্তরাজারা ভয়ে কম্পিত। রাজার অনেক বন্ধু আছে এবং তিনি ধর্মপ্রিয়। অতএব এই কুল বোধিসত্ত্বের যোগ্য।' ইহার উপরে দ্বিতীয় দেবপুত্র বলিল, 'এই রাজার যে বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে, তাহা সত্য বটে; তবু তাহার অনেক

সন্তান আছে, এবং তিনি অত্যন্ত বৃদ্ধ। সুতরাং তিনি পুত্রোৎপাদনে অসমর্থ। এই কারণে এই বংশও বোধিসত্ত্বের অনুপযুক্ত।'

'এইভাবে দেবপুত্ররা জম্বুদ্বীপের ষোলোটি রাজ্যে (ষোড়শ জনপদেষু) ছোটো বড়ো যে-সব রাজবংশ ছিল, তাহাদের সবগুলিকেই বিচার করিয়া দেখিল। কিন্তু ইহাদের প্রত্যেকটিই তাহাদের নিকট দোষযুক্ত বলিয়া মনে হইল'।[১]

মাত্র আটটি কুলের খবর

ষোলো জনপদের ভিতরে এখানে শুধু আটটি রাজকুলেরই বর্ণনা আছে। ইহাদের ভিতর সুমিত্রের কুল তাহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই লুপ্ত হইয়া যায় এবং বিদেহদের রাজ্য সম্ভবতঃ বজ্জীদের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। বাকী সাতটি বংশের মধ্যে, পাণ্ডববংশে কে রাজত্ব করিতেছিলেন তাহা বলা হয় নাই, আর অন্যান্য বৌদ্ধগ্রন্থেও তাহার সম্বন্ধে কোনো খবর পাওয়া যায় না। কুরুদেশে কৌরব্য নামক রাজা রাজত্ব করিতেন, এই কথা রট্‌ঠপালসুত্তে লিখিত আছে। এই রাজা যে পাণ্ডববংশীয় ছিলেন কোথাও তাহার কোনো প্রমাণ নাই। অবশিষ্ট ছয়টি রাজকুলের সম্বন্ধে যে খবর এখানে দেওয়া হইল, ত্রিপিটক গ্রন্থে অল্পবিস্তর এই রকমই দেখা যায়।

শাক্যকুল

বৌদ্ধগ্রন্থে শাক্যকুলের বিস্তৃত সংবাদ দেওয়া আছে। এমন অবস্থায়, উপরিউক্ত ষোলোটি জনপদের মধ্যে শাক্যদের নাম আদৌ নাই, ইহা কিরূপে সম্ভবপর হইল? এই প্রশ্নের উত্তর এই যে, উপরি উক্ত তালিকাটি রচিত হওয়ার পূর্বেই শাক্যদের স্বাধীনতা নষ্ট হইয়াছিল এবং তাহাদের দেশ কোসলরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল; আর এইজন্যই উক্ত তালিকায় তাহাদের কোনো উল্লেখ নাই।

বোধিসত্ত্ব গৃহত্যাগ করিয়া যখন রাজগৃহে আসিলেন, তখন রাজা বিম্বিসার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, 'আপনি কে?' ইহার উত্তরে বোধিসত্ত্ব বলিয়াছিলেন ঃ

উজুং জানপদো রাজা হিমবন্তস্‌স পস্‌সতো।
ধনবিরিয়েন সম্পন্নো কোসলেসু নিকেতিনো॥
আদিচ্চা নাম গোত্তেন, সাকিয়া নাম জাতিয়া।
তম্‌হা কুলা পব্বজিতোম্‌হি রাজ ন কামে অভিপত্থয়ং॥

—সুত্তনিপাত, পব্বজ্জাসুত্ত

'হে রাজা, এখন সম্মুখস্থ হিমালয়ের পাদদেশে কোসল রাজ্যে একটি ছোটো জনপদ (প্রবেশ) আছে। তাহার অধিবাসীদের গোত্র আদিত্য এবং জাতি শাক্য। হে রাজা, আমি এই বংশে জন্মিয়াছি। এখন কামভোগের ইচ্ছা ছাড়িয়া সন্ন্যাসী হইয়াছি।'

---

১. ইহা মুলের সংক্ষিপ্ত রূপান্তর।

উপরের গাথাটিতে 'কোসলেসু নিকেতিনো' শব্দগুলির গুরুত্ব আছে। ইহার অর্থ 'কোসলদেশে যাহাদের বাড়ি, অর্থাৎ যাহারা কোসলদেশের লোক বলিয়া পরিগণিত হয়'। ইহা হইতে সহজেই বুঝা যায় যে, শাক্যদের স্বাধীনতা বহু পূর্বেই লুপ্ত হইয়াছিল।

শাক্যরা কোসলরাজকে কর দিত এবং আভ্যন্তরীণ শাসনের কাজ নিজেরাই করিত। পসেনদির সহিত মহানামা নামক দাসীকন্যার বিবাহ হইয়াছিল এই কাহিনী আগেই দেওয়া হইয়াছে। অধ্যাপক রিস্ ডেভিড্স্ ইহার সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেন। তাঁহার বক্তব্য এইরূপ বলিয়া মনে হয় যে, কোসলরাজার আধিপত্য শাক্যরা যদি মানিয়াই লইল, তাহা হইলে কোসলরাজকে নিজেদের কন্যাদান করিতে তাহারা আপত্তি করিবে কেন?[১] কিন্তু ভারতবর্ষের জাতিভেদ প্রথার জোর যে কতখানি, তাহা হয়তো অধ্যাপক মহাশয় জানেন না। উদয়পুরের প্রতাপসিংহ আকবরের আধিপত্য মানিয়া লইয়াছিলেন; তথাপি আকবরকে নিজের কন্যা প্রদান করিতে তিনি প্রস্তুত ছিলেন না। ললিতবিস্তরে লিখিত আছে যে, কোসলকুল 'মাতঙ্গচ্যুতি হইতে উৎপন্ন'। ইহা হইতে মনে হয় যে, এই বংশ মাতঙ্গ নামক কোনো নিম্ন জাতি হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল। এইরূপ বংশের সহিত শাক্যরা বিবাহসম্বন্ধ স্থাপন করিতে অসম্মত হইয়া থাকিলে, বিস্মিত হইবার কোনো কারণ নাই।

গণরাজ্যগুলির-শাসনব্যবস্থা

আমরা পূর্বে বলিয়াছি যে, এইসকল রাজ্য এককালে গণমূলক অথবা গোষ্ঠীমূলক ছিল। ত্রিপিটক-গ্রন্থে বজ্জী, মল্ল অথবা শাক্যদের সম্বন্ধে যে-সব কথা আছে, তাহা হইতে প্রতীয়মান হয় যে, এইসকল রাজ্যের প্রত্যেকটি গ্রাম বা শহরের নায়ককে রাজা বলা হইত। এই সকল রাজা একস্থানে মিলিত হইয়া নিজেদের ভিতর একজনকে অধ্যক্ষ করিত। এই অধ্যক্ষের অধিকার কি তাহার জীবদ্দশা পর্যন্ত থাকিত, অথবা কোনো নির্দিষ্ট কাল পর্যন্তই থাকিত, এ সম্বন্ধে কোনো খবর পাওয়া যায় না। বজ্জীদের ভিতর যে কোনো মহারাজা ছিলেন, এইরূপও লক্ষিত হয় না। বজ্জীদের সেনাপতির উল্লেখ আছে, কিন্তু মহারাজার উল্লেখ নাই। হয়তো, কোনো কাজের জন্য সাময়িকভাবে কাহাকেও অধ্যক্ষ করা হইত। এইসকল গণ বা গোষ্ঠীরাজ্যে বিচার এবং শাসন কিভাবে করিতে হইবে, সে সম্বন্ধে কতকগুলি আইন-কানুন নির্ধারিত থাকিত এবং তদনুযায়ী গোষ্ঠীর রাজারা নিজ নিজ শাসনকার্য চালাইত।

গোষ্ঠীরাজ্যগুলির বিনাশের কারণসমূহ

ষোলোটি জনপদের গোষ্ঠীরাজাদের বিলোপ ঘটায়, উহাদের অধিকাংশগুলিতে কোনো-না-কোনো মহারাজার আধিপত্য স্থাপিত হইয়াছিল। শুধু মল্লদের দুইটি ছোটো রাজ্য ও বজ্জীদের একটি শক্তিশালী রাজ্য, এইভাবে মোট তিনটি গণ বা গোষ্ঠীরাজ্য, স্বাধীন থাকিয়া গেল। কিন্তু এইগুলিও একচ্ছত্র রাজতন্ত্রের কবলে পড়-পড় অবস্থায় ছিল। ইহার কারণ কী কী হওয়া সম্ভবপর? আমার মতে, এই বিপ্লবের প্রধান কারণ ছিল, গণরাজাদের আরামপ্রিয়তা ও বিলাসিতা ও রাজনীতিতে ব্রাহ্মণদের প্রাধান্য।

---

১. Buddhist India, পৃ. ১১-১২

গণরাজাদিগকে কেহ নির্বাচন করিয়া দিত না। পিতার মৃত্যুর পর ছেলে রাজা হইত। বংশপরম্পরায় এই অধিকার ভোগ করিতে পারায়, এইসব রাজা স্বভাবতঃই বিলাসী ও দায়িত্বজ্ঞানহীন হইয়া পড়িত। পূর্বে ললিতবিস্তর হইতে বজ্জীদের সম্বন্ধে যে বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে, তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিলে লক্ষিত হইবে যে, এই গণরাজগণ শক্তিশালী হইলেও, তাহাদের পরস্পরের ভিতর সদ্ভাব ছিল না এবং প্রত্যেকেই নিজেকে রাজা বলিয়া মনে করিত। এইসকল কারণে, বুদ্ধের মৃত্যুর পর, অজাতশত্রু বজ্জীদের গণরাজাদের মধ্যে অনৈক্য ও ভেদ উৎপন্ন করিয়া, অনায়াসে তাহাদের রাজ্যগুলি করায়ত্ত করিতে পারিয়াছিলেন।

এই গণরাজাদের পক্ষে সাধারণ লোকের আনুগত্য ও সমর্থন পাওয়া সম্ভবপর ছিল না। কারণ যখন কোনো রাজা লোকদের উৎপীড়ন করিত, তখন তাহা বন্ধ করা জনসাধারণের অথবা অন্য রাজাদের ক্ষমতার বাহিরে ছিল। বরং এইসব রাজার বিনাশ হউক, এবং তাহাদের পরিবর্তে একজন সার্বভৌম রাজা থাকুক, ইহাই সাধারণ জনতার দৃষ্টিতে শ্রেয়স্কর ছিল। অবশ্য এইরূপ সার্বভৌম মহারাজও নিজের কর্মচারীদের উপর অত্যাচার করিত এবং রাজধানীর আশেপাশে কোনো সুন্দরী যুবতী দেখিতে পাইলে, তাহাকে ধরিয়া আনিয়া নিজের অন্তঃপুরে রাখিয়া দিত—অল্পবিস্তর পরিমাণে তাহা দ্বারা এইরূপ অত্যাচার সংঘটিত হইলেও, উহা গণরাজাদের অত্যাচারের মতো এত বেশি হইতে পারিত না। প্রত্যেক গ্রামেই একজন করিয়া গণরাজা থাকায়, একবার তাহার অত্যাচার আরম্ভ হইলে, সমাজের কেহই তাহার হাত হইতে রেহাই পাইত না। কর আদায় করিয়া বা বিনা বেতনে খাটাইয়া, এইসকল রাজা সকলের উপর উৎপীড়ন চালাইত। কিন্তু প্রজাদের এইভাবে নির্যাতন করা সার্বভৌম মহারাজার পক্ষে আবশ্যক ছিল না। তাহাদের আমোদ-প্রমোদের জন্য যে অর্থের প্রয়োজন হইত, তাহা তিনি সহজেই নিয়মিতভাবে কর আদায় দ্বারা সংগ্রহ করিতে পারিতেন। সুতরাং 'পাথর হইতে ইঁট নরম', এই নীতি অনুসারে, সার্বভৌম রাজতন্ত্র যদি সাধারণ জনতার নিকট বরণীয় বলিয়া মনে হইয়া থাকে, তাহাতে আশ্চর্যান্বিত হইবার কিছুই নাই।

সার্বভৌম রাজতন্ত্রে পুরোহিতের কাজ, বংশপরম্পরায় অথবা ব্রাহ্মণসমাজের অনুমোদনে, শুধু ব্রাহ্মণগণই পাইত। মন্ত্রিপদও ব্রাহ্মণদেরও প্রাপ্য ছিল। কাজেকাজেই ব্রাহ্মণরা সার্বভৌম রাজতন্ত্রের মস্ত বড়ো সমর্থক ছিল। ব্রাহ্মণদের গ্রন্থে যে গণরাজাদের নামোল্লেখও নাই, ইহা ভাবিয়া দেখিবার বিষয়। ইহা হইতে প্রতীয়মান হয় যে, ব্রাহ্মণরা গোষ্ঠীমূলক রাজ্যশাসন পদ্ধতি মোটেই পছন্দ করিত না। অম্বট্‌ঠসুত্তে লিখিত আছে যে, শাক্য প্রভৃতি গণরাজারা ব্রাহ্মণদিগকে মোটেই সম্মান করে না বলিয়া অম্বট্‌ঠ ব্রাহ্মণরা তাহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিয়া থাকে।[১] গণরাজ্যগুলিতে যাগযজ্ঞ করিবার জন্য কেহ

---

১. চণ্ডা ভো গৌতম সাক্য জাতি........ইব্‌ভা সন্তা ইব্‌ভা সমানা ন ব্রাহ্মণে রঙ্গকরোন্তি, ন ব্রাহ্মণে মানেন্তি, ইত্যাদি —দীর্ঘনিকায় অম্বট্‌ঠসুত্ত।

উৎসাহ দিত না, অপরদিকে সার্বভৌম রাজতন্ত্রে মহারাজারা যাগযজ্ঞ করিবার জন্য ব্রাহ্মণদিগকে বংশপরম্পরায় ব্রহ্মোত্তর সম্পত্তি দান করিতেন। এক বিম্বিসারের রাজ্যেই সোণদণ্ড, কূটদন্ত প্রভৃতি ব্রাহ্মণদের, এবং কোসলদেশে পোক্‌খরসাতি (পৌষ্করসাদি) তারুক্‌খ (তারুক্ষ) প্রভৃতি ব্রাহ্মণদের বড়ো বড়ো ব্রহ্মোত্তর সম্পত্তি ছিল—সুত্তপিটকের বর্ণনা হইতে ইহা বুঝা যায়। সুতরাং 'পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ' এই নীতি অনুসারে ব্রাহ্মণজাতি ও একচ্ছত্র রাজতন্ত্রের প্রভাব পরস্পরের সাহায্যে স্বভাবতঃই বর্ধিত হইয়াছিল।

পরবর্তী পরিচ্ছেদগুলি হইতে স্পষ্টই দেখা যাইবে যে, বুদ্ধের সময় ব্রাহ্মণদের চেয়ে শ্রমণদের (পরিব্রাজকদের) গুরুত্ব ক্রমে বাড়িয়া চলিতেছিল। এই শ্রমণদের মনে গণরাজ্যগুলির প্রতি বিশেষ মমতা ছিল। কারণ এইসব রাজ্যে কেহ যাগযজ্ঞের ধার ধারিত না। তথাপি নিজেরা আধ্যাত্মিক চিন্তায় নিমগ্ন থাকায়, রাজনৈতিক ব্যাপারে কী উপায়ে গণরাজ্যগুলির উন্নতি হইতে পারে, তাহা ভাবিয়া বাহির করিবার মতো অবসর তাহাদের ছিল না। সমাজে যাহা প্রচলিত আছে, তাহাই অপরিহার্য, এইরূপ তাহাদের ধারণা ছিল বলিয়া মনে হয়।

বুদ্ধ যে গণরাজ্যগুলিকে ভালো চোখে দেখিতেন, তাহা বেশ স্পষ্ট। আমরা পূর্বে বলিয়া আসিয়াছি যে, বজ্জীদের জন্য তিনি উন্নতির সাতটি নিয়ম স্থির করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু তিনিও এই সকল প্রাচীন শাসনপদ্ধতি হইতে কী করিয়া সুশৃঙ্খল নতুন শাসনব্যবস্থা তৈয়ার করা যাইতে পারে, সে-সম্বন্ধে কোথাও নিজমত প্রকাশ করিয়াছেন বলিয়া দেখা যায় না। গণরাজাদের ভিতর যদি কেহ জনসাধারণের উপর অত্যাচার আরম্ভ করে, তাহা হইলে কি অন্যান্য গণরাজারা একত্র মিলিয়া তাহার বিরোধিতা করিবে? অথবা সকল রাজাকেই কি জনসাধারণ মাঝে মাঝে নিজেদের মত দিয়া নির্বাচন করিয়া দিবে, এবং এইভাবে তাহাদিগকে নিয়ন্ত্রণে রাখিবে? এই রকম প্রশ্নের আলোচনা বৌদ্ধ সাহিত্যের কোথাও দৃষ্টিগোচর হয় না।

বুদ্ধের অনুগামীরাও তো গণরাজ্যের কথা একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছিল। আদর্শ শাসনব্যবস্থা কি রকম হওয়া উচিত, তাহা বর্ণনা করিবার জন্য দীঘনিকায় গ্রন্থে চক্কবত্তিসুত্ত ও মহাসুদস্‌সনসুত্ত এই দুইটি সুত্ত আছে। এইগুলিতে সার্বভৌম চক্রবর্তী রাজার গুরুত্ব অতিরঞ্জিত করা হইয়াছে। ব্রাহ্মণদের সম্রাট আর বৌদ্ধদের এই চক্রবর্তীর মধ্যে শুধু এইটুকু পার্থক্য ছিল যে, সম্রাট্‌ জনতার কল্যাণের কথা কিছুমাত্র না ভাবিয়া বহু যাগযজ্ঞ করতঃ কেবল ব্রাহ্মণদিগকে তুষ্ট রাখিতেন, আর চক্রবর্তী সর্বজনসাধারণের প্রতি ন্যায়সংগত আচরণ করিয়া সকলকেই সুখী রাখিতে সচেষ্ট থাকিতেন। রাজ্যে শান্তি স্থাপিত হওয়ার পর, চক্রবর্তী প্রজাদিগকে এইরূপ উপদেশ দিতেন—

পাণো ন হন্তব্বে, অদিন্নং নাদাতব্বং, কামেসু মিচ্ছা ন চরিতব্বা, মুসা ন ভাসিতব্বা, মজ্জং ন পাতব্বং।

'প্রাণীদিগকে হত্যা করিবে না, চুরি করিবে না, ব্যভিচার করিবে না, মিথ্যা বলিবে না, মদ্যপান করিবে না।'

অর্থাৎ বৌদ্ধ গৃহস্থদের জন্য যে পাঁচটি নৈতিক নিয়ম আছে, চক্রবর্তী রাজারা ঐগুলি পালন করিবার জন্য উপদেশ দিতেন। এইভাবে ব্রাহ্মণদের দৃষ্টিতেই হউক, অথবা বুদ্ধের মতবিলম্বীদের দৃষ্টিতেই হউক, একচ্ছত্র রাজতন্ত্র সকলেরই শ্রেয়স্কর বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল। তত্ত্বের দিক হইতে ইহাদের আদর্শে কোনো পার্থক্য ছিল না। শুধু শাসনপদ্ধতির খুঁটিনাটি ব্যাপারেই প্রভেদ ছিল।

কিন্তু গৌতম বা বোধিসত্ত্বের উপর গোষ্ঠীমূলক রাজ্যশাসনপদ্ধতির খুব ভালো পরিণাম ঘটিয়াছিল। তিনি নিজ সংঘের পরিচালন বিধি এইসব গণরাজ্যের শাসনব্যবস্থা সম্মুখে রাখিয়াই রচনা করিয়াছিলেন। সুতরাং এইসব গোষ্ঠীমূলক রাজ্যের সম্বন্ধে সামান্য যাহা-কিছু খবর পাওয়া যায়, তাহার বিশেষ গুরুত্ব আছে বলিয়া মনে হয়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বুদ্ধের সময় ধর্মের অবস্থা

ভ্রান্ত ধারণা

বহু আধুনিক বিদ্বানের এইরূপ ভ্রান্ত ধারণা দেখা যায় যে, ব্রাহ্মণরা প্রথমতঃ সম্পূর্ণভাবে বেদের উপর নির্ভর করিত, তাহার পর তাহারা যাগযজ্ঞের প্রতি অত্যধিক শ্রদ্ধাশীল হইল, পরে এইসব যাগযজ্ঞ হইতে উপনিষদের দার্শনিক তত্ত্বগুলি নিঃসৃত হইয়াছিল, এবং সর্বশেষে বুদ্ধ এইসকল তত্ত্বের সংস্কারসাধন করিয়া নিজের সম্প্রদায় স্থাপন করিয়াছিলেন। এই মত অত্যন্ত ভ্রমমূলক। ইহা সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ না করিলে, বুদ্ধচরিত্র ঠিক ঠিক বুঝিতে পারা যাইবে না। সুতরাং বর্তমান পরিচ্ছেদে বুদ্ধের সময় ধর্মের অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহা এই স্থলে বর্ণনা করা সমীচীন হইবে বলিয়া মনে হয়।

যজ্ঞসংস্কৃতির স্রোত

আমরা প্রথম পরিচ্ছেদে বলিয়াছি যে, আর্য ও দাস, এই দুই জাতির সংঘর্ষে সপ্তসিন্ধুপ্রদেশে যাগযজ্ঞের সংস্কৃতি উৎপন্ন হইয়াছিল, এবং পরীক্ষিৎ ও তৎপুত্র জনমেজয়, এই দুইজনের রাজত্বকালে উক্ত বৈদিক সংস্কৃতি কুরুদেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কিন্তু এই সংস্কৃতির স্রোত কুরুদেশের বাহিরে পূর্বদিকে প্রবলভাবে প্রবাহিত হয় নাই। উহার গতি কুরুদেশেই সীমাবদ্ধ থাকিয়া যায়। ইহার প্রধান কারণ এই যে, পূর্বদিকের দেশগুলিতে এমন অনেক লোক ছিল, যাহারা মুনিঋষিদের অহিংসাধর্ম ও তপোব্রতকে গুরুত্ব দিত।

তপস্বী মুনিঋষি

জাতক অট্ঠকথাতে তপস্বী মুনিঋষিদের সম্বন্ধে অনেক গল্প আছে। এইসব গল্প হইতে বুঝা যায় যে, ইহারা বনে গিয়া তপস্যা করিত। এই তপস্যার প্রধান অঙ্গ ছিল কোনো প্রাণীকে কষ্ট না দেওয়া এবং যথাসাধ্য শারীরিক কৃচ্ছ সাধন করা। এই তাপসরা একাকী কিংবা সংঘবদ্ধ হইয়া বাস করিত। অনেক জাতক কথাতে দেখা যায় যে, এক-একটি সংঘে পাঁচ পাঁচশো তপস্বী পরিব্রাজক বাস করিত। তাহারা বনের ফলমূল প্রভৃতি খাইয়া জীবনধারণ করিত, এবং সুযোগমতো নোনতা ও টক জিনিস (লোণ অম্বিল সেবনত্থং) খাইবার জন্য লোকালয়ে আসিত। জনসাধারণ তাহাদিগকে সম্মান করিত ও তাহাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্য জোগাইত। জনসাধারণের উপর এইসব মুনিঋষির খুব প্রভাব ছিল, কিন্তু তাহারা জনসাধারণকে কোনো ধর্মোপদেশ দিত না। তাহাদের আচরণ দেখিয়া লোকেরা অহিংসাধর্মে বিশ্বাসী হইত। শুধু এইটুকু শিক্ষাই তাহারা উহাদের নিকট লাভ করিত।

মুনিঋষিদের সংসারানভিজ্ঞতা ও নির্বুদ্ধিতা

এই তপস্বীদের বিষয়বুদ্ধি কম থাকায়, ইহারা মাঝে মাঝে সাংসারিক ব্যাপারে বোকা

বনিত। কয়েকটি মেয়ে ঋষ্যশৃঙ্গকে ভুলাইয়া কেমনভাবে দশরথের রাজধানীতে লইয়া আসিয়াছিল, পরাশর মুনি সত্যবতীর প্রেমে কিভাবে আসক্ত হাইয়াছিল প্রভৃতি বর্ণনা পুরাণাদিতে তো রহিয়াছেই। তাহা ছাড়া অট্‌ঠকথাতেও এইসব মুনিঋষি যে মাঝে মাঝে বিপথগামী হইত, তাহার অনেক গল্প পাওয়া যায়। আমি উহাদের মধ্যে একটি এখানে বলিতেছি ঃ

প্রাচীনকালে বারাণসীতে যখন রাজা ব্রহ্মদত্ত রাজত্ব করিতেছিলেন, তখন বোধিসত্ত্ব কাশী রাজ্যে উত্তরদেশীয় ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর, তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন; এবং পাঁচশো শিষ্যের সহিত বর্তমান হিমালয় পর্বতের পাদদেশে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন। বর্ষা নিকটেই আগত, এমন সময় শিষ্যরা তাঁহাকে বলিল, "গুরুদেব, আপনি লোকালয়ে গিয়া নোনা ও টক পদার্থ খাইয়া আসুন।" আচার্য কহিলেন, "হে দীর্ঘজীবীগণ, আমি এখানেই থাকিব। বরং তোমরা গিয়া শরীরের উপকারী পদার্থ খাইয়া আইস।"

তখন এই তপস্বীরা বারাণসীতে আসিল। রাজা ইহাদের খ্যাতি আগেই শুনিয়াছিলেন। তিনি তাহাদিগকে নিজের উদ্যানে চাতুর্মাস্য ব্রতের সময় থাকিবার জন্য অনুরোধ করিলেন, এবং তাহাদের খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা নিজ বাড়িতেই করাইলেন। একদিন নগরে মদ্যপান উৎসব চলিতেছিল। পরিব্রাজকদের পক্ষে অরণ্যে মদ্য পাওয়া কঠিন মনে করিয়া, রাজা এই তপস্বীদের অত্যুৎকৃষ্ট সুরা পাঠাইয়া দিলেন। তপস্বীরা সুরা পান করিয়া নাচিতে লাগিল, গান করিতে থাকিল এবং কেহ কেহ বিশৃঙ্খলভাবে মাটিতে গড়াগড়ি খাইতে লাগিল। সাধারণ অবস্থায় ফিরিয়া আসার পর, তাহাদের মনে খুব অনুতাপ হইল। ঐ দিনই তাহারা রাজার উদ্যান ছাড়িয়া, হিমালয়ের দিকে রওনা হইল। ক্রমে নিজেদের আশ্রয়ে আসিয়া, তাহারা গুরুদেবকে প্রণাম করিয়া এক পাশে বসিল। আচার্য তাহাদিগকে বলিলেন, "লোকালয়ে ভিক্ষা পাইতে তোমাদের কোনো কষ্ট হয় নাই তো? আর তোমরা সেখানে প্রাণ খুলিয়া মনের আনন্দে থাকিতে তো?" তাহারা বলিল, "গুরুদেব, আমরা সুখেই ছিলাম; শুধু যে পদার্থ পান করা ঠিক নয়, তাহা পান করিয়াছিলাম।

অপায়িম্‌হ অনচ্চিম্‌হ অগায়িম্‌হ রুদিম্‌হ চ।
বিসঞ্‌ঞকরণিং পিত্বা দিট্‌ঠা নাহম্‌হ বানরা॥

"আমরা পান করিয়াছি, নাচিয়াছি, গান করিয়াছি এবং কাঁদিয়াছি। পাগল করা মদ খাইয়া বানর হইয়া যাই নাই, শুধু এইটুকুই যা বাকী ছিল।"[১]

মুনি ঋষিদের মধ্যে জাতিভেদ ছিল না

তপস্বী মুনিঋষিদের মধ্যে জাতিভেদের মোটেই কোনো স্থান ছিল না। যে-কোনো জাতির মানুষই হউক না কেন, একবার তপস্বী হইয়া গেলে, সমাজের সকলেই তাহাকে সম্মান করিত। উদাহরণস্বরূপ, আমরা এখানে জাতক হইতে মাতঙ্গ ঋষির গল্পটি[২] সংক্ষেপে দিতেছি ঃ

১. সুরাপান জাতক (সংখ্যা ৮১)।

২. মাতঙ্গ জাতক (সংখ্যা ৪৯৭)।

মাতঙ্গ বারাণসীর উপকণ্ঠে চণ্ডালকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। সে প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর, রাস্তায় তাহার সহিত একদিন বারাণসীর এক বড়ো শেঠের যুবতী কন্যা দৃষ্টমঙ্গলিকার সাক্ষাৎ হয়। তখন মাতঙ্গ এক পাশে গিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। দৃষ্টমঙ্গলিকা নিজের অনুচরদিগকে জিজ্ঞাসা করিল, "রাস্তার এক পাশে দাঁড়াইয়া এই লোকটি কে?" তাহার ভৃত্যরা তখন বলিল যে সে একজন চণ্ডাল, তখন দৃষ্টমঙ্গলিকা তাহার যাত্রা অশুভ হইয়াছে মনে করিয়া সেখানে হইতে বাড়ি ফিরিয়া গেল।

মাসে অথবা দুইমাসে একবার করিয়া দৃষ্টমঙ্গলিকা নিজেদের উদ্যানবাটিকায় যাইত এবং সঙ্গের লোকদিগকে ও সেখানে অন্যান্য যাহারা আসিত তাহাদিগকে টাকাপয়সা বিতরণ করিত। সেইদিন বাড়ি ফিরিয়া যাওয়ায়, উদ্যানের লোকেরা বিফলমনোরথ হইল, ও মাতঙ্গকে মারধর করিয়া অজ্ঞান অবস্থায় রাস্তায় ফেলিয়া গেল। কিছুক্ষণ পর মাতঙ্গের জ্ঞান হইলে সে দৃষ্টমঙ্গলিকার পিতার দরজার সিঁড়ির সামনে গিয়া আড়াআড়িভাবে পড়িয়া থাকিল। তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল, "তুই এই রকম জিদ করিতেছিস কেন?" সে বলিল, "দৃষ্টমঙ্গলিকাকে সঙ্গে না লইয়া আমি এখান হইতে কিছুতেই নড়িব না।" সে সাতদিন সেখানেই ঐভাবে পড়িয়া থাকার পর, শেঠ নিরূপায় হইয়া নিজের মেয়েকে তাহার কাছে সমর্পণ করিল। তখন সে মেয়েকে সঙ্গে লইয়া চণ্ডালদের গ্রামে চলিয়া গেল।

দৃষ্টমঙ্গলিকা মাতঙ্গের পত্নী হইতে রাজী ছিল, তথাপি মাতঙ্গ তাহার সহিত পতি-পত্নীভাবে না থাকিয়া, তাহাকে ঘরে রাখিয়া, নিজে বনে চলিয়া গেল এবং সেখানে কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিয়া দিল। সাত দিন তপস্যার পর, মাতঙ্গ গৃহে ফিরিয়া দৃষ্টমঙ্গলিকাকে কহিল, "তুমি গিয়া সকলের নিকট বলো যে, মাতঙ্গ তোমার পতি নয়, কিন্তু মহাব্রহ্মা তোমার পতি। আর ইহাও সকলের নিকট প্রচার করো যে, পূর্ণিমার দিন তোমার পতি চন্দ্রলোক হইতে নীচে নামিয়া আসিবেন।" তদনুসারে দৃষ্টমঙ্গলিকা এই সংবাদ সকলের নিকট প্রচার করিল। পূর্ণিমার দিন রাত্রিতে, চণ্ডালগ্রামে, তাহার বাড়ির সম্মুখে, প্রকাণ্ড জনতা সম্মিলিত হইল। তখন মাতঙ্গঋষি চন্দ্রলোক হইতে নীচে অবতরণ করিল; এবং নিজের কুটীরে প্রবেশ করিয়া দৃষ্টমঙ্গলিকার নাভিতে নিজের অঙ্গুষ্ঠদ্বারা স্পর্শ করিল।

সমবেত ব্রহ্মভক্তরা এই আশ্চর্যকর ব্যাপার দেখিতে পাইয়া দৃষ্টমঙ্গলিকাকে উপরে তুলিয়া বারাণসী নগরীতে লইয়া গেল; এবং নগরীর মধ্যভাগে মস্তবড়ো একটি মণ্ডপ তৈয়ার করিয়া তাহাতে দৃষ্টমঙ্গলিকার পূজা আরম্ভ করিয়া দিল। লোকেরা তাহার নামে মানত করিতে থাকিল। নয়মাস কাটিয়া যাওয়ার পর, ঐ মণ্ডপেই দৃষ্টমঙ্গলিকার একটি ছেলে হইল। মণ্ডপে জন্মগ্রহণ করায়, ছেলের নাম রাখা হইল মাণ্ডব্য। লোকেরা মণ্ডপের নিকটেই একটি বিরাট প্রাসাদ নির্মাণ করিয়া মাতা ও পুত্রকে ঐ প্রাসাদে রাখিয়া দিল। আর নিয়মিতভাবে তাহাদের পূজাও চলিতে থাকিল। মাণ্ডব্যের বাল্যকাল হইতেই, তাহাকে শিক্ষা দিবার জন্য, বড়ো বড়ো বৈদিক পণ্ডিত স্বেচ্ছায় তাহার নিকট আসিল। মাণ্ডব্য তিন বেদেই পারদর্শী হইল এবং ব্রাহ্মণদিগকে খুব সাহায্য করিতে থাকিল। একদিন তাহার

দুয়ারে ভিক্ষা করিবার জন্য মাতঙ্গঋষি দাঁড়াইয়া আছে, এমন সময় মাণ্ডব্য তাহাকে বলিল, "ছেঁড়া কাপড় পরিয়া পিশাচের মতন কে তুমি এখানে দাঁড়াইয়া আছে?"

মাতঙ্গ—তোমার ঘরে খুব খাদ্য ও পেয় আছে। যদি কিছু উচ্ছিষ্ট পাই, এই আশায় এখানে দাঁড়াইয়া আছি।

মাণ্ডব্য—কিন্তু এই অন্ন ও পেয় ব্রাহ্মণদের জন্য; তোমার ন্যায় হীন ব্যক্তির জন্য নয়।

দুইজনের ভিতর অনেক কথা কাটাকাটির পর, মাণ্ডব্য মাতঙ্গকে তাহার তিনজন দারোয়ানের দ্বারা ধাক্কা মারিয়া বাড়ির বাহির করিয়া দিল। কিন্তু ইহাতে মাণ্ডব্যের মুখের কথা আড়ষ্ট হইয়া গেল, চোখ ফ্যাকাশে ও নিস্তেজ হইয়া গেল, এবং সে অজ্ঞান হইয়া মাটিতে পড়িয়া গেল। তাহার সঙ্গের ব্রাহ্মণদেরও কিছুটা ঐ রকমই অবস্থা হইল। তাহারা মুখ বিকৃত করিয়া মাটিতে গড়াইয়া লুটাইতে থাকিল। এইসব দেখিয়া দৃষ্টমঙ্গলিকা ঘাবড়াইয়া গেল। এক দরিদ্র তাপসের প্রভাবে নিজের ছেলে ও অন্যান্য ব্রাহ্মণদের এইরূপ দূরবস্থা হইয়াছে, ইহা যখন সে বুঝিতে পারিল, তখন সে ঐ তাপসের খোঁজে বাহির হইল। মাতঙ্গ ঋষি এক জায়গায় বসিয়া ভিক্ষালব্ধ ভাতের মাড় খাইতেছিলেন। দৃষ্টমঙ্গলিকা তাহাকে চিনিতে পারিল, এবং নিজের ছেলেকে ক্ষমা করিবার জন্য বিনীত প্রার্থনা করিল। তখন মাতঙ্গ নিজের উচ্ছিষ্ট মাড় হইতে খানিকটা লইয়া দৃষ্টমঙ্গলিকাকে দিলেন এবং বলিলেন, "এই মাড় ছেলের ও অন্যান্য ব্রাহ্মণদের মুখে দাও; তাহা হইলেই তাহারা ভালো হইয়া যাইবে।" দৃষ্টমঙ্গলিকা এইরূপ করার পর, তাহারা সকলেই সাধারণ অবস্থায় ফিরিয়া আসিল। কিন্তু চণ্ডালের উচ্ছিষ্ট খাইয়া ব্রাহ্মণ রোগমুক্ত হইয়াছে, এই খবর সমস্ত বারাণসীতে ছড়াইয়া পড়িল। তখন লোকেদের কাছে লজ্জায় মুখ দেখাইতে না পারিয়া ঐ ব্রাহ্মণগণ মেজ্ঝা (মেধ্য) রাষ্ট্রে চলিয়া গেল। শুধু মাণ্ডব্য সেখানেই রহিয়া গেল।

কিছুকাল পর মাতঙ্গঋষি দেশ ভ্রমণ করিতে করিতে মেজ্ঝরাষ্ট্রে গিয়া পৌঁছিলেন। মাণ্ডব্যের সহচর ব্রাহ্মণরা এই খবর পাওয়া মাত্র মেজ্ঝদেশের রাজাকে বুঝাইয়া দিল যে, নবাগত এই ভিখারী মায়াবী, ও তাহা দ্বারা রাষ্ট্রের সর্বনাশ হইবে। ইহা শুনিয়া রাজা নিজের অনুচরদিগকে মাতঙ্গের খোঁজে পাঠাইলেন। অনুচররা তাহাকে একটা দেওয়ালের কাছে বসিয়া ভিক্ষার অন্ন খাইতেছে এমন অবস্থায় দেখিতে পাইলে এবং সেখানেই তাহাকে মারিয়া ফেলিল। কিন্তু ইহাতে দেবতারা ক্রুর হইয়া এই রাষ্ট্রের সর্বনাশ করিলেন।

মাতঙ্গের হত্যায় মেজ্ঝরাষ্ট্রের সর্বনাশ হওয়ার কথা অনেক জাতকেই দেখিতে পাওয়া যায়। এই পৌরাণিক গল্পটিতে কতটুকু সত্যতা আছে, তাহা বলা যায় না। তথাপি মাতঙ্গঋষি যে চণ্ডাল চিলেন এবং ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়রাও যে তাহার পূজা করিত, ইহা বসলসুত্তের নিম্নলিখিত গাথাগুলি হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়।

তদামিনা পি জানাথ যথা মেদং নিদস্সনং।
চণ্ডালপুত্তো সোপাকো মাতঙ্গো ইতি বিস্সুতো।।১

সো যসং পরমং পত্তো মাতঙ্গো যং সুদুল্লভং।
আগচ্ছুং তস্‌সুপট্‌ঠানং খত্তিয়া ব্রাহ্মণা বহূ॥২
দেবযানং অভিরুয্‌হ বিরজং সো মহাপথং।
কামরাগং বিরাজে ত্বা ব্রহ্মলোকূপগো অহু।
ন ন জাতি নিবারেসি ব্রহ্মলোকূপপত্তিয়া॥৩

১. ইহার আমি একটি উদাহরণ দিতেছি। কুকুরের মাংস খায়, এমন যে চণ্ডাল, সেইরূপ এক চণ্ডালের মাতঙ্গ নামে একটি বিখ্যাত ছেলে ছিল।
২. সেই মাতঙ্গ অতীব শ্রেষ্ঠ এবং দুর্লভ কীর্তি লাভ করিয়াছিল। তাহার সেবার জন্য অনেক ক্ষত্রিয় এবং ব্রাহ্মণ উপস্থিত থাকিত।
৩. যে পথে গেলে বিষয়বাসনার ক্ষয় হয়, সেই শ্রেষ্ঠ পথ ধরিয়া এবং দেবযান (সমাধি) অবলম্বন করিয়া সে ব্রহ্মলোকে গিয়াছিল। সংসারে নীচকুলে জন্মগ্রহণ করিলেও, মাতঙ্গের এই নীচ জন্ম তাহার ব্রহ্মলোকে জন্মগ্রহণ করিবার অন্তরায় হয় নাই।

শম্বুকের কাহিনী কাল্পনিক

শম্বুক নামে কোনো এক শূদ্র বনে তপস্যা করিতেছিল বলিয়া জনৈক ব্রাহ্মণসন্তানের মৃত্যু হইয়াছে, এই খবর পাইয়া রামচন্দ্র বনে গিয়া শম্বুকের মাথা কাটিয়া ফেলিলেন এবং ব্রাহ্মণের ছেলেকে আবার বাঁচাইয়া দিলেন—রামায়ণে এই কাহিনী অত্যন্ত বিস্তারের সহিত বর্ণিত হইয়াছে। কিছুটা সৌম্য আকারে, ভবভূতিও এই ঘটনা তাহার উত্তররামচরিতে স্থান দিয়াছেন। কিন্তু বুদ্ধের পুর্বে, অথবা ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্ম থাকা পর্যন্ত, এইরকম ঘটনা ঘটিয়াছিল বলিয়া কোথাও প্রমাণ পাওয়া যায় না। এই কাহিনী রচনা করিবার উদ্দেশ্য হয়তো ইহাই ছিল যে, অনুরূপ প্রসঙ্গ ঘটিলে যেন রাজা এই রকম আচরণই করেন।

শ্রমণ

বনবাসী এইসব মুনিঋষিদের তাপস অথবা পরিব্রাজক কহিত। তাহাদের তপঃসাধনের পদ্ধতি কিরকম ছিল, সে সম্বন্ধে বিশেষ কিছু খবর পাওয়া যায় না। এই তাপসদের সংঘ হইতে যাহারা লোকালয়ে ফিরিয়া আসিত তাহারাই জনসাধারণকে উপদেশ দিবার জন্য, ভিন্ন ভিন্ন শ্রমণসংঘ স্থাপন করিয়াছিল। শ্রমণ শব্দটি শ্রম্‌ ধাতু হইতে উৎপন্ন। ইহার অর্থ 'যাহারা কষ্ট অথবা পরিশ্রম করে।' আজকাল যেমন কায়িক শ্রমকারী মজুরদের গুরুত্ব বাড়িয়া চলিতেছে, তেমনই বুদ্ধের সময় শ্রমণদের গুরুত্ব বাড়িতেছিল; কিন্তু মজুর ও ইহাদের মধ্যে তফাত এই যে, মজুর সমাজের কাজে লাগে এমন বস্তু উৎপাদন করিবার জন্য কষ্ট করে, আর এই শ্রমণরা সমাজে আধ্যাত্মিক জাগরণ আনিবার জন্য কষ্ট করে। সম্ভবত, তপঃসাধন দ্বারা ইহারা শ্রমণ নাম লাভ করিয়াছিল। কিন্তু অরণ্যবাসী মুনিঋষিরাও তপস্যাদ্বারা শরীর ক্লিষ্ট করিত; তথাপি তাহাদিগকে শ্রমণ বলা হইত না। লোকের মঙ্গলের জন্য স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া পরিশ্রম করিত বলিয়াই ইহাদিগকে শ্রমণ বলা হইত, ইহাই বেশি সম্ভবপর বলিয়া মনে হয়।

তেষট্টি শ্রমণপন্থ

বুদ্ধের সময় ছোটো বড়ো এই রকম তেষট্টিটি শ্রমণসংঘ বিদ্যমান ছিল। 'যানি চ তীনি যানি চ সট্‌ঠি' এই বাক্যে যে তিন এবং যাট মতের কথা বলা হইয়াছে, তাহার মধ্যে বৌদ্ধ মতও ধরা হইয়াছে কিনা, তাহা বলিতে পারা যায় না। এই রকম যদি মানিয়া লওয়া হয় যে, ইহাতে বৌদ্ধ মত ধরা হইয়াছে, তাহা হইলে পালি সাহিত্যে অনেক স্থলে যে বাষট্টিটি মতের (দ্বাসট্‌ঠি দিট্‌ঠি গতানি) উল্লেখ দেখা যায়, তাহার অর্থ ঠিক ঠিক বুঝিতে পারা যায় অর্থাৎ বুদ্ধের নিজের শ্রমণপন্থের বাহিরে আরো বাষট্টিটি শ্রমণপন্থ বিদ্যমান ছিল, এইরূপ অনুমান করা চলে। দীঘনিকায়ের প্রথম ব্রহ্মজালসুত্তে এই বাষট্টি শ্রমণপন্থের ভিন্ন ভিন্ন মতগুলির পুঙ্খনুপুঙ্খ বিবরণ দেওয়ার প্রযত্ন করা হইয়াছে। কিন্তু এই বিবরণ কৃত্রিম বলিয়া মনে হয়। এই সুত্তটি যখন লেখা হইয়াছিল, সেই সময় উক্ত বাষট্টি শ্রমণপন্থ সম্বন্ধে এই বাষট্টি সংখ্যাটি ছাড়া অন্য সব খুঁটিনাটি তথ্য লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল, তাই সুত্তরচয়িতা বাষট্টি সংখ্যা পূর্ণ করিবার জন্য নতুন তথ্য রচনা করিয়া এই সুত্তে ঢুকাইয়াছিলেন। এই প্রাচীন শ্রমণপন্থগুলির সঠিক খবর বিলুপ্ত হওয়ার কারণ এইরূপ বলিয়া মনে হয় যে, উহাদের মধ্যে প্রসিদ্ধ পন্থের সংখ্যা খুবই কম ছিল; তাহা ছাড়া, হয়তো ছোটোখাটো সম্প্রদায়গুলি কালে বড়ো বড়ো সম্প্রদায়ের মধ্যে সমাবিষ্ট হইয়া গিয়াছিল। বর্তমানের সাধু বৈরাগী প্রভৃতি পন্থসমূহ ভালো করিয়া গুনিয়া দেখিলে, কতগুলিই-না পাওয়া যাইবে! কিন্তু ইহাদের মধ্যে নাম নির্দেশের যোগ্য কবীর, দাদূ, উদাসী প্রভৃতি পন্থের সংখ্যা হাতের আঙুল কয়টি দিয়াই গণনা করা যাইতে পারে।

তপঃসাধনের প্রণালী

বুদ্ধের সময় সবচেয়ে বড়ো শ্রমণসংঘ মাত্র ছয়টি ছিল। আবার ইহাদের মধ্যেও নিগ্রন্থ শ্রমণ সম্প্রদায়ের স্থান ছিল সকলের উপরে। এই পন্থের ঐতিহাসিক প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন পার্শ্বমুনি। বুদ্ধের জন্মের একশো তিরানব্বই বৎসর পূর্বে তিনি পরিনির্বাণ লাভ করিয়াছিলেন, এই প্রকার অনুমান করা যাইতে পারে। ইহার পূর্বে, অন্তত চল্লিশ-পঞ্চাশ বৎসর এই পার্শ্ব তীর্থংকর নিজ ধর্ম প্রচার করিয়া থাকিবেন। তাঁহার এবং অন্যান্য শ্রমণসংঘের নায়কদের মতের আলোচনা পরে করা হইবে। বর্তমানে, ইহাদের তপঃসাধনের প্রণালী কি প্রকার ছিল, তাহা নির্দেশ করা বাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে হয়। কেননা ইহা দ্বারা তাপসকে তপঃসাধনের পদ্ধতি সম্বন্ধেও অল্পস্বল্প জ্ঞান হইবে। শ্রমণদের তপঃসাধনের প্রণালী বহু সুত্তে বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু ইহাদের মধ্যে মজ্ঝিমনিকায়ের মহাসীহনাদসুত্তে তপঃসাধনের যে বর্ণনা পাওয়া যায়, তাহা বিশেষ গুরুত্বপূণ বলিয়া মনে হওয়াতে আমি এখানে তাহার কিঞ্চিৎ আভাস দিতেছি।

ভগবান বুদ্ধ সারিপুত্তকে কহিলেন, "হে সারিপুত্ত, আমি চার প্রকারের তপস্যা করিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে। আমি তপস্বী হইয়াছিলাম, রুক্ষ হইয়াছিলাম, জুগুপ্সী হইয়াছিলাম এবং প্রবিবিত্ত হইয়াছিলাম।

তপস্বিতা

"হে সারিপুত্ত, আমার তপস্বিতা কি রকম ছিল, তাহা বলিতেছি।

(নি) আমি উলঙ্গ থাকিতাম। লৌকিক আচার পালন করিতাম না। হাতে ভিক্ষা লইয়া তাহাই খাইতাম। যদি কেহ বলিত, 'মহাশয়, এই দিকে আইস', তাহা হইলে আমি তাহা শুনিতাম না। আমার বসিবার জায়গায় অন্ন আনিয়া দিলে অথবা আমার জন্য কেহ অন্ন প্রস্তুত করিয়া দিলে সেই অন্ন এবং আমাকে কেহ খাবার নিমন্ত্রণ করিলে সেই নিমন্ত্রণ আমি গ্রহণ করিতাম না। যে পাত্রে অন্ন সিদ্ধ করা হইত সেই পাত্রে অন্ন আনিয়া দিলে আমি তাহা লইতাম না। উদুখল হইতে কোনো খাদ্যবস্তু আনিয়া দিলে আমি তাহা লইতাম না। দেউড়ির অপরদিকে ঘরের ভিতরে থাকিয়া কেহ ভিক্ষা দিলে আমি তাহা গ্রহণ করিতাম না। দুই ব্যক্তি একসঙ্গে খাইতে বসার পর যদি একজন উঠিয়া আমাকে ভিক্ষা দিত তাহা হইলে আমি সেই ভিক্ষা লইতাম না। গর্ভবতী কিংবা শিশুকে স্তন্য দিতেছে অথবা পুরুষের সহিত নির্জনে বসিয়া আছে এমন স্ত্রীলোকের দেওয়া ভিক্ষা আমি গ্রহণ করিতাম না। মেলায় প্রস্তুত অন্নের ভিক্ষা আমি লইতাম না। যেখানে কুকুর দাঁড়াইয়া আছে, অথবা মাছির ভিড় ও কোলাহল রহিয়াছে সেখানে আমি ভিক্ষাগ্রহণ করিতাম না। মাছ, মাংস, মদ প্রভৃতি পদার্থও লাইতাম না।[১] শুধু একই গৃহে ভিক্ষা করিয়াও শুধু একই গ্রাস খাইয়া থাকিতাম। অথবা দুই গৃহে ভিক্ষা করিয়া দুই গ্রস অন্ন, এইভাবে সাতদিনে আস্তে আস্তে গৃহের এবং গ্রাসের সংখ্যা সাত পর্যন্ত বাড়াইয়া ঐ অন্নে জীবনধারণ করিতাম। এক হাতার বেশি গ্রহণ করিতাম না। এইভাবে সাত দিনে বাড়াইতে বাড়াইতে সাত হাতা অন্ন গ্রহণ করিয়া উদর পূর্ণ করিতাম। একদিন পর একদিন, আবার দুইদিন পর একদিন খাইতাম। এইভাবে উপবাসের সময় বাড়াইতে বাড়াইতে সাত দিন পর একদিন, অথবা পনেরো দিন পর একদিন খাইতাম।

(ই) 'শাক, শ্যামাক, নীবার, মুচিরা চামড়ার যে-সব টুকরা ফেলিয়া দিত সেইগুলি, শেওলা, কুড়া, হাড়ির তলার পোড়া লাগা ভাত, মাড়, ঘাস অথবা গোবর খাইয়া থাকিতাম; অথবা বনে অনায়াসে যে-সব ফল-মূল পাইতাম, তাহা দ্বারা আমি উদর পূর্ণ করিতাম। আমি শণের চট পরিধান করিতাম। জোড়াতালি দেওয়া কাপড় পরিতাম। যে কাপড় দিয়া শব ঢাকা হইত, ঐ কাপড় পরিতাম। রাস্তায় পাওয়া নেকড়া দিয়া কাপড় তৈয়ার করিয়া তাহা ধারণ করিতাম। গাছের ছাল পরিতাম। মৃগচর্ম ধারণ করিতাম। কুশনির্মিত বস্ত্র পরিতাম।

মানুষের চুলে কিংবা ঘোড়ার লোমে তৈরী কম্বল, অথবা হুতুম পেঁচার পালকে তৈরী মোটা কাপড় পরিতাম।

(নি) "আমি গোঁফ দাড়ি ও মাথার চুল টানিয়া তুলিতাম। দাঁড়াইয়া তপস্যা করিতাম। আবর্জনা ফেলিবার জায়গায় বসিয়া তপস্যা করিতাম।"

---

১. জৈন সাধুরা মাছ ও মাংস আহার করিত; কিন্তু তাহারা মদ খাইত কিনা সে সম্বন্ধে কোনো প্রমাণ নাই। মাংসাহার সম্বন্ধে একাদশ পরিচ্ছেদে আলোচনা করিয়াছি।

(ই) "আমি কাঁটার শয্যায় ঘুমাইতাম। দিনের মধ্যে তিনবার করিয়া স্নান করিতাম। এইভাবে নানাপ্রকারে শরীরকে কষ্ট দিতাম। ইহাই হইল আমার তপস্বিতা।"

রুক্ষতা

"হে সারিপুত্ত, আমার রুক্ষতা কি রকম ছিল তাহা বলিতেছি ঃ

(নি) অনেক বছরের ধুলা পড়িয়া আমার শরীরের উপর এক পরত মাটি জমিয়া গিয়াছিল। যেমন কোনো গাবগাছের ছাল অনেক বছরের ধুলায় ভরিয়া যায়, আমার শরীরের অবস্থাও সেই রকম হইয়াছিল। কিন্তু আমার কখনো এই রকম মনে হয় নাই যে, ধুলির এই আবরণ আমি নিজে হাত দিয়া ঝাড়িয়া ফেলি, অথবা অন্য কেহ হাত দিয়া ঝাড়িয়া ফেলুক। ইহাই ছিল আমার রক্ষতা।"

জুগুপ্সা

"এখন আমার জুগুপ্সা কি রকম ছিল তাহা বলিতেছি ঃ

(নি) আমি অত্যন্ত সাবধানে যাওয়া-আসা করিতাম। জলের ফোঁটাটির প্রতিও আমার খুব দয়া হইত। অত্যন্ত কঠিন অবস্থায় পড়িয়াছে এখন ক্ষুদ্রতম প্রাণীও আমার হাতে মরণ না পাউক, ইহার জন্য আমি অত্যন্ত সাবধান থাকিতাম। ইহা হইল আমার জুগুপ্সা।" (জুগুপ্সা মানে হিংসার প্রতি বিরক্তি)।

প্রবিবিক্ততা

"হে সারিপুত্ত, এখন আমার প্রবিবিক্ততা কোন্ রকমের ছিল, তাহা বলিতেছি ঃ

(ই) বনে জঙ্গলে থাকার সময়, যদি আমি কোনো রাখাল, অথবা বনে ঘাস কাটে এমন কোনো লোক, অথবা কোনো কাঠুরিয়া কিংবা কোনো বনরক্ষক কর্মচারী দেখিতে পাইতাম, তাহা হইলে অরণ্যের আরো গহন ভাগে অথবা কোনো নীচু জায়গায়, অথবা কোনো সমতল প্রদেশের ভিতর দিয়া অনবরত ছুটিয়া পলাইতাম। এইরূপ করিবার উদ্দেশ্য এই ছিল যে, ঐ ব্যক্তি যেন আমাকে দেখিতে না পায়, এবং আমি যেন তাহাকে দেখিতে না পাই। বনের হরিণ যেমন মানুষ দেখিলে ছুটিয়া পালায়, আমিও তেমনই ছুটিয়া পলাইতাম। ইহাই ছিল আমার প্রবিবিক্ততা"।

উৎকৃষ্ট আহার

(ই) "যেখানে গোরু বাঁধা হয় ও যেখান হইতে সবেমাত্র গোরু চরাইতে লইয়া যাওয়া হইয়াছে, সেখানে আমি হাতে পায়ে হামাগুড়ি দিয়া যাইতাম এবং বাছুরের গোবর খাইতাম। যতদিন পর্যন্ত আমার মলমূত্র ত্যাগ হইত, ততদিন পর্যন্ত আমি ইহাই খাইয়া থাকিতাম। ইহাই ছিল আমার মহাবিকট ভোজন।"

উপেক্ষা

(ন) 'আমি কোনো গহন অরণ্যে বাস করিতাম। ঐ স্থানটি এমনই ভীতিদায়ক ছিল যে,

যদি কোন বৈরাগ্যহীন ব্যক্তি সেখানে প্রবেশ করিত, তাহা হইলে সে শিহরিয়া উঠিত। শীতকালে যখন ভীষণ বরফ পড়িত, তখন আমি খোলা জায়গায় অবস্থান করিতাম, আর দিনের বেলা বনের ভিতরে চলিয়া যাইতাম। গ্রীষ্মকালের শেষ মাসে দিনের বেলা খোলা জায়গায় থাকিতাম, আর রাত্রিবেলা জঙ্গলের ভিতরে চলিয়া যাইতাম। আমি শ্মশানে মানুষের হাড় শিয়রে রাখিয়া নিদ্রা যাইতাম। গ্রামবাসীরা সেখানে গিয়া আমার গায়ে থুথু ফেলিত, মূত্রত্যাগ করিত, ধুলা ফেলিত, অথবা আমার কানে কাঠি ঢুকাইয়া দিত। তথাপি তাহাদের সম্বন্ধে আমার মনে কখনো পাপবুদ্ধি উৎপন্ন হয় নাই।"

আহার ব্রত

(ই) "কোনো কোনো শ্রমণ ও ব্রাহ্মণের মত এই যে, আহার দ্বারা আত্মশুদ্ধি হয়। তাহারা শুধু কুল খাইয়া থাকে, কুলের চূর্ণ খায়, কুলের ক্বাথ খায়, অথবা অন্য কোনো পদার্থ কুলের সহিত মিশাইয়া খায়। আমার মনে পড়ে যে, আমি এক কালে শুধু একটি কুল খাইয়া থাকিতাম। হে সারিপুত্ত, তুমি আবার মনে করিয়ো না যে, তখনকার দিনে কুলগুলি আকারে খুব বড়ো ছিল। আজকাল কুল যেরকম, তখনো কুল সেই রকমই ছিল। এইভাবে শুধু একটি কুল খাইয়া থাকাতে আমার শরীর অতিশয় কৃশ হইয়া যাইত। 'আসীতক'-লতা কিংবা 'কাল' লতার গাঁটগুলির মতনই আমার শরীরের গাঁটগুলি স্পষ্ট দেখা যাইত। আমার কোমরবন্ধ উটের পায়ের মতো দেখাইত। আমার মেরুদণ্ড সুতার গুটি-মালার মতো দেখাইত। ভাঙিয়া পড়িবে এমন ঘরের কড়িবরগাগুলি যেমন উপর-নীচ করিতে থাকে, আমার বুকের পাঁজরগুলির অবস্থাও তেমনই হইয়াছিল। গভীর কূপে নক্ষত্রের প্রতিবিম্বের মতো আমার চোখের তারাগুলি খুব ভিতরে ঢুকিয়া গিয়াছিল। তিত লাউ, কাঁচা থাকিতে কাটিয়া যদি রোদে ফেলিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে উহা শুকাইয়া যেমনটি হয়, আমার মাথার চামড়া শুকাইয়া সেই রকম হইয়াছিল। আমি যদি পেটের উপর হাত বুলাইতাম, তাহা হইলে উহা শিরদাঁড়াতে গিয়া লাগিত, আরি শিরদাঁড়ায় হাত বুলাইলে, পেটের চামড়া হাতে লাগিত। এইভাবে আমার শিরদাঁড়া আর পেটের চামড়া এক হইয়া গিয়াছিল। আমি কোথাও মলমূত্র ত্যাগ করার চেষ্টা করিলে, সেখানেই পড়িয়া যাইতাম। শরীরে হাত বুলাইলে আমা দুর্বল লোমগুলি খসিয়া পড়িত। সেই উপবাসের ফলে, আমার অবস্থা ঐ রকম হইয়াছিল।

"কোনো কোনো শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ মুগ খাইয়া থাকে, তিল খাইয়া থাকে অথবা চাউল খাইয়া থাকে। এইসব জিনিসে আত্মশুদ্ধি হয় বলিয়া তাহাদের ধারণা! হে সারিপুত্ত, আমি মাত্র একটি তিল অথবা একটি চাউল অথবা একটি মুগ খাইয়া থাকিতাম। তুমি আবার মনে না কর যে, তখনকার দিনে এইসব শস্যের দানা আকারে খুব বড়ো ছিল। তখনকার দানাও এখনকার মতোই ছিল। এই উপবাসে আমার দশা (উপরে যেমন বর্ণিত হইয়াছে), সেইরূপই হইত।"

বুদ্ধঘোষাচার্যের মত এই যে, ভগবান বুদ্ধ এইসব তপস্যা কোনো-এক পূর্বজন্মে করিয়াছিলেন। সেই সময় কুল প্রভৃতি পদার্থ এখনকার মতোই ছিল, এই কথা হইতে বুদ্ধঘোষাচার্যের এই উক্তিটি যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হয়। তবে জানি না বুদ্ধের সময়ে যে ভিন্ন ভিন্ন তপঃসাধনের প্রণালী প্রচলিত ছিল, সেইগুলির নিরর্থকতা দেখাইবার জন্যই সুত্তের কর্তারা উপরি-উক্ত কথাগুলি ভগবান বুদ্ধের মুখে বসাইয়াছেন কিনা।

পাদটীকায় বর্ণিত ব্যতিক্রম কয়টি বাদ দিয়া, (নি)-অক্ষরে প্রদর্শিত তপস্যার প্রক্রিয়াগুলি নির্গ্রন্থ (জৈন সাধু) সম্প্রদায়ের লোকেরা অভ্যাস করিত। আজও চুল উপড়াইয়া ফেলা, উপবাস করা ইত্যাদি প্রথা তাহাদের মধ্যে প্রচলিত আছে।

(ই)-চিহ্নিত তপঃসাধনের প্রণালীগুলি অন্যান্য সম্প্রদায়ের শ্রমণ এবং ব্রাহ্মণরা অভ্যাস করিত। ইহাদের ভিতর অনেকগুলি আজও সাধু, বৈরাগী প্রভৃতি পন্থের লোকেদের মধ্যে প্রচলিত আছে।

মলমূত্র খাওয়ার প্রথা

নিজের মলমূত্র খাওয়ার রেওয়াজ আজও অঘোরপন্থী লোকেদের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। কাশীতে তেলঙ্গস্বামী নামক এক বিখ্যাত সন্ন্যাসী ছিলেন। তিনি উলঙ্গ থাকিতেন। তাঁহার মতো আরো অনেক পরমহংস সাধু কাশী শহরে উলঙ্গ হইয়া চলাফেরা করিতেন। তৎকালে গ্রোডউইন নামক একজন খুব লোকপ্রিয় কালেক্টর ছিলেন। (ইহাকে লোকেরা গোবিন্দসাহেব নাম দিয়াছিল।) তিনি অত্যন্ত সহানুভূতির সহিত হিন্দুদের আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে জ্ঞান সম্পাদন করিয়াছিলেন এবং এইসব উলঙ্গ সাধু যাহাতে কৌপীন পরিয়া রাস্তায় বাহির হয়, এই উদ্দেশ্যে তিনি নিম্নলিখিত উপায়টি অবলম্বন করিয়াছিলেন।

রাস্তায় উলঙ্গ সাধু দেখিতে পাইলে, পুলিস তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতেন, "তুমি কি পরমহংস?" ঐ ব্যক্তি হাঁ বলিবা মাত্র, তাহাকে সাহেব নিজের ছোঁয়া অন্ন খাইতে অনুরোধ করিতেন। অবশ্যই এই প্রস্তাব উলঙ্গ সাধুর মোটেই পছন্দ হইত না। তখন গোবিন্দ সাহেব কহিতেন, "শাস্ত্রে এই রকম বলা আছে যে, পরমহংসের কোনোপ্রকার ভেদবুদ্ধি নাই, আর তোমার মনে তো বাপু যথেষ্ট ভেদভাব রহিয়াছে, অতএব তোমার পক্ষে উলঙ্গ হইয়া রাস্তায় চলা উচিত নয়।" এইভাবে অনেক উলঙ্গ সাধুকে তিনি কৌপীন পরিতে বাধ্য করিয়াছিলেন।

এইরূপ ঘটনাই একদিন তেলঙ্গস্বামীর ব্যাপারে ঘটিল। পুলিশ তেলঙ্গস্বামীকে কালেক্টর সাহেবের কুঠিতে লইয়া গেল। এই সংবাদ জানিবামাত্র, তাঁহার শিষ্য এবং তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাশীল পণ্ডিত ও অন্যান্য প্রভাবশালী লোকরা সাহেবের কুঠিতে গেল। সাহেব সকলকে যথাযোগ্যস্থানে বসাইয়া তেলঙ্গস্বামীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি পরমহংস?" তেলঙ্গস্বামীর মুখ হইতে হাঁ-উত্তর পাওয়ামাত্র, সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার ঘরে তৈরি করা অন্ন তুমি খাইবে কি?" তদুত্তরে তেলঙ্গস্বামী কহিলেন, "তুমি কি আমার অন্ন খাইবে?" সাহেব উত্তর দিলেন, 'যদিও আমি পরমহংস নই, তবু আমি যে-কোনো ব্যক্তির অন্নই খাই।"

তেলঙ্গস্বামী সেখানেই নিজের হাতে মলত্যাগ করিয়া, হাতটি সম্মুখে বাড়াইয়া দিয়া গোবিন্দসাহেবকে বলিলেন, "এই নাও আমার অন্ন। এইটি তুমি খাইয়া দেখাও তো।" সাহেব অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন এবং ক্রোধের সহিত বলিলেন, "এটা কি মানুষের যোগ্য খাদ্য?" তখন তেলঙ্গস্বামী ঐ পদার্থটি নিঃশেষে খাইয়া হাত চাটিয়া একেবারে পরিষ্কার করিয়া ফেলিলেন! সাহেব সন্ন্যাসীকে ছাড়িয়া দিলেন। শুধু তাহাই নহে, সাহেব পুনরায় তাহার সম্বন্ধে আর কোনোদিন খোঁজখবরও লইলেন না।

আমি ১৯০২ সালে যখন কাশীতে ছিলাম, তখন কাশীর পণ্ডিতদিগকে এই কাহিনী অত্যন্ত গর্বের সহিত বলিতে শুনিয়াছি। তৎপূর্বে 'কাশীযাত্রা' নামক পুস্তকে ঠিক ততখানি গর্বের সহিতই বর্ণিত এই কাহিনীটি আমি পড়িয়াছিলাম।

আধুনিক তপঃসাধন

আমাদের এই তেলঙ্গস্বামীই ঘোর শীতকালে শুধু তাহার মাথাটুকু জলের উপর রাখিয়া গঙ্গাতে বসিয়া থাকিতেন।

লোহার পেরেক দিয়া খাট বানাইয়া, তাহার উপর শুইয়া থাকে, এই রকম বৈরাগী অনেকেই দেখিয়া থাকিবেন। ১৯০২ সালে কাশীর বিন্দুমাধব মন্দিরের নিকট ঐ রকম একজন বৈরাগী থাকিত। কাঠের কৌপীন পরিয়া বেড়ায়, এই রকম সাধু বৈরাগীও আমার দৃষ্টিগোচর হইয়াছে।

শ্রমণদের তপস্যা সম্বন্ধে লোকের মনে শ্রদ্ধা

উপরে তপঃসাধনের যে নানা পদ্ধতি বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে শাক, শ্যামাক এবং বনের সহজপ্রাপ্য ফলমূল খাইয়া থাকা, এইগুলি অরণ্যবাসী মুনিঋষিরা করিতেন। তাঁহারা অনেকে বল্কল পরিতেন এবং অনেকে পবিত্র অগ্নিহোত্রও রক্ষা করিতেন। কিন্তু এই যে-সব নতুন শ্রমণসম্প্রদায় উৎপন্ন হইল, তাহারা অগ্নিহোত্র ছাড়িয়া দিল এবং পূর্বের অরণ্যবাসী মুনি-ঋষিরা তপস্যার যে-সব অনুষ্ঠান করিতেন তাহাদের অনেকগুলি গ্রহণ করিয়া তৎসঙ্গে চামড়ার টুকরা প্রভৃতি খাওয়ার প্রক্রিয়াটি জুড়িয়া দিল।

বুদ্ধের সময় নির্গ্রন্থ সাধুদের (জৈনদের) সম্প্রদায় যে বেশ শক্তিশালী ছিল, পূর্বে তাহা বলিয়াছি। এই সম্প্রদায়টি ছাড়া পূরণকাশ্যপ, মক্খলিগোসাল, অজিত কেসকম্বল পকুধকাত্যায়ণ এবং সঞ্জয় বেলট্‌ঠপুত্ত এই পাঁচজন শ্রমণগুরুর সম্প্রদায়গুলিও খুব বিখ্যাত ছিল। ইহাদের দার্শনিক তত্ত্বসম্বন্ধে সপ্তম পরিচ্ছেদে সংক্ষেপে আলোচনা করিয়াছি। তাহা হইতে প্রতিভাত হইবে যে যদিও তত্ত্বের ব্যাপারে তাহাদের ভিতর খুব মতানৈক্য ছিল তথাপি দুইটি বিষয়ে ইহারা একমত ছিল। বিষয় দুইটি এই ঃ

১. ইহারা কেহই যাগযজ্ঞ পছন্দ করিত না, এবং

২. তপঃসাধনের প্রতি তাহাদের কম হউক, বেশি হউক শ্রদ্ধা ছিল।

শ্রমণদের প্রচারকার্য

এইসকল এবং অন্যান্য শ্রমণের জনসমাজে যে বেশ প্রভাব ছিল, তাহা আমরা আগেই বলিয়া আসিয়াছি। ইহারা বর্ষার চারি মাস ব্যতীত বৎসরের বাকী আট মাস পূর্বে চম্পা (ভাগলপুর), পশ্চিমে কুরুদেশ, উত্তরে হিমালয় এবং দক্ষিণে বিন্ধ্য, এই চতুঃসীমানার অন্তর্বর্তী দেশে অনবরত ঘুরিয়া বেড়াইত এবং জনসাধারণের নিকট নিজ নিজ সম্প্রদায়ের মত প্রচার করিত। ইহাতে সর্বসাধারণ লোকের মনে যাগযজ্ঞ সম্বন্ধে অশ্রদ্ধা এবং তপস্যার প্রতি শ্রদ্ধা উৎপন্ন হইয়াছিল।

যাগযজ্ঞের প্রসার

কিন্তু রাজারা যুদ্ধে জয়লাভ করিবার জন্য যাগযজ্ঞ করা প্রয়োজন বলিয়া মনে করিতেন। দীঘনিকায়ে লিখিত আছে যে, যাগযজ্ঞ সম্পাদনের নিমিত্ত কোসলের রাজা 'পসেনদি' 'পোক্খরসাতি' (পৌষ্করসাদি) নামক ব্রাহ্মণকে উক্কট্ঠা নামক গ্রাম, এবং লোহিচ্চ (লৌহিত্য) নামক ব্রাহ্মণকে সালবতিকা নামক গ্রাম দান করিয়াছিলেন। তাহা ছাড়া স্বয়ং পসেনদি রাজাও যাগযজ্ঞ করিতেন বলিয়া কোসলসংযুত্তের নবমসুত্তে দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু এইসব যাগযজ্ঞ কোসলের পসেনদি ও মগধের বিম্বিসার, এই দুই রাজার রাজ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। কারণ বড়ো বড়ো যজ্ঞ করা শুধু রাজা এবং ব্রহ্মোত্তর সম্পত্তির মালিক ব্রাহ্মণদের পক্ষেই সম্ভবপর ছিল।

এইপ্রকার ব্যয়সাধ্য যাগযজ্ঞ করা সাধারণ লোকের আয়ত্তের বাহিরে ছিল বলিয়া, যাগযজ্ঞের ছোটখাটো সংস্করণ অর্থাৎ অল্প পরিসরের ভিতর যাগযজ্ঞ করার পদ্ধতি প্রবর্তিত হইয়াছিল। অমুক রকমের কাঠ দিয়া প্রস্তুত অমুক রকমের হাতা দিয়া, তুষ দিয়া, কুঁড়া দিয়া, অমুক প্রকারের চাউল দিয়া, অমুক রকমের ঘি দিয়া, অমুক প্রকারের তেল দিয়া, অমুক পশুর রক্ত দিয়া হোম করিলে, অমুক তমুক কার্যসিদ্ধি হয়, সাধারণ লোককে এইরূপ করিয়া ব্রাহ্মণরা তাহাদের দ্বারা হোম করাইত এবং এই কার্যে কোনো কোনো শ্রমণও অংশ গ্রহণ করিত—এসব কথা দীঘনিকায়ে উপলব্ধ তথ্য হইতে বুঝিতে পারা যায়।[১] কার্যসিদ্ধির জন্য লোকে হোম করিলেও, এইসব হোম ধর্মের অঙ্গ বলিয়া গণ্য হইত না বলিয়া মনে হয় কারণ যেসব ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ এই প্রকার হোম করিত, লোকে তাহাদিগকে বিশেষ সম্মানের চোখে দেখিত না।

দেবতার পূজা

যেমন আজকাল হিন্দুরা দেবদেবী, যক্ষ পিশাচ প্রভৃতির অস্তিত্ব মানে এবং তাহাদিগকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য তাহাদের উদ্দেশে পশু বলি দেয়, তেমনই বুদ্ধের সময় হিন্দুরা দেবদেবী মানিত ও তাহাদের উদ্দেশে বলিদান করিত। বর্তমান ও তৎকালীন হিন্দুদের

---

১. দীঘনিকায়—ব্রহ্মজাল, সামাঞ্ঞফল ইত্যাদি সুত্ত দ্রষ্টব্য।

মধ্যে শুধু এতটুকু পার্থক্য যে, অনেক অধুনা প্রচলিত দেবদেবীর পূজায় পুরোহিত লাগে এবং অধিকাংশ স্থলেই এইসব পুরোহিত ব্রাহ্মণ। তাহা ছাড়া যদিও বর্তমান কালের দেবদেবী বুদ্ধসমকালীন দেবদেবীর মতোই কাল্পনিক তথাপি অধিকাংশ আধুনিক দেবদেবীর সম্বন্ধেই পুরাণাদি রচিত হইয়া গিয়াছে। বুদ্ধের সময় এত সব হয় নাই। বটগাছের মতো কোনো কোনো গাছে কোনো পাহাড়ে অথবা বনে সদয়-হৃদয় দেবতারা থাকেন এবং তাহাদের নিকট কিছু মানত করিলে তাহা তাহাদের কাছে পৌঁছায় লোকেদের এইরকম ধারণা ছিল; এবং পাঁঠা মুরগী প্রভৃতি বলি দিয়া তাহারা নিজ নিজ মানত পূর্ণ করিত। পলাস জাতক (সংখ্যা ৩০৭) গল্পটি হইতে এইরকম বোঝা যায় যে, ব্রাহ্মণরাও দেবদেবীর পূজা করিত, কিন্তু এইরূপ পূজার পৌরোহিত্য তাহারা নিজেদের একচেটিয়া ব্যবসায় রূপে অন্যান্য জাতির পূজকদের হাত হইতে কাড়িয়া লইয়াছিল বলিয়া কোথাও প্রমাণ পাওয়া যায় না। আজকাল যেমন দগড়োবা স্থসোবার অথবা জাখাঈ জোখাঈর[১] পূজায় ব্রাহ্মণ পুরোহিত লাগে না, তেমনই ঐকালে কোনো দেবদেবীর পুজাতেই ব্রাহ্মণ পুরোহিত অত্যাবশ্যক ছিল না। লোকে মানত করিত এবং কোনো মধ্যস্থের সাহায্য ছাড়া নিজ হাতেই বলি দিত। সুজাতা বটবৃক্ষবাসী দেবতার কাছে দুধের পায়েস মানত করিয়াছিল, এবং শেষে গাছের নীচে বসা গোতম বোধিসত্ত্বকেই সেই পায়েস দিয়াছিল—বৌদ্ধসাহিত্যে এই কাহিনী সুপ্রসিদ্ধ, আর; বৌদ্ধ চিত্রশিল্পেও ইহার সুফল লক্ষিত হয়। আমার বক্তব্য এই যে, তৎকালে দেবদেবীর পূজায় ব্রাহ্মণ পুরোহিতের আবশ্যকতা ছিল না।

শ্রমণদের উন্নতি

এইসব দেবদেবীর পিছনে পুরাণ কিংবা পুরোহিত না থাকায়, ইহাদের সহিত বর্তমান কালের ধর্মভাব জড়িত হয় নাই। সর্বশ্রেণীর লোকই নিজ নিজ আপদবিপদ দূর করিবার উদ্দেশ্যে, অথবা দেবতার কাছে মানত করায় তিনি মনস্কামনা পূর্ণ করিয়াছেন এই ধারণায়, তাঁহার নিকট বলি দিত। কিন্তু কেহই ইহাকে ধর্মকৃত্য বলিয়া মনে করিত না। ব্রাহ্মণদের যাগযজ্ঞের পিছনে বেদ ও বৈদিক সাহিত্যের সমর্থন ছিল বলিয়া, তাহা ধর্মের অঙ্গ বলিয়া পরিগণিত হইত। কিন্তু এইসব যাগযজ্ঞ বহু ব্যয়সাপেক্ষ হওয়ায়, এইগুলি সাধারণ লোকের ক্ষমতার বাইরে ছিল। এইগুলিতে শত শত গোরু ও ষাঁড় মারা যাইত। রাজা ও সমাজের পদস্থ ব্যক্তিদিগকে অতি প্রয়োজনীয় এইসব পশু যজ্ঞের জন্য কৃষকদের নিকট হইতে জোর করিয়া কাড়িয়া লইতে হইত। তাই সাধারণ লোকের নিকট যাগযজ্ঞগুলি অত্যন্ত অপ্রিয় হইয়া উঠিতেছিল। অপর দিকে, সাধারণ লোক শ্রমণদিগকে যথেষ্ট আদর-যত্ন করিত, চাতুর্মাস্যে তাহাদের জন্য কুটীর প্রভৃতি নির্মাণ করিয়া তাহাদের থাকার সুবিধা করিয়া দিত, এবং সর্বদাই তাহাদের উপদেশ শুনিবার জন্য প্রস্তুত থাকিত। অর্থাৎ শ্রমণসংঘগুলির অনবরতই উন্নতি হইতেছিল।

---

১. এই দুইটি মারাঠী গ্রাম্য দেবদেবী বিশেষের নাম—অনুবাদক।

উপনিষৎকালীন ঋষি

সম্প্রতি এইরূপ একটি ধারণা প্রচলিত হইয়াছে যে, বেদ হইতে উপনিষদ্ এবং উপনিষদ্ হইতে বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি ধর্ম উৎপন্ন হওয়ায়, বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি ধর্মও বৈদিক ধর্মই। কিন্তু আমি আশা করি যে, উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে ইহা স্পষ্ট হইবে যে, বৌদ্ধ এবং জৈনদের প্রাচীন পরম্পরা বেদ কিংবা উপনিষদ্ হইতে নির্গত না হইয়া, বরং বেদপূর্বকালে মধ্য ভারতবর্ষে মুনিঋষিদের যে পরম্পরা ছিল, তাহা হইতেই নিসৃত হইয়াছে। তথাপি বুদ্ধের সময়, উপনিষদ্-বর্ণিত ব্রাহ্মণদের অবস্থা কী প্রকার ছিল, সংক্ষেপে এখানে তাহার আলোচনা করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

আরণ্যক ও উপনিষদ্গুলি বুদ্ধের সময়ের বহু বৎসর পরে রচিত হইয়াছিল, এই কথা আমি 'হিন্দি সংস্কৃতি আণি অহিংসা' নামক পুস্তকে দেখাইয়াছি (পৃঃ ৪৮-৫০ দ্রষ্টব্য)। কিন্তু বুদ্ধের সময়ও, উপনিষদে বর্ণিত ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের মতো কিছু-সংখ্যক ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় ছিল, এইরূপ ধরিয়া লইলে, আপত্তির কারণ নাই। কিন্তু ইহাদের মধ্যে অধিকাংশ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ই হোমহবনের ধর্ম ছাড়িয়া দিয়া, শুদ্ধ শ্রমণধর্ম অবলম্বন করিত—জাতকের অনেক কাহিনী হইতে ইহা স্পষ্ট পরিলক্ষিত হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, আমি এখানে নঙ্গুট্‌ঠ জাতকের (সংখ্যা ১৪০) একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতেছি।

বারাণসীতে যখন রাজা ব্রহ্মদত্ত রাজত্ব করিতেন, তখন সেখানে বোধিসত্ত্ব ঔদীচ্য-ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতামাতা তাঁহার জন্মদিনে জাতাগ্নি প্রতিষ্ঠা করিলেন। এবং তাঁহার ষোলো বছর পূর্ণ হওয়ার পর, তাঁহারা বোধিসত্ত্বকে বলিলেন, "বাবা, তোমার জন্মদিনে আমার এই অগ্নি প্রতিষ্ঠা করিয়াছি। তুমি যদি গৃহস্থ হইয়া থাকিতে চাও, তাহা হইলে তিন বেদ অধ্যয়ন করো; কিন্তু যদি তুমি ব্রহ্মলোকে যাইতে চাও, তাহা হইলে এই অগ্নি সঙ্গে লইয়া বনে যাও এবং অগ্নির সেবাদ্বারা ব্রহ্মদেবের আরাধনা করিয়া ব্রহ্মলোকপরায়ণ হও।"

বোধিসত্ত্ব গৃহস্থ হইতে ইচ্ছুক ছিলেন না। সুতরাং ঐ জাতাগ্নি সঙ্গে লইয়া তিনি বনে গেলেন, এবং সেখানে আশ্রয় নির্মাণ করিয়া অগ্নির সেবা করিতে লাগিলেন। একদিন এক কৃষক বোধিসত্ত্বকে দক্ষিণা দেওয়ার উদ্দেশ্যে একটি ষাঁড় আনিয়া দিল। বোধিসত্ত্ব মনস্থ করিলেন যে, ষাঁড়টিকে বলি দিয়া ভগবান অগ্নির পূজা করিবেন। কিন্তু আশ্রমে নুন ফুরাইয়া গিয়াছিল। তাই নুন আনিবার জন্য তিনি গ্রামে গেলেন। এদিকে কয়েকটি গুণ্ডা ঐ ষাঁড় মারিয়া অগ্নিহোত্রের আগুনে, নিজেদের যতখানি প্রয়োজন ততখানি মাংস সিদ্ধ করিয়া ভক্ষণ করিল ও বাকী মাংস সঙ্গে লইয়া গেল।

ব্রাহ্মণ নুন লইয়া আশ্রমে ফিরিয়া দেখিল যে, ষাঁড়ের শুধু চামড়া, লেজ ও হাড়গুলি অবশিষ্ট আছে। তখন সে নিজে নিজে বলিল, "এই ভগবান অগ্নি নিজের বলিই রক্ষা করিতে পারে না, তবে আর আমাকে কি করিয়া রক্ষা করিবে?" এইরূপ কহিয়া, ব্রাহ্মণ ঐ অগ্নি জলে ফেলিয়া দিয়া, সন্ন্যাস গ্রহণ করিল।

বুদ্ধের উপদেশ শুনিয়া উরুবেলকাশ্যপ, নদীকাশ্যপ এবং গয়াকাশ্যপ, এই তিন জন ব্রাহ্মণ ভ্রাতা নিজ নিজ অগ্নিহোত্র নদীতে ফেলিয়া দিয়াছিল—এই কাহিনী বৌদ্ধ সাহিত্যে সুপ্রসিদ্ধ।

উপনিষদের ঋষি

কোনো কোনো ব্রাহ্মণের এইরূপ খোলাখুলিভাবে শ্রমণধর্ম গ্রহণ করিবার মতো সাহস ছিল না। তাহাদের মন বৈদিক যাগযজ্ঞ ও শ্রমণদের দার্শনিক তত্ত্ব, এই দুইটির মধ্যে দোদুল্যমান থাকিত; তাহারা অশ্বমেধ প্রভৃতি যজ্ঞের উপর রূপক রচনা করিয়া, তাহাতেই আত্মতত্ত্ব আবিষ্কার করিতে চেষ্টা করিতেন। উদাহরণ স্বরূপ, বৃহদারণ্যক উপনিষদের প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয় ব্রাহ্মণের প্রারম্ভে যে গল্পটি আছে, তাহা দ্রষ্টব্য। সেখানে ঋষি বলিতেছেন, "এই বিশ্ব উৎপন্ন হওয়ার পূর্বে কোনো কিছুই ছিল না। মৃত্যু এইসব ঢাকিয়া রাখিয়াছিল। কেন? গ্রাস করিবার ইচ্ছায়। কারণ খাওয়ার ইচ্ছাকেই মৃত্যু বলে। তাহার মনে হইল, 'আমি আত্মবান হইব........।' 'আমি পুনরায় বড়ো বড়ো যজ্ঞ করিব,' মৃত্যু এইরূপ কামনা করিল। এইরূপ কামনা করিয়া সে পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িল; তখন সে তপস্যা করিতে লাগিল। সেই পরিশ্রান্ত ও তপস্তপ্ত মৃত্যু হইতে যশ এবং বীর্য উৎপন্ন হইল। প্রাণই যশ এবং উহাই বীর্য। এইভাবে সেই প্রাণ শরীর ছাড়িয়া চলিয়া যাওয়ায়, প্রজাপতির ঐ শরীর স্ফীত হইল। তথাপি তাহার মন ঐ শরীরেই থাকিয়া গেল। 'আমার এই শরীর মেধ্য (যজ্ঞের উপযুক্ত) হউক এবং তাহাদ্বারা আমি যেন আত্মবান হই', সে এইরূপ কামনা করিল। 'যেহেতু ঐ শরীর আমার বিয়োগে যশ ও বীর্যশূন্য হইতে থাকিল ও ফুলিয়া গেল, সেইজন্য তাহা অশ্ব (স্ফীত) হইল। আর যেহেতু তাহা মেধ্য হইল, সেইজন্য তাহাই অশ্বমেধের অশ্বমেধত্ব। যে এইভাবে এই অশ্ব জানে, সেই অশ্বমেধ জানে।"

এই গল্পটিতে অশ্বমেধকে নিমিত্ত করিয়া তপশ্চর্য্যাপ্রধান অহিংসাধর্ম বর্ণনা করার চেষ্টা দেখা যায়। খাওয়ার ইচ্ছাই মৃত্যু। সে আত্মবান্ হইল অর্থাৎ তাহার ব্যক্তিত্ব উৎপন্ন হইল এবং ক্রমে তাহাতে যজ্ঞের ইচ্ছা উৎপন্ন হইল। সেই ইচ্ছা হইতে যশ ও বীর্য এই দুইটি গুণ বাহির হইল, তাহারাই বাস্তবিক পক্ষে প্রাণ। তাহারা যদি চলিয়া যায়, তাহা হইলে শরীর মরিয়া যেন স্ফীত (অশ্বয়িত) হয়, এইরূপ বুঝিবে। এবং তখন তাহা পুড়িয়া ফেলার যোগ্য হয়। যে এই তত্ত্ব জানে, সে-ই অশ্বমেধ জানে।

ছান্দোগ্য উপনিষদে প্রবাহণ জৈবলি আরুণপুত্রকে বলিতেছে, "হে গোতম, দ্যুলোকই অগ্নি। আদিত্যই তাহার সমিধ্ (যজ্ঞ কাষ্ঠ), কিরণ তাহার ধূম, দিবস তাহার শিক্ষা, চন্দ্র তাহার অঙ্গার, এবং নক্ষত্রগুলি তাহার বিস্ফুলিঙ্গ।" (ছা. উ. ৫।৪)

ইহা হইতে পরিলক্ষিত হইবে যে এই ব্রাহ্মণ ঋষিদের মনে শ্রমণ সংস্কৃতির পূর্ণ প্রভাব পড়িয়াছিল; কিন্তু তাহারা সংসারে খোলাখুলিভাবে এইসব তত্ত্ব প্রতিপাদন করা ভালো মনে করেন নাই; আর এইজন্যই তাহারা এইরূপ রূপকের ভাষা ব্যবহার করিতেন।

উপনিষদের ঋষিরাও জাতভেদ মানত না

অতি প্রাচীনকালের মুনিঋষি, শ্রমণ এবং উপনিষদের ঋষি, ইহাদের মধ্যে এক বিষয়ে মতের ঐক্য ছিল; এবং ইহা জাতিভেদ সম্বন্ধে। ইতঃপূর্বে মাতঙ্গ ঋষির গল্প তো দেওয়াই হইয়াছে। ইহা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, মুনিঋষিদের ভিতর জাতিভেদ ছিল। শ্রমণ সংঘগুলিতে তো জাতিভেদের কিছুমাত্র স্থান ছিলই না; উপরন্তু উপনিষদের ঋষিরাও জাতির গুরুত্ব বিশেষ মানিতেন না, ইহা নিম্নলিখিত গল্পটি হইতে বুঝা যাইবে।

সত্যকাম নিজের মা জবালাকে কহিল, 'মা আমি ব্রহ্মচর্য সাধন করিতে চাই (আমি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে চাই)। আমার কী গোত্র তাহা বলো।'' জবালা কহিল, ''বাছা, আমি তাহা জানি না। আমার তখন অল্প বয়স, আমি অনেক লোকের কাছে থাকিতাম (বহ্বহং চরন্তী); আর তখনই তুমি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলে। সুতরাং তোমার গোত্র আমার জানা নাই। আমার নাম জবালা, আর তোমার নাম সত্যকাম। সুতরাং তোমাকে কেহ জিজ্ঞাসা করিলে, তুমি বলিবে যে, তুমি সত্যকাম জাবাল।''

সে (সত্যকাম) হারিদ্রুমত গৌতমকে কহিল, ''আমি আপনার নিকট ব্রহ্মজ্ঞান শিখিবার জন্য আসিয়াছি।''

গৌতম কহিলেন, ''তোমার গোত্র কি?'' সত্যকাম কহিল, ''আমি তাহা জানি না। আমি মাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। কিন্তু তিনি আমাকে বলিলেন যে, যৌবনে বহু পুরুষের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ ঘটায়, তিনি আমার গোত্র জানেন না। অতএব তিনি বলিলেন যে, আমি যেন আমার নাম সত্যকাম জাবাল এইরূপ বলি।'' গৌতম তাহাকে কহিলেন, ''তুমি সত্য হইতে চ্যুত হও নাই। অব্রাহ্মণের পক্ষে ইহা সম্ভবপর নয়। সুতরাং তুমি সমিধ্ লইয়া আইস। তোমার উপনয়ন করিব।'' ইহা কহিয়া ঐ ঋষি তাহার উপনয়ন করিলেন। (ছা. উ. ৪।৪)

গুপ্তদের রাজত্বকাল হইতে জাতিভেদ সবল হইল

সত্যকামের গল্প হইতে প্রমাণিত হয় যে, যদিও উপনিষদের ঋষি জাতিভেদ মানিতেন, তথাপি জাতি অপেক্ষা তিনি সত্যকেই বেশি মূল্য দিতেন। কিন্তু এইসব উপনিষদেরই সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যাখ্যা করিতে ইচ্ছুক বাদরায়ণ ব্যাস এবং তাহার ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য জাতিভেদকে কতদূর উপরে তুলিয়াছেন তাহা লক্ষ্য করুন ঃ শ্রবণাধ্যয়নার্থ প্রতিষেধাৎ স্মৃতেশ্চ। অ ১।৩।৩৮ ইতশ্চন শূদ্রস্যাধিকারঃ। যদস্য স্মৃতেঃ শ্রবণাধ্যয়নার্থ-প্রতিষেধো ভবতি। বেদ শ্রবণপ্রতিষেধা বেদাধ্যয়ন-প্রতিষেধস্তদর্থজ্ঞানানুষ্ঠানয়োশ্চ প্রতিষেধঃ শূদ্রস্য স্মর্য্যতে। শ্রবণপ্রতিষেধস্তাবৎ 'অথাস্য বেদমুপশৃণ্বতস্ত্রপুজতুভ্যাং শ্রোত্রপ্রপূরণম্' ইতি। 'পদ্যুহবা এতৎ শ্মশানং যচ্ছুদ্রস্তস্মাচ্ছুদ্রসমীপে নাধ্যেতব্যম্' ইতি চ। অত এবাধ্যয়নপ্রতিষেধঃ। যস্য হি সমীপেহপি নাধ্যেতব্যং ভবতি, স কথমশ্রুতমধীয়ীত। ভবতি চ বেদোচ্চারণে জিহ্বাচ্ছেদো ধারণে শরীরভেদ ইতি। অতএব চার্থাদর্থজ্ঞানানুষ্ঠানয়োঃ প্রতিষেধোঃ ভবতি ন শূদ্রায় মতিং দদ্যাৎ' ইতি। (ব্রহ্মসূত্রশঙ্করভাষ্য অ ১।৩।৩৮)

"এবং এইজন্যই শূদ্রের ব্রহ্মজ্ঞানে অধিকার নাই। কারণ স্মৃতিতে তাহার পক্ষে বেদ শ্রবণ করা ও অধ্যয়ন করা নিষিদ্ধ হইয়াছে। স্মৃতিশাস্ত্রে শূদ্রের জন্য বেদ-শ্রবণে প্রতিষেধ, বেদ্যধ্যয়নে প্রতিষেধ, এবং তাহার অর্থজ্ঞান ও তৎপ্রতিপাদিত বিধির অনুষ্ঠানে প্রতিষেধ করা হইয়াছে। শ্রবণে প্রতিষেধ এইরূপে করা হইয়াছে—'সে বেদবাক্য শুনিলে, তাহার কান লাক্ষা ও সীসা দিয়া ভরিয়া দিবে।' শূদ্র মানে পদযুক্ত শ্মশান। সুতরাং শূদ্রের নিকটে কখনো অধ্যয়ন করিবে না।' এবং এইজন্যই অধ্যয়ন-প্রতিষেধও বুঝিতে হইবে। কারণ, যাহার নিকটে অধ্যয়ন করা উচিত নয়, সে নিজে কি করিয়া বেদ অধ্যয়ন করিবে? আর সে যদি বেদবাক্য উচ্চারণ করে, তাহা হইলে তাহার জিহ্বা কাটিয়া দিবে, সে বেদমন্ত্র ধারণ করিলে, (অর্থাৎ বেদমন্ত্র মুখস্থ করিলে) তাহাকে হত্যা করিবে, এইরূপ শাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে। অতএব তাহার পক্ষে বেদের অর্থ জানা কিংবা বেদবিহিত ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করা কর্তব্য নয়—ইহা প্রমাণিত হয়। 'শূদ্রকে জ্ঞানদান করিবে না।"

শূদ্রদিগকে লাঞ্ছনা করিবার জন্য শঙ্করাচার্য যেসব শাস্ত্রবচনের সাহায্য লইয়াছেন, সেগুলি গৌতমধর্মসূত্র প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে লওয়া হইয়াছে। আর এইগুলি গুপ্তরাজাদের সময়ে লিখিত হইয়াছিল। অর্থাৎ সমুদ্রগুপ্ত হইতে আরম্ভ করিয়া (চতুর্থ শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া) শঙ্করাচার্য পর্যন্ত (নবম শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্যন্ত), আমাদের ব্রাহ্মণপুরুষেরা শূদ্রদিগকে দাবাইয়া সমাজে নিজেদের আধিপত্যবজায় রাখিবার চেষ্টা অব্যাহত ভাবে চালাইয়া আসিতেছিলেন, এইরূপ মনে হয়। ধর্মসূত্রকার এবং শঙ্করাচার্য, ইহাদের ভিতর শুধু এইটুকু পার্থক্য ছিল যে, সূত্রকারদের সময় মুসলমানরা এই দেশে আসে নাই, কিন্তু শঙ্করাচার্যের সময় সিন্ধুদেশ মুসলমানদের হস্তগত হইয়াছিল এবং সেখানে মুসলমানধর্ম অনবরত প্রসারলাভ করিতেছিল। অন্ততঃ মুসলমানদের নিকট আমাদের এই আচার্যের সাম্যধর্ম শিক্ষা করা উচিত ছিল। তাহা না করিয়া, আমাদের এই আচার্য তাহার জাতিভেদের ঘোড়া একইভাবে হাঁকাইতে থাকিলেন। ইহার পরিণাম এই হতভাগা দেশকে কিভাবে ভোগ করিতে হইল, ইতিহাস তাহারই সাক্ষ্য দিতেছে।

নারী সাধুদের সংঘ

তপস্বী মুনিঋষিদের মধ্যে, অথবা বৈদিক ঋষিদের মধ্যে, স্ত্রীলোকের সমাবেশ হয় না। গার্গী বাচক্লবীর মতো নারী ব্রহ্মজ্ঞানের চর্চায় অংশগ্রহণ করিত বটে।[১] কিন্তু মেয়েদের কোনো পৃথক সংঘ ছিল না। স্ত্রীলোকের পৃথক্ সংঘ বুদ্ধের সময়ের পূর্বে দুই-একশত বৎসরের মধ্যে স্থাপিত হইয়াছিল। মনে হয় যে, জৈন সাধ্বীদের সংঘই ইহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। এইসব জৈন সাধ্বী যে বাদ-বিবাদে বিশেষ পটু ছিল, তাহা ভদ্রা কুণ্ডলকেশা[২] ইত্যাদির গল্প হইতে বুঝিয়া পারা যায়।

১. বৃ. উ ৩।৬।১ ইত্যাদি।

২. 'বৌদ্ধ সংঘা চা পরিচয়', পৃ. ২১৪-১৭।

আগে মুনিঋষিরা অরণ্যে বাস করিত এবং কদাচিৎই গ্রামে কিংবা শহরে যাইত। এইজন্য তাহাদের পক্ষে স্ত্রীসংঘ স্থাপন করা সম্ভবপর হয় নাই। কিন্তু শ্রমণরা লোকালয়ের আশেপাশেই থাকিত এবং তৎকালের সামাজিক অবস্থা স্ত্রীসংঘ স্থাপন করার পক্ষে অনুকূল ছিল বলিয়া, তাহারা ঐরূপ সংঘ স্থাপন করিতে পারিয়াছিল। বৌদ্ধ এবং জৈন সাহিত্য পাঠ করিলে, বিশেষ একটি জিনিস লক্ষিত হয় যে, তৎকালে ধর্মের ব্যাপারে পুরুষদের মতোই মেয়েরাও বেশ অগ্রগামী ছিল। ইহার কারণ এই যে, গঠনমূলক অথবা গোষ্ঠীমূলক রাজ্যগুলিতে মেয়েদের পূর্ণ স্বাধীনতা ছিল। ভগবান বুদ্ধ বজ্জীদিগকে উন্নতির যে সাতটি নিয়ম বলিয়াছিলেন তাহাদের পঞ্চমটি এইরূপ ছিল ঃ 'স্ত্রীলোকের সম্মান রাখিতে হইবে; বিবাহিত হউক অথবা অবিবাহিত হউক, স্ত্রীলোকের উপর কোনোরকম অত্যাচার হইতে দিবে না।' আর অন্তন্তঃ বুদ্ধের মৃত্যু পর্যন্ত, বজ্জীরা এই নিয়ম মানিয়া চলিত। বজ্জীদের মতো, মল্লদের রাজ্যেও স্ত্রীলোকের সম্মান রক্ষিত হইত, এইরূপ ধরিয়া লইলে, আপত্তির কারণ নাই। অঙ্গ, কাশী, শাক্য, কোলিয় ইত্যাদি গোষ্ঠীমূলক রাজ্যগুলির স্বাধীনতা নষ্ট হইয়া গিয়াছিল বটে, তথাপি আভ্যন্তরীণ শাসনব্যবস্থা দেশের লোকেদের হাতেই ছিল বলিয়া, ইহাদের রাজ্যে স্ত্রীস্বাধীনতায় বিশেষ কিছু আঘাত পড়ে নাই।

মগধ ও কোসলে সার্বভৌম রাজতন্ত্র দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল বটে, তথাপি সেখানকার একচ্ছত্র রাজারা প্রাচীন গোষ্ঠীমূলক রাজ্যশাসন পদ্ধতি সমূলে উৎপাটন করিতে সমর্থ হয় নাই। বিম্বিসার অথবা পসেনদি কোনো নারীকেই জোরজবরদস্তি করিয়া নিজের অন্তঃপুরে আনিয়াছিলেন বলিয়া কোথাও কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না।

কোনো কোনো রাজতান্ত্রিক রাজ্যে মেয়েদের সম্মান

গোষ্ঠীমূলক রাজ্যশাসন পদ্ধতি লোকের স্মৃতি হইতে ধীরে ধীরে মুছিয়া যাইতেছিল; আর সার্বভৌম রাজতন্ত্র যতই প্রবল হইতে থাকিল, নারীদের স্বাধীনতাও ততই লুপ্ত হইতে থাকিল। তথাপি কোনো কোনো রাজা স্ত্রীলোকের যথাযোগ্য সম্মান রাখিত, ইহা উন্মাদয়ন্তীর (উন্মদয়ন্তীর) গল্প হইতে বুঝা যায়।[১]

বোধিসত্ত্ব শিবিরাজকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহাকে শিবিকুমারই বলা হইত। শিবিরাজার সেনাপতির ছেলে অভিপারক ও শিবিকুমার সমবয়স্ক ছিল। তাহারা দুই জনে তক্ষশিলায় শাস্ত্র পড়িয়াছিল। পিতার মৃত্যুর পর, শিবিকুমার রাজা হইলেন; আর সেনাপতির মৃত্যুর পর শিবিকুমার অভিপারককে সেনাপতি করিলেন। অভিপারক শ্রেষ্ঠী উন্মাদয়ন্তী নামক এক অত্যন্ত সুন্দরী শ্রেষ্ঠী-কন্যাকে বিবাহ করিলেন। রাজা নগর ভ্রমণে বাহির হইলে, উন্মাদয়ন্তী জানালায় দাঁড়াইয়া তাঁহাকে দেখিতেছিল। তখন উভয়ের মধ্যে দৃষ্টি বিনিময় হইল। রাজা তাহার সৌন্দর্যে মোহিত হইয়া পাগল হইয়া গেলেন এবং প্রাসাদে গিয়া আপন শয্যায় পড়িয়া রহিলেন। এই কথা অভিপারক জানিতে পারিয়া রাজার নিকট

---

১. উন্মদন্তীজাতক নং ৫২৭

গেলেন। এবং তাঁহাকে বলিলেন, ''আমার পত্নীকে আপনি গ্রহণ করুন এবং এই উন্মত্ততা ছাড়িয়া দিন।'' ইহাতে রাজার জ্ঞান হইল ও তিনি বলিলেন, ''কিন্তু শিবিদের ধর্ম এইরকম নয়। আমি তো শিবিদের নেতা, আর শিবিদের ধর্ম পালন করা আমার অবশ্যকর্তব্য। অতএব রিপুর বশবর্তী হওয়া আমাকে শোভা পায় না।''

এই কাহিনীটি বেশ বড়ো এবং মনোরঞ্জক। এখানে ইহার শুধু সারমর্ম দেওয়া হইয়াছে। এই গল্পটি যখন রচিত হইয়াছিল, সেই সময় গণমূলক রাজ্যশাসনপদ্ধতি একেবারে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল বলিয়া মনে হয়। তথাপি শিবির মতো গণমূলক রাজ্যের রাজারা স্ত্রীলোকের প্রতি কী কর্তব্য, তাহা ভালো করিয়াই জানিত; আর সার্বভৌম রাজারাও এই কর্তব্যের কথা স্মরণে রাখুক, ইহাই গল্পের উদ্দেশ্য ছিল। শিবিকুমারের ভাষণের শেষদিকে এই গাথাটি আছে ঃ

নেতা পিতা উগ্‌গতো রট্‌ঠ পালো
ধম্মং শিবীনং অপচায়মানো।
সো ধম্মমেবানুবিচিন্তয়ন্তো
তস্মা সকে চিত্তবসে ন বত্তে॥

'আমি শিবিদের নায়ক, পিতা এবং রাজ্যপালক নেতা। সুতরাং শিবিদের যাহা কর্তব্য তাহা পালন করিয়া, এবং শিবিদের যাহা ধর্ম, সেই সম্বন্ধে ভালোভাবে বিচার করিয়া আমি রিপুর বশ হইব না।'

বাল্যবিবাহের কথা

অন্তত বৌদ্ধরাজাদের উপর এই কাহিনীটির বেশ ভালো পরিণাম হইয়াছিল; কিন্তু আবার এইজন্যই, তাহার সঙ্গে সঙ্গে, উহার একটি খারাপ ফলও ফলিয়াছিল। এই প্রসঙ্গে ব্রহ্মদেশের একটি প্রথা মনে পড়ে। ব্রহ্মদেশের রাজারা কখনো কখনো বিবাহিতা নারীকে নিজের অন্তঃপুরে আনিতেন না। এমন কি বিবাহিতা নারীর স্বামীও যদি তাহার সহিত বিবাহ ভঙ্গ করিয়া তাহাকে রাজার হাতে সমর্পণ করিতে রাজী হইত, তবু রাজারা ইহা বড়ো অধর্ম বলিয়া মনে করিতেন। কিন্তু অবিবাহিতা মেয়েকে তাহার পিতামাতার সম্মতি ছাড়াও যথেচ্ছভাবে ধরিয়া লইয়া যাইতেন। রাজা মেয়েকে জোর করিয়া লইয়া যাইবেন, এই ভয়ে, পিতামাতা অতি অল্প বয়সেই মেয়েকে বিবাহ দিয়া দিত। আসলে এ বিবাহগুলি একেবারে অর্থহীন ছিল। এইরূপ বিবাহের পর, মেয়ে স্বামীর ঘরে যাইত না। শুধু ইহাই নহে; প্রথম বরকে বাদ দিয়া, ইচ্ছামতো নূতন বরের সহিত ঐ মেয়েকে বিবাহ দিতে কোনো আপত্তি ছিল না। শুধু রাজার অত্যাচার হইতে মেয়েকে রক্ষা করিবার জন্য, মেয়ের পিতামাতা ঐ কৌশলটি গ্রহণ করিত। ভারতবর্ষেও বাল্যবিবাহের দৃঢ়মূল প্রথাটি অনুরূপ অবস্থা হইতেই উৎপন্ন হইয়াছিল কিনা, তাহা বলা সম্ভবপর নয়। কিন্তু ইহা নিঃসন্দিগ্ধ যে বুদ্ধের সময় এই প্রথা সর্বত্র প্রচলিত হয় নাই, এবং একচ্ছত্র রাজতন্ত্র শক্তিশালী হওয়ার

পরই, ইহা ধর্মের সহিত জড়িত হইয়াছিল। ভারতবর্ষে যদি গণমূলক রাজ্যশাসন-পদ্ধতি বিকাশ লাভ করিত, তাহা হইলে বাল্যবিবাহের প্রথা যে মোটেই দাঁড়াইবার স্থান পাইত না ইহা বলা অনাবশ্যক।

চারি প্রকার শ্রমণ-ব্রাহ্মণ

বুদ্ধের সময় পর্যন্ত চারিপ্রকার শ্রমণ-ব্রাহ্মণের উৎপত্তি হইয়াছিল। মজ্ঝিমনিকায়ের নিবাপসুত্তে এই সম্বন্ধে একটি রূপক ও ঐ রূপকের ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। তাহার সারমর্ম এই ঃ

ভগবান বুদ্ধ শ্রাবস্তীনগরে অনাথপিণ্ডিকের বাগানে থাকাকালে, ভিক্ষুদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন, "হে ভিক্ষুগণ, যে-ব্যক্তি চারণভূমিতে ঘাস লাগায়, সে তাহা হরিণের মঙ্গলকামনায় লাগায় না। এই চারণভূমির ঘাস খাইয়া যাহাতে হরিণ পাগল হইয়া সম্পূর্ণভাবে তাহার আয়ত্তে আসে, এই উদ্দেশ্যেই সে ঘাস লাগায়।"

১. হে ভিক্ষুগণ, এইরূপ এক চারণভূমিতে কয়েকটি হরিণ ঢুকিল এবং সেখানকার ঘাস খাইয়া মত্ত হইয়া যাওয়ায়, তাহারা চারণভূমির মালিকের হাতে ধরা পড়িল।

২. ইহা দেখিয়া, অন্যান্য কয়েকটি হরিণ ভাবিল, এই চারণভূমিতে প্রবেশ করা খুব অনিষ্টজনক তাই তাহারা চারণভূমি পরিত্যাগ করিয়া, শুষ্ক অরণ্যের ভিতর চলিয়া গেল। সেখানে গ্রীষ্মকাল আসার পর, ঘাস ও জল দুর্লভ হইয়া যাওয়ায় তাহাদের শরীর খুব দুর্বল হইল। তখন তাহারা জঠরজ্বালায় অস্থির হইয়া চারণভূমিতে প্রবেশ করিল এবং সব ভুলিয়া ঘাস জল খাইতে আরম্ভ করিল এবং ইহাতে তাহারা মানুষের অধীন হইল।

৩. তৃতীয় আর একটি হরিণের দল উক্ত দুইরকম রাস্তাই এড়াইয়া, চারণভূমির নিকটস্থ জঙ্গলে ঢুকিল এবং খুব সাবধানে বাহির হইতে চারণভূমির ঘাস খাইতে লাগিল। অনেকদিন পর্যন্ত চারণভূমির মালিক ইহা টের পায় নাই। কিন্তু কিছুকাল পর, ঐ হরিণগুলি কোথায় ঘাস খাইয়া যায়, তাহা সে খুঁজিয়া বাহির করিল এবং ঐ জায়গার চারি দিকে জাল ছড়াইয়া দিয়া হরিণগুলিকে ধরিয়া ফেলিল।

৪. কিন্তু চতুর্থ একদল হরিণ খুবই বুদ্ধিমান ছিল। তাহারা চারণভূমি হইতে দূরে গহনবনের ভিতর আশ্রয় লইল; আর সেখান হইতে খুব সাবধানতার সহিত চারণভূমির ঘাস ও জল উপভোগ করিতে থাকিল। চারণভূমির মালিক তাহারা যে কোথায় থাকে, তাহার কিছুই সন্ধান পাইল না।

"হে ভিক্ষুগণ, এইটি আমার রচিত একটি রূপক। যে ব্যক্তি ঘাস লাগায়, সে অন্য কেহ নয়, সে হইতেছে 'মার'।"

১. যে-সব শ্রমণ-ব্রাহ্মণ বিষয়সুখেই আনন্দ পায়, তাহারা প্রথম শ্রেণীর হরিণ।

২. বিষয়সুখের ভয়ে যাহারা অরণ্যে আশ্রয় লয়, এবং যাহারা সংসার হইতে সরিয়া যায়, তাহারা দ্বিতীয় শ্রেণীর হরিণ।

৩. যে-সব শ্রমণ-ব্রাহ্মণ অত্যন্ত সাবধানতার সহিত বিষয় উপভোগ করে; 'জগৎ শ্বাশ্বত কি অশাশ্বত, আত্মা অমর কি বিনাশী' ইত্যাদি প্রশ্ন লইয়া বাদ-বিবাদ করে, এবং নিজ সময় অযথা কাটায়, তাহারা তৃতীয় প্রকার হরিণ।

৪. কিন্তু যাহারা এইরূপ বাদ-বিবাদে না পড়িয়া, নিজের অন্তঃকরণ নিষ্কলঙ্ক রাখিতে যত্নশীল হয়, তাহারা চতুর্থ শ্রেণীর হরিণ।

এই সুত্তে বর্ণিত প্রথম শ্রেণীর শ্রমণ-ব্রাহ্মণ মানে যাহারা যাগযজ্ঞ ও সোমরস পানকেই ধর্মের সার বলিয়া বুঝিত, এইরূপ বৈদিক ব্রাহ্মণ। বৈদিক পশুহিংসা ও সোমরসপানে বিরক্ত হইয়া, যাহারা বনে যাইত এবং সেখানে ফলমূল খাইয়া উদর পালন করিত, সেইসব মুনিঋষি দ্বিতীয় শ্রেণীর শ্রমণ-ব্রাহ্মণ। বনে যখন ফলমূল পাওয়া যাইত না, অথবা যখন তাহাদের নোনা ও টক জিনিস খাইবার ইচ্ছা হইত, তখন তাহারা লোকালয়ে আসিত ও সংসারের জালে আবদ্ধ হইত। ইহার একটি উদাহরণ পূর্বেই দেওয়া হইয়াছে। যাহারা মুনি-ঋষিদের মতো শুধু ফলমূল খাইয়া জীবন ধারণ না করিয়া, ভিন্ন ভিন্ন শ্রমণ সম্প্রদায় স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহারা তৃতীয় শ্রেণীর শ্রমণ-ব্রাহ্মণ। এইসব পরিব্রাজক গহন বনে না গিয়া লোকালয়েই বাস করিত, এবং জনসাধারণের নিকট যে অন্নবস্ত্র মিলিত, তাহা খুব সাবধানতার সহিত উপভোগ করিত। কিন্তু তাহারা "আত্মা আছে কি নাই", ইত্যাদি বিবাদে ডুবিয়া থাকিত। এই জন্য তাহাদের আত্মশুদ্ধি হইত না ও তাহারা মারের জালে ধরা পড়িত। বুদ্ধ এইসব নিরর্থক বাদ-বিবাদ ছাড়িয়া দিয়া আধ্যাত্মিক বিশুদ্ধতা লাভের পথ খুঁজিয়া বাহির করিলেন। তিনি তাঁহার ভিক্ষুদিগকে চতুর্থ শ্রেণীর শ্রমণ-ব্রাহ্মণদের মধ্যে গণনা করিয়াছেন। অন্যান্য শ্রমণ-ব্রাহ্মণদের আত্মবাদ এবং বুদ্ধের আত্মবাদ এই দুইয়ের মধ্যে কী পার্থক্য ছিল, তাহার স্পষ্ট বিবরণ সপ্তম পরিচ্ছেদে দেওয়া হইবে। এখানে শুধু ইহাই বলা দরকার যে, এই চারি প্রকার শ্রমণ-ব্রাহ্মণদের মধ্যে কোথাও উপনিষদের ঋষিদিগকে সমাবিষ্ট করা যায় না, এবং এইজন্য বৌদ্ধধর্ম উপনিষদ্ হইতে নির্গত হইয়াছে, এই ধারণাটি ভিত্তিহীন বলিয়া প্রমাণিত হয়।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

গোতমবোধিসত্ত্ব

গোতমের জন্মতারিখ

গোতমের জন্মতারিখ সম্বন্ধে আধুনিক পণ্ডিতদের ভিতর খুব মতভেদ দেখা যায়। দেওয়ান বাহাদুর স্বামিকন্নু পিল্লের মতে বুদ্ধের পরিনির্বাণ খৃস্টপূর্ব ৪৭৮ অব্দে হইয়াছিল। অন্য কোনো কোনো পণ্ডিত বলেন যে, তাহা খৃস্টপূর্ব ৪৮৬-৮৭ সনে হইয়াছিল। কিন্তু আজকাল যে নূতন তথ্য পাওয়া গিয়াছে, তাহা হইতে ইহাই নিশ্চয় পূর্বক বলা যায় যে, মহাবংস এবং দীপবংশে বুদ্ধের পরিনির্বাণের যে তারিখ দেওয়া হইয়াছে, তাহাই নির্ভুল তারিখ।[১] এইসব গ্রন্থ হইতে প্রমাণ হয় যে, বুদ্ধের পরিনির্বাণ খৃস্টপূর্ব ৫৪৩ অব্দে হইয়াছিল; এবং তাঁহার পরিনির্বাণের এই তারিখ মানিয়া লইলে, বুদ্ধের জন্ম খৃস্টপূর্ব ৬২৩ অব্দে হইয়াছিল, এইরূপ বলিতে হইবে।

বোধিসত্ত্ব

গোতমের জন্মকাল হইতে তাঁহার বুদ্ধত্ব লাভ পর্যন্ত তাঁহাকে বোধিসত্ত্ব বলার রেওয়াজ বেশ প্রাচীন। পালি সাহিত্যের সর্বাপেক্ষা পুরাতন যে সুত্তনিপাত গ্রন্থ, তাহাতে বলা হইয়াছে যে,

সো বোধিসত্তো রতনবরো অতুল্যো।
মনুস্সলোকে হিতসুখতায় জাতো।
সক্যানং গামে জনপদে লুম্বিনেয্যে।

শ্রেষ্ঠরত্নের মতো অতুলনীয় যে বোধিসত্ত্ব, তিনি লুম্বিনী-জনপদে শাক্যদের গ্রামে, মানবের মঙ্গল ও সুখের জন্য, জন্মগ্রহণ করিলেন।

'বোধি' মানে যে-জ্ঞানে মনুষ্যের উদ্ধার হয়। আর এই জ্ঞানের জন্য যে প্রাণী (সত্ত্ব) চেষ্টা করে, তাহাকে বোধিসত্ত্ব বলে। প্রথম প্রথম, গোতমের জন্ম হইতে তাহার সম্বোধিজ্ঞান হাওয়া পর্যন্ত তাঁহার নামের সহিত এই বিশেষণটি লাগানো হইত বলিয়া মনে হয়। ক্রমে এই ধারণা প্রবর্তিত হইল যে, বর্তমান জন্মের পূর্বেও তিনি অনেকবার জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; এইসব জন্মেও তাঁহার নামের সহিত বোধিসত্ত্ব বিশেষণটি লাগানো হইতে থাকিল। তাঁহার পূর্বজন্মসমূহের কাহিনীগুলি জাতকে সংগ্রহ করা হইয়াছে, এইসব কাহিনীর মুখ্যপাত্রকে বোধিসত্ত্ব এই নাম দিয়া, তিনি যে পূর্বজন্মের গোতমই ছিলেন, ইহা বলা হইয়াছে। যে-সব কাহিনীতে কোনো যোগ্য পাত্র পাওয়া যায় নাই, সেগুলিতে বোধিসত্ত্বের জীবনের সহিত কোনো সম্বন্ধ নাই, এই রকম কোনো বনদেবতা অথবা অন্য কোনো

---

১. V. A. Smith. The Early History of India. Oxford, 1-24. p. 49-50

ব্যক্তিকে মুখ্যপাত্ররূপে গণনা করিয়া, কোনো রকমে তাহার সহিত বুদ্ধের সম্বন্ধ জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। সে যাহাই হউক, এখানে আমি গোতমের জন্ম হইতে তাঁহার বুদ্ধত্ব লাভ পর্যন্ত, তাঁহাকে বোধিসত্ত্ব এই নামে নির্দেশ করিব; তাঁহার পুর্বজন্মের সহিত এই বিশেষণের কোনো সম্বন্ধ নাই, এইরূপ বুঝিতে হইবে।

বোধিসত্ত্বের কুল

বোধিসত্ত্বের বংশ ও বাল্যকালের খবর ত্রিপিটক গ্রন্থে অতি অল্পই পাওয়া যায়। নানাপ্রসঙ্গে যেসব সুত্ত উপদিষ্ট হইয়াছিল, সেইগুলিতে এই খবর পাওয়া যায়। কিন্তু এইগুলিতে যে-তথ্য পাওয়া যায়, আর অট্ঠকথাতে যে-সব খবর পাওয়া যায়, ইহাদের মধ্যে কখনো কখনো মিল হয় না। এইজন্য এইসব পরস্পরবিরোধী তথ্য নিখুঁতভাবে পরীক্ষা করিয়া, তাহা হইতে কিছু তথ্য বাহির করা যায় কিনা, তাহার চেষ্টা করা সমীচীন হইবে।

মজ্ঝিমনিকায়ে চূলদুক্খক্খন্ধসুত্তের অট্ঠকথাতে গোতমের পরিবার সম্বন্ধে কিছু খবর পাওয়া যায়। তাহা এইরূপ ঃ

"শুদ্ধোদন, শুক্লোদন, শাক্যোদন, ধোতোদন ও অমিতোদন, ইহারা পাঁচ ভাই। অমিতাদেবী তাহাদের বোন। তিষ্যস্থবির এই বোনের ছেলে। তথাগত ও নন্দ শুদ্ধোদনের ছেলে। মহানাম ও অনুরুদ্ধ শুক্লোদনের এবং আনন্দস্থবির অমিতোদনের ছেলে। অমিতোদন ভগবান্ বুদ্ধের ছোটো; আর মহানাম বুদ্ধের বড়ো।"

এখানে যে অনুক্রম দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে অমিতোদনকে সকলের ছোটো ভাই বলিয়া দেখায়। আর তাহার ছেলে আনন্দ ভগবান বুদ্ধের চেয়ে ছোটো ছিল, তাহাও ঠিকই হইয়াছে। কিন্তু মনোরথপূরণী অট্ঠকথাতে অনুরুদ্ধ সম্বন্ধে লিখিতে গিয়া 'অমিতোদনসক্কস গেহে পটিসন্ধিং গণ্হি' (অমিতোদন শাক্যদের গৃহে জন্মগ্রহণ করিল) এইরূপ বলা হইয়াছে! একই বুদ্ধঘোষাচার্যকর্তৃক লিখিত এই দুইটি অট্ঠকথাতে এ রকম বিরোধ দেখা যায়। প্রথম অট্ঠকথাতে আনন্দ অমিতোদনের ছেলে ছিল, এইরূপ বলা হইয়াছে; আর দ্বিতীয়টিতে অনুরুদ্ধ তাহার ছেলে ছিল, এইরূপ বলা হইয়াছে।[১] সুতরাং শুক্লোদন ইত্যাদি নামগুলিও কাল্পনিক কিনা সন্দেহ হয়।

বোধিসত্ত্বের জন্মস্থান

সুত্তনিপাত হইতে ইতঃপূর্বে যে অংশটি উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতে লিখিত আছে যে, বুদ্ধের জন্ম লুম্বিনী নামক জনপদে হইয়াছিল। আজও এই জায়গার নাম লুম্বিনীদেবী, এবং সেখানকার ভূমিগর্ভে নিমগ্ন অশোকের যে শিলাস্তম্ভ পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে এই বাক্যটি লিখিত আছে ঃ "লুম্বিনীগ্রাম উবালিকে কতে।" সুতরাং বোধিসত্ত্বের জন্ম যে লুম্বিনীগ্রামে হইয়াছিল, তাহা সম্পূর্ণভাবে প্রমাণিত হয়।

১. 'বৌদ্ধ সংঘাচা পরিচয়' পৃ. ১৫৪

অন্য অনেক সুত্তে এইরূপ উল্লেখ রহিয়াছে যে, 'মহানাম শাক্য' কপিলবস্তুর অধিবাসী ছিলেন। কিন্তু শুদ্ধোদন যে কপিলবস্তুতে থাকিতেন, তাহা শুধু মহাবগ্‌গেই লিখিত আছে। লুম্বিনীগ্রামে ও কপিলবস্তুর মধ্যে ১৪-১৫ মাইল ব্যবধান। সুতরাং বলিতে হইবে যে, শুদ্ধোদন কখনো কখনো তাঁহার লুম্বিনীগ্রামের জমিদারিতে থাকিতেন এবং সেখানেই বোধিসত্ত্ব জন্মাইয়াছিলেন। কিন্তু নিম্নোদ্ধৃত অঙ্গুত্তরনিকায়ের তিকনিপাতের ১২৪৫-সংখ্যক সুত্তটি এইরূপ মানিবার বিপক্ষে প্রবল অন্তরায়।

কালামের আশ্রম

এককালে ভগবান্ বুদ্ধ কোসলদেশে ভ্রমণ করিতে করিতে কপিলবস্তুতে আসিয়া পৌঁছিলেন। তিনি আসিয়াছেন, এই সংবাদ শুনিয়া, মহানাম শাক্য তাঁহার সহিত দেখা করিল। তখন তিনি মহানামকে বলিলেন, "এক রাত্রি থাকিবার জন্য, আমাকে একটি জায়গা দেখিয়া দাও।" কিন্তু ভগবান্ বুদ্ধ থাকিতে পারেন, এমন জায়গা মহানাম কোথাও খুঁজিয়া পাইল না। ফিরিয়া আসিয়া সে বুদ্ধকে বলিল, "মহাশয়, আপনার যোগ্যস্থান আমি দেখিতে পাইলাম না। আপনার পূর্বের ব্রহ্মচারি-বন্ধু ভরণ্ডু কালামের আশ্রমে আপনি এক রাত্রি থাকুন।" ভগবান্ বুদ্ধ তখন মহানামকে সেখানে তাঁহার থাকিবার জায়গা প্রস্তুত করিবার জন্য কহিলেন ও পরে সেই রাত্রি ঐ আশ্রমেই কাটাইলেন।

পরের দিন সকালবেলা মহানাম বুদ্ধের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেল। তখন ভগবান তাহাকে কহিলেন, "হে মহানাম, এই সংসারে তিন রকমের ধর্মগুরু আছে। প্রথম শ্রেণীর ধর্মগুরু কামোপভোগের সমতিক্রম (পরিত্যাগ) দেখান, কিন্তু রূপ ও বেদনার সমতিক্রম দেখান না। দ্বিতীয় শ্রেণীর ধর্মগুরু কামোপভোগ ও রূপের সমতিক্রম দেখান, কিন্তু বেদনার সমতিক্রম দেখান না। তৃতীয় শ্রেণীর ধর্মগুরু এই তিনটিরই সমতিক্রম দেখান এসব ধর্মগুরুর আদর্শ এক, কি ভিন্ন ভিন্ন?"

ইহার উপর ভরণ্ডু কহিলেন, "হে মহানাম, তুমি এইরূপ বলো যে, ইহাদের সকলেরই আদর্শ এক।" কিন্তু ভগবান কহিলেন, "হে মহানাম, উহাদের আদর্শ ভিন্ন ভিন্ন, এরূপই বলো।" দ্বিতীয়বার এবং তৃতীয়বারও ভরণ্ডু তাহাদের আদর্শ এক, এইরূপ বলিতে পরামর্শ দিলেন; এবং ভগবান তাহাদের আদর্শ ভিন্ন ভিন্ন, এইরূপে বলিতে কহিলেন। "মহানামের মতো প্রভাবশালী শাক্যের সম্মুখে গোতম আমাকে অপদস্থ করিল" এইরূপ মনে করিয়া সেই ভরণ্ডু কালাম কপিলবস্তু ছাড়িয়া গেলেন, আর তিনি কখনো সেখানে ফিরিয়া আসেন নাই।

ভরণ্ডুকালামসুত্ত হইতে যাহা স্পষ্ট হয়

এখানে এই সুত্তের সম্পূর্ণ অনুবাদ দেওয়া হইল। তাহা হইতে বুদ্ধের জীবনচরিতের দুই-তিনটি কথা বেশ স্পষ্ট হয়। ইহাদের মধ্যে প্রথমটি এই যে, বুদ্ধত্ব লাভের পর, ভগবান গোতম একটি বৃহৎ ভিক্ষুসংঘ সঙ্গে লইয়া কপিলবস্তুতে আসেন নাই, আর শাক্যরাও তাঁহাকে খুব সম্মান দেখান নাই। তিনি একাই আসিয়াছিলেন, এবং তাহার জন্য যথাযোগ্য

স্থান বাহির করিতে মহানামকে বেশ বেগ পাইতে হইয়াছিল। যদি এই কথাই ঠিক হয় যে, রাজা শুদ্ধোদন বোধিসত্ত্বের জন্য তিনটি প্রাসাদ নির্মাণ করিয়াছিলেন, তাহা হইলে, উহাদের মধ্যে একটি খালি করিয়া বুদ্ধকে দেওয়া হইল না কেন? অনেক গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় যে কপিলবস্তুতে শাক্যদের একটি সংস্থাগার (অর্থাৎ নগরমন্দির) ছিল। বুদ্ধের শেষ বয়সে, শাক্যরা এই সংস্থাগারটি মেরামত করাইয়াছিলেন, এবং প্রথম তাঁহারা বুদ্ধকে সেখানে তাঁহার ভিক্ষুসংঘের সহিত এক রাত্রি থাকিতে অনুরোধ করিয়া তাঁহার দ্বারা ধর্মোপদেশ দেওয়াইয়াছিল।[১] কিন্তু উপরে বর্ণিত প্রসঙ্গে বুদ্ধ ঐ সংস্থাগারে থাকিতে পারেন নাই। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, বুদ্ধ শাক্যদের মধ্যে একজন সামান্য যুবক ছিলেন এবং কপিলবস্তুতে তাঁহার তেমন কিছু প্রভাব ছিল না।

দ্বিতীয় কথা এই যে, গোতম গৃহত্যাগ করিয়া যাওয়ার পূর্বে, কপিলবস্তুতে কালামের এই আশ্রমটি বিদ্যমান ছিল। সুতরাং বুদ্ধের পক্ষে কালামের ধর্ম বুঝিয়া লইবার জন্য, মগধের রাজগৃহ পর্যন্ত যাওয়ার কোনো আবশ্যকতা ছিল না। এই সুত্ত হইতে প্রমাণিত হয় যে, বুদ্ধ কপিলবস্তুতেই কালামের দার্শনিক তত্ত্বের সহিত পরিচিত হইতে পারিয়াছিলেন।

তৃতীয় কথা এই যে, যদি "মহানাম শাক্য" বুদ্ধের খুড়তুত ভাই হইত, তাহা হইলে সে বুদ্ধের থাকিবার ব্যবস্থা ভরণ্ডু কালামের আশ্রমে না করিয়া নিজ গৃহের নিকট কোথাও প্রশস্ত জায়গাতে করিত। গৃহস্থের বাড়িতে শ্রমণ তিন দিনের বেশি থাকত না, আর এখানেও শুধু এক রাত্রি থাকিবার ব্যবস্থাই দরকার ছিল; আর এইটুকু ব্যবস্থাও মহানাম নিজের গৃহে কিংবা তাহার অতিথিগৃহে করিতে পারিল না। হয় মহানামের ঘর খুবই ছোটো ছিল অথবা বুদ্ধকে এক রাত্রির জন্য আশ্রয় দেওয়ার মতো যোগ্য কারণ সে দেখে নাই।

এইসব কথা ভাবিয়া দেখিলে, প্রতীয়মান হয় যে, মহানাম শাক্য এবং ভগবান বুদ্ধ, ইহাদের সম্বন্ধ তেমন ঘনিষ্ঠতা ছিল না, আর শুদ্ধোদন শাক্যও কপিলবস্তু হইতে ১৪ মাইল দূরে থাকিতেন। কপিলবস্তুর সহিত তাহার সম্বন্ধ নিশ্চয়ই খুব কম ছিল। হয়তো শুধু যখন শাক্যদের সভাসমিতি হইত, তখনই তিনি কপিলবস্তুতে যাইতেন।

ভদ্দিয়রাজার কথা

মহাপদানসুত্তে বলা হইয়াছে যে, শুদ্ধোদন রাজা ছিলেন এবং কপিলবস্তু তাঁহার রাজধানী ছিল। কিন্তু বিনয়পিটকের চুল্লবগ্‌গে ভদ্দিয় রাজার যে কাহিনী পাওয়া যায়, তাহার সহিত এই বর্ণনাটির একেবারেই মিল নাই।

অনুরুদ্ধের বড়োভাই মহানাম তাহার পিতার মৃত্যুর পর সংসারের সকল কাজ দেখিতেছিল। অনুরুদ্ধের সাংসারিক জ্ঞান কিছুই ছিল না। যখন ভগবান বুদ্ধের খ্যাতি সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িল, তখন বড়ো বড়ো শাক্য যুবকেরা ভিক্ষু হইয়া তাঁহার সংঘে প্রবেশ করিতে লাগিল। ইহা দেখিয়া মহানাম অনুরুদ্ধকে কহিল, "আমাদের বাড়ির কেহই ভিক্ষু

---

১. সলারতন সংযুত্ত, আসীবিসবগ্‌গসুত্ত ৬ দ্রষ্টব্য।

হয় নাই; সুতারং হয় তুমি ভিক্ষু হও, অথবা আমি হই।" অনুরুদ্ধ বলিল, "ভিক্ষুর কাজ আমি পারিব না; তুমিই ভিক্ষু হও।"

মহানাম হইতে রাজী হইয়া, ছোটো ভাইকে সংসারের সব রকম কাজ বুঝাইতে লাগিল। সে কহিল, "প্রথমতঃ ক্ষেতে লাঙল দিতে হইবে। তাহার পর বীজ বুনা দরকার। তাহার পর, ইহাতে খালের জল দিতে হয়। তাহার পর, জল সরাইয়া ক্ষেতের আগাছা বাছিতে হয়। শস্য পাকিলে, তাহা কাটিয়া আনিতে হয়।" অনুরুদ্ধ বলিল, 'ইহা যে মস্ত হাঙ্গামা। বাড়ির সব ব্যবস্থা তুমিই দেখ। আমি ভিক্ষু হইব।" কিন্তু ইহাতে তাহার মায়ের সম্মতি ছিল না। আবার সেও জেদ ধরিয়া বসিল। তখন তাহাদের মা বলিল, "শাক্যদের রাজা ভদ্দিয় যদি তোমার সহিত ভিক্ষু হন, তাহা হইলে আমি তোমাকে ভিক্ষু হওয়ার অনুমতি দিব।"

রাজা ভদ্দিয় অনুরুদ্ধের বন্ধু ছিলেন। কিন্তু অনুরুদ্ধের মা ভাবিল যে, ভদ্দিয় ভিক্ষু হইবে না। তাই তিনি ঐ রকম একটি শর্ত করিলেন। অনুরুদ্ধ তাহার বন্ধুর নিকট গিয়া তাহাকে আগ্রহের সহিত ভিক্ষু হইবার জন্য অনুরোধ করিতে থাকিল। তখন ভদ্দিয় বলিলেন, "তুমি সাত বৎসর অপেক্ষা করো। তাহার পর আমরা ভিক্ষু হইব।" কিন্তু অনুরুদ্ধ এত বৎসর অপেক্ষা করিতে প্রস্তুত ছিল না। তখন ভদ্দিয় ছয় বৎসর সময় চাহিলেন। তাহার পর পাঁচ, চার, তিন, দুই, এক বৎসর, সাত মাস, এইভাবে সময় কমাইতে কমাইতে, শেষে তিনি সাত দিন পর অনুরুদ্ধের সহিত যাইতে রাজী হইলেন। এবং সাত দিন পর ভদ্দিয়, অনুরুদ্ধ, আনন্দ, ভগু, কিম্বিল ও দেবদত্ত, এই ছয়জন শাক্যপুত্র এবং তাহাদের সহিত উপালি নামক এক নাপিত, মোট এই সাতজন চতুরঙ্গ সেনাদল সজ্জিত করিয়া, সেই সৈন্য সহ কপিলবস্তু হইতে বেশ কিছু দূরে গেল; এবং সেখান হইতে সৈন্যদিগকে রাজধানীতে ফিরাইয়া দিয়া, তাহারা শাক্যদেশের সীমা অতিক্রম করিল। সেই সময়, ভগবান বুদ্ধ মল্লদের দেশে অনুপ্রিয়নামক গ্রামে বাস করিতেছিলেন। এই সাতজন সেখানে গিয়া, তাঁহার নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করিল।

ভদ্দিয়ের কাহিনী হইতে সিদ্ধান্ত

ভগবান বুদ্ধের কীর্তি শুনিয়া বহু শাক্য কুমার ভিক্ষু হইতে লাগিল; আর তখন শাক্যদের সিংহাসনে তো ছিলেন রাজা ভদ্দিয়। তাহা হইলে, শুদ্ধোদন কোন্ সময়ে রাজা ছিলেন? শাক্যরা কি সকলে মিলিয়া তাহাদের রাজা নির্বাচন করিত, না কোসলের মহারাজা তাহাকে নিযুক্ত করিতেন, ইহা বলা যায় না। শাক্যরা তাহাকে নির্বাচন করিত, এই কথা ঠিক হইলে, মহানাম শাক্যের মতো বয়োজ্যেষ্ঠ কোনো শাক্যকে সহজেই নির্বাচন করা যাইত। তাহা ছাড়া অঙ্গুত্তরনিকায়ের প্রথম নিপাতে বুদ্ধের মুখে এইরূপ কথা রাখা হইয়াছে, "উচ্চকুলে উৎপন্ন আমার ভিক্ষু শ্রাবকদের মধ্যে, কালিগোধের পুত্র ভদ্দিয় সর্বশ্রেষ্ঠ।" শুধু উচ্চকুলে জন্মগ্রহণ করাতেই শাক্যের মতো গণরাজারা ভদ্দিয়কে নিজেদের রাজা বলিয়া নির্বাচন করিবে, ইহা সম্ভবপর বলিয়া মনে হয় না। কোসল দেশের পসেনদিই তাহাকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, ইহাই অধিক গ্রহণীয় বলিয়া মনে হয়। সে যাহা হউক, ইহা অবশ্যস্বীকার্য যে শুদ্ধোদন কখনো শাক্যদের রাজা হন নাই।

শাক্যদের প্রধান পেশা চাষবাস

ত্রিপিটক সাহিত্যে যে-তথ্য পাওয়া যায়, তাহা লুম্বিনীদেবীস্থ অশোকের শিলালিপির সাহায্যে পরীক্ষা করিয়া দেখিলে প্রতীয়মান হয় যে, শুদ্ধোদন একজন শাক্য ছিলেন এবং তিনি লুম্বিনীগ্রামে বাস করিতেন ও সেখানেই বোধিসত্ত্বের জন্ম হইয়াছিল। মহানাম ও অনুরুদ্ধের যে কথোপকথনটি উপরে দেওয়া হইয়াছে, তাহা হইতে প্রমাণিত হয় যে, শাক্যদের প্রধান পেশা ছিল চাষবাস। মহানামের মতো শাক্যেরা যেমন নিজেরাই চাষবাস করিত, শুদ্ধোদন শাক্যও সেইরূপ করিতেন। জাতকের নিদানকথায় শুদ্ধোদনকে মহারাজা বানানো হইয়াছে। কিন্তু সেখানে তাঁহার চাষবাস ও খামারের বর্ণনাও দেওয়া হইয়াছে। বর্ণনাটি এইরূপ—

"একদিন রাজার বীজবপনের উৎসব (বপ্পমঙ্গলং) ছিল। সেই দিন সমস্ত শহরটি দেবতাদের বিমানের মতো সাজানো হইত। সর্ব দাস ও শ্রমিক নূতন বস্ত্র পরিধান করিয়া ও গন্ধমালা প্রভৃতিতে সজ্জিত হইয়া রাজবাড়িতে একত্র হইত। রাজার খামারে এক হাজার লাঙল চলিত। সেই দিন সাতশো নিরানব্বইটি লাঙলে রশি, বলদ ও বলদের জোয়াল রুপালী পাত দিয়া মুড়াইয়া দেওয়া হইত; আর রাজার লাঙলাদি সরঞ্জাম সর্বোৎকৃষ্ট সোনার পাতে মোড়ানো হইত.........রাজা সোনার পাতে মোড়া লাঙল ধরিতেন, আর তাঁহার অমাত্যরা সাতশো নিরানব্বইটি রূপার পাতে মোড়া লাঙল ধরিত। বাকীগুলি (২০০) অন্যান্য লোকেরা লইত ও সকলে মিলিয়া ক্ষেতে লাঙল দিত। রাজা সোজাসুজি, এই দিক হইতে ঐ দিকে, লাঙল ফিরাইতেন।"

এই গল্পটিতে কিছু কপোলকল্পিত কথা থাকিলেও, ইহার মধ্যে এইটুকু সত্যাংশ আছে যে শুদ্ধোদন নিজে চাষবাস করিতেন। আজকাল মহারাষ্ট্রে ও গুজরাটে যেমন বেতনধারী পাটীল (গ্রামের মোড়ল) নিজেও চাষবাস করে, আবার মজুর দিয়াও করায়, তেমনই শাক্যরাও করিত। তাহাদের মধ্যে শুধু এইটুকু তফাত ছিল যে, এখনকার পাটীলদের রাজকীয় অধিকার খুবই কম; কিন্তু শাক্যদের এইরকম অধিকার ছিল। নিজেদের জায়গাতে যেসব প্রজা কিংবা মজুর থাকিত, তাহাদের ন্যায়-অন্যায়ের বিচার ইহারাই করিত, এবং তাহারা সংস্থাগারে অর্থাৎ নগরমন্দিরে মিলিত হইয়া দেশের আভ্যন্তরীণ শাসন-ব্যবস্থাও চালাইত। পরস্পরের মধ্যে কোনো বিবাদ ঘটিলে, নিজেই তাহারা উহার বিচার করিত। শুধু কাহাকেও দেশ হইতে নির্বাসন দিতে হইলে, কিংবা ফাঁসি দিতে হইলে, তাহার জন্য কোসলরাজার অনুমতি লইতে হইত—ইহা চূলসচ্চকসুত্তের নিম্নলিখিত কথোপকথন হইতে প্রতীয়মান হইবে ঃ

"ভগবান বলিলেন, 'হে অগ্‌গিবেস্সন, কোসলের রাজা পসেনদি কিংবা মগধের সার্বভৌম রাজা অজাতশত্রুর আমাদের প্রজাদের মধ্যে কোনো অপরাধীকে প্রাণদণ্ড দেওয়ার, জরিমানা করার অথবা দেশ হইতে নির্বাসন দেওয়ার পূর্ণ অধিকার আছে, কি নাই?"

"সচ্চক বলিল, 'হে গোতম, বজ্জী এবং মল্ল, এই দুই গণমূলক রাজ্যের রাজাদেরও নিজ নিজ রাজ্যে ফাঁসি দেওয়ার, জরিমানা করার অথবা দেশ হইতে নির্বাসিত করার অধিকার আছে; তাহা হইলে কোসলের রাজা পসেনদি কিংবা অজাতশত্রুর এই অধিকার রহিয়াছে, ইহা বলা নিষ্প্রোয়োজন'।"

এই কথোপকথন হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, গণমূলক রাজ্যগুলির মধ্যে কেবল বজ্জী ও মল্লদের রাজ্য দুইটির পূর্ণ স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ ছিল; আর শাক্য, কোলিয়, কাশী, অঙ্গ প্রভৃতি দেশের গণরাজাদের অপরাধীকে প্রাণদণ্ড দেওয়ার, মোটা রকমের জরিমানা করার, কিংবা দেশ হইতে বাহির করিয়া দেওয়ার অধিকার আর ছিল না। এইসব কাজের জন্য শাক্য, কোলিয় ও কাশীর গণরাজাদিগকে মগধ রাজার অনুমতি লইতে হইত।

মায়াদেবী সম্বন্ধে তথ্য

বোধিসত্ত্বের মায়ের সম্বন্ধে খুব অল্প খবরই পাওয়া যায়। অবশ্য তাঁহার নাম যে মায়াদেবী ছিল, ইহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু শুদ্ধোদন কত বৎসর বয়সে বিবাহ করিয়াছিলেন, এবং মায়াদেবীর কত বৎসর বয়সে বোধিসত্ত্বের জন্ম হইয়াছিল, এইসকল বিষয়ে কোথাও কোনো খবর পাওয়া যায় না। অপদান গ্রন্থে মহাপ্রজাপতি গোতমীর একটি অপদান আছে। তাহাতে তিনি বলিতেছেন—

পচ্ছিমে চ ভবে দানি জাতা দেবদেহে পুরে।
পিতা অঞ্জনসক্কো মে মাতা মম সুলক্খণা॥
ততো কপিলবত্থুস্মিং সুদ্ধোদনঘরং গতা।

"আর এই শেষ জন্মে, আমি দেবদহ নগরে জন্মগ্রহণ করিলাম। আমার পিতা অঞ্জন শাক্য, আর মাতা সুলক্ষণা। তাহার পর (আমার বয়স হইলে), আমি কপিলবস্তুর শুদ্ধোদনের গৃহে গেলাম। (অর্থাৎ শুদ্ধোদনের সহিত আমার বিবাহ হইল)।"

গোতমীর এই কথাগুলির ভিতর কতটুকু সত্যতা আছে, তাহা বলা যায় না। ইতঃপূর্বে আলোচনান্তে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া গিয়াছে, তাহার সহিত উদ্ধৃত অপদানের "কপিলবস্তুর শুদ্ধোদনের ঘরে গেলাম", এই কথাগুলি খাপ খায় না।[১] কিন্তু যেহেতু গোতমী অঞ্জন শাক্যের ও সুলক্ষণার মেয়ে ছিল, এইরূপ মানার বিরুদ্ধে কোথাও কোনো তথ্য পাওয়া যায় না, অতএব গোতমী এবং তাহার বড়ো বোন মায়াদেবী অঞ্জন শাক্যের মেয়ে ছিল এবং তাহাদের উভয়েরই শুদ্ধোদনের সহিত বিবাহ হইয়াছিল, এইরূপ বলিলে, কোনো আপত্তির কারণ নাই। কিন্তু তাহাদের বিবাহ কি একই সময়ে, অথবা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে হইয়াছিল, তাহা জানিবার কোনো উপায় নাই।

বোধিসত্ত্ব জন্মিবার পর, সপ্তম দিবসে, মায়াদেবী পরলোকে গমন করিয়াছিলেন, এই কথা বৌদ্ধ সাহিত্যে সুপ্রসিদ্ধ। ইহার পর বোধিসত্ত্বের লালনপলনে অনেক অসুবিধা হাওয়ায়, শুদ্ধোদন মায়াদেবীরই কনিষ্ঠা ভগিনীকে বিবাহ করিয়া থাকিবেন, ইহাই বিশেষভাবে সম্ভবপর বলিয়া মনে হয়। এইটুকু অবশ্য সুনিশ্চিত যে, গোতমী মায়ের মতো অত্যন্ত স্নেহের সহিত বোধিসত্ত্বকে লালনপালন করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ বোধিসত্ত্বকে কখনো আপন মায়ের অভাববোধ করিতে হয় নাই।

---

১. কারণ, ভরণ্ডুর কাহিনী হইতে এইরূপ নির্ধারিত হয় যে শুদ্ধোদন কপিলবস্তুতে থাকিতেন না।

বোধিসত্ত্বের জন্ম

মায়াদেবীর তখন পেটে দশমাসের গর্ভ। তিনি পিতৃগৃহে যাইতে চাহিলেন। তাঁহার ইচ্ছা জানিতে পারিয়া রাজা শুদ্ধোদন কপিলবস্তু হইতে দেবদহ নগর পর্যন্ত সমস্ত পথ পরিষ্কার করাইয়া, তাহা পতাকাদিদ্বারা সুশোভিত করিলেন, এবং মায়াদেবীকে সোনার পালকিতে খুব জাঁকজমকের সহিত পিতৃগৃহে রওনা করিয়া দিলেন। সেখানে যাওয়ার পথে, লুম্বিনীবনে শালগাছের নীচে, তিনি একটি পুত্রসন্তান প্রসব করিলেন। জাতকের নিদানকথাতে যে বর্ণনা আছে, উপরের কথাকয়টি তাহারই সারমর্ম। রাজা শুদ্ধোদন সাধারণ জমিদার হইয়া থাকিলে, তিনি এত বড়ো রাস্তার সবটুকু এমন সুন্দর করিয়া সাজাইতে পারিয়াছিলেন, ইহা সম্ভবপর নয়। তাহা ছাড়া দশ মাস পূর্ণ হওয়ার পর, কোনো অন্তঃসত্ত্বা নারীকে কেহ পিতৃগৃহে পাঠায় না। সুতরাং এই গল্পটিতে সত্যের অংশ খুব কম বলিয়া মনে হয়।

মহাপদানসুত্তে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে যে, বোধিসত্ত্ব মাতৃগর্ভে প্রবেশ করার পর হইতে আরম্ভ করিয়া, জন্মগ্রহণ করার পর, সাতদিন পর্যন্ত, মোট ষোলদিন অলৌকিক ঘটনা (ধম্মতা) ঘটিয়াছিল। ইহাদের মধ্যে নবমটি হইতেছে এই যে, বোধিসত্ত্বের মা ঠিক ঠিক দশমাস গর্ভধারণের পর, বোধিসত্ত্বকে জন্ম দিয়াছিলেন; দশমটি এই যে, তিনি দাঁড়াইয়া থাকা কালেই, তাঁহার প্রসব হইয়াছিল; এবং অষ্টমটি এই যে, বোধিসত্ত্বের জন্মের সাতদিন পর, তাহার মা মৃত্যুমুখে পতিত হন। এই তিনটি অনন্যসাধারণ ঘটনা গোতম বোধিসত্ত্বের জীবনচরিত হইতে গৃহীত হইয়া থাকিবে। কিন্তু বাকী সব-কয়টি কল্পনাপ্রসূত ও ধীরে ধীরে গোতমের জীবনচরিতে ঢুকিয়াছিল বলিয়া মনে হয়। সংক্ষেপে আমার বক্তব্য এই যে, বোধিসত্ত্বের মা দাঁড়াইয়া থাকা কালেই তাঁহার জন্ম হইয়াছিল, এবং তাঁহার জন্মের সাতদিন পর, তিনি পরলোকগামী হইয়াছিলেন, এইরকম মানার বিরুদ্ধে কোনো আপত্তি নাই। জাতকের নিদানকথাতে লিখিত আছে যে, শালবৃক্ষের নীচে তাঁহার প্রসব হইয়াছিল, আর ললিতবিস্তরে লিখিত হইয়াছে যে, প্লক্ষ গাছের নীচে তাঁহার প্রসব হইয়াছিল। শালবৃক্ষের নীচে হউক অথবা প্লক্ষ বৃক্ষের নীচে হউক, লুম্বিনীগ্রামে শুদ্ধোদনের গৃহের বাহিরে, কোনো বাগানে বেড়াইবার সময়, তাঁহার প্রসব হইয়াছিল। এই বিবরণের মধ্যে এইটুকু তথ্য আছে বলিয়া বুঝিতে হইবে যে, দণ্ডায়মান অবস্থাতেই তাঁহার প্রসব হইয়াছিল।

বোধিসত্ত্বের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে জ্যোতিষদের গণনা

"বোধিসত্ত্ব জন্মগ্রহণ করার পর, শুদ্ধোদন তাঁহাকে তাঁহার মায়ের সহিত নিজের বাড়িতে আনিলেন এবং বড়ো বড়ো ব্রাহ্মণ পণ্ডিত দ্বারা তাঁহার জন্মপত্রিকা তৈয়ার করাইলেন। পণ্ডিতরা তাঁহার মধ্যে বত্রিশটি সুলক্ষণ দেখিতে পাইয়া বলিলেন যে, এই জাতক হয় রাজ-চক্রবর্তী হইবে অথবা পূর্ণজ্ঞানশালী হইবে।" এইপ্রকার বর্ণনা আরো অনেক বিস্তারের সহিত জাতকের নিদানকথাতে, ললিতবিস্তরে এবং বুদ্ধচরিতকাব্যে পাওয়া যায়। তৎকালে এইসব লক্ষণের উপর লোকেদের খুব বিশ্বাস ছিল, ইহাতে সন্দেহ নাই। ত্রিপিটক সাহিত্যে

বহুস্থলে এই লক্ষণগুলির বিস্তৃত উল্লেখ দেখা যায়। পোক্‌খরসাতি নামক ব্রাহ্মণ বুদ্ধের শরীরে এই লক্ষণগুলি আছে কিনা দেখিবার জন্য অম্বষ্ঠ নামক এক যুবককে পাঠাইয়াছিলেন। অম্বষ্ঠ তাহাতে ত্রিশটি লক্ষণ দেখিতে পাইল। কিন্তু বাকী দুইটি লক্ষণ তাহার দৃষ্টিগোচর হইল না। তখন বুদ্ধ তাঁহার অলৌকিক ক্ষমতা দ্বারা অম্বষ্ঠকে ঐ লক্ষণ দুইটিও দেখাইলেন।[১] এইভাবে বৌদ্ধসাহিত্যের বহুস্থলে বুদ্ধের জীবনের সহিত এই লক্ষণগুলির সম্বন্ধ দেখানো হইয়াছে। ইহা বুদ্ধের মহত্ত্ব প্রকাশ করিবার জন্য ভক্তজনদের চেষ্টা ছাড়া আর কিছুই নহে। সুতরাং ইহাতে বিশেষ কিছু তথ্য আছে, এইরূপ মানিবার আবশ্যকতা নাই। তথাপি বোধিসত্ত্বের জন্মের পর, অসিতঋষি তাঁহাদের গৃহে আসিয়া তাঁহার জন্মপত্রিকা তৈয়ার করিয়াছিলেন—এই কাহিনীটি অতি প্রাচীন বলিয়া মনে হয়। ইহার বিবরণ সুত্তনিপাতের নালসুত্তের প্রস্তাবনায় দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার সংক্ষিপ্ত আভাস নীচে দিতেছি।

"সুন্দর বস্ত্র পরিধান করিয়া, এবং ইন্দ্রকে সাদর অভ্যর্তনা করিয়া, দেবগণ নিজ নিজ উত্তরীয় আকাশে উড়াইয়া দিয়া, উৎসব করিতেছিলেন। অসিতঋষি তাহাদিগকে উৎসবরত দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই উৎসব কিসের জন্য?" দেবতারা অসিতঋষিকে কহিলেন, "আজ লুম্বিনীগ্রামে শাক্যকুলে বোধিসত্ত্বের জন্ম হইল, এবং এইজন্যই আমরা উৎসব করিতেছি।" ইহা শুনিয়া অসিতঋষি অত্যন্ত বিনীতভাবে শুদ্ধোদনের গৃহে আসিলেন; এবং তিনি নবজাত শিশুকে দেখিতে চাহিলেন। শাক্যগণ বোধিসত্ত্বকে অসিতঋষির নিকটে আনিল। তখন তাঁহার নানা সুলক্ষণ দেখিতে পাইয়া ঋষি উচ্ছ্বাসের সহিত বলিয়া উঠিলেন, "এই শিশু মনুষ্যপ্রাণীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ।" কিন্তু যখন অসিতঋষির মনে পড়িল যে তিনি আর বেশিদিন বাঁচিবেন না, তখন তাহার চোখ হইতে ফোঁটা ফোঁটা জল পড়িতে লাগিল। তাহা দেখিয়া শাক্যরা জিজ্ঞাসা করিল, "নবজাত কুমারের জীবনে কি কোনো বিপদের আশঙ্কা আছে? ঋষি কহিলেন, "এই কুমার পরে সংবুদ্ধ হইবে, কিন্তু আমার আয়ু অতি অল্পই অবশিষ্ট থাকায়, আমি তাঁহার ধর্মোপদেশ শুনিবার সুযোগ পাইব না, সেইজন্য আমার দুঃখ হইতেছে।" এইরূপ কহিয়া তিনি শাক্যদের মনের আশঙ্কা দূর করিলেন, এবং তাহাদিগকে আনন্দিত করিয়া, তিনি সেখানে হইতে চলিয়া গেলেন।"

বোধিসত্ত্বের নাম

"স শাক্যসিংহঃ সর্বার্থসিদ্ধঃ শৌদ্ধোদনিশ্চ সঃ।
গৌতমশ্চার্কবন্ধুশ্চ মায়াদেবীসুতশ্চ সঃ॥"

অমরকোষে বোধিসত্ত্বের এই ছয়টি নাম দেওয়া হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে শাক্যসিংহ, শৌদ্ধোদনি এবং মায়াদেবীসুত, এই তিনটি তাঁহার নামের বিশেষণ, আর অর্কবন্ধু এই শব্দটি তাঁহার গোত্রের নাম। আর বাকী সর্বার্থসিদ্ধ ও গৌতম, এই দুইটির মধ্যে, তাঁহার প্রকৃত নাম কোনটি? অথবা দুইই তাঁহার নাম ছিল কি? মনে এইরূপ প্রশ্ন জাগে।

---

১. "দীঘনিকায় অম্বট্‌ঠসুত্ত।

বোধিসত্ত্বের সর্বার্থসিদ্ধি নাম ছিল বলিয়া ত্রিপিটক-সাহিত্যের কোথাও উল্লেখ দেখা যায় না। জাতকের নিদানকথাতে তাঁহার শুধু সিদ্ধত্থ (সিদ্ধার্থ), এইটুকু নামই ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু ইহাও ললিতবিস্তর হইতে গৃহীত হইয়া থাকিবে। ললিতবিস্তরে লিখিত আছে যে—

'অস্যহি জাতমাত্রেণ মম সর্বার্থাঃ সংসিদ্ধাঃ। যন্ন হমস্য সর্বার্থসিদ্ধ ইতি নাম কুর্যাম্। ততো রাজা বোধিসত্ত্বং মহতা সৎকারণে সৎকৃত্য সর্বার্থসিদ্ধোহয়ং কুমারো নাম্না ভবতু ইতি নামাস্যাকার্ষীৎ।।'

অমরকোষে সর্বার্থসিদ্ধ এই নামই দেওয়া আছে। কিন্তু ললিতবিস্তরে বার বার বোধিসত্ত্বকে সিদ্ধার্থকুমার এই নামেও অভিহিত করা হইয়াছে। আর ইহাই পালিভাষায় 'সিদ্ধত্থ' এই পরিবর্তিত আকার ধারণ করিয়াছে। সর্বার্থসিদ্ধ এই শব্দটির পালিভাষায় সব্বত্থসিদ্ধ এই রূপান্তর হওয়া উচিত ছিল; কিন্তু তাহা শুনিতে অদ্ভুত লাগায়, জাতক অট্‌ঠকথার রচয়িতা সিদ্ধত্থ এই নামটিই ব্যবহার করিয়া থাকিবেন। সুতরাং সর্বার্থসিদ্ধ অথবা সিদ্ধার্থ এই দুইটি নামই ললিতবিস্তরের রচয়িতা অথবা তাহার মতো অন্য কোনো বুদ্ধভক্ত কবির কল্পনা হইতে উদ্ভুত হইয়া থাকিবে।

বোধিসত্ত্বের প্রকৃত নাম যে গোতম ছিল, ইহাতে সন্দেহ নাই। থেরীগাথায় মহাপ্রজাপতি গোতমীর যেসব গাথা আছে, তাহাদের মধ্যে একটি এই—

বহূনং বত অত্থায় মায়া জনয়ি গোতমং।
ব্যাধিমরণতুন্নানং দুক্‌খক্‌খন্ধং ব্যাপানুদি॥

'বহুলোকের কল্যাণের জন্য, মায়া গোতমকে জন্ম দিল। গোতম ব্যাধি ও মরণে জর্জরিত জনসমূহের দুঃখরাশি নাশ করিলেন।'

কিন্তু মহাপদানসুত্তে বুদ্ধকে 'গোতমো গোত্তেন' এইরূপ বলা হইয়াছে। তেমনই অপদান গ্রন্থের অনেক জায়গাতে 'গোতমো নাম নামেন এবং গোতমো নাম গোত্তেন'—এই দুই প্রকারের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা হইতে সংশয় জাগে যে, বোধিসত্ত্বের নাম ও গোত্র কি একই ছিল? কিন্তু সুত্তনিপাতের নিম্নলিখিত গাথাগুলি হইতে এই সংশয় দূর হওয়া সম্ভবপর।

উজুং জানপদো রাজা হিমবন্তস্‌স পসসতো।
ধনবিরিয়েন সম্পন্নো কোসলেসু নিকেতিনো॥
আদিচ্চা নাম গোত্তেন সাকিয়া নাম জাতিয়া।
তম্‌হা কুলা পব্বজিতোহম্‌হি রাজ ন কামে অভিপত্থয়ং

—পব্বজ্জাসুত্ত, গা ১৮-৯৮

(বোধিসত্ত্ব বিম্বিসাররাজকে কহিতেছে)—''হে রাজা, এখান হইতে সোজা হিমালয়ের পাদদেশে একটি ধনবান্ ও শৌর্য-সম্পন্ন দেশ আছে। সেই দেশটি কোসলরাষ্ট্রের অন্তর্গত।

সেখানকার লোকেদের গোত্র আদিত্য, এবং তাহাদিগকে শাক্য বলা হয়। আমি ঐ বংশের লোক। এখন সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইয়াছি। হে রাজা, কামোপভোগের ইচ্ছায়, এই সন্ন্যাস লই নাই।"

ইএ গাথাতে শাক্যদের গোত্র আদিত্য বলিয়া লিখিত আছে। একই কালে কাহারো আদিত্য এবং গোতম, এই দুইটি গোত্র থাকা সম্ভবপর বলিয়া মনে হয় না। যেহেতু বৌদ্ধ সাহিত্যে সুত্তনিপাত সর্বাপেক্ষা প্রাচীন গ্রন্থ, সেইজন্য শাক্যদের প্রকৃত গোত্র 'আদিত্য' বলিয়া মানা ঠিক হইবে। পূর্বে অমরকোষ হইতে যে শ্লোকটি উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতে বুদ্ধের এক নাম অর্কবন্ধু, এইরূপ বলা হইয়াছে। ইহা তাঁহার গোত্রনাম বলিয়া বুঝা সমীচীন হইবে; কারণ এই ব্যাখ্যাই 'আদিচ্চা নাম গোত্তেন' এই বাক্যের সহিত সুন্দর মিলিয়া যায়। বোধিসত্ত্বের প্রকৃত নাম ছিল গোতম এবং বুদ্ধপদ লাভ করার পর তিনি এই নামেই বিখ্যাত হইয়াছিলেন। 'সমণো খলু ভো গোতমো সক্যকুলাপব্বজিতো,' এইরূপ উল্লেখ সুত্তপিটকের কত জায়গাতেই না রহিয়াছে।

বোধিসত্ত্বের সমাধিপ্রীতি

"বোধিসত্ত্বের শৈশবে, একবার তাঁহাকে শুদ্ধোদন রাজার পূর্বনির্দিষ্ট কৃষি উৎসবে লইয়া যাওয়া হয়। সেখানে তাঁহার ধাত্রীরা তাঁহাকে একটি জামগাছের নীচে বিছানায় শোয়াইয়া রাখে। শিশু সিদ্ধার্থ ঘুমাইয়া পড়িয়াছে দেখয়া, ধাত্রীরা তাঁহাকে সেখানে রাখিয়া, উৎসব দেখিতে চলিয়া গেল। ততক্ষণে বোধিসত্ত্ব উঠিয়া আসন করিয়া বসিলেন এবং ধ্যানমগ্ন হইয়া গেলেন। বেশ কিছু সময় কাটিয়া যাওয়ার পর, ধাত্রীরা আসিয়া দেখিল যে, নিকটের অন্যান্য গাছগুলির ছায়া বিপরীত দিকে সরিয়া গিয়াছে, কিন্তু সেই জামগাছটির ছায়া পূর্ববৎ রহিয়াছে! এই আশ্চর্যকর ব্যাপার দেখিয়া রাজা শুদ্ধোদন বোধিসত্ত্বকে নমস্কার করিলেন।" এইটি জাতকের গল্পের সারমর্ম। বোধিসত্ত্বের জীবনের এই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাটিকে একটি অলৌকিক আশ্চর্যকর ব্যাপারের রূপ দেওয়াতে, উহার আর কোনো অর্থ থাকিল না। বাস্তবিক ঘটনা এই রকম বলিয়া মনে হয় যে, বোধিসত্ত্ব তাঁহার পিতার সহিত ক্ষেতে গিয়া, লাঙল চালানো প্রভৃতি কাজ করিতেন এবং বিশ্রামের সময় কোনো জামগাছের নীচে ধ্যান করিতেন।

মজ্ঝিমনিকায়ের মহাসচ্চকসুত্তে ভগবান বুদ্ধ সচ্চককে উদ্দেশ করিয়া বলিতেছেন—

"আমার মনে পড়ে, আমি যখন পিতার সঙ্গে ক্ষেতে কাজ করিতে যাইতাম, তখন জাম গাছের শীতল ছায়ায় বসিয়া, কামোপভোগ ও অশুভ বিচার হইতে মুক্ত হইয়া, যেই ধ্যানে সবিতর্ক, সবিচার ও বিবেকোৎপন্ন প্রীতিসুখ আছে, সেই প্রথম ধ্যানটি আমি করিতাম। ইহাই কি সত্যজ্ঞানের প্রকৃত পথ নয়?" এইভাবে আমার চিন্তা সেই প্রাচীন স্মৃতিকে অনুসরণ করিল; এবং আমার মনে হইল যে, ইহাই জ্ঞানলাভের সেই মার্গ হইবে। হে অগ্গিবেসসন, আমি আমার নিজেকেই বলিলাম, 'যে সুখ কমোপভোগ এবং অশুভ চিন্তার

সহিত অলিপ্ত, সেই সুখকে আমি ভয় করি কেন?' তাহার পর আমি ভাবিলাম, ঐ সুখকে ভয় করা আমার উচিত নয়। কিন্তু (শরীর পীড়ন দ্বারা) দুর্বলীকৃত দেহে এই সুখ লাভ করা সম্ভবপর নয়; সুতরাং আমার পক্ষে পুনরায় প্রয়োজনমত অন্ন গ্রহণ করা উচিত ইহবে।''

সাত বৎসর দৈহিক কৃচ্ছ্র সাধন চালাইবার পর, হঠাৎ তাঁহার পিতার ক্ষেত্রস্থিত ঐ জাম গাছের নীচে বসিয়া বোধিসত্ত্ব যে প্রথম ধ্যানটি সম্পাদন করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার মনে পড়িয়া গেল, এবং উহাই তত্ত্ববোধের প্রকৃত মার্গ হইতে বাধ্য, এইরূপ ধরিয়া লইয়া, তিনি দৈহিক কৃচ্ছ্র সাধন ছাড়িয়া দিলেন, এবং প্রয়োজনমত আহারাদি আরম্ভ করিলেন।

কিন্তু বোধিসত্ত্ব তাঁহার এই ধ্যানটি কাহার নিকট শিখিয়াছিলেন? অথবা এই ধ্যানটি কি তিনি স্বাভাবিকভাবেই করিতে পারিয়াছিলেন? জাতক অট্‌ঠকথার রচয়িতা, ললিতবিস্তরের গ্রন্থকার এবং বুদ্ধচরিতের লেখক—ইঁহারা সকলেই বলিয়াছেন যে, বুদ্ধ অতি অল্প বয়সেই এই ধ্যানটি করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এইজন্য বলিতে হয় যে, এই সামর্থ্য তাঁহার মধ্যে আপনা আপনিই উৎপন্ন হইয়াছিল এবং উহা একটি আশ্চর্যকর অলৌকিক ঘটনা। কিন্তু আমি পূর্বে যে ভরণ্ডুকালামসুত্তটি উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহা বিচার করিয়া দেখিলে এই অদ্ভুত অলৌকিক ঘটনার একটি সহজ ব্যাখ্যা পাওয়া যাইবে। কালামের আশ্রম কপিলবস্তুতে ছিল। সুতরাং বলিতে হইবে যে, শাক্যদের মধ্যে এমন বহু লোক ছিল, যাহারা কালামের সম্প্রদায়ের কথা জানিত। পরে, তাহার সম্বন্ধে আরো খবর দেওয়া হইবে। তাহা হইতে দেখা যাইবে যে, তিনি ধ্যানমার্গাবলম্বী সাধক ছিলেন ও সমাধির সাতটি স্তর শিখাইতেন। ইহাদের মধ্যে, 'প্রথমধ্যান' নামক প্রথম স্তরটি যদি বোধিসত্ত্ব গৃহে থাকাকালেই সম্পাদন করিয়া থাকেন, তাহা হইলে, ইহাতে আশ্চর্যান্বিত হইবার মতো কি আছে? ইহাতে আশ্চর্যকর কিছু থাকিলে, তাহা শুধু এইটুকু যে, অল্প বয়সে চাষবাসের কাজ করিবার সময়ও বোধিসত্ত্বের মনোবৃত্তি ধর্মপ্রবণ ছিল এবং তিনি মাঝে মাঝে ধ্যান সমাধি অভ্যাস করিতেন।

বোধিসত্ত্বের ধ্যানের বিষয়

বোধিসত্ত্বের ধ্যানের বিষয় কী ছিল, তাহা বলা সহজ নয়। যাহাতে মন স্থির করিয়া, প্রথম ধ্যানটি সম্পাদন করিতে হয়, তাহার বিষয়[১] মোট ছাব্বিশটি। ইহাদের মধ্যে বোধিসত্ত্বের ধ্যানের বিষয়টি কী ছিল, যদিও ইহা বলিতে পারা কঠিন, তথাপি তিনি মৈত্রী করুণা, মুদিতা এবং উপেক্ষা, এই চারিটি বিষয়ের মধ্যে কোনো একটি বিষয়ের ধ্যান করিতেন বলিয়া অনুমান করিলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। কেননা, এইগুলি তাঁহার প্রেমল স্বভাবের অনুরূপ। তাহা ছাড়া, এইরূপ মানিবার স্বপক্ষে অপর একটি প্রমাণও পাওয়া যায়। তাহা এইরূপ ঃ ''কোলিয়দেশে যখন ভগবান বুদ্ধ কোলিয়দের হরিদ্রবসন নামক শহরের নিকটে

১. বুদ্ধঘোষাচার্যের ও অভিধর্মের মতে বিষয়গুলির সংখ্যা ২৫। কিন্তু উপেক্ষা সম্বন্ধেও প্রথম ধ্যানটি সম্পাদিত হইতে পারে, এইরূপ ধরিয়া লইলে, বিষয়গুলির সংখ্যা ২৬ হইবে। দ্রষ্টব্য ঃ সমাধি মার্গ, পৃ. ৬৮-৬৯।

থাকিতেন, ঐ সময় একদিন তাঁহার কয়েকজন ভিক্ষু সকালবেলা ভিক্ষায় বাহির হওয়ার পূর্বে, অন্য এক পন্থের পরিব্রাজকদের বাগানে বেড়াইতে গেল। তখন ঐ পরিব্রাজকরা তাহাদিগকে বলিল, 'আমরা আমাদের শ্রাবকদিগকে এই উপদেশ দিয়া থাকি, 'বন্ধুগণ, চিত্তের উপক্লেশ ও দুর্বলকারী যে পাঁচটি নীবরণ[১] আছে, সেইগুলি পরিত্যাগ করিয়া, তোমরা মৈত্রীযুক্ত চিত্তে একদিন ভরিয়া ফেল। ঐ ভাবে, উপরে, নীচে ও চারিদিকে সমস্ত জগৎ তোমাদের বিশাল, শ্রেষ্ঠ, অসীম, শত্রুতাহীন, দ্বেষহীন, ও মৈত্রীপূর্ণ চিত্তদ্বারা ভরিয়া ফেল, করুণাপূর্ণ চিত্তদ্বারা........মুদিতাপূর্ণ চিত্তদ্বারা......উপেক্ষাপূর্ণ চিত্তদ্বারা ভরিয়া ফেল।' শ্রমণ গোতমও এই উপদেশ দেয়। তাহা হইলে, তাহার ও আমাদের উপদেশের মধ্যে পার্থক্য কি?''—(বোজ্ঝঙ্গসংযুক্ত, বগ্‌গ ৬ সুত্ত ৪)

জাতক অট্‌ঠকথাতে ও অন্যান্য অট্‌ঠকথার বহু স্থলে দেখা যায় যে, শাক্য ও কোলিয়ারা পরস্পরের প্রতিবেশী, এবং তাহাদের মধ্যে নিকট সম্বন্ধ ছিল; আর মাঝে মাঝে রোহিণী নদীর জল লইয়া তাহাদের মধ্যে ঝগড়া হইত। এই কোলিয়দের রাজ্যে অন্য কোনো পন্থের পরিব্রাজকরা বৌদ্ধসংঘের ভিক্ষুদিগকে উপরিলিখিত প্রশ্নটি করিয়াছিলেন। এইসব পরিব্রাজক নিশ্চয়ই সেখানে বহু বৎসর যাবৎ বাস করিতেছিল। বুদ্ধ যখন ধর্মোপদেশ দিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহার পর যে এই পরিব্রাজকদের আশ্রম স্থাপিত হইয়াছিল, এমন নহে; সেটি নিশ্চয়ই পূর্ব হইতেই সেখানে ছিল। এবং এই পরিব্রাজকরা মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষা, এই চারিটি ব্রহ্মবিহারে ভাবনা করিতে উপদেশ দিত।[২] সুতরাং তাহারা কালামের পন্থের পরিব্রাজক ছিল, এইরূপ বুঝিলে আপত্তির কারণ কি? অন্ততঃ, এই ব্রহ্মবিহারগুলি বোধিসত্ত্ব অল্প বয়স হইতেই জানিতেন, এবং ইহাদের উপর মন স্থির করিয়া তিনি প্রথম ধ্যানটি অভ্যাস করিতেন, এইরূপ বলিবার পক্ষে কোনো বাধা নাই।

বোধিসত্ত্বের গৃহত্যাগের কি কি কারণ?

বোধিসত্ত্বের জীবনে ইহার পরই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হইতেছে তাঁহার নিজ প্রাসাদ হইতে উদ্যানের দিকে গমন। মহারাজ শুদ্ধোদন এইরকম বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন, যাহাতে বোধিসত্ত্বের চলার পথে কোনো বৃদ্ধ, রুগ্‌ণ, কিংবা মৃত ব্যক্তি না আসিতে পারে, তথাপি দেবতারা একটি বৃদ্ধ নির্মাণ করিয়া তাঁহার দৃষ্টিপথে রাখিলেন, আর বোধিসত্ত্ব উদাসমনে সেখান হইতে নিজ প্রাসাদে ফিরিয়া গেলেন। দ্বিতীয় বার দেবতারা তাঁহার সম্মুখে একটি রুগ্‌ণ, তৃতীয় বার একটি মৃত এবং চতুর্থ বার একটি পরিব্রাজক নির্মাণ করিয়া রাখিয়া গেলেন; তাহাতে বোধিসত্ত্বের পূর্ণ বৈরাগ্য হইল; এবং তিনি গৃহত্যাগ করিয়া, তত্ত্বলাভের পথ খুঁজিয়া বাহির করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ললিতবিস্তরাদি গ্রন্থে এই ঘটনার অত্যন্ত রসাল বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। এইগুলি যে সর্বাংশে গ্রহণযোগ্য নয়, তাহা অবশ্যই বলিতে হইবে। যদি ইহা ঠিক হয় যে বোধিসত্ত্ব তাহার পিতার সঙ্গে অথবা নিজেই ক্ষেতে গিয়া কাজ করিতেন, এবং আলার কালামের আশ্রমে গিয়া তাহার দার্শনিকতত্ত্ব শিখিতেন, তাহা

১. সমাধিমার্গ, পৃ. ৩১-৩৫।

২. 'সমাধিমার্গের পঞ্চম পরিচ্ছেদে এই চারিটি ব্রহ্মবিহারের ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে।

হইলে তিনি যে উপরি বর্ণিত ঘটনার আগে কখনো বৃদ্ধ রুগ্‌ণ ও মৃত মানুষ দেখেন নাই, ইহা কি করিয়া সম্ভবপর হইতে পারে?

শেষ দিন বোধিসত্ত্ব যখন উদ্যানে গেলেন, তখন "দেবতারা একটি সুন্দর পরিব্রাজক নির্মাণ করিয়া তাঁহার দৃষ্টির সম্মুখে আনিয়া রাখিলেন। তখন বোধিসত্ত্ব সারথিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এই ব্যক্তি কে?' যদিও বোধিসত্ত্ব তখনো বুদ্ধ না হওয়ায়, ঐ সময় সারথি পরিব্রাজক অথবা পরিব্রাজকের ধর্ম সম্বন্ধে কিছুই জানিত না, তথাপি দেবতাদের প্রভাবে সে বলিল, 'এই ব্যক্তি পরিব্রাজক'; আর তাহার পর সে সন্ন্যাসের গুণধর্ম বর্ণনা করিল"— জাতক অট্‌ঠকথার রচয়িতা এইরূপ বলিয়াছেন। কিন্তু যদি এই কথা সত্য হয় যে কপিলবস্তুতে ও শাক্যদের সন্নিহিত রাজ্যে পরিব্রাজকদের আশ্রম ছিল, তাহা হইলে পরিব্রাজক সম্বন্ধে বোধিসত্ত্ব অথবা সারথি কিছুই জানিত না, ইহা আশ্চর্যকর নয় কি?

অঙ্গুত্তরনিকায়ের চতুক্কনিপাতে (সুত্ত ১৯৫) বপ্প শাক্যের কাহিনী আছে। সে নির্গ্রন্থ (জৈন) শ্রাবক ছিল। একদিন তাহার সহিত মহামোগগল্লানের কথাবার্তা হইতেছিল, এমন সময় ভগবান বুদ্ধ সেখানে আসিলেন, এবং বপ্পকে উপদেশ দিলেন। তখন বপ্প কহিল, "নির্গ্রন্থদের উপাসনাপ্রণালীদ্বারা আমার কিছুই লাভ হয় নাই। এখন আমি আপনার উপাসক হইব।" অট্‌ঠকথার রচয়িতা বলিয়াছেন যে, বপ্প ভগবান বুদ্ধের কাকা ছিলেন। এই কথা মহাদুক্‌খক্‌খন্ধ সুত্তের অট্‌ঠকথার সহিত মিলে না। সে যাহাই হউক, ইহাতে সন্দেহ নাই যে, বপ্প নামক একজন বয়োবৃদ্ধ শাক্য জৈন ছিল। অর্থাৎ বোধিসত্ত্বের জন্মের পূর্বেই শাক্যদেশে জৈনধর্ম প্রসার লাভ করিয়াছিল। সুতরাং বোধিসত্ত্ব যে পরিব্রাজক সম্বন্ধে কিছু জানিতেন না, ইহা মোটেই সম্ভবপর নয়।

তাহা হইলে, এইসব আশ্চর্যকর গল্প কোথা হইতে বুদ্ধের জীবনে ঢুকিল? মহাপদানসুত্ত হইলে।[১] বৃদ্ধ মানুষ্যটিকে দেখিয়া বোধিসত্ত্ব যে তাঁহার সারথিকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, সে সম্বন্ধে জাতক অট্‌ঠকথার রচয়িতা বলেন, "মহাপদানে আগতনয়েন পুচ্ছিত্বা"

---

১. অপদান (স অবদান) মানে সচ্চরিত্র। যেসব সুত্তে মহৎলোকদের সচ্চরিত্রের বর্ণনা আছে, সে সব মহাপদানসুত্ত। ইহাতে পূর্বযুগের ছয়জন বুদ্ধ এবং বর্তমান যুগের গৌতম বুদ্ধ, মোট এই সাতজন বুদ্ধের জীবনী প্রথমদিকে সংক্ষেপতঃ বর্ণনা করিয়া, পরে বিপসসীবুদ্ধের জীবনচরিত সবিস্তারে বর্ণনা করা হইয়াছে। অট্‌ঠকথার রচয়িতা বলেন যে, এই মহাপদানসুত্তটি নমুনা ও আদর্শরূপে গ্রহণ করিতে হইবে, এবং অন্যান্য বুদ্ধদেব জীবনচরিতও এইভাবেই বর্ণনা করিতে হইবে। এই বর্ণনার অধিকাংশ এই সুত্তটি রচিত হইবার আগে বা পরে বুদ্ধের জীবনীতে ঢুকানো হইয়াছে; আর প্রত্যক্ষ ত্রিপিটকে ইহা ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় পাওয়া যায় উদ্যানদর্শনের অংশটি কিন্তু ত্রিপিটকে নাই। এইটি জাতক অট্‌ঠকথার রচয়িতা বাদ দিয়াছেন। তৎপূর্বে ললিতবিস্তারে এবং বুদ্ধচরিতকাব্যে এই কাহিনীটি সমাবিষ্ট হইয়াছিল। গোতম বোধিসত্ত্বের জন্য তিনটি প্রাসাদ নির্মাণ করা হইয়াছিল, এই কাহিনীটি আমি এককালে ঐতিহাসিক বলিয়া মনে করিতাম। কিন্তু ইহাও কাল্পনিক হইবে; কারণ নিজে খাটিয়া ক্ষেতের কাজ করেন, শুদ্ধোদনের ন্যায় এমন ছোটোখাটো জমিদার যে ছেলের জন্য তিনটি প্রাসাদ নির্মাণ করিবেন, তাহা সম্ভবপর নয়।

পরলোকগত চিন্তামন বৈজনাথ রাজবাড়ে-কর্তৃক অনুদিত 'দীঘনিকায়ের' দ্বিতীয় ভাগের প্রারম্ভে মহাপদানসুত্তের মারাঠী অনুবাদ আছে। অনুসন্ধিৎসু পাঠকগণ তাহা নিশ্চয়ই পড়িবেন। (এই অনুবাদের প্রকাশক, "গ্রন্থসম্পাদক ও প্রকাশকমণ্ডলী," ৩৮০ ঠাকুরদ্বার রোড় বোম্বাই-২)।

(মহাপদানসুত্তে কাহিনীটি যে ভাবে পাওয়া যায়, তদনুসারে প্রশ্ন করিয়া)। অর্থাৎ এইসব অলৌকিক গল্প মহাপদানসুত্ত হইতে গৃহীত হইয়াছে, এইরূপ বলিতে হইবে।

তাহা হইলে প্রশ্ন উঠে, বোধিসত্ত্বের গৃহত্যাগের কারণ কী হইতে পারে? ইহার উত্তর অত্তদণ্ডসুত্তে স্বয়ং ভগবান্ বুদ্ধই দিতেছেন :

অত্তদণ্ডা ভয়ং জাতং, জনং পস্সথ মেধকং।
সংবেগং কিত্তয়িস্সামি যথা সংবিজিতং ময়া॥১
ফন্দমানং পজং দিস্বা মচ্ছে অপ্পোদকে যথা।
অঞ্ঞমঞ্ঞেহি ব্যারুদ্ধে দিস্বা মং ভয়মাবিসি॥২
সমন্তমসরো লোকো, দিসা সব্বা সমেরিতা।
ইচ্ছং ভবনমত্তনো নাদ্দসাসিং অনোসিতং।
ওসানে ত্বেব ব্যারুদ্ধে দিস্বা মে অরতী অহু॥৩

১. অস্ত্রধারণ ভয়াবহ মনে হইল। (অস্ত্রধারণ করাতে) এই জনসমুদায় কি রকমভাবে কলহ করিতেছে দেখ! আমাতে সংবেগ (বৈরাগ্য) কিভাবে উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহা বলিতেছি।

২. কম জলে যেমন মাছগুলি ছট্‌ফট্ করে, তদ্রূপ পরস্পরের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া ছট্‌ফট্ করিতেছে এইরকম জনসাধারণের দিকে তাকাইয়া, আমার অন্তঃকরণে ভয় ঢুকিল। চারিদিকে সমস্ত জগৎ অসার দেখাইতে লাগিল। সর্বদিক কম্পিত হইতেছে, আমার এইরূপ মনে হইল; তাহাতে আশ্রয়ের জায়গা খুঁজিয়া, আমি কোথাও ভীতিশূন্য স্থান পাইলাম না। কারণ, শেষ পর্যন্ত সর্বজনতা পরস্পরের বিরোধিতা করিতেছে দেখিয়া, আমাতে বৈরাগ্য উৎপন্ন হইল।

রোহিণী নদীর জল লইয়া শাক্য ও কোলিয়রা পরস্পরের সহিত কলহ করিত; একবার উভয়েই নিজ নিজ সৈন্যদল সজ্জিত করিয়া রোহিণী নদীর তীরে আনিল; আর ঐ সময়, ভগবান বুদ্ধ উভয় সৈন্যের মধ্যে আসিয়া তাহাদিগকে উপদেশ দিতে গিয়া এই সুত্তটি বলিলেন, জাতক অট্‌ঠকথার অনেক জায়গায় এইরূপ বর্ণনা আছে। কিন্তু এই বর্ণনা ভ্রান্ত বলিয়া মনে হয়। হয়তো ভগবান্ বুদ্ধ শাক্য ও কোলিয়দিগকে এইরকম উপদেশ দিয়াছিলেন। আর হয়তো তিনি তাহাদের ঝগড়াও মিটাইয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু উক্ত প্রসঙ্গে এই সুত্তটি বলিবার কোনো কারণ দেখা যায় না। ইহাতে ভগবান্ বুদ্ধ তাঁহার কি করিয়া বৈরাগ্য হইল এবং তিনি কেন ঘর হইতে বাহির হইলেন, তাহাই বলিতেছেন। রোহিণী নদীর জলের জন্য, কিংবা তৎসদৃশ অন্য কোনো কারণে, শাক্য ও কোলিয়দের ঝগড়া হইত। এবং এই ধরণের প্রসঙ্গে, তিনি অস্ত্র গ্রহণ করিবেন কিনা, এই প্রশ্ন বোধিসত্ত্বের মনে আসিয়া থাকিবে। কিন্তু অস্ত্রদ্বারা এইসব কলহ মিটানো সম্ভবপর ছিল না। শাক্য ও কোলিয়দের ঝগড়া বলপ্রয়োগ দ্বারা মিটাইলেও তাহা ঠিক ঠিক মিটিত না। কারণ ঝগড়া মিটাইবার জন্য পুনরায় প্রতিবেশী রাজার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করা প্রয়োজন হইত। আর তাহাকে যুদ্ধে পরাজিত করিলেও, তাহার নিকটবর্তী অন্য রাজাকেও পরাভূত করা প্রয়োজন

হইত। সুতরাং অস্ত্রধারণ করায়, যুদ্ধে সর্বত্র জয়লাভ করা ছাড়া গত্যন্তর থাকিত না। কিন্তু এইভাবে জয়লাভ করিলেও, শান্তি কোথা হইতে পাওয়া সম্ভবপর হইত? পসেনদি কোসল ও বিম্বিসার, ইহাদের পুত্ররাই তো ইহাদের শত্রু হইয়াছিল। তবে অস্ত্রধারণে আর লাভ কি? শেষ পর্যন্ত ঝগড়া করিতে থাকা—শুধু এইটুকু। অস্ত্রশস্ত্র দ্বারা কলহ মিটাইবার এই উপায়ের প্রতি প্রেমল-স্বভাব বোধিসত্ত্বের বিরক্তি ধরিয়াছিল ও তাই তিনি অস্ত্রসংবরণের পথ গ্রহণ করিলেন।

সুত্তনিপাতের পব্বজ্যাসুত্তের প্রারম্ভেই নিম্নলিখিত গাথা কয়টি আছে ঃ

পব্বজং কিত্তয়িস্‌সামি, যথা পব্বজি চক্‌খু মা,
যথা বীমংসমানো সো পব্বজং সমরোচয়ি॥১
সংবাধোহয়ং ঘরাবাসো রজস্‌সায়তনং ইতি।
অব্ভোকাসো চ পব্বজ্জা ইতি দিস্বান পব্বজি॥২

১. চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তি কেন সন্ন্যাস গ্রহণ করিল, এবং কেন তাহার উহা ভালো লাগিল এই কথা বলিয়া আমি (তাহার) সন্ন্যাস বর্ণনা করিতেছি।

২. গৃহস্থাশ্রম হইতেছে অত্যন্ত বিঘ্নসংকুল ও আবর্জনাময় স্থান; এবং সন্ন্যাস হইতেছে মুক্ত বাতাস, এইরূপ বুঝিতে পারিয়া, ঐ ব্যক্তি পরিব্রাজক হইয়াছিল।

এই কথাগুলির মূল ভিত্তি মহাসচ্চকসুত্তে পাওয়া যায়। সেখানে ভগবান বলিতেছেন, "হে অগিবেস্সন, আমি সম্বোধি লাভের পূর্বে যখন বোধিসত্ত্ব ছিলাম তখন আমার মনে হইয়াছিল, 'গৃহস্থাশ্রম হইতেছে সংকট ও আবর্জনার জায়গা। সন্ন্যাস হইতেছে বিমুক্ত হাওয়া। গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া পূর্ণ ও শুদ্ধ ব্রহ্মচর্য পালন করা সম্ভবপর নয়। তাই মাথা মুণ্ডন করিয়া, ঘর ছাড়িয়া সন্ন্যাসী হওয়া সমীচীন।"

কিন্তু অরিয়পরিয়েসন সুত্তে ইহা অপেক্ষা কিছুটা ভিন্ন রকমের কারণ দেওয়া হইয়াছে। সেখানে ভগবান বুদ্ধ বলিতেছেন, "হে ভিক্ষুগণ, সম্বোধিজ্ঞান লাভের পূর্বে, বোধিসত্ত্ব থাকা কালেই, আমি যখন নিজে জন্মধর্মী ছিলাম, তখন জন্মের আবর্তে পতিত পদার্থসমূহের (পুত্র, দারা, দাস, দাসী, ইত্যাদির) পিছনে ছুটিতাম। (অর্থাৎ আমার সুখ উহাদের উপর নির্ভর করে, আমি এইরূপ মনে করিতাম) নিজে যখন জরাধর্মী ছিলাম, ব্যাধিধর্মী ছিলাম, মরণধর্মী ছিলাম, শোকধর্মী ছিলাম, তখন আমি জরা, ব্যাধি, মরণ, শোক, এইগুলির আবর্তে পতিত পদার্থসমূহের পশ্চাৎ ধাবিত হইতাম। তখন আমার মনে এইরূপ বিচার আসিল যে, আমি নিজেই যখন জন্ম, জরা, মরণ, ব্যাধি ও শোকে আক্রান্ত তখন এইগুলি দ্বারা আক্রান্ত যে দারা, পুত্র ইত্যাদি, তাহাদের পশ্চাৎ ধাবিত হওয়া আমার পক্ষে ঠিক নহে, অতএব এই জন্ম, জরা প্রভৃতি হইতে যে ক্ষতি হয়, তাহা উপলব্ধি করিয়া, এখন আমার উচিত হইবে অজাত, অজর, ব্যাধিহীন, অমর ও অশোক এমন যে পরম শ্রেষ্ঠ নির্বাণ পদ, তাহা খুঁজিয়া বাহির করা।"

এইভাবে বোধিসত্ত্বের সন্ন্যাস গ্রহণের তিনটি কারণ দেওয়া হইয়াছে ঃ

১. তাঁহার আত্মীয় স্বজনরা পরস্পরের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য অস্ত্রধারণ করাতে, তাঁহার মনে ভীতি উৎপন্ন হইয়াছিল;

২. তাঁহার নিজের গৃহ বিঘ্নসংকুল ও আবর্জনার স্থান বলিয়া মনে হইয়াছিল;

৩. তাঁহার মনে হইল যে, তিনি নিজে জন্ম, জরা, মরণ ও ব্যাধির সহিত জড়িত থাকা কালে, ঐ রকম বস্তুর প্রতি তাঁহার আসক্তি থাকা যোগ্য নয়। সন্ন্যাস গ্রহণের এই তিনটি কারণই সমর্থন করা সম্ভবপর।

বোধিসত্ত্বের জ্ঞাতি শাক্য ও কোলিয়দের মধ্যে কলহ বাধিয়াছিল; এই প্রসঙ্গে উক্ত কলহে তিনি নিজে জড়িত হইবেন কিনা, এইরূপ প্রশ্ন বোধিসত্ত্বের সম্মুখে উপস্থিত হইল। তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, মারামারি দ্বারা এই বিবাদ মিটিবার নহে। কিন্তু যদি তিনি এই বিবাদে সংশ্লিষ্ট না থাকেন, তাহা হইলে লোকে তাঁহাকে ভীরু বলিবে, এবং তিনি গৃহস্থ হইয়াও গৃহস্থের ধর্ম পালন করিলেন না, এইরূপ হইবে। অবশ্য গৃহস্থাশ্রম তাঁহার নিকট বিঘ্নসংকুল বলিয়া মনে হইতেছিল। তাহা অপেক্ষা সন্ন্যাসী হইয়া নিরাসক্তভাবে বনে জঙ্গলে ঘুরিয়া বেড়াইলে খারাপ কি? কিন্তু স্ত্রী ও পুত্রের প্রতি তাঁহার খুব ভালবাসা থাকায়, গৃহত্যাগ করাও তাঁহার পক্ষে বেশ কঠিন ছিল। সুতরাং তাঁহাকে এই বিষয়ে আরো বিচার করিতে হইল। তিনি ভাবিলেন, 'আমি নিজে জন্ম, জরা, ব্যাধি, মরণ ধর্মী হওয়া সত্ত্বেও, ঐরূপ ধর্ম-যুক্ত দারাপুত্র প্রভৃতিতে আসক্ত হইয়া বিঘ্ন ও জঞ্জালে ভরা এই গৃহস্থাশ্রমে পড়িয়া থাকা আমার উচিত নয়।' শাক্য ও কোলিয়দের মধ্যে কলহ ও মারামারি যে এই তিনটি কারণের মধ্যে সর্বপ্রধান, তাহা মনে রাখিলে, বোধিসত্ত্ব পরে বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইয়া যে মধ্যমমার্গ আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তাহার অর্থ ঠিক ঠিক বুঝা যাইবে।

পুত্র রাহুল

ত্রিপিটকের বহু জায়গায় দেখিতে পাওয়া যায় যে, বোধিসত্ত্বের অল্প বয়সে বিবাহ হইয়াছিল, এবং গৃহত্যাগ করিবার পূর্বে তাঁহার রাহুল নামে একটি ছেলে জন্মিয়াছিল। জাতকের নিদানকথাতে এইরূপ বলা হইয়াছে যে, যেদিন রাহুল জন্মিয়াছিল, সেইদিন রাত্রিতে বোধিসত্ত্ব গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন। কিন্তু অন্যান্য অট্ঠকথার রচয়িতাদের মত এইরকম দেখা যায় যে, বালক রাহুলের জন্মের সপ্তম দিনে, বোধিসত্ত্ব গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রাচীন বৌদ্ধ সাহিত্যে এই দুইটি মতের কোনোটিরই ভিত্তি পাওয়া যায় না। এইটুকু অবশ্য নির্বিবাদ যে, বোধিসত্ত্ব গৃহত্যাগ করিবার পূর্বে তাঁহার রাহুল নামক একটি ছেলে ছিল। মহাবগ্গে এবং অন্যান্য কোনো কোনো স্থলে, এইরূপ বিবরণ দেখা যায় যে, বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হওয়ার পর, গোতম বোধিসত্ত্ব কপিলবস্তুতে ফিরিয়া যান, এবং ঐ সময় তিনি রাহুলকে দীক্ষা দেন। অট্ঠকথার বহুস্থলে বলা হইয়াছে যে, ঐ সময় রাহুলের বয়স সাত বৎসর ছিল। রাহুলকে ভগবান বুদ্ধ 'শ্রামণের' করিয়া ছিলেন কিনা এবং তখন তাহার বয়স কত ছিল, ইত্যাদি আলোচনা এই বইয়ের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ করা হইবে। কেননা, 'শ্রামণের' ভিক্ষু সংঘের সহিত সম্বন্ধ।

রাহুলমাতা "দেবী"

রাহুলের জননীকে মহাবগ্‌গ এবং জাতক অট্‌ঠকথার সর্বত্র 'রাহুলমাতা দেবী' বলা হইয়াছে। তাহার যসোধরা (যশোধরা) নামটি শুধু অপদান গ্রন্থে পাওয়া যায়। জাতকের নিদান কথাতে লিখিত হইয়াছে, "যে সময় আমাদের বোধিসত্ত্ব লুম্বিনী বনে জন্মগ্রহণ করিলেন, ঠিক সেই সময় রাহুলমাতা দেবী, 'ছন্নু' অমাত্য, 'কালুদায়ি' (কালা উদায়ি) অমাত্য, অশ্বরাজ 'কন্‌থা,' (বুদ্ধগয়ার) মহা বোধিবৃক্ষ এবং চারিটি নিধিকুম্ভ (ভালো ভালো দ্রব্যে ভরা কলস) উৎপন্ন হইল।" ইহাদের মধ্যে বোধিবৃক্ষটি ও নিধিকলসগুলি ঠিক ঐ সময়েই উৎপন্ন হইয়াছিল, এই কথাটুকু নিছক পৌরাণিক গল্প বলিয়া বুঝিতে হইবে। কিন্তু বোধিসত্ত্ব, রাহুলমাতা ছন্ন ও কালাউদায়ি, ইহারা একই সময়ে জন্মগ্রহণ না করিয়া থাকিলেও, সমবয়স্ক ছিল, এইরূপ মানিতে কোনো আপত্তি নাই। খুব সম্ভবতঃ ৭৮ বৎসর বয়সে, অর্থাৎ বুদ্ধের পরিনির্বাণের দুই বছর পূর্বে রাহুলমাতার দেহবসান হইয়াছিল। অপদানে (৫৮৪) রাহুলমাতা বলিতেছেন,

অট্‌ঠসত্ততিবস্সাহং পচ্ছিমো বত্ততি ভবো

....

পহায় বোগমিস্সামি কতম্মে সরণ মত্তনো॥

"আমি আজ ৭৮ বছরের হইয়াছি। ইহাই আমার শেষ জন্ম। আমি তোমাদিগকে ছাড়িয়া যাইব। আমি আমার মুক্তি সম্পাদন করিয়াছি।"

উপরের অপদানটিতে তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে, তাঁহার এই শেষ জন্মে তিনি শাক্যকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার পিতৃকুলের কোনো খবর কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই। তিনি অনেক বৎসর ভিক্ষুণী ছিলেন এবং আটাত্তর বছর বয়সে বুদ্ধের নিকট গিয়া উপরিলিখিত কথাগুলি বলিয়াছিলেন, অপদানের লেখক এইরকম বলিতে চান বলিয়া মনে হয়। কিন্তু ভিক্ষুণী হওয়ার পর, তিনি কোনো উপদেশ দিয়াছিলেন, অথবা বৌদ্ধ সংঘের সহিত তাঁহার কোনো সম্বন্ধ ছিল, এইরকম কথা কোথাও পাওয়া যায় না। সুতরাং তিনি সত্য সত্যই ভিক্ষুণী হইয়াছিলেন কিনা, ইহাও নিশ্চয়ের সহিত বলা কঠিন। অপদান গ্রন্থে তাঁহার নাম যশোধরা, আর ললিতবিস্তরে গোপা বলিয়া লিখিত আছে। সুতরাং এই দুইটির মধ্যে তাঁহার প্রকৃত নাম কোন্‌টি, অথবা এই দুইটি নামই তাঁহার ছিল কিনা, তাহা বুঝিতে পারা যায় না।

গৃহত্যাগের প্রসঙ্গ

বোধিসত্ত্ব তাঁহার গৃহত্যাগের দিন রাত্রিতে নিজ প্রাসাদে উপবিষ্ট ছিলেন। তাঁহার পরিবারস্থ গায়িকারা গীতবাদ্য প্রভৃতির দ্বারা তাঁহার মনোরঞ্জন করিবার জন্য খুব চেষ্টা করিল। কিন্তু বোধিসত্ত্ব ইহাতে আনন্দ পাইলেন না। শেষে ঐ নারীরা পরিশ্রান্ত হইয়া ঘুমাইয়া পড়িল। উহাদের মধ্যে কেহ কেহ ঘুমের ভিতর নানা রকম বকিতেছিল; কাহারো কাহারো মুখ

হইতে লালা বাহির হইতেছিল। এইসব দেখিয়া, বোধিসত্ত্বের খুব ঘৃণা হইল, এবং নীচে গিয়া তিনি সারথি ছন্নকে ডাকিয়া তুলিলেন। ছন্ন কন্থক নামক ঘোড়াটিকে সাজাইয়া আনিল। বোধিসত্ত্ব তাহার উপর চড়িলেন এবং ছন্ন ঘোড়ার লেজ ধরিয়া বসিল। দেবতারা তাহাদের দুই জনের জন্য নগর দ্বার খুলিয়া দিলেন। তাহারা বাহিরে গিয়া, উভয়ে অনোমা নামক নদীর তীরে আসিল। সেখানে বোধিসত্ত্ব নিজের তরবারি দিয়া নিজের চুল কাটিয়া ফেলিলেন, আর গায়ের সব অলংকার ছন্নের কাছে রাখিয়া, রাজগৃহে চলিয়া গেলেন। বোধিসত্ত্ব চলিয়া যাওয়ায়, কন্থক অনোমা নদীতে দেহ বিসর্জন করিল। আর সারথি ছন্ন অলংকার সঙ্গে লইয়া কপিলবস্তুতে ফিরিয়া গেল।

এইটি নিদানকথার গল্পের সারমর্ম। নিদানকথা, ললিতবিস্তর এবং বুদ্ধ চরিত-কাব্যে এই প্রসঙ্গের রসাল বর্ণনা পাওয়া যায়, আর বৌদ্ধচিত্রকলায় এই সব বর্ণনার অতি সুন্দর ফল ফলিয়াছে; কিন্তু ইহাদের ভিতর কিছুই নাই, অথবা থাকিলেও তাহা খুবই অল্প হইবে। কেননা, প্রাচীনতর সুত্তসমূহে এইরকম অসম্ভব পৌরাণিক গল্পের কোনো ভিত্তি দেখিতে পাওয়া যায় না।

অরিয়পরিয়েসনসুত্তে স্বয়ং ভগবান্ বুদ্ধ তাঁহার গৃহত্যাগের ঘটনাটি বর্ণনা করিয়াছেন। তাহা এইরূপ—

সো খো অহং ভিক্খবে অপরেন সময়েন দহরো ব সমানো সুসু কালকেসো ভদ্রেন যোব্বনেন সমন্নাগতো পঠমেন বয়সা অকামকানং মাতা-পিতুন্নং অস্সুমুখানাং রুদন্তানং কেসমস্সুং ওহারেত্বা কাসাবানি বত্থানি অচ্ছাদেত্বা অগারস্মা অনগারিয়ং পব্বজিং।

"হে ভিক্ষুগণ, যদিও আমার তখন তরুণ বয়স, আমার একটি চুলও পাকে নাই, আমি পূর্ণ যৌবনাবস্থায় ছিলাম এবং আমার পিতামাতা আমাকে অনুমতি দিতেছিলেন না, ও চোখের জলে তাঁহাদের মুখ ভিজিয়া গিয়াছিল, আর তাঁহারা অনবরত কাঁদিতেছিলেন, তথাপি (এসব গ্রাহ্য না করিয়া) আমি এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে, কিছুকাল পর, মাথা মুড়াইয়া, কাষায় বস্ত্র দ্বারা দেহ আচ্ছাদন করিয়া, ঘরের বাহির হইয়া পড়িলাম (আমি সন্ন্যাসী হইলাম)।"

উপরের এই উদ্ধৃতাংশটিই অবিকল এই আকারে মহাসচ্চকসুত্তে পাওয়া যায়। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, বোধিসত্ত্ব বাড়ির লোকদিগকে কিছু না জানাইয়া সারথি ছন্নের সহিত অশ্ব-কন্থকের পিঠে চড়িয়া পলাইয়া গিয়াছিলেন, এই কথা একেবারেই ভুল। যদিও বোধিসত্ত্বের আপন মা মায়াদেবী তাঁহার জন্মের সাত দিন পরেই মারা যান, তথাপি মহাপ্রজাপতী গোতমী তাঁহাকে নিজের সন্তানের মতো পালন করিয়াছিলেন। উপরের উদ্ধৃত অংশটিতে উঁহাকেই ভগবান বুদ্ধ মা বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকিবেন। এই উদ্ধৃতাংশটি হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, বোধিসত্ত্ব যে সন্ন্যাসী হইবেন, তাহা শুদ্ধোদন ও গোতমী অনেক দিন হইতেই জানিতেন, আর বোধিসত্ত্ব তাঁহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে এবং তাঁহাদের সমক্ষেই সন্ন্যাস লইয়াছিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

তপস্যা ও তত্ত্ববোধ

আলার কালামের সহিত সাক্ষাৎ

জাতকের নিদানকথাতে দেখা যায় যে, ঘর ছাড়িয়া বোধিসত্ত্ব সোজাসুজি রাজগৃহে গেলেন, সেখানে তাঁহার সহিত বিম্বিসার রাজার সাক্ষাৎ হইল, এবং তাহার পর তিনি আলার কালামের কাছে গিয়া তাহার দার্শনিক তত্ত্ব শিক্ষা করিলেন। অশ্বঘোষ-প্রণীত বুদ্ধজীবনচরিত নামক কাব্যে নিদানকথার এই ক্রমটিই গৃহীত হইয়াছে। ''বোধিসত্ত্ব প্রথমে বৈশালীতে গেলেন, এবং সেখানে তিনি আলার কালামের শিষ্য হইলেন, তাহার পর তিনি রাজগৃহে গেলেন, সেখানে বিম্বিসার রাজা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করার পর তিনি উদ্রক রামপুত্রের নিকট গেলেন''—ললিতবিস্তরে এইরূপ বিস্তৃত বিবরণ রহিয়াছে। কিন্তু এই দুইটি বর্ণনার কোনোটিই প্রাচীন সুত্তের সহিত মিলে না। উপরে আর্য পরিয়েসনসুত্ত হইতে যে অংশটি উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতে বলা হইয়াছে যে বোধিসত্ত্ব গৃহে থাকা কালেই নিজ পিতামাতার সম্মুখে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহার অব্যবহিত পরেই নিম্নলিখিত কথাটি দেখিতে পাওয়া যায় ঃ

সো এবং পব্বজিতো সমানো কিংকুসল-গবেসী অনুত্তরং সন্তিবরপদং পরিয়েসমানো যেন আলারো কালামো তেনুপসংকমিং।

(বুদ্ধ বলিতেছেন) ''এইভাবে সন্ন্যাস গ্রহণের পর, মঙ্গলকর পথ কোন্‌টি, তাহা জানিবার উদ্দেশ্যে শ্রেষ্ঠ, লোকোত্তর এবং শান্তিময় তত্ত্বের অন্বেষণ করিতে করিতে আমি আলার কালামের নিকট গেলাম।'

এই উদ্ধৃত বাক্যটি হইতে দেখা যায় যে, বোধিসত্ত্ব রাজগৃহে না গিয়া, প্রথমে আলার কালামের নিকট গিয়াছিলেন। আলার কালাম কোসল দেশেরই অধিবাসী ছিলেন। অঙ্গুত্তরনিকায়ের তিকনিপাতে (সুত্ত ৬৫) কালাম নামক ক্ষত্রিয়দের কেসপুত্ত নামক একটি শহরের উল্লেখ আছে। তাহা হইতে মনে হয় যে, আলার কালাম এই ক্ষত্রিয় বংশেরই একজন ছিলেন। শাক্য ও কোলিয় রাজ্যে তাঁহার বেশ খ্যাতি ছিল। উপরে বলা হইয়াছে যে, কপিলবস্তুতে তাঁহার ভরণ্ডুকালাম নামক জনৈক শিষ্যের একটি আশ্রম ছিল। তাঁহার অপর এক শিষ্য (অথবা, খুব বেশি হয়তো, উদ্দক রামপুত্তের শিষ্য) নিকটস্থ কোলিয়দের দেশে থাকিত। শাক্য ও কোলিয় দেশে যে এই সম্প্রদায়ের বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। বোধিসত্ত্ব তাঁহার প্রথম ধ্যানের প্রণালীটি এই পরিব্রাজকের নিকটই শিখিয়া থাকিবেন এবং তিনিই তাঁহাকে সন্ন্যাসদীক্ষা দিয়া থাকিবেন।

কিন্তু শাক্য অথবা কোলিয় দেশের কোনো আশ্রমে থাকিয়া কালাতিপাত করা বোধিসত্ত্বের নিকট যোগ্য মনে হয় নাই। মঙ্গলকরমার্গ এবং শ্রেষ্ঠ, লোকোত্তর ও শান্তিময় তত্ত্ব জানিবার উদ্দেশ্যেই, তিনি প্রত্যক্ষ আলার কালামের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তৎকালে আলার

কালাম বোধ হয় কোসল দেশের কোনো জায়গায় থাকিতেন। তিনি বোধিসত্ত্বকে চারিটি ধ্যান এবং তাহাদের উপরের আরো তিনটি স্তর শিখাইয়াছিলেন। কিন্তু শুধু সমাধির এই সাতটি স্তর শিখিয়াই বুদ্ধ সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না। এই সাধনমার্গ মনোনিগ্রহের পথ বটে, কিন্তু সমস্ত মনুষ্যজাতির জন্য ইহার উপযোগিতা কি? এইজন্যই ইহার পরও, বোধিসত্ত্ব অভীষ্ট কল্যাণমার্গের অনুসন্ধান চালাইয়া গেলেন।

উদ্দক রামপুত্তের সহিত সাক্ষাৎ

আলার কালাম ও উদ্দক রামপুত্ত উভয়ে একই সমাধিমার্গ শিখাইতেন। তাঁহাদের সাধনমার্গে শুধু এইটুকু তফাত ছিল যে, আলার কালাম সমাধির সাতটি স্তর, এবং উদ্দক রামপুত্ত আটটি স্তর শিখাইতেন। বোধ হয়, দুইজনের একই গুরু ছিলেন, এবং পরে তাহারাই দুইটি পৃথক্‌সম্প্রদায় স্থাপন করিয়া থাকিবেন। আলার কালামের নিকট বিদায় লইয়া, বোধিসত্ত্ব উদ্দকের কাছে গেলেন। কিন্তু তাঁহার সাধনমার্গেও বুদ্ধ তেমন কিছু খুঁজিয়া পাইলেন না। সেইজন্য তিনি স্থির করিলেন যে, রাজগৃহে গিয়া সেখানে যে সব প্রসিদ্ধ শ্রমণ পন্থ ছিল, তাহাদের দার্শনিক তত্ত্বের সহিত পরিচয় করিয়া লইবেন।

সাক্ষাৎ করিবার জন্য রাজা বিম্বিসারের আগমন

এক অজ্ঞাত কবি সুত্তনিপাতের পব্বজ্জাসুত্তে বোধিসত্ত্বের রাজগৃহে আগমন বর্ণনা করিয়াছেন। বর্ণনাটির অনুবাদ এইরূপ ঃ

১. চক্ষুষ্মান্ (বোধিসত্ত্ব) কেন সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং কি রকম বিচারে তাঁহার সন্ন্যাস ভালো লাগিয়াছিল, তাহা কহিয়া আমি তাঁহার সন্ন্যাসের বর্ণনা করিতেছি।

২. গৃহস্থাশ্রম বিবিধ বিঘ্ন ও আবর্জনার স্থল, আর সন্ন্যাস হইতেছে মুক্ত বাতাস, এইরূপ বুঝিতে পারিয়া তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেলেন।

৩. সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া, তিনি শারীরিক পাপকর্ম বর্জন করিলেন, বাচনিক দুর্ব্যবহার পরিত্যাগ করিলেন এবং শুদ্ধ উপায়ে জীবিক অর্জন করিতে লাগিলেন।

৪. বুদ্ধ মগধদেশের গিরিব্রজ (রাজগৃহে) আসিলেন। তাঁহার শরীরে তখন সুলক্ষণের প্রাচুর্য দেখা দিয়াছে। এই অবস্থায় তিনি ভিক্ষার জন্য রাজগৃহে প্রবেশ করিলেন।

৫. রাজা বিম্বিসার নিজ প্রাসাদ হইতে তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন। তাঁহার শরীরে সুলক্ষণের ঐশ্বর্য লক্ষ্য করিয়া বিম্বিসার কহিলেন,

৬. ওহে তোমরা আমার কথা শুন ঃ এই ব্যক্তি সুন্দর, ভব্য, শুদ্ধ এবং আচারসম্পন্ন। তিনি তাঁহার দুই হাতের মধ্যস্থলে পায়ের কাছে দৃষ্টি রাখিয়া হাঁটিতেছেন (যুগমত্তং চ পেক্‌খতি)।

৭. পায়ের কাছে দৃষ্টি রাখিয়া হাঁটিতেছেন, এই যে জাগ্রৎ ভিক্ষু, তিনি নীচকুলোৎপন্ন বলিয়া মনে হয় না। তিনি কোথায় যাইতেছেন, তাহা রাজদূতরা দৌড়াইয়া গিয়া দেখিয়া আসুক।

৮. সেই ভিক্ষু (বোধিসত্ত্ব) কোথায় যাইতেছেন, এবং তিনি কোথায় থাকেন, তাহা দেখিবার জন্য, (বিম্বিসার রাজকর্তৃক প্রেরিত) ঐ দূতরা তাঁহার পিছনে পিছনে গেল।

৯. ইন্দ্রিয়সংযমী, বিবেকী ও জাগ্রৎ বোধিসত্ত্ব গৃহে গৃহে ভিক্ষা করিয়া শীঘ্রই পাত্র ভরিয়া, ভিক্ষা সংগ্রহ করিলেন।

১০. ভিক্ষাটন শেষ করিয়া, ঐ মুনি নগরের বাহিরে গেলেন এবং পাণ্ডব পর্বতের নিকট, সেখানে থাকিবেন এই উদ্দেশ্যে, আসিলেন।

১১. তিনি তাঁহার আবাসস্থলে বসিয়া আছেন দেখিতে পাইয়া, সেই দূতরা তাঁহার নিকট বসিল এবং তাহাদের মধ্যে একজন গিয়া রাজাকে খবর দিল—

১২. "মহারাজ, ঐ ভিক্ষু পাণ্ডব পর্বতের পূর্বদিকে বাঘের মতো, বলীবর্দের মতো অথবা গিরিগুহাবাসী সিংহের মতো বসিয়া আছেন!"

১৩. দূতদের কথা শুনিয়া সেই ক্ষত্রিয় (রাজা) উৎকৃষ্ট রথে বসিয়া, সত্বর পর্বতের দিকে রওনা হইলেন।

১৪. রথে যতদূর পর্যন্ত যাওয়া যায়, ততদূর গিয়া, সেই ক্ষত্রিয় রথ হইতে নীচে নামিলেন এবং পায়ে হাঁটিয়াই (বোধিসত্ত্বের) নিকট গিয়া তাঁহার কাছে বসিলেন।

১৫. সেখানে বসিয়া রাজা তাঁহাকে কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিলেন। কুশলপ্রশ্নাদির পর, তিনি এইরূপ কহিলেন ঃ

১৬. তুমি তো যুবক ও তরুণ এবং মানুষের প্রথম বয়সের মালিক। তোমার দেহকান্তি উচ্চবংসীয় ক্ষত্রিয়ের মতো অত্যন্ত মনোহর দেখাইতেছে।

১৭. তুমি হস্তিদলের সেনাপতি হইয়া আমার সৈন্যের শোভা সংবর্ধন করো। আমি তোমাকে সম্পত্তি দিতেছি, তুমি তাহা উপভোগ করো। এখন, তোমার কী জাতি, তাহা আমাকে বলো।

১৮. হে রাজা! এখান হইতে সোজা হিমালয়ের পাদদেশে, ধনসম্পদ এবং বীর্যসম্পন্ন একটি দেশ আছে। উহা কোসলরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত।

১৯. ঐ দেশের লোকদের গোত্র আদিত্য এবং তাহাদের জাতির নাম শাক্য। হে রাজা! আমি ঐ বংশেই জন্মগ্রহণ করিয়া, এখন সন্ন্যাসী হইয়াছি, কিন্তু তাহা কামোপভোগের ইচ্ছায় নহে।

২০. আমি কমোপভোগে দোষ দেখিতে পাইলাম এবং নির্জনে বাস করাই আমার কাছে সুখের বলিয়া মনে হইল। এখন আমি তপস্যা করিবার জন্য যাইতেছি। এই তপস্যার পথেই এখন আমার মন আনন্দ পায়।

এই সুত্তের তৃতীয় গাথাতে লিখিত আছে যে, বোধিসত্ত্ব শরীর, বাক্ ও উপজীবিকার শুদ্ধি সম্পাদন করিয়াছিলেন। কিন্তু ঘর হইতে বাহির হইয়া, পথে চলিবার সময়, তাঁহার পক্ষে এই কাজটি সম্পাদন করা সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয় না। তিনি যখন আলার কালাম

ও উদ্দক রামপুত্ত, এই দুইজনের নিকট থাকিতেন, ঐ সময়, তাহাদের আচার-বিচার খুব ভালোভাবে অনুষ্ঠান করিয়া, এই কাজটি সম্পাদন করিয়া থাকিবেন—এই রকম মনে হয়। কিন্তু শুধু এইটুকুতেই তিনি সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। তাই তৎকালে যেসব প্রসিদ্ধ শ্রমণনায়ক ছিলেন, তাঁহাদের দার্শনিক তত্ত্ব বুঝিয়া লইবার উদ্দেশ্যে, তিনি রাজগৃহে আসিলেন। সেখানে প্রত্যেক সম্প্রদায়েই অল্পবিস্তর তপস্যা করার রেওয়াজ আছে, এইরূপ দেখিতে পাইয়া বুদ্ধ ভাবিলেন যে, তাঁহারও এইরূপ তপস্যা করা উচিত, এবং এইজন্যই এই সুত্তের শেষ গাথাটিতে বুদ্ধ বলিতেছেন, "এখন আমি তপস্যা করিবার জন্য যাইতেছি।"

কামোপভোগের ইচ্ছা তাঁহার মন হইতে পূর্বেই চলিয়া গিয়াছিল। সুতরাং মগধের রাজা তাঁহাকে যে সম্পত্তি ও উচ্চপদ দিতে চাহিলেন, তাহা যে তাঁহার ভালো লাগিল না, ইহা বলা নিষ্প্রয়োজন।

উরুবেলা নামক স্থানে আগমন

রাজগৃহ হইতে বোধিসত্ত্ব উরুবেলাতে আসিলেন এবং তপস্যার পক্ষে এই জায়গাটি তাঁহার ভালো বলিয়া মনে হইল। অরিয়পরিয়েনসুত্তে ইহার বর্ণনা দেখা যায়।

ভগবান বুদ্ধ কহিতেছেন, "হে ভিক্ষুগণ, প্রকৃত মঙ্গল কি, তাহা জানিবার উদ্দেশ্যে, লোকোত্তর শান্তির সর্বশ্রেষ্ঠ পদ খুঁজিতে খুঁজিতে ক্রমশ নানা দেশ ভ্রমণ করিয়া, আমি উরুবেলার সেনানিগমে আসিলাম। সেখানে আমি একটি রমণীয় স্থান দেখিতে পাইলাম। ঐ স্থানে একটি সুন্দর বন। আর তাহার মাঝে একটি নদী ধীরে ধীরে বহিয়া যাইতেছিল। তাহার দুই পার্শ্বে সাদা বালুর চর এবং তাহা হইতে জলে নামা সহজ—ভারি সুন্দর জায়গা। এই বনের চারিদিকে, ভিক্ষা পাওয়া যাইবে, এমন সব গ্রাম দেখা যাইতেছিল। এই জায়গাটি অত্যন্ত রমণীয় হওয়ায়, সদ্বংশীয় লোকের পক্ষে তপস্যার যোগ্য স্থান, এইরূপ মনে করিয়া, আমি সেখানেই তপস্যা করিতে থাকিলাম।"

রাজগৃহের চারিদিকে যেসব পাহাড় আছে, সেগুলিতে নির্গ্রন্থ প্রভৃতি সম্প্রদায়ের শ্রমণরা তপস্যা করিতেন, এই কথা অনেক জায়গায় উপলব্ধ হয়। কিন্তু তপস্যার জন্য এই সকল রুক্ষ পাহাড় বোধিসত্ত্বের পছন্দ হয় নাই; উরুবেলার সুন্দর স্থানটিই তাঁহার ভালো লাগিয়াছিল। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, বোধিসত্ত্ব প্রাকৃতিক সৌন্দর্য খুব ভালোবাসিতেন।

তিনটি উপমা

তপস্যা আরম্ভ করিবার পূর্বে, বোধিসত্ত্ব মনে মনে তিনটি উপমার কথা ভাবিলেন। এই উপমা কয়টি 'মহাসচ্চকসুত্তে' বর্ণনা করা হইয়াছে। সেখানে ভগবান বুদ্ধ বলিতেছেন, "হে অগ্‌গিবেস্‌সন, যদি একটি ভিজা কাঠ কিছুকাল জলে পড়িয়া থাকে, এবং যদি কোনো ব্যক্তি অরণি কাষ্ঠ আনিয়া তাহা ঐ ভিজা কাঠের উপর ঘষিয়া আগুন বাহির করার চেষ্টা করে, তাহা হইলে কি উহা হইতে আগুন বাহির হইবে?"

সচ্চক—হে গোতম, ঐ কাঠ হইতে আগুন বাহির হওয়া অসম্ভব। কেননা, তাহা ভিজা। ঐ ব্যক্তির সব পরিশ্রম ব্যর্থ হইয়া, শুধু তাহার কষ্টই সার হইবে।

বুদ্ধ—হে অগ্‌গিবেস্‌সন, ঠিক তেমনই যে শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ কামোপভোগ হইতে অলিপ্ত হয় নাই এবং যাহাদের কামরিপু শান্ত হয় নাই, তাহারা যতই কষ্ট ভোগ করুক না, তবুও জ্ঞানদৃষ্টি এবং লোকোত্তর সম্বোধি লাভ করিতে তাহারা পারিবে না। হে অগ্‌গিবেস্‌সন, আমার মনে আরও একটি উপমার কল্পনাও আছে। যদি একটি ভিজা কাঠ জল হইতে দূরে পড়িয়া থাকে, আর যদি কোনো ব্যক্তি তাহাতে অরণি ঘষিয়া আগুন বাহির করিবার চেষ্টা করে, তাহা হইলে উহা হইতে আগুন বাহির হইবে কি?

সচ্চক—না, গোতম, তাহার চেষ্টা বিফল হইয়া, শুধু তাহার কষ্ট সার হইবে। কেননা, ঐ কাঠটি ভিজা।

বুদ্ধ—ঠিক তেমনই, হে অগ্‌গিবেস্‌সন, যে শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ কামোপভোগ ত্যাগ করিয়া তাহা হইতে শরীর ও মনে অলিপ্ত হইয়াছে, কিন্তু মনের কামবিকার শান্ত করিতে পারে নাই, তাহারা যত কষ্টই স্বীকার করুক-না, তবুও উহাতে তাহাদের জ্ঞানদৃষ্টি এবং লোকত্তোর সম্বোধি লাভ হইবে না। হে অগ্‌গিবেস্‌সন, আর একটি উপমাও আমার কল্পনায় আসিয়াছে। যদি একটি শুকনা কাঠের টুকরা জল হইতে দূরে পড়িয়া থাকে, এবং যদি কোনো ব্যক্তি তাহার উপর অরণি ঘষিয়া আগুন বাহির করিতে চেষ্টা করে, তাহা হইলে সে আগুন উৎপন্ন করিতে পারিবে কি পারিবে না?

সচ্চক—হাঁ, গোতম পারিবে; কারণ ঐ কাঠটি একেবারে শুকনা। আর জলেও পড়ে নাই।

বুদ্ধ—হে অগ্‌গিবেস্‌সন, সেই রকমই, যে শ্রমণ ব্রাহ্মণ শরীর ও মনে কামোপভোগ হইতে দূরে থাকে এবং যাহার কামরিপু সম্পূর্ণ নষ্ট হইয়া গিয়াছে, সে শরীরকে অত্যন্ত কষ্ট দেউক বা না দেউক, তাহার পক্ষে জ্ঞানদৃষ্টি এবং লোকোত্তর সম্বোধি পাওয়া সম্ভবপর।

তপস্যা আরম্ভ করিবার পূর্বে বোধিসত্ত্বের মনে এই তিনটি উপমার কল্পনা উত্থিত হইয়াছিল। প্রথমটির তাৎপর্য এই যে, যদি কোনো শ্রমণ ব্রাহ্মণ যাগযজ্ঞেই সন্তুষ্ট থাকে, তাহা হইলে সে তপস্যা করিয়া শরীরকে কষ্ট দিলেও, তাহার তত্ত্ববোধ হইবে না। দ্বিতীয়টির তাৎপর্য এই যে, শ্রমণ ব্রাহ্মণ যাগযজ্ঞের পথ ছাড়িয়া দিয়া, অরণ্যে গিয়া বাস করিলেও, যদি তাহার অন্তকরণস্থ কামবাসনা নষ্ট না হইয়া থাকে, তাহা হইলে তপস্যার দ্বারাও তাহার কিছু লাভ হইবে না। ভিজা কাঠে অরণি ঘষিয়া আগুন বাহির করিবার চেষ্টার মতোই, তাহার সকল চেষ্টা বিফল হইবে। কিন্তু তৃতীয়টির তাৎপর্য এই যে, যদি কোনো মানুষ কামোপভোগ হইতে দূরে থাকিয়া, মনের কাম বাসনা পুরাপুরি নাশ করিতে পারে তাহা হইলে শরীরকে কোনো কষ্ট না দিয়াও, তাহার তত্ত্ববোধ হওয়া সম্ভবপর।

হঠযোগ

বোধিসত্ত্বের মনে এই উপমাগুলি আসা সত্ত্বেও, তিনি তৎকালীন শ্রমণদের আচার ব্যবহার অনুসরণ করিয়া, তীব্র তপস্যা করিবেন বলিয়া স্থির করিলেন। প্রথমে হঠযোগের উপর জোর দিলেন। ভগবান বুদ্ধ সচ্চককে বলিতেছেন, "হে অগ্‌গিবেস্‌সন আমি যখন দাঁতে

দাঁত চাপিয়া ও তালুতে জিভ লাগাইয়া চিত্ত দমন করিতাম, তখন আমার কাঁখ হইতে ঘাম বাহির হইত। কোনো শক্তিশালী পুরুষ যেমন কোনো দুর্বল মানুষকে তাহার মাথায় কিংবা কাঁধে চাপিয়া ধরে, তেমনই আমি আমার চিত্তকে জোর করিয়া দাবাইয়া রাখিতাম।

"হে অগ্‌গিবেস্‌সন, তাহার পর শ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধ করিয়া, আমি ধ্যান করিতে থাকিলাম। তখন আমার কানের ভিতর দিয়া শ্বাস বাহির হইবার শব্দ হইতে থাকিল। কর্মকারের হাপরের মতো আমার কান হইতে আওয়াজ আসিতে লাগিল। হে অগ্‌গিবেস্‌সন, তথাপি আমি শ্বাসপ্রশ্বাস ও কান বন্ধ করিয়া, ঐ ধ্যানই করিতে লাগিলাম। তখন আমার মনে হইতে লাগিল যে, যেন কেহ ধারালো তরবারির অগ্রভাগ দিয়া আমার মাথা মন্থন করিয়া দিতেছে। তথাপি আমি ঐ ধ্যানই করিতে থাকিলাম। তখন আমি এইরকম বোধ করিতে লাগিলাম, যেন কেহ আমার মাথায় চামড়ার পটি বাঁধিয়া আঁটিয়া দিতেছে। তথাপি আমি ঐ ধ্যানই করিতে থাকিলাম। তাহাতে আমার পেটে ব্যথা হইল। কসাই যেমন ছুরি দিয়া গোরুর পেট চিরিয়া দেয়, তেমনই যেন কেহ আমার পেট চিরিয়া দিতেছে, এইরূপ মনে হইল। এই সব অবস্থাতেই, আমার মনের উৎসাহ অটুট ও স্মৃতি স্থির ছিল; কিন্তু শরীরের শক্তি কমিয়া গেল। তথাপি এইসব কষ্টদায়ক বেদনাও আমার চিত্তকে বাঁধিতে পারিল না।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদে শ্রমণদের নানারকম তপস্যা প্রণালী বর্ণনা করা হইয়াছে। কিন্তু উহাতে হঠযোগের বর্ণনা দেওয়া হয় নাই। তথাপি ইহা ধরিয়া লইতে হইবে যে, উপরে বর্ণিত হঠযোগের অনুশীলনকারী তপস্বী তৎকালে ছিল। তাহা না হইলে, বোধিসত্ত্ব ঐরূপ যোগাভ্যাস আরম্ভ করিতেন না।

উপবাস

এইভাবে হঠযোগের অনুশীলন করিয়া বোধিসত্ত্ব যখন দেখিলেন যে, উহাতে কোনো তথ্য নাই, তখন তিনি উপবাসের প্রক্রিয়া আরম্ভ করিলেন। অন্নজল একেবারে পরিত্যাগ করা এখন তাঁহার সমীচীন বলিয়া মনে হইল না। তথাপি তিনি অত্যন্ত অল্প আহারই গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিলেন। ভগবান বুদ্ধ সচ্চককে কহিতেছেন, "হে অগ্‌গিবেস্‌সন, আমি অত্যন্ত অল্প আহার করিতে থাকিলাম। মুগের ক্বাথ, কুলথের[১] ক্বাথ, ভুট্টার ক্বাথ ও ছোলার (হরেণু) ক্বাথ খাইয়া থাকিতাম। এইগুলিও আবার অত্যন্ত অল্প পরিমাণে খাইতাম বলিয়া, আমার শরীর খুবই কৃশ হইয়া গেল। আমার শরীরের গাঁটগুলি আসীতক লতা কিংবা কাললতার গাঁটের মতো দেখাইতে লাগিল। আমার কোমরের তাগাটি উটের পায়ের মতো হইয়া গেল। আমার মেরুদণ্ডটি সূতার গুটি দিয়া তৈয়ারি মালার মতো দেখাইতে লাগিল। ভাঙা ঘরের কড়িবরগাগুলি যেমন একবার উপরে উঠে ও একবার নীচে নামে, আমার ঘাড়ের অবস্থাও সেইরূপ হইয়া গেল। গভীর কূয়াতে নক্ষত্রের প্রতিবিম্ব পড়িলে, তাহা যেমন দেখায়, আমার চোখের তারাগুলিও তেমনই ভিতরে ঢুকিয়া গিয়াছিল। কাঁচা লাউ কাটিয়া রোদে ফেলিয়া দিলে, তাহা যেমন শুকাইয়া যায়, আমার মাথার চামড়াও

---

১. পাহাড়ের গায়ে উৎপন্ন শস্যবিশেষ।

তেমনই শুকাইয়া গিয়াছিল। আমি যদি পেটে হাত বুলাইতাম, তাহা হইলে শিরদাঁড়াটি হাতে লাগিত। আর শিরদাঁড়ার উপর হাত ঘুরাইলে, পেটের চামড়া গিয়া হাতে লাগিত। এইভাবে আমার শিরদাঁড়া ও পেটের চামড়া এক হইয়া গিয়াছিল। কোথাও মল কিংবা মূত্রত্যাগ করিতে বসিলে, আমি সেখানেই পড়িয়া যাইতাম। আমার শরীরে হাত বুলাইলে, আমার গায়ের দুর্বল লোমগুলি আপনা হইতেই ঝরিয়া পড়িত।"

চিন্তার উপর সংযম

বোধিসত্ত্ব যে সাত বৎসর তপস্যা করিয়াছিলেন, তাহার উল্লেখ অনেক স্থলেই দেখা যায়। এই সাত বৎসর তিনি প্রধানত শরীরকে কষ্ট দিয়া কৃচ্ছ্রসাধন করিয়াছিলেন বটে, তথাপি তাঁহার মনে যে, অন্য কোনো চিন্তাই আসিত না, তাহা নহে। উপরে আমরা যে তিনটি উপমার কথা বলিয়াছি, সেগুলিও ভালোভাবে লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, বুদ্ধ স্পষ্ট বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, কামরিপু সম্পূর্ণ নাশ করিতে না পারিলে, শুধু নানাভাবে শরীরকে ক্লেশ দিয়া কোনো কাজ হইবে না। তাহা ছাড়া, অন্যান্য সৎচিন্তাও যে বুদ্ধের মনে উদিত হইত, তাহা অন্য অনেক সুত্ত হইতে বুঝা যায়। ইহাদের মধ্যে কয়েকটি চিন্তা এখানে সংক্ষেপে সংগৃহীত হইল।

মজ্ঝিমনিকায়ের দ্বেধাবিতক্কসুত্তে ভগবান্ বলিতেছেন, "হে ভিক্ষুগণ, আমি জ্ঞান লাভ করিবার পূর্বে, অর্থাৎ বোধিসত্ত্ব থাকা কালে, আমার মনে এইরূপ চিন্তা আসিল যে, সব চিন্তা দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। তদনুসারে আমি কামবিতর্ক (বিষয় চিন্তা), ব্যাপাদ বিতর্ক (দ্বেষ চিন্তা) এবং বিহিংসাবিতর্ক (অপরকে কিংবা নিজকে যন্ত্রণা দেওয়ার বুদ্ধি), এই তিনটি বিতর্ক বা চিন্তাকে আমি এক বিভাগে ফেলিলাম; এবং নৈষ্কর্ম্য (নির্জনে থাকা), অব্যাপাদ (মৈত্রী) ও অবিহিংসা (যন্ত্রণা না দেওয়ার বুদ্ধি) এই তিনটি বিতর্ক বা চিন্তা অপর শ্রেণীতে রাখিলাম। তাহার পর, খুব সাবধানতা ও দক্ষতার সহিত সংসারে চলাফেরা করিবার সময়ও, আমার মনে প্রথম তিনটি বিতর্কের মধ্যে কোনো একটি উৎপন্ন হইত। তখন আমি এইরূপ বিচার করিতাম যে, এই একটি খারাপ চিন্তা আমার মনে উদিত হইল। এই খারাপ চিন্তাটি আমার দুঃখের, অপরের দুঃখের কিংবা আমাদের উভয়ের দুঃখের কারণ হইবে, প্রজ্ঞানের নিরোধ করিবে ও আমাকে নির্বাণের অবস্থায় যাইতে দিবে না। এইরূপ বিচারে, আমার মন হইতে ঐ খারাপ চিন্তাটি বিলীন হইয়া যাইত।

"হে ভিক্ষুগণ, শরৎকালে যখন সর্বত্র ক্ষেতের শস্য পাকিয়া যায়, তখন রাখালরা গোরু-মহিষগুলিকে খুব সাবধানে রাখে; লাঠি দিয়া মারিয়াও, তাহাদিগকে ক্ষেত হইতে দূরে রাখে; কেননা, রাখাল জানে যে, সেইরূপ না করিলে, তাহার গোরু-মহিষ লোকের ক্ষেতে ঢুকিবে এবং তজ্জন্য তাহাকে শাস্তি ভোগ করিতে হইবে। তেমনই আমি বুঝিতে পারিলাম যে, কাম, ব্যাপাদ, বিহিংসা ইত্যাদি খারাপ মনোবৃত্তিগুলি ভয়াবহ।

"ঐ সময়, আমি যখন খুব সাবধানতা এবং উৎসাহের সহিত কাজ করিতাম, তখন আমার মনে নৈষ্কর্ম, অব্যাপাদে এবং অবিহিংসা, এই তিনটি বিতর্কের মধ্যে কোনো একটি

উৎপন্ন হইত। তখন আমি এইরূপ ভাবিতাম ঃ আমার মনে এই একটি শুভ বিতর্ক উৎপন্ন হইয়াছে; উহা আমাকে, পরকে, কিংবা আমাদের উভয়ের কাহাকেও দুঃখ দিবে না, উহা প্রজ্ঞার অভিবৃদ্ধি করিবে ও নির্বাণের অবস্থায় পৌঁছাইয়া দিবে, সমস্ত রাত্রি কিংবা সমস্ত দিবস এই বিতর্ক চিন্তন করিলেও তাহা হইতে কোনো ভয়ের কারণ নাই; তথাপি অনেকক্ষণ চিন্তা করিলে, আমার শরীর ক্লান্ত হইয়া পড়িবে এবং তজ্জন্য আমার চিত্ত স্থির থাকিবে না; আর অস্থির চিত্ত কোথা হইতে সমাধি লাভ করিবে? সুতরাং (কিছুকাল পরে) আমি আমার চিত্তকে উহারই ভিতরে স্থির করিয়া আনিতাম.....গ্রীষ্ম ঋতুর শেষ দিকে, লোকেরা যখন শস্য কাটিয়া ঘরে আনে তখন কোনো রাখাল তাহার গোরুগুলিকে ইচ্ছামত স্বাধীনভাবে চরিয়া বেড়াইবার জন্য ছাড়িয়া দেয়। কিন্তু তখন সে গাছের নীচে থাকুক বা খোলা জায়গায় থাকুক, গোরুগুলির দিকে দৃষ্টি রাখা ছাড়া আর কিছু করে না। আমার মনে নৈষ্কার্ম্যাদি শুভ বিতর্ক উৎপন্ন হইলে, আমি শুধু এইটুকু স্মরণে রাখিতাম যে, আমার মনের এই চিন্তাগুলি শুভ। (আমি উহাদিগকে নিগ্রহ করিবার কোনো চেষ্টা কারতাম না।)"

নির্ভয়তা

শুভ চিন্তার দ্বারা অশুভ চিন্তা জয় করিলেও, যে পর্যন্ত ধার্মিক ব্যক্তির মনে নির্ভয়তা অথবা অভয় উৎপন্ন হয় না, ততক্ষণ তাহার তত্ত্ববোধ হওয়া সম্ভবপর নয়। ডাকাত অথবা সৈনিক নিজ শত্রুর উপরে সাহসের সহিত ঝাঁপাইয়া পড়ে, কিন্তু তাহাদের ভিতর নির্ভয়তা খুব অল্পই আছে। তাহারা যতই কেন অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হউক, তবু তাহারা সর্বদাই প্রাণের ভয়ে ভীত থাকে; তাহারা ভাবে, কখন যে আমার শত্রু আমাকে আঘাত করিবে ইহার কিছু ঠিক নাই। সুতরাং তাহাদের নির্ভয়তা খাঁটি নহে। আধ্যাত্মিক মার্গে যে নির্ভয়তা পাওয়া যায়, তাহাই প্রকৃত নির্ভয়তা। এইরূপ নির্ভয়তা বোধিসত্ত্ব কি করিয়া সম্পাদন করিলেন, তাহা নিম্নের উদ্ধৃতাংশ হইতে বুঝা যাইবে।

ভগবান বুদ্ধ জানুশ্রেণীনামক ব্রাহ্মণকে কহিলেন, "হে ব্রাহ্মণ, আমি যখন সম্বোধি লাভ করি নাই, অর্থাৎ শুধু বোধিসত্ত্ব ছিলাম, তখন আমার মনে হইল যে, যেসব শ্রমণ অথবা ব্রাহ্মণ বিশুদ্ধ শারীরিক কর্ম না করিয়া বনে বাস করে, তাহারা এই অবগুণবশত ভয় ভৈরবকে ডাকিয়া আনে। কিন্তু আমার কর্ম বিশুদ্ধ। যাঁহাদের শারীরিক কর্ম বিশুদ্ধ, এমন যেসব সজ্জন (আর্য) বনে থাকেন, আমি তাঁহাদের মধ্যে একজন, আমি যখন এই কথা বুঝিতে পারিলাম, তখন অরণ্যবাসের মধ্যে আমি অতিশয় নির্ভয়তা অনুভব করিলাম। কিন্তু অন্যান্য কোনো কোনো শ্রবণ বা ব্রাহ্মণ তাহাদের বাচনিক কর্ম অবিশুদ্ধ থাকা কালে, মানসিক কর্ম অবিশুদ্ধ থাকা কালে, এবং আজীব (উপজীবিকা) অবিশুদ্ধ থাকা কালে, বনে গিয়া বাস করে, এবং এইসব অবগুণবশত ভয় ভৈরবকে ডাকিয়া আনে। কিন্তু আমার বাচনিক ও মানসিক কর্ম এবং উপজীবিকা পরিশুদ্ধ। যেসব সজ্জনের উক্ত কর্ম ও উপজীবিকা পরিশুদ্ধ, আমিও যে তাহাদের মধ্যে একজন, ইহা যখন আমি বুঝিতে পারিলাম, তখন অরণ্যবাসে আমি অতিশয় নির্ভরতা অনুভব করিলাম।

"হে ব্রাহ্মণ, যে সব শ্রমণ অথবা ব্রাহ্মণ লোভী, দুষ্টান্তঃকরণ, অলস, ভ্রান্তচিত্ত অথবা সংশয়গ্রস্ত এবং এই সকল অবগুণ থাকাকালেই অরণ্যে বাস করে, তাহারা এইসব অবগুণবশত ভয় ভৈরবকে ডাকিয়া আনে। কিন্তু আমার চিত্ত কামে অলিপ্ত, দ্বেষ হইতে মুক্ত (অর্থাৎ সর্বপ্রাণীর প্রতি আমার মনে মৈত্রী ভাব থাকে), উৎসাহপূর্ণ ও সংশয়শূন্য। এইপ্রকার সদ্‌গুণসম্পন্ন যে সব সাধুব্যক্তি বনে বাস করেন, আমি যে তাঁহাদের মধ্যে একজন, এই কথা যখন আমি বুঝিতে পারিলাম, তখন বনবাসে আমি অতিশয় নির্ভয়তা অনুভব করিলাম।

"হে ব্রাহ্মণ, যে সব শ্রমণ অথবা ব্রাহ্মণ আত্মস্তুতি ও পরনিন্দা করে, যাহারা ভীতু, যাহারা সম্মানের জন্য লোলুপ হইয়া অরণ্যে বাস করে......কিংবা যাহারা জড়বুদ্ধি, তাহারা এই সকল দোষবশত ভয় ভৈরবকে ডাকিয়া আনে। কিন্তু আমাতে এইসব দুর্গুণ নাই। আমি আত্মপ্রশংসা কিংবা পরিনিন্দা করি না, আমি ভীতু নই, আমি সম্মানের লিপ্সা করি না......এবং আমি প্রজ্ঞাবান, আর সাধুপুরুষদের মধ্যে যাহারা এইসব সদ্‌গুণসম্পন্ন হইয়া অরণ্যে বাস করেন, আমিও তাঁহাদের মধ্যে একজন, এই কথা যখন আমি বুঝিতে পারিলাম, তখন আমি অরণ্যবাসে অতিশয় নির্ভয়তা অনুভব করিলাম।

"হে ব্রাহ্মণ, চতুর্দশী, পূর্ণিমা, অমাবস্যা এবং অষ্টমী, এই রাত্রিগুলি (ভয়ের জন্য) প্রসিদ্ধ। এইসব রাত্রিতে যে সব উদ্যানে, অরণ্যে কিংবা বৃক্ষের নীচে লোকে দেবতাদের উদ্দেশ্যে পশুবলি দেয়, অথবা যে সব স্থান অত্যন্ত ভীতিসংকুল বলিয়া লোকে মনে করে, সেইসব জায়গায় আমি (একাকী) থাকিতাম; কারণ ভয় ভৈরব কি রকম, আমার তাহা দেখিতে অভিলাষ ছিল। আমি যখন এইরূপ স্থানে (রাত্রিতে) থাকিতাম, তখন মাঝে মাঝে কোনো হরিণ পাশ দিয়া চলিয়া যাইত, কোনো ময়ূর শুকনা কাঠের টুকরা নীচে ফেলিত অথবা গাছের পাতা বাতাসে নড়িত। ঐ রকম প্রসঙ্গে আমি ভাবিতাম যে, ইহাই সেই ভয় ভৈরব, আর আমি মনে মনে বলিতাম, যেহেতু আমি ভয় ভৈরবকে দেখবার ইচ্ছা লাইয়াই এখানে অসিয়াছি, সুতরাং এই অবস্থাতেই তাহাকে বিনাশ করিতে হইবে। পথ চলিতে চলিতে যদি (কখনো) আমার নিকট সেই ভয় ভৈরব আসিত, তাহা হইলে পথ চলিতে চলিতেই, আমি তাহাকে বিনাশ করিতাম। তাহাকে বিনাশ না করা পর্যন্ত, আমি কখনো দাঁড়াইতাম না ও বসিতাম না, অথবা বিছানায় পড়িয়া থাকিতাম না। যদি সেই ভয় ভৈরব আমার দাঁড়ানো থাকা কালে আমার নিকট আসিত, তাহা হইলে ঐ দাঁড়ানো অবস্থাতেই আমি তাহাকে বিনাশ করিতাম। তাহাকে বিনাশ না করা পর্যন্ত, আমি হাঁটিতাম না, বসিতাম না কিংবা বিছানায় শুইতাম না। বসা থাকাকালে, যদি ভয় ভৈরব আসিত, তাহা হইলে আমি শুইতাম না, দাঁড়াইতাম না কিংবা হাঁটিতাম না। বসা থাকাকালেই তাহাকে নাশ করিতাম। বিছানায় শুইয়া থাকাকালে, যদি সে আসিত, তাহা হইলে আমি বসিতাম না, দাঁড়াইতাম না অথবা হাঁটিতাম না, বিছানায় শুইয়া থাকাকালেই আমি তাহা নাশ করিতাম।

রাজযোগ

বোধিসত্ত্ব যে শুধু হঠযোগে ও তপস্যাতেই নিজের সব সময়টুকু কাটাইতেন, এমন নহে। আসলে এইরূপ করা কোনো তাপসের পক্ষেই সম্ভবপর ছিল না। মাঝে মাঝে তাহার ভালো খাদ্য খাওয়া প্রয়োজন হইত। তাহার পর শরীরে কিছু শক্তি হইত, আবার তিনি উপবাস প্রভৃতি দ্বারা দেহপীড়ন অভ্যাস করিতেন। এই সাত বৎসর বোধিসত্ত্ব প্রধানত তপস্যা করিয়া থাকিলেও, মাঝে মাঝে তিনি যে ভালো অন্ন গ্রহণ করিতেন এবং শান্ত সমাধিসুখও অনুভব করিতেন, ইহাতে সন্দেহ নাই। হঠযোগ ছাড়িয়া দেওয়ার পর, তিনি কিভাবে আনাপানস্মৃতিসমাধির ভাবনা করিতেন, তাহা ভগবান বুদ্ধ আনাপানসংযুত্তে প্রথম বগ্‌গের অষ্টম সুত্তে বলিয়াছেন।

ভগবান্ বুদ্ধ কহিতেছেন ঃ হে ভিক্ষুগণ, আনাপানস্মৃতিসমাধির ভাবনা করিলে, খুব উপকার হয়। কিভাবে তাহার ভাবনা করিলে খুব উপকার হয়? কোনো ভিক্ষু বনে, গাছের নীচে, অথবা অন্য কোনো নির্জন স্থানে আসন বিছাইয়া বসে। সে যদি খুব লম্বা শ্বাস ভিতরে টানিয়া লয়, তখন সে জানে যে সে লম্বা শ্বাস টানিয়া লইতেছে, যদি সে লম্বা প্রশ্বাস ফেলে, তাহা হইলে সে জানে যে, সে লম্বা প্রশ্বাস ফিলিতেছে, যদি সে ছোটো শ্বাস ভিতরে টানিয়া লয়, ইত্যাদি।[১]......এইভাবে আনাপানস্মৃতিসমাধির ভাবনা করিলে, খুব লাভ হয়। হে ভিক্ষুগণ, আমিও সম্বোধি লাভ করিবার পূর্বে, অর্থাৎ বোধিসত্ত্ব থাকাকালে বহু সময় এই ভাবনাটিই করিতাম। এইজন্য আমার শরীরে ও চোখে কোনো রকম যন্ত্রণা হইত না, এবং আমার চিত্ত পাপচিন্তা হইতে মুক্ত হইত।" ইহা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, বোধিসত্ত্ব সবসময় হঠযোগ অভ্যাস করিতেন না। মাঝে মাঝে তিনি এই শান্ত রাজযোগও অভ্যাস করিতেন এবং তাহাতে তিনি মনে আনন্দ পাইতেন।

ধ্যানমার্গের অবলম্বন

এইভাবে উপবাস ও আহার, হঠযোগ ও রাজযোগের মধ্যে, একবার এই দিকে আর একবার ঐ দিকে, এইভাবে ধাক্কা খাইতে খাইতে, সর্বশেষে বোধিসত্ত্বের মনে এই নিশ্চিন্ত ধারণা জন্মিল যে, তপস্যা করা একেবারে বৃথা, তাহার সহায়তা ছাড়াই মুক্তিলাভ সম্ভবপর। তাই, তিনি তপস্যাব্রত ছাড়িয়া দিয়া পুনরায় পুরাপুরি ভাবে ধ্যানমার্গ অবলম্বন করিলেন। মহাসচ্চকসুত্তে ইহা সংক্ষেপে বর্ণনা করা হইয়াছে।

ভগবান বুদ্ধ সচ্চককে বলিতেছেন, "হে অগ্‌গিবেস্‌সন, আমার মনে পড়িল যে, আমার পিতা শাক্যের ক্ষেতে চাষবাসের কাজ চলিতেছিল, এমন সময় একদিন আমি একটি জাম গাছের শীতল ছায়াতে বসিয়া প্রথম ধ্যানটি করিয়াছিলাম। তখন এই স্মৃতিকে অনুসরণ করিয়া আমি হৃদয়ঙ্গম করিলাম যে, ইহাই জ্ঞান লাভের পথ। আর আমি ভাবিলাম ঃ বিষয়ের উপভোগ অথবা অশুভ চিন্তার সাহায্য ছাড়া যে সুখ পাওয়া যায়, তাহাকে আমি ভয় করিব কেন? তাহার পর, আমি স্থির করিলাম যে, এইরূপ সুখকে আমি

১. বিশেষ বিবরণের জন্য সমাধিমার্গ পৃ. ৩৮-৪৮ দ্রষ্টব্য।

ভয় করিব না, কিন্তু এইরূপ সুখ অত্যন্ত কৃশ শরীরে পাওয়া সম্ভবপর ছিল না। তাই অল্প অল্প আহার করিব, এইরূপ স্থির করিয়া আমি তদনুসারে চলিতে থাকিলাম। সেই সময় পাঁচজন ভিক্ষু আমার সেবা করিত। কেননা তাহারা আশা করিত যে, আমি যে ধর্মতত্ত্ব উপলব্ধি করিব তাহা আমি তাহাদিগকে শিখাইব। কিন্তু আমি যখন পুনরায় আহার শুরু করিলাম, (তপস্যা ছাড়িয়া দিলাম) তখন ঐ পাঁচ জন ভিক্ষু ভাবিল যে, এই গোতম তপস্যা হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছে ও এখন তাহার পানাহারের দিকে মতি ফিরিয়াছে। তাই আমার উপর বিরক্ত হইয়া তাহারা আমাকে ছাড়িয়া গেল।"

তথাপি বোধিসত্ত্বের সংকল্প টলিল না তপস্যার পথ ছাড়িয়া, সাদাসিধা ধ্যানমার্গেই তত্ত্ববোধ করিয়া লইতে হইবে, তিনি এইরূপ নিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন।

'মার' -যুদ্ধ

এই প্রসঙ্গে বোধিসত্ত্বের সহিত 'মার' যুদ্ধ করিয়াছিল বলিয়া নানারূপ কাব্যময় বর্ণনা বুদ্ধচরিত প্রভৃতি গ্রন্থগুলিতে দেখা যায়। এইসব বর্ণনার মূল সুত্তনিপাতের প্রধানসুত্তে রহিয়াছে। এখানে ঐ সুত্তটির অনুবাদ দিতেছি—

১. নৈরঞ্জনা নদীর তীরে তপস্যা আরম্ভ করিয়া নির্বাণ প্রাপ্তির জন্য, আমি যখন খুব উৎসাহের সহিত ধ্যান করিতে ছিলাম, তখন—

২. মার (তাহার বীণা হইতে) অতি করুণ সুর বাহির করিয়া, আমার নিকট আসিল। (সে বলিল) তুমি অত্যন্ত কৃশ ও ফেকাশে হইয়া গিয়াছ, তোমার মরণ নিকটে।

৩. হাজার ভাগে তুমি মরিবে। তোমার জীবনের শুধু এক ভাগ অবশিষ্ট আছে। ওহে ভালোমানুষ, তুমি বাঁচো। বাঁচা খুব ভালো। যদি বাঁচ, তবেই তো পুণ্য করিতে পারিবে।

৪. ব্রহ্মচর্য পালন ও অগ্নিহোত্রের পূজা করিলে. বহু পুণ্য সঞ্চিত হইবে। তবে আর নির্বাণের জন্য এত প্রয়াস কেন?

৫. নির্বাণের রাস্তা বড়ো কঠিন ও দুর্গম। এই গাথা কয়টি বলিয়া, মার বুদ্ধের পাশে দাঁড়াইল।

৬. যে এইসব কথা বলিল, সেই মারকে ভগবান কহিলেন, ওহে বিচারহীন লোকের বন্ধু, ওহে পাপী, তুমি এখানে কেন আসিয়াছ (তাহা আমি জানি)।

৭. ঐ রকম পুণ্যে আমার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। যে পুণ্য চায়, তাহাকেই গিয়া মার এইসব কথা বলুক।

৮. আমার শ্রদ্ধা আছে, বীর্য আছে, আর প্রজ্ঞাও আছে। আমি যখন এইভাবে আমার আদর্শের উপর চিত্ত ন্যস্ত করিয়াছি, তখন তুমি আমাকে বাঁচিবার জন্য কেন উপদেশ দিতেছ?

৯. এই বাতাসও হয়তো নদীর স্রোত শুকাইয়া ফেলিতে পারে। কিন্তু আমার চিত্ত আদর্শের উপর ন্যস্ত। (আমি প্রেষিতাত্মা); তাই তুমি আমার রক্ত শুষিয়া ফেলিতে পারিবে না।

১০. (কিন্তু আমারই চেষ্টাতে) যদি আমার রক্ত শুষিয়া যায়; আর যখন আমার মাংস ক্ষীণ হয়, তখন আমার চিত্ত অধিকতর প্রসন্ন হয়, এবং স্মৃতি, প্রজ্ঞা ও সমাধি ক্রমেই বাড়িতে থাকে।

১১. এইভাবে থাকিয়া, যখন আমি উত্তম সুখ অনুভব করি, তখন আমার চিত্ত কামভোগের দিকে আকৃষ্ট হয় না। আমার এই আত্মশুদ্ধি তুমি লক্ষ্য করো।

১২. (হে মার,) কামভোগ হইতেছে তোমার প্রথম সৈন্য, অরতি দ্বিতীয়, ক্ষুধা ও তৃষ্ণা তৃতীয় এবং বিষয়-বাসনা চতুর্থ সৈন্য।

১৩. পঞ্চমটি আলস্য, ষষ্ঠটি ভয়, সপ্তমটি কুসংশয়, অষ্টমটি অভিমান (কিংবা গর্ব)।

১৪. লাভ, সৎকার (সম্মান), পূজা এই তিনটি মিলিয়া নবম, আর মিথ্যা উপায়ে লব্ধ কীর্তিই হইতেছে তোমার দশম সৈন্য—ইহার জন্য লোকে আত্মপ্রশংসা ও পরনিন্দা করে।

১৫. হে কৃষ্ণবর্ণ নমুচি (দানব), (মানবের) প্রহারকারী এই তো তোমার সেনা। ভীতু মানুষ এই সেনাকে জয় করিতে পারে না। যে তাহাকে জয় করিতে পারে, শুধু সেই সুখ পায়।

১৬. এই দেখো, আমি আমায় মুঞ্জ[১] তৃণ ধারণ করিয়া আছি। এখন পরাজয় হইলে, আমার বাঁচিয়া থাকাই বৃথা। পরাজিত হইয়া বাঁচিয়া থাকার অপেক্ষা, সংগ্রামে মৃত্যু আসিলে ভালো।

১৭. কোনো কোনো শ্রমণ ব্রাহ্মণ তোমার সেনার সহিত মিশিয়া যাওয়ায়, তাহাদিগকে আর চিনিতে পারা যায় না, এবং যে পথে সাধুপুরুষরা যান, ঐ পথ তাহারা জানে না।

১৮. চারিদিকেই মারের সেনা দেখা যাইতেছে। আর মার তাহার বাহনাদি সহ যুদ্ধের জন্য সজ্জিত হইয়াছে। আমি তাহার সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য সম্মুখে অগ্রসর হইতেছি। কেননা, আমাকে দেখিতে হইবে, সে যেন আমার স্থানভ্রষ্ট করিতে না পারে।

১৯. দেবতা ও মানুষ তোমার সম্মুখে দাঁড়াইতে পারে না। কিন্তু লোকে যেমন ঢিল ছুঁড়িয়া মাটির হাঁড়ি ভাঙে, তেমনই আমার প্রজ্ঞাদ্বারা তোমার সেনাকে পরাজিত করি।

২০. আমি আমার দৃঢ় সংকল্পের উপর প্রভুত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া এবং আমার স্মৃতি জাগ্রৎ করিয়া বহু শ্রাবককে উপদেশ দিয়া দেশে দেশে ভ্রমণ করিব।

২১. তাহারা (ঐসব শ্রাবক) আমার উপদেশ অনুযায়ী অতি সন্তর্পণে জীবনপথে চলিয়া এবং নিজ নিজ আদর্শে চিত্ত স্থির রাখিয়া, তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে, এমন এক উচ্চপদে পৌছাইবে, যেখানে শোক করার কোনো প্রসঙ্গই আসে না।

---

১. "সংগ্রামে পরাজিত হইয়া পিছে হটিব না" এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিবার সময় মুঞ্জ নামক এক প্রকার তৃণ মাথায় বাঁধা হইত।

২২. (মার কহিল) সাত বৎসর পর্যন্ত আমি ভগবান বুদ্ধের পিছনে পিছনে ছুটিয়াছি; কিন্তু এই স্মৃতিমান্ ব্যক্তির কোনো রক্ষাকবচই আমি দেখিলাম না।

২৩. এখানে কিছু নরম পদার্থ পাওয়া যাইবে, কিছু মিষ্ট পদার্থ পাওয়া যাইবে, এইরূপ আশা করিয়া একটা কাক একটি মেদবর্ণ পাথরের কাছে আসিল।

২৪. কিন্তু উহাতে যে কিছুই লাভের আশা নাই, ইহা বুঝিতে পারিয়া কাকটা সেখান হইতে চলিয়া গেল। আমিও ঐ কাকের মতোই গোতমের নিকট হইতে নিরাশ হইয়া চলিয়া যাইতেছি।

২৫. এইভাবে যখন মার শোক করিতেছিল, তখন তাহার কাঁখ হইতে বীণাটি নীচে পড়িয়া গেল; আর সেই দুঃখী মার সেখানেই অন্তর্ধান করিল।

ললিতবিস্তরের অষ্টাদশ পরিচ্ছদে এই সুত্তের (সংস্কৃত) অনুবাদ আছে। ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে, সুত্তটি খুব প্রাচীন। উপরে ভয়-ভৈরব সুত্ত হইতে যে বিবরণটি আমরা দিয়াছি, তাহা পাঠ করিলে, এই সরল রূপকের অর্থ সহজেই বোধগম্য হয়। মনুষ্যজাতির কল্যাণের জন্য কেহ অগ্রসর হইলে, তাহাকে প্রথমেই যে-মারসেনা আক্রমণ করে, তাহা হইতেছে কামভোগের বাসনা। এই বাসনাকে জয় করিয়া, সম্মুখে পা ফেলিতে না ফেলিতেই অসন্তোষ (অরতি) উৎপন্ন হয়, তাহার পর, ক্ষুধা, পিপাসা প্রভৃতি, একটির পর আর-একটি আসিয়া উপস্থিত হয়; আর এইসব বাসনা ও রিপু জয় করিতে না পারিলে, কল্যাণপ্রদ তত্ত্বের সাক্ষাৎ পাওয়া কখনো সম্ভবপর নয়। অতএব বুদ্ধ যে মারকে পরাভূত করিয়াছিলেন, তাহার অর্থ এইভাবে বুঝিতে হইবে যে, ঐরূপ মনোবৃত্তিগুলি তিনি জয় করিয়াছিলেন।

সুজাতার দেওয়া ভিক্ষা

বৈশাখমাসের পূর্ণিমারাত্রিতে বোধিসত্ত্ব সম্বোধি লাভ করেন। ঐ দিন দুপুরে সুজাতা নামক একজন সদ্বংশীয়া যুবতী তাঁহাকে খুব ভালো অন্ন ভিক্ষা দিয়াছিল। এই কথার উল্লেখ সুত্তপিটকের অতি অল্প স্থানেই দেখিতে পাওয়া যায়।[১] আর এই প্রসঙ্গে ছাড়া অন্য কোনো প্রসঙ্গে সুজাতা নামের উল্লেখ দেখা যায় না। তথাপি বৌদ্ধচিত্রকলাতে সুজাতার স্থান অতি উচ্চে এবং বুদ্ধের নিকটও এই ঘটনাটি চিরস্মরণীয় হইয়া গিয়াছিল। চুন্দ নামক কর্মকারের দেওয়া ভিক্ষার অন্ন খাইয়া, ভগবান বুদ্ধ অসুস্থ হইয়া পড়েন। ইহাতে বুদ্ধ অনুমান করিলেন যে, শীঘ্রই তাঁহার পরিনির্বাণ হইবে, এবং তাঁহার দেহত্যাগের পর যাহাতে তাহারা চুন্দকে দোষ না দেয়, সেইজন্য তিনি আনন্দকে বলিলেন, "সম্বোধি লাভের দিন আমি যে ভিক্ষা পাইয়াছিলাম, ও আজ যে ভিক্ষা পাইয়াছি, এই দুইটিরই মূল্য সমান, এই কথা তুমি চুন্দকে বলিয়ো এবং এইভাবে তাহাকে সান্ত্বনা দিয়ো।

বোধিবৃক্ষের নীচে আসন

সুজাতার দেওয়া ভিক্ষা সঙ্গে লইয়া বোধিসত্ত্ব নৈরঞ্জনা নদীর তীরে গিয়া তাহা ভোজন

১. অঙ্গুত্তরনিকায় এককনিপাত। "বৌদ্ধসংঘাচা পরিচয়" পৃ ২৩৬

করিলেন; আর ঐ রাত্রিতে তিনি একটি অশ্বত্থ গাছের নীচে গিয়া বসিলেন। ঐ গাছটি আজ আর নাই। এই রকম কথিত আছে যে, রাজা শশাঙ্ক তাহা ধ্বংস করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার জায়গায় আর একটি অশ্বত্থ গাছ লাগানো হইয়াছিল। তাহারই গা ঘেঁষিয়া বুদ্ধগয়ার প্রসিদ্ধ মন্দির দাঁড়াইয়া আছে। ললিতবিস্তরে বর্ণিত আছে যে, বুদ্ধদেব ঐ গাছের নীচে যখন বসিয়াছিলেন, তখন আর একবার তাঁহার সহিত মারের যুদ্ধ হইয়াছিল। সংযুত্তনিকায়ের সগাথাবগ্‌গে এইরূপ বলা হইয়াছে যে, মার বুদ্ধকে ভুলাইবার জন্য তৃষ্ণা, অরতি ও রাগ নামক তাহার তিন কন্যাকে বোধিবৃক্ষের নীচে (ঐ অশ্বত্থ গাছের নীচে) পাঠাইয়াছিল। জাতকের নিদানকথাতে এই প্রসঙ্গে মার সেনা চারিদিক হইতে বুদ্ধকে কিভাবে আক্রমণ করিয়াছিল, তাহার বিস্তৃত বর্ণনা আছে। মারের সৈন্য দেখিয়া ব্রহ্মাদি দেবতারা পর্যন্ত পলাইয়া যায়। শুধু একা বোধিসত্ত্বই আপন জায়গাতে স্থির হইয়া থাকেন। তখন 'ঐ জায়গা আমার' এই কথা বলিয়া, মার বুদ্ধকে সেখান হইতে উঠিয়া যাইবার জন্য আদেশ করে; আর ঐ জায়গায় উপর তাহার যে অধিকার আছে, তাহা প্রমাণ করিবার জন্য নিজের সেনাকে দিয়া সাক্ষ্য দেওয়ায়। দেবতারা সব সেখান হইতে পলাইয়া যাওয়ায়, বুদ্ধের দিকে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য কাহাকেও পাওয়া গেল না। তখন বুদ্ধ তাঁহার ডান হাত নামাইয়া বলেন, "এই সর্বংসহা বসুন্ধরা আমার সাক্ষী", আর পৃথিবীদেবতা বিরাট রূপ ধারণ করিয়া, মার সেনাকে পরাভূত করেন—ইত্যাদি পৌরাণিক ধরনের বর্ণনা জাতক অট্‌ঠকথার লেখক দিয়াছেন।

বৌদ্ধ চিত্রকলার চিত্রকারগণ এই প্রসঙ্গটি খুব সন্দর করিয়া আঁকিয়াছেন। তাঁহারা লোভ, দ্বেষ, মোহ, মদ, মাৎসর্য ইত্যাদি খারাপ মনোবৃত্তিগুলিকে মূর্তিমান রূপ দেওয়ার যে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা বিশেষ প্রশংসার যোগ্য বলিয়া মনে হয়। প্রথমে কবিরা এই প্রসঙ্গের বর্ণনা দিলেন, ও তাহার পর চিত্রকাররা ঐ বর্ণনার মূর্তরূপ দেওয়ার চেষ্টা করিলেন, না প্রথমে চিত্রকাররা এই প্রসঙ্গটি ছবিতে ফুটাইয়া তুলিলেন ও তাহার পর কবিরা ভাষায় উহা বর্ণনা করিয়াছিলেন—তাহা বলা সম্ভবপর নয়। সে যাহাই হউক, এই কথাটুকু অন্তত সত্য যে, উক্ত বৌদ্ধ চিত্রগুলির উপর বর্ণিত মার সেনাকেই মূর্ত আকার দেওয়ার প্রচেষ্টা।

তত্ত্ববোধ

বৈশাখ মাসে সেই পূর্ণিমা রাত্রিতে, বোধিসত্ত্বের তত্ত্ববোধ হইয়াছিল আর তখন হইতে তাঁহাকে বুদ্ধ বলা হইয়া থাকে। অর্থাৎ ঐদিন পর্যন্ত গৌতম বোধিসত্ত্ব ছিলেন, আর সেই দিন হইতে গৌতম বুদ্ধ হইলেন। বুদ্ধ যে তত্ত্বের জ্ঞান লাভ করিলেন, সেই তত্ত্বটি হইতেছে চারিটি আর্য সত্য এবং তদন্তর্গত অষ্টাঙ্গিক মার্গ। এই তত্ত্বের উপদেশ তিনি প্রথমত তাহার সঙ্গী পাঁচজন সহচরকে দিয়াছিলেন। (এই প্রসঙ্গটি পরে বর্ণিত হইয়াছে, তাই এখানে তাহার আর বিবরণ দিতেছি না)।

বিমুক্তি সুখের আস্বাদ

তত্ত্ববোধ হওয়ার পর, ভগবান বুদ্ধ ঐ বোধিবৃক্ষের নীচে সাত দিন বসিয়া বিমুক্তি সুখের

আস্বাদ লইতেছিলেন, আর মহাবগ্‌গে ঐ প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে যে, রাত্রির তৃতীয় প্রহরে নিম্নলিখিত প্রতীত্য-সমুৎপাদ নামক তত্ত্বটি উল্টাপাল্টা ভাবে তাহার মনে আসিয়াছিল। কিন্তু সংযুত্তনিকায়ের দুইটি সুত্তে এইরূপ বলা হইয়াছে যে, বোধিসত্ত্ব থাকাকালেই, গোতম এই প্রতীত্য-সমুৎপাদ বুঝিতে পারিয়াছিলেন।[১] এই সুত্তগুলিতে যে বিবরণ আছে, তাহার সহিত মহাবগ্‌গের বিবরণের মিল হয় না। এইরূপ মনে হয় যে, যে সময় মহাবগ্‌গ লিখিত হইয়াছিল তখন প্রতীত্য-সমুৎপাদের তত্ত্বটি অযথা বেশি গুরুত্ব লাভ করিয়াছিল। নাগার্জুনের মতো মহাযানপন্থের আচার্যরা প্রতীত্যসমুৎপাদকে নিজেদের দর্শনের মূল ভিত্তিরূপেই গ্রহণ করিয়াছেন।[২]

প্রতীত্য-সমুৎপাদ

প্রতীত্য-সমুৎপাদের তত্ত্বটি সংক্ষেপে এইরূপ ঃ

অবিদ্যা হইতে সংস্কার, সংস্কার হইতে বিজ্ঞান, বিজ্ঞান হইতে নামরূপ, নামরূপ হইতে ষড়ায়তন, ষড়ায়তন হইতে স্পর্শ, স্পর্শ হইতে বেদনা, বেদনা হইতে তৃষ্ণা, তৃষ্ণা হইতে উপাদান, উপাদান হইতে ভব, ভব হইতে জাতি (জন্ম), এবং জাতি হইতে জরা, মরণ, শোক, পরিদেবন, দুঃখ, দৌর্মনস্য, উপায়াস উৎপন্ন হয়।

পূর্ণ বৈরাগ্য দ্বারা অবিদ্যা নিরোধ করিলে সংস্কারের নিরোধ হয়। সংস্কারের নিরোধ দ্বারা বিজ্ঞানের নিরোধ হয়। বিজ্ঞানের নিরোধ দ্বারা নামরূপের নিরোধ হয়। নামরূপের নিরোধ দ্বারা ষড়ায়তনের নিরোধ, ষড়ায়তনের নিরোধ দ্বারা স্পর্শের নিরোধ, স্পর্শের নিরোধ দ্বারা বেদনার নিরোধ, বেদনার নিরোধ দ্বারা তৃষ্ণার নিরোধ, তৃষ্ণার নিরোধ দ্বারা উপাদানের নিরোধ, উপাদানের নিরোধ দ্বারা ভবের নিরোধ, ভবের নিরোধ দ্বারা জন্মের নিরোধ, জন্মের নিরোধ দ্বারা জরা, মরণ, শোক, পরিদেবন, দুঃখ, দৌর্মনস্য, উপায়াস, এইসবগুলির নিরোধ হয়।

দুঃখের পশ্চাতে এতগুলি কারণের পরম্পরা জুড়িয়া দেওয়ায় তাহা সাধারণ মানুষের পক্ষে বুঝা বড়োই কঠিন হইয়াছে। হইতে হইতে এই প্রতীত্য-সমুৎপাদ একটি গহন তত্ত্বের আকার ধারণ করিল এবং তত্ত্ব সম্বন্ধে বাদ-বিবাদ হইতে থাকিল। নাগার্জুনাচার্য তাহার মাধ্যমককারিকা গ্রন্থ এই প্রতীত্য-সমুৎপাদের ভিত্তির উপরেই রচনা করিয়াছেন; আর বুদ্ধঘোষাচার্য তাঁহার বিশুদ্ধিমার্গের ষষ্ঠাংশ (প্রায় একশো সোয়া শো পৃষ্ঠা) এই প্রতীত্য-সমুৎপাদের আলোচনাতেই ব্যয় করিয়াছেন। এইসব আলোচনা ও বাদবিবাদ পাঠ করিলে বিদ্বান্ ব্যক্তিদেরও গোলমাল হইয়া যায়; তবে আর সাধারণ লোক এই দার্শনিক তত্ত্ব কি করিয়া বুঝিবে; ভগবান বুদ্ধের ধর্ম যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় প্রভৃতি উচ্চবর্ণের লোকদের অপেক্ষা নিম্নশ্রেণীর লোকদের মধ্যে বিশেষভাবে ছড়াইয়াছিল, তাহা এইরূপ গহন দার্শনিক তত্ত্বের জন্য নহে। চারি আর্যসত্যের তত্ত্ব একেবারেই সাদাসিধা। ইহা যদি সর্বপ্রকার লোকের

১. নিদানবগ্‌গ সংযুক্ত। সুত্ত ১০ এবং ৬৫ দ্রষ্টব্য।

২. মাধ্যমক-কারিকার প্রারম্ভ দ্রষ্টব্য।

নিকট সত্য বলিয়া মনে হয়, তাহা হইলে বিস্মিত হইবার কোনো কারণ নাই। শীঘ্রই এই তত্ত্ব আলোচিত হইবে।

ব্রহ্মদেবের অনুরোধ

তত্ত্ববোধ হওয়ার পর, ভগবান বুদ্ধ এক সপ্তাহ বোধিবৃক্ষের নীচে (অর্থাৎ সেই অশ্বত্থের নীচে) কাটাইয়া ছিলেন, ইহা আগে বলা হইয়াছে। ইহার পর দ্বিতীয় সপ্তাহ, তিনি অজপাল ন্যগ্রোধ বৃক্ষের নীচে, তৃতীয় সপ্তাহ মুচলিন্দ বৃক্ষের নীচে এবং চতুর্থ সপ্তাহ রাজায়তন বৃক্ষের নীচে কাটাইয়া, পুনরায় অজপাল বৃক্ষের নীচে আসিলেন। সেখানে তাঁহার মনে এই চিন্তাটি আসিল, 'আমি তো অত্যন্ত কষ্ট করিয়া এই ধর্মের তত্ত্ব জানিয়াছি তখন ইহার সম্বন্ধে আবার জনসাধারণকে উপদেশ দিয়া অধিক কষ্ট পাওয়া ঠিক হইবে না। ব্রহ্মদেব তাঁহার মনের এই কথা জানিলেন এবং জনসাধারণকে ধর্মোপদেশ দেওয়ার জন্য তিনি ভগবান বুদ্ধের নিকট প্রার্থনা করিলেন। এইসব কথা বিস্তৃতভাবে মহাবগ্‌গে ও মজ্‌ঝিমনিকায়ের অরিয়পরিয়েসমসুত্তে বর্ণনা করা হইয়াছে। কিন্তু সম্ভবত এইসব কথা আদৌ গৌতম বুদ্ধের সম্বন্ধেই নয়। কোনো পুরাণের রচয়িতা এই কাহিনীটি বিপস্‌সীবুদ্ধের সম্বন্ধে রচনা করিয়াছিলেন এবং উহা যেরূপ ছিল পরে ঠিক সেই রূপেই, গোতম বুদ্ধের জীবন চরিতেও সমাবিষ্ট হইয়াছিল। আমি 'বুদ্ধ, ধর্ম আণি সংঘ' এই পুস্তকে (পৃ. ১৬-১৯) এই রূপকের অর্থ বাহির করিতে চেষ্টা করিয়াছি, সুতরাং এখানে তাহার সম্বন্ধে আর চর্চা করিতেছি না।

পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুদিগকে উপদেশ দেওয়ার সংকল্প

ভগবান বুদ্ধ মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, "আমি যে চারিটি আর্যসত্যের জ্ঞান লাভ করিয়াছি সর্বাগ্রে কাহাকে তাহা দান করিব? যদি আলার কালাম ও উদ্দক রামপুত্ত, বোধিসত্ত্বের এই দুইজন গুরু, ঐ সময় জীবিত থাকিতেন, তাহা হইলে এই নবীন ধর্মমার্গ তাহাদিগকে বলিবামাত্র, তাঁহারা, উহা গ্রহণ করিতেন। কিন্তু তাঁহারা তখন জীবিত ছিলেন না। সুতরাং ভগবান বুদ্ধ স্থির করিলেন যে, তাঁহার যে পাঁচ জন সাথী (পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষু) ছিল, তাহাদিগকেই এই চারটি আর্যসত্য সম্বন্ধে উপদেশ দিবেন। উক্ত পাঁচ জন ভিক্ষু ঐ সময় কাশীর নিকট ঋষিপত্তনে থাকিত। ভগবান বুদ্ধ ঐ দিকে রওনা হইলেন। রাস্তায় উপক একজন আজীবক শ্রমণের সহিত তাঁহার দেখা হইল। বুদ্ধ তাহাকে বলিলেন যে, তাঁহার তত্ত্ববোধ হইয়াছে। কিন্তু উপকের নিকট তাহা সত্য বলিয়া মনে হইল না। "হয়তো তোমার তত্ত্ববোধ হইয়া থাকিবে" এইরূপ বলিয়া সে অন্য রাস্তায় চলিয়া গেল। এই একটি ঘটনা হইতেই ভগবান বুদ্ধ বুঝিতে পারিলেন যে, অন্যপন্থের শ্রমণদিগকে উপদেশ দেওয়া নিরর্থক।

বুদ্ধকর্তৃক পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুদের মত পরিবর্তন

আষাঢ় মাসের পূর্ণিমার পূর্বে ভগবান বুদ্ধ বারাণসীতে পৌঁছিলেন। তিনি ঋষিপত্তনে

আসিলে, তাঁহাকে দূর হইতে দেখিয়াই, পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুরা স্থির করিল যে, তাঁহাকে উহাদের কেহই অভ্যর্থনা করিবে না। কিন্তু তিনি যতই তাহাদের নিকটে আসিতে লাগিলেন, ততই তাহাদের এই সংকল্পের জোর কমিতে থাকিল। ক্রমে তাহারা বুদ্ধের যথাযোগ্য অভ্যর্থনা করিল। কিন্তু তাহারা তাঁহার নূতন ধর্মমার্গ শুনিতে রাজী হইল না। ভগবান বুদ্ধ যখন তাহাদিগকে বলিলেন, "আমি এক নূতন ধর্মমার্গ পাইয়াছি, তখন তাহারা কহিল, "হে আয়ুষ্মান্ গোতম, তুমি ঐ যে কঠিন তপস্যা করিয়াছিলে, তাহাতেও তোমার সদ্ধর্ম মার্গের জ্ঞান হয় নাই। আর এখন তো তুমি তপোভ্রষ্ট হইয়া খাওয়া দাওয়ার দিকে মতি ফিরাইয়াছ। তোমার মতো লোক কি করিয়া সদ্ধর্ম জানিবে?"

ভগবান কহিলেন, "হে ভিক্ষুগণ, ইহার পূর্বে আমি কখনো বৃথা বড়াই করিয়াছি কি? যদি না করিয়া থাকি, তাহা হইলে তোমরা আমার কথা মন দিয়া শুন। আমি অমৃতের খণ্ড পাইয়াছি। এই মার্গ অবলম্বন করিলে, তোমরা অবিলম্বে মুক্তি লাভ করিবে।" এইভাবে পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুদিগকে বুঝাইয়া কিছুদিন পরে তিনি তাহাদিগকে তাঁহার নূতন ধর্ম শুনিতে রাজী করাইলেন। ঐ প্রসঙ্গে তিনি যে উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহাকে "ধর্মচক্র প্রবর্তন" বলে। এই সুত্তটি সচ্চসংযুত্তের দ্বিতীয় বগ্‌গে এবং বিনয়গ্রন্থের মহাবগ্‌গে পাওয়া যায়। ললিতবিস্তরের ষড়বিংশ অধ্যায়ে ইহার সংস্কৃত অনুবাদ দেওয়া আছে আমি এখানে পালিসুত্তের সারমর্ম দিতেছি।

ধর্মচক্র প্রবর্তন

আমি এইরূপ শুনিয়াছি। এককালে ভগবান বুদ্ধ বারাণসীতে ঋষিপত্তনের মৃগবনে থাকিতেন। সেখানে ভগবান পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুদিগকে উদ্দেশ করিয়া বলিয়াছিলেন, "হে ভিক্ষুগণ, ধার্মিক মনুষ্য (পব্বজিতেন) কখনো এই দুইটি "অন্তে" যাইবে না। ঐ দুইটি "অন্ত" কি? প্রথম অন্ত হইতেছে, কামোপভোগে সুখ আছে, এইরূপ মানিয়া লওয়া; এই অন্তটি অত্যন্ত হীন, গ্রাম্য, সামান্যজনসেবিত, অনার্য এবং অনর্থাবহ। দ্বিতীয় অন্তটি হইতেছে শরীরকে কষ্ট দেওয়া; এই অন্তটি দুঃখজনক, অনার্য এবং অনর্থাবহ। এই দুই অন্তে না গিয়া, তথাগত এমন একটি মধ্যম মার্গ আবিষ্কার করিয়াছেন, যাহা জ্ঞানচক্ষু উৎপন্ন করে, যাহা উপশম, প্রজ্ঞা, সম্বোধ এবং নির্বাণের কারণীভূত হয়। ঐ মধ্যম মার্গটি কি? সম্যক্ দৃষ্টি, সম্যক্ সংকল্প, সম্যক্ বাক্, সম্যক্ কর্মান্ত, সম্যক্ আজীব, সম্যক্ ব্যায়াম, সম্যক্ স্মৃতি, সম্যক্ সমাধি, ইহাই আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ।"

"হে ভিক্ষুগণ, দুঃখনামক প্রথম আর্যসত্যটি এইরূপ। জন্ম দুঃখজনক। জরা দুঃখজনক। ব্যাধি দুঃখজনক। মরণ দুঃখজনক। অপ্রিয়ের সমাগম ও প্রিয়ের বিয়োগ দুঃখজনক। অভীষ্ট বস্তু না পাইলে তাহা হইতেও দুঃখ হয়। সংক্ষেপে পাঁচটি উপাদানস্কন্ধ দুঃখজনক'।[১]

---

১. স্কন্ধের সংখ্যা পাঁচ। এই স্কন্ধ বাসনাময় হইলে তাহাকে উপাদান স্কন্ধ বলে।—'বুদ্ধ আনি সংঘ', ৯০-৯১ দ্রষ্টব্য।

"হে ভিক্ষুগন, বারাবার উৎপন্ন হয় এমন যে, বিবিধবিষয়ে বিচরণকারী তৃষ্ণা—যাহাকে কামতৃষ্ণা, ভবতৃষ্ণা এবং বিনাশতৃষ্ণা বলে—এইটি দুঃখসমুদয় নামক দ্বিতীয় আর্যসত্য।"

"বৈরাগ্যের সাহায্যে, ঐ তৃষ্ণা পূর্ণভাবে নিরোধ করা, উহা ত্যাগ করা, তাহা হইতে মুক্তি লাভ করা, ইহাই দুঃখনিরোধ নামক তৃতীয় আর্যসত্য।"

"এবং (উপরি-কথিত) আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গই দুঃখনিরোধগামিনী প্রতিপদা নামক চতুর্থ আর্যসত্য।"

"(ক) ইহা দুঃখ, এরূপ যখন আমি বুঝিতে পারিলাম, তখন আমাতে অভিনব দৃষ্টি উৎপন্ন হইল, জ্ঞান উৎপন্ন হইল, বিদ্যা উৎপন্ন হইল, এবং আলোক উৎপন্ন হইল। এই দুঃখকে জানা উচিত, আমি যখন এইরূপ বুঝিলাম, তখন আমাতে অভিনব দৃষ্টি (ইত্যাদি)......ইহা দুঃখ, এইরূপ যখন আমি জানিলাম, তখন আমাতে (ইত্যাদি).......

"(খ) যখন আমি জানিলাম যে, এই দুঃখসমুদয় একটি আর্যসত্য, তাহা ত্যাজ্য, এবং আমি তাহা ত্যাগ করিয়াছি, তখন আমাতে অভিনব দৃষ্টি উৎপন্ন হইল (ইত্যাদি পূর্বোক্ত).......

"(গ) এই দুঃখনিরোধ একটি আর্যসত্য এইরূপ যখন আমি জানিলাম, তাহার সহিত সাক্ষাৎ পরিচয় করা সমীচীন, এইরূপ যখন আমি জানিলাম, এবং তাহার সহিত আমার সাক্ষাৎ পরিচয় হইয়াছে, এইরূপ যখন জানিলাম, তখন আমাতে অভিনব দৃষ্টি (ইত্যাদি পূর্বোক্ত).......

"(ঘ) আমি যখন জানিলাম যে, এইটি দুঃখনিরোধগামিনীপ্রতিপদা নামক একটি আর্যসত্য, তাহা অভ্যাস করা সমীচীন এবং তাহার অভ্যাস করিয়াছি, তখন আমাতে অভিনব দৃষ্টি উৎপন্ন হইল, জ্ঞান উৎপন্ন হইল, বিদ্যা উৎপন্ন হইল এবং আলোক উৎপন্ন হইল। যতক্ষণ পর্যন্ত প্রত্যেকটিতে তিনটি করিয়া ও মোটের উপর বারোটি সত্য, এইভাবে এই চারিটি আর্যসত্যের জ্ঞান আমার হয় নাই, ততক্ষণ পর্যন্ত আমি পূর্ণ সম্বোধি লাভ করি নাই।"

বুদ্ধ যেসব উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে অনেকগুলি সুত্তপিটকে সংগৃহীত হইয়াছে। কিন্তু যদি বুদ্ধের ধর্মের মূল ভিত্তি বলিয়া তাঁহার কোনো একটি উপদেশ থাকিয়া থাকে, তাহা হইলে উহা একটিই। শুধু সচ্চসংযুত্তেই এই চারিটি আর্যসত্য সম্বন্ধে সর্বসমেত ১৩১টি সুত্ত আছে। তাহা ছাড়া, অন্যান্য নিকায়েও বারবার ইহার উল্লেখ পাওয়া যায়। বুদ্ধের অন্যান্য সব উপদেশ এই চারটি আর্যসত্যের অনুযায়ী হওয়ায়, ইহার গুরুত্ব খুব বেশি।

উপরের বিবরণে, ক হইতে ঘ পর্যন্ত যেসব তথ্য দেওয়া হইয়াছে, সেগুলি শুধু সচ্চসংযুত্তের একটি মাত্র সুত্তে এবং মহাবগ্‌গে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার উল্লেখ অন্য কোথাও নাই। এইজন্য দৃঢ় সন্দেহ হয় যে, এইগুলি পরবর্তীকালে সুত্তের ভিতর রাখা হইয়া

থাকিবে। তথাপি উক্ত চারিটি আর্যসত্যের ব্যাখ্যা করিতে ইহাদের সাহায্যে হওয়া সম্ভবপর বলিয়া, এইগুলি এখানে দেওয়া হইল।

চারিটি আর্যসত্যের ব্যাখ্যা

পৃথিবীতে যে দুঃখ আছে, এ কথা কেহই অস্বীকার করিতে পারে না। কিন্তু সকলেই নিজ নিজ দুঃখ কি করিয়া নষ্ট হইবে, শুধু এই চিন্তাই করে। ইহার ফল এই যে, অপরকে মারিয়াও প্রত্যেক ব্যক্তি নিজে সুখী হইতে চায়। ইহাদের মধ্যে যাহারা হিংস্রপ্রকৃতি ও বুদ্ধিমান, তাহারা নেতা হয়; আর অন্য সকলকে তাহাদের অধীন হইয়া থাকিতে হয়। ইহাদের বুদ্ধি হিংসাপ্রধান বলিয়া, এইসব নেতাদের মধ্যেও একতা থাকে না। এবং তাহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশি হিংস্র-প্রকৃতি ও বুদ্ধিমান নেতাকে নিজেদের রাজা করিয়া, তাহারই কথামতো সকলকে চলিতে হয়। রাজাও ভয় করেন যে, অন্য রাজা তাহার রাজ্য লইয়া যাইবেন এবং নিজকে সুরক্ষিত করার জন্য, তিনি তখন যাগযজ্ঞ করিয়া, অনেক পশু বলি দেন। যদি মনুষ্য ও ইতরপ্রাণীর ক্লেশদায়ক সমাজব্যবস্থা নষ্ট করিয়া তাহার পরিবর্তে অন্য কোনো হিতকর ও সুখকর সমাজব্যবস্থা দাঁড় করাইতে হয় তাহা হইলে নিজের এবং অপরের দুঃখ এক, প্রত্যেকের এইরূপ জ্ঞান হওয়া প্রয়োজন; এবং এইজন্যই ভগবান বুদ্ধ প্রথম আর্যসুত্তটিতে সর্ব-প্রাণী-সাধারণ দুঃখের সমাবেশ করিয়াছেন। শ্রমণরা যে জন্ম, জরা, মরণ ইত্যাদি সর্বসাধারণ দুঃখের অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন শুধু তাহাই নহে; অধিকন্তু এই দুঃখের বিনাশ করিবার জন্যই তাঁহারা তপস্যা করিতেন। কিন্তু দুঃখের কারণ যে ঠিক কী, এই সম্বন্ধে তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে মতভেদ ছিল। কেহ বলিতেন আত্মাই দুঃখ উৎপন্ন করিয়াছে (সয়ংকতং দুক্‌খং); কেহ কহিতেন দুঃখ অন্যে উৎপন্ন করিয়াছে (পরংকতং দুক্‌খং); তৃতীয় কেহ কেহ কহিতেন দুঃখ কিয়দংশে আত্মা উৎপন্ন করিয়াছে, আর কিয়দংশে অন্যেরা উৎপন্ন করিয়াছে (সয়ং কতং চ পরং কতং চ দুঃক্‌খং)।[১] ইহাতে প্রথম শ্রেণীর শ্রমণ মানে নির্গ্রন্থ (জৈন) প্রভৃতি। তাঁহারা এইরূপ মানিতেন যে, আত্মা পূর্বজন্মে পাপ করায় দুঃখ উৎপন্ন হইয়াছে; এবং তাঁহারা এই দুঃখ পরিহারের জন্য শরীর-পীড়ন করিয়া আত্মাকে কষ্ট দিতেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর শ্রমণ মানে সাংখ্যমতাবলম্বী প্রভৃতি। তাঁহারা মনে করিতেন যে, জড়-প্রকৃতি হইতে দুঃখ উৎপন্ন হইয়াছে; এবং আত্মাকে প্রকৃতির অধীনতা হইতে মুক্ত করিবার জন্য তাঁহারা খরতর তপস্যা করিতেন। তৃতীয় প্রকার শ্রমণরা এইরূপ প্রতিপাদন করিতেন যে, আত্মা ও প্রকৃতি উভয়ে মিলিয়া দুঃখ উৎপন্ন করে; এবং তাঁহারা আত্মাকে ঐ দুঃখ হইতে মুক্ত করিবার জন্য দেহ-পীড়ন অভ্যাস করিতেন। চতুর্থ প্রকার শ্রমণরা দুঃখকে আকস্মিক বলিয়া মানিতেন; সুতরাং তাহাদের অক্রিয়বাদের দিকে প্রবণতা ছিল। এইভাবে, শ্রমণরা হয় নিষ্ফল তপস্যা সাধন করিতেন, নয় নিষ্ক্রিয় হইয়া যাইতেন। তাহাদের দ্বারা জনসাধারণের অতি অল্পই উপকার হইত।

ভগবান বুদ্ধ প্রথম ইহা দেখাইলেন যে, দুঃখের প্রকৃত কারণ আত্মাও নয়, অথবা প্রকৃতিও নয়, উহা হইতেছে মানুষের তৃষ্ণা। পূর্বজন্মের এবং বর্তমান জন্মের তৃষ্ণা হইতেই

১. নিদানবগ্‌গ সংযুক্ত, বগ্‌গ ২. সুত্ত ৭।

সব দুঃখ উৎপন্ন হয়। তৃষ্ণা কোথা হইতে আসিল, এই প্রশ্ন নিরর্থক। উহা যতক্ষণ পর্যন্ত থাকিবে, ততক্ষণ পর্যন্ত দুঃখ উৎপন্ন হইবেই। ইহা হইল দ্বিতীয় আর্যসত্য।

তৃষ্ণার বিনাশ করিয়াই মানুষ দুঃখ হইতে মুক্ত হয়, ইহা তৃতীয় আর্যসত্য।

তৃষ্ণানাশের উপায় হইতেছে দুই অন্তের মধ্যবর্তী আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ। ইহাই চতুর্থ আর্যসত্য।

অষ্টাঙ্গিক মার্গের ব্যাখ্যা

এই আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গের প্রথম সিঁড়ি হইতেছে সম্যক্ দৃষ্টি। সম্যক্ দৃষ্টি মানে চার আর্যসত্যের যথার্থ জ্ঞান। পৃথিবী দুঃখে পূর্ণ হইয়া আছে। এই দুঃখ মানবজাতির তীব্র তৃষ্ণা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। ঐ তৃষ্ণা বিনাশ করিলে সকলেই শান্তি পাইতে পারে এবং পরস্পরের প্রতি কায়মনোবাক্যে সদাচার, সত্য, প্রেম এবং আন্তরিকতার সহিত আচরণ করা ইহাই আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ; আর এই মার্গই সেই শান্তির পথ। এইপ্রকার সম্যক্ দৃষ্টি জনসাধারণের ভিতর না জন্মিলে অহংকার ও স্বার্থ হইতে উৎপন্ন নানা কলহ ও বিবাদ কখনো থামিবে না এবং জগতে কখনো শান্তি স্থাপিত হইবে না।

যদি প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের ঐশ্বর্য ও ক্ষমতা বাড়াইবার সংকল্প করে, তাহা হইলে উহা দ্বারা নিজে এবং অপরে সমানভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে বাধ্য। এইজন্য কামভোগে আবদ্ধ না থাকিবার, অপরের উপর পূর্ণ মৈত্রীভাব পোষণ করিবার এবং অন্যের সুখশান্তি বাড়াইবার সংকল্প পোষণ করা সমীচীন।

মিথ্যা বলা, গলাবাজি করা, গালি দেওয়া, বৃথা বকিয়া যাওয়া, ইত্যাদি অসৎ বাণীর দ্বারা সমাজযন্ত্রে গোলমাল হয়, ঝগড়া উৎপন্ন হয়, আর এইগুলি জীবহিংসার কারণ; সুতরাং সত্যকথা, যেসব কথায় পরস্পরের মধ্যে বন্ধুত্ব উৎপন্ন হয় সেইরূপ কথা এবং প্রিয় ও মিত ভাষণ, এইসব আচরণ করা সমীচীন। ইহাকেই সম্যক্ বাণী বলে।

প্রাণনাশ, চুরি, ব্যভিচার, ইত্যাদি শারীরিক কর্ম আচরণ করিলে, তাহা হইতে সমাজের বড়ো ক্ষতি হয়। এইজন্য প্রাণনাশ, চুরি, ব্যাভিচার ইত্যাদি কর্ম হইতে অলিপ্ত থাকিয়া, লোকের কল্যাণ হইবে, এইরূপ কর্ম করা আবশ্যক। ইহকেই সম্যক্ কর্মান্ত কহে।

সম্যক্ আজীব মানে যেরকম উপায়ে সমাজের অনিষ্ট হইবে না, সেইরকম উপায়ে নিজের জীবিকা অর্জন করা। উদাহরণস্বরূপ, গৃহস্থ মদ্য বিক্রয় করিবে না; পশু ক্রয় বিক্রয় করিবে না ও তৎসদৃশ অন্যান্য ব্যবসায় করিবে না। এইসব ব্যবসায় হইতে যে সমাজের নানা রকম অনিষ্ট হয়, তাহা সুস্পষ্ট। এই রকম ব্যবসায় বর্জন করিয়া বিশুদ্ধ এবং সরল উপায়ে নিজের জীবিকা উপার্জন করা, ইহাকেই সম্যাক্ আজীব বলে।

যেসব খারাপ চিন্তা মনে আসে নাই, তাহাদিগকে মনে আসিবার অবকাশ না দেওয়া, যেসব খারাপ চিন্তা মনে আসিয়াছে, তাহাদিগকে নাশ করা, যেসব ভালো চিন্তা মনে উৎপন্ন হয় নাই তাহাদিগকে উৎপন্ন করার এবং যেসব ভালো চিন্তা মনে আসিয়াছে

তাহাদিগকে বাড়াইয়া পরিপূর্ণ করিবার চেষ্টা—এই চারিটি মানসিক প্রযত্নকে সম্যক্ ব্যায়াম কহে (শারীরিক ব্যায়ামের সহিত ইহার কোনো সম্বন্ধ নাই)।

শরীর কতকগুলি অপবিত্র পদার্থদ্বারা নির্মিত হইয়াছে, এই বিবেক জ্ঞানটি সর্বদা সজাগ রাখা, শরীরের সুখদুঃখাদি বেদনার দিকে বারবার অবলোকন করা, নিজের চিত্তকে অবলোকন করা, ইন্দ্রিয় ও তাহাদের বিষয় হইতে কী কী বন্ধন উৎপন্ন হয় এবং এইসব বন্ধন কি করিয়া নাশ করা যাইতে পারে, মনের সম্বন্ধে এইসব বিষয়ে নির্ভুলভাবে চিন্তা করা, ইহাকেই সম্যক্ স্মৃতি বলে।

নিজের শরীরের উপর, মৃত দেহের উপর, মৈত্রী, করুণা প্রভৃতি মনোবৃত্তির উপর, কিংবা পৃথিবী, জল, তেজ ইত্যাদি পদার্থের উপর, চিত্ত একাগ্র করিয়া চারিটি ধ্যান সম্পাদন করা, ইহাকে সম্যক্ সমাধি বলে।[১]

দুই অন্তের কোনো দিকে না গিয়া, এই মধ্যম মার্গের ভাবনা করিতে হইবে। প্রথম অন্তটি হইতেছে কামোপভোগের মধ্যে সুখ মানা; এই অন্তটির সহিত 'হীন' 'গ্রাম্য' 'সামান্যজনসেবিত', 'অনার্য', ও 'অনর্থাবহ' (হীনো গম্মো পোথুজ্জনিকো অনরিয়ো অনত্থসংহিতো) এই পাঁচটি বিশেষণ লাগানো হইয়াছে। মনুষ্যজাতি দারিদ্র্যে এবং অজ্ঞানে ছট্‌ফট্ করিতেছে, এমন অবস্থায় আমি নিজে বিষয়ভোগে আনন্দ মানিতেছি, ইহার মতো আর কী নীচ জিনিস থাকিতে পারে? এই অন্তটি গ্রাম্য অর্থাৎ অশিক্ষিত লোকের। উহা সর্বসাধারণ লোকের। উহা আর্যদিগকে (ধীর ও বীর লোকদিগকে) শোভা পাইবার মতো নয়; আর উহা অনর্থজনক। দ্বিতীয় অন্তটি হইতেছে দেহকে কষ্ট দেওয়া। ইহার সম্বন্ধে 'নীচ' ও 'গ্রাম্য' এই বিশেষণ দুইটি প্রয়োগ করা হয় নাই। কিন্তু ইহাও দুঃখজনক এবং ধীর ও বীর লোকদিগকে শোভা পাওয়ার মতো নয় এবং উহা অনর্থাবহ (দুঃক্‌খো অনরিয়ো অনত্থসংহিতো)। অষ্টাঙ্গিক মার্গের যতগুলি অঙ্গ আছে, সবগুলিই এই দুইটি অন্ত বর্জন করে।

উদাহরণস্বরূপ, পানাহার করা, মজা উপভোগ করা এইগুলি সুখলোলুপ লোকের আদর্শ, আর উপবাস প্রভৃতি ব্রতদ্বারা শরীর কৃশ করা এইটি তাপসদের আদর্শ। এই দুই আদর্শের মধ্যবর্তী আদর্শটি হইতেছে চারিটি আর্যসত্যের জ্ঞান। এইভাবে অষ্টাঙ্গিক মার্গের অন্যান্য অঙ্গগুলিও ঐ দুই অন্তের মধ্যবর্তী বলিয়া জানিবে।[২]

---

১. এইসব পদার্থের উপর মন একাগ্র করিয়া কিভাবে ধ্যান সম্পাদন করা যায় তাহার বিবরণ সমাধি মার্গে দেওয়া হইয়াছে।

২. চার আর্যসত্যের সম্বন্ধে খুঁটিনাটি খবর 'বুদ্ধ, ধর্ম আণি সংঘ' এই পুস্তকের তৃতীয় পরিশিষ্টে (পৃ. ৯৪-৯৯) দেওয়া হইয়াছে; পাঠক তাহাও দেখিবেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

শ্রাবক সংঘ

পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুদের বিবরণ

যে পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুদিগকে ভবগান বুদ্ধ সর্বাগ্রে ধর্ম সম্বন্ধে উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহাদের বর্ণনা সুত্তপিটকে খুব অল্পই পাওয়া যায়। সকলের আগে, যে ব্যক্তি (বুদ্ধের নিকট হইতে) বৌদ্ধধর্মের তত্ত্ব জানিয়াছিলেন, সেই 'অজ্ঞাত কৌণ্ডিন্য' বহুকাল পর রাজগৃহে আসিয়া বুদ্ধকে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়াছিলেন, এইরূপ উল্লেখ সংযুত্তনিকায়ের বঙ্গীস সংযুত্তে (সংখ্যা ৯) পাওয়া যায়। দ্বিতীয় পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষু অস্‌সজির (অশ্বজিৎ) রাজগৃহে অসুখ হইয়াছিল, এবং তখন তাহাকে ভগবান উপদেশ দিয়াছিলেন এইরূপ বিবরণ খন্ধসংযুত্তের ৮৮তম সুত্তে দেখিতে পাওয়া যায়। এই দুইজন ছাড়া পঞ্চবর্গীয় বাকী তিনজন ভিক্ষুর নাম সুত্তপিটকে আদৌ পাওয়া যায় না।

জাতকের নিদানকথাতে এবং অন্যান্য অট্‌ঠকথাতে এই পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুদের সম্বন্ধে অল্পবিস্তর খবর পাওয়া যায়। তাহার সার এই—

রামো ধজো লক্‌খণো চাপি মন্তী
কোণ্ডঞ্‌ঞো চ ভোজো সুযামো সুদত্তো।
এতে তদা অট্‌ঠ অহেসুং ব্রাহ্মণা
ছলংগবা মন্‌তং ব্যাকরিংসু॥

'রাম, ধ্বজ, লক্‌খণ (লক্ষ্মণ), মন্তী (মন্ত্রী), কোণ্ডঞ্ঞ (কৌণ্ডিন্য), ভোজ, সুযাম ও সুদত্ত এই আট জন ষড়ঙ্গবেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ ছিলেন, ইঁহারা বোধিসত্ত্বের জন্ম-পত্রিকা তৈয়ার করিয়াছিলেন।'

ইহাদের মধ্যে সাত ব্যক্তি এইরূপ দ্বিধাযুক্ত মত ব্যক্ত করিয়াছিলেন যে যদি বোধিসত্ত্ব গৃহস্থাশ্রমে থাকেন, তাহ হইলে তিনি রাজচক্রবর্তী হইবেন; আর যদি তিনি গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হন, তাহা হইলে তিনি সম্যক্ সংবুদ্ধ হইবেন। এই আটজনের মধ্যে কৌণ্ডিন্য একেবারে তরুণ ছিলেন। তিনি নিঃসন্দিগ্ধভাবে এইরূপ ভবিষ্যদ্‌বাণী করিয়াছিলেন যে, বোধিসত্ত্ব অবশ্যই সম্যক সংবুদ্ধ হইবেন। যাঁহারা দ্বিধাযুক্ত ভবিষ্যদ্‌বাণী করিয়াছিলেন, সেই সাতজন ব্রাহ্মণ নিজ নিজ গৃহে গিয়া নিজেদের পুত্রদিগকে কহিলেন, ''আমরা এখন বৃদ্ধ হইয়াছি। রাজকুমার সিদ্ধার্থ যদি সংবুদ্ধ হন তাহা হইলে তাহা দেখা আমাদের অদৃষ্টে নাই। যদি তিনি সংবুদ্ধ হন তাহা হইলে তোমরা তাহার সংঘে যোগদান করিয়ো।''

বোধিসত্ত্ব যখন গৃহত্যাগ করিলেন, তখন শুধু কৌণ্ডিন্যই জীবিত ছিলেন। তিনি বাকী সাতজন ব্রাহ্মণের পুত্রদের নিকট গিয়া কহিলেন, ''সিদ্ধার্থকুমার পরিব্রাজক হইয়াছেন। তিনি নিশ্চয়ই সংবুদ্ধ হইবেন। তাঁহার অনুসরণ করিয়া চলো, আমরাও পরিব্রাজক হইব।'' এইসব যুবকের মধ্যে চারজন কৌণ্ডিন্যের কথা শুনিল এবং তাহার সহিত সন্ন্যাস

গ্রহণ করিয়া বোধিসত্ত্বকে অনুসরণ করিল। পরে এই পাঁচজন পঞ্চবর্গীয় নামে খ্যাত হইয়াছিল। তাহাদের নাম মহাবগ্‌গ ও ললিতবিস্তরে পাওয়া যায়। নামগুলি এইঃ কোণ্ডিঞ্‌ঞ (কৌণ্ডিন্য), বপ্প (বাষ্প), ভদ্দিয় (ভদ্রিক), মহানাম ও অস্‌সজি (অশ্বজিৎ)।

কিন্তু পঞ্চবর্গীয়দের সম্বন্ধে উপরিলিখিত বিবরণটি পৌরাণিক গল্প জাতীয় বলিয়া মনে হয়। গোতমকুমার সংবুদ্ধ হইবেন, এই ব্যাপারে যদি কৌণ্ডিন্য একেবারে নিঃসন্দিগ্ধ ছিলেন, তাহা হইলে উরুবেলাতে তিনি ভগবান বুদ্ধকে পরিত্যাগ করিয়া বারাণসীতে কেন চলিয়া গেলেন? বোধিসত্ত্ব শরীরের প্রয়োজনীয় আহার আরম্ভ করা মাত্র, তাহার প্রতি কৌণ্ডিন্যের যে পূর্ণ বিশ্বাস ছিল, তাহা কি করিয়া নষ্ট হইল? আমার মনে হয় যে, এই পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুরা পূর্বে আলার কালামের পন্থের অনুগামী ছিল, এবং শাক্যদের দেশে অথবা তাহারই আশেপাশে কোনো দেশে বাস করিত। সেখানে তাহাদের সহিত বুদ্ধের বন্ধুত্ব হইয়াছিল। ইহারা সকলেই যে ব্রাহ্মণ ছিলেন, এমন কথাও বলা যাইতে পারে না। আলার কালাম এবং উদ্দকরামপুত্তের সম্প্রদায়ে সত্যের সন্ধান না পাইয়া, বোধিসত্ত্ব অন্য মার্গের আবিষ্কার করিবার উদ্দেশ্যে রাজগৃহে আসিয়াছিলেন; খুব সম্ভবত ঐ সময় তাঁহার সঙ্গে, এই পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুরাও আসিয়াছিল। তাহারা মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়াছিল যে, যদি বোধিসত্ত্ব নূতন ধর্মমার্গ উপলব্ধি করিতে পারেন, তাহা হইলে তাহারাও ঐ মার্গ অবলম্বন করিবে। কিন্তু বোধিসত্ত্ব যখন তপস্যা ও উপবাস ত্যাগ করিলেন, তখন তাহাদের বিশ্বাস উড়িয়া গেল ও তাহারা বারাণসীতে চলিয়া গেল।

পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুসংঘ

গোতম বোধিসত্ত্ব সংবুদ্ধ হইয়া যখন বারাণসীর ঋষিপত্তনে আসিলেন তখন ঐ পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুরা তাঁহাকে সামান্য ভদ্রতাও দেখাইবেন না বলিয়া সংকল্প করিয়াছিলেন, ইত্যাদি কথা পূর্বেই পঞ্চম পরিচ্ছেদে বলা হইয়াছে। শেষে ঐ পঞ্চবর্গীয়গণ বোধিসত্ত্বের ধর্মমার্গ শুনিলেন এবং ঐ সময় একমাত্র কৌণ্ডিন্যই বুদ্ধের মতের সহিত সম্মতি দেখাইলেন। তখন ভগবান বুদ্ধ আবেগের সহিত বলিয়া উঠিলেন, ''কৌণ্ডিন্য বুঝিতে পারিয়াছে (অঞ্‌ঞাসি বত ভো কোণ্ডিঞ্‌ঞো)।'' ইহাতে কৌণ্ডিন্যের ''অঞ্‌ঞাসি কোণ্ডঞ্‌ঞো (অজ্ঞাত কোণ্ডিন্য)'' এই নাম পড়িয়া গেল। আর শুধু এই একটি প্রসঙ্গের জন্যই বৌদ্ধ সাহিত্যে কৌণ্ডিন্যকে খুব প্রধান স্থান দেওয়া হইয়াছে। ইহার পর, তিনি (কৌণ্ডিন্য) যে কোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজ করিয়াছিলেন, এইরূপ বিন্দুমাত্র উল্লেখও পাওয়া যায় না। তিনি একাকী সকলের আগে বুদ্ধের নূতন ধর্মমার্গকে অভিনন্দন জানাইয়াছিলেন, ইহাতেই তাঁহার জীবনের সফলতা বুঝিতে হইবে।

তাহার পর, ভগবান বুদ্ধ বপ্প (বাপ্প) ও ভদ্দিয় (ভদ্রিক), এই দুই জনকে তাঁহার নূতন ধর্মের তত্ত্ব বুঝাইয়া দিলেন। এবং কয়েক দিন পর তাঁহারাও এই নূতন ধর্মমার্গের তত্ত্ব উপলব্ধি করিলেন। ইহার কিছুকাল পরে, মহানাম ও অস্‌সজি (অশ্বজিৎ) এই দুইজনও

নূতন ধর্মমার্গের তত্ত্ব উপলব্ধি করিলেন। আর এই পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুরা বুদ্ধের একনিষ্ঠ ভক্ত হইলেন। এই কাজের জন্য, ভগবান বুদ্ধ কতখানি সময় দিয়াছিলেন, কোথাও তাহার উল্লেখ পাওয়া যায় না। কিন্তু পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুরা যে সর্বাগ্রে বুদ্ধের শিষ্য হইয়াছিলেন এবং এই পাঁচজনের দ্বারা ভিক্ষুসংঘ স্থাপিত হইয়াছিল, এসম্বন্ধে সুত্তপিটক ও বিনয়পিটকের মধ্যে একবাক্যতা আছে।

যশ ও তাহার সাথী

পঞ্চবর্গীয়দের সহিত যখন ভগবান বুদ্ধ ঋষিপত্তনে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন কিভাবে আরো ৫৫ জন ভিক্ষু তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিল, এবং ঐ চাতুর্মাসের পর ভগবান বুদ্ধ রাজগৃহ পর্যন্ত পর্যটন করিয়া ভিক্ষুসংঘের কতখানি শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছিলেন, তাহার বর্ণনা মহাবগ্‌গে পাওয়া যায়। এখানে তাহার সারমর্ম দিতেছি।

বারাণসীতে যশ নামক একটি সম্পন্ন যুবক বাস করিত। হঠাৎ সংসার হইতে তাহার মন সরিয়া গেল এবং সে একটি শান্তিময় স্থানের অন্বেষণে ঋষিপত্তনে আসিল। বুদ্ধ তাহাকে উপদেশ দিয়া নিজের সংঘে গ্রহণ করিলেন। তাহার খোঁজে তাহার পিতামাতা ঋষিপত্তনে আসিলেন। বুদ্ধ তাঁহাদিগকেও ধর্মোপদেশ দিলেন এবং তাঁহারাও বুদ্ধের ভক্ত হইলেন।

যখন বারাণসীবাসী বিমল, সুবাহু, পুণ্ণজি (পূর্ণজিৎ) ও গবম্পতি (গবাংপতি), এই চারিজন যশের বন্ধু জানিতে পারিল যে, সে সন্ন্যাসী হইয়া বুদ্ধের সংঘে যোগদান করিয়াছে, তখন তাহারাও ঋষিপত্তনে আসিয়া বুদ্ধের ভিক্ষুসংঘে প্রবেশ করিল। ইহাদের আরো পঞ্চাশজন যুবক বন্ধু ছিল। ইহারাও ঋষিপত্তনে আসিয়া বুদ্ধের উপদেশ শুনিল এবং বন্ধুদের মতোই তাহারাও সংঘে প্রবেশ করিল। এইভাবে ঋষিপত্তনে যাটজন ভিক্ষু লইয়া একটি সংঘ গঠিত হইল।

বহুজন মঙ্গলার্থে ধর্মপ্রচার

চাতুর্মাসের শেষদিকে ভগবান বুদ্ধ নিজ ভিক্ষুসংঘকে কহিলেন, "হে ভিক্ষুগণ, সাংসারিক ও পারলৌকিক বন্ধন হইতে আমি মুক্ত হইয়াছি, আর তোমরাও ঐ বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়াছ। সুতরাং, হে ভিক্ষুগণ, এখন জনতার মঙ্গলের জন্য, সুখের জন্য, জনসাধারণের উপর দয়া করিবার জন্য, দেবতা ও মনুষ্যের কল্যাণার্থ ধর্মোপদেশ দিতে প্রস্তুত হও। একই রাস্তায় দুইজনে যাইয়ো না। প্রারম্ভে কল্যাণপ্রদ, মধ্যভাগে কল্যাণপ্রদ এবং অন্তে কল্যাণপ্রদ এই যে আমাদের ধর্মমার্গ, ইহার সম্বন্ধে লোকদিগকে উপদেশ দাও।"

এইভাবে ভগবান্ বুদ্ধ নিজের যাট জন ভিক্ষুকে চতুর্দিকে প্রেরণ করিলেন। তাহারা অন্যান্য যুবককে ভগবানের নিকট আনিত, ও ভগবান তাহাদিগকে সন্ন্যাস প্রদান করিয়া নিজ ভিক্ষুসংঘে গ্রহণ করিতেন। কিন্তু ইহাতে যাট জন ভিক্ষু এবং তরুণ সন্ন্যাসপ্রার্থীদের বেশ কষ্ট হইত। সুতরাং ভগবান বুদ্ধ তাঁহার ভিক্ষুদিগকে এই অনুমতি দিলেন যে, তাহারাও

উপযুক্ত মনে করিলে কোনো সন্ন্যাসপ্রার্থীকে সন্ন্যাস দিয়া ভিক্ষুসংঘে গ্রহণ করিতে পারিবে। তাহার পর তিনি নিজে উরুবেলাতে যাইবার জন্য রওনা হইলেন।

ভদ্রবর্গীয় ভিক্ষু

পথে এক উদ্যানে ভদ্দবগ্‌গীয় নামক ত্রিশ জন যুবক নিজ নিজ পত্নীসহ ক্রীড়া করিবার জন্য সম্মিলিত হইয়াছিল। তাহাদের মধ্যে একজনের স্ত্রী ছিল না, তাই তাহার জন্য একটি বেশ্যা আনা হইয়াছিল। এই ত্রিশ জন পুরুষ ও উনত্রিশ জন মেয়ে আমোদ ফুর্তিতে ডুবিয়া একেবারে অসাধারণ ভাবে চলাফেরা করিতেছিল। ঐ সময় বেশ্যাটি তাহাদের জিনিসপত্র যতদূর পারিল সঙ্গে লইয়া সেখান হইতে পলায়ন করিল! তখন ভগবান বুদ্ধ এই উপবনে একটি গাছের নীচে বিশ্রামের জন্য বসিয়া ছিলেন। যুবকরা যখন বুঝিতে পারিল যে, বেশ্যা তাহাদের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র লইয়া পলাইয়া গিয়াছে, তখন তাহার অন্বেষণ করিতে করিতে; ভগবান যেখানে বসিয়াছিলেন, তাহারা সেই দিকে আসিল এবং কহিল, ''মহাশয়, এইদিকে একটি যুবতীকে যাইতে দেখিয়াছেন কি?''

ভগবান কহিলেন, ''হে তরুণ ভদ্রলোকরা, কোনো যুবতীর খোঁজে ঘুরিতে থাকা, আর আত্মজ্ঞান সম্পাদন করা, এই দুইটির মধ্যে কোন্‌টিকে তোমরা ভালো বলিয়া মনে কর?''

বুদ্ধের এই কথা শুনিয়া, তাহারা বুদ্ধের নিকট বসিল; এবং বহুক্ষণ বুদ্ধের উপদেশ শুনিবার পর, তাহারা গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া, বুদ্ধের ভিক্ষুসংঘে প্রবেশ করিল।

কাশ্যপ ভ্রাতাগণ

এই উপবন হইতে ভগবান উরুবেলায় আসিলেন। সেখানে উরুবেলকাশ্যপ, নদীকাশ্যপ ও গয়াকাশ্যপ, এই তিনজন জটাধারী ভ্রাতা ক্রমান্বয়ে পাঁচশো, তিনশো ও দুইশো জটাধারী শিষ্যসহ অগ্নিহোত্র রক্ষা করিয়া তপস্যা করিতেছিল। ইহাদের মধ্যে সর্বজ্যেষ্ঠ ভ্রাতার আশ্রমে ভগবান বুদ্ধ অবস্থান করিলেন; এবং অনেক অলৌকিক আশ্চর্যজনক ঘটনা দেখাইয়া, তিনি উরুবেলকাশ্যপ ও তাহার পাঁচশো শিষ্যকে নিজ ভিক্ষুসংঘে গ্রহণ করিলেন। উরুবেলকাশ্যপের পর, তাহার ছোটো দুই ভ্রাতা এবং তাহাদের সর্ব অনুগামীরাও বুদ্ধের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিল।

বিরাট ভিক্ষুসংঘের সহিত রাজগৃহে প্রবেশ

এই ১০০৩ জন ভিক্ষু সঙ্গে লইয়া ভগবান বুদ্ধ রাজগৃহে আসিলেন। সেখানে এত বড়ো ভিক্ষু সংঘ দেখিতে পাওয়ায়, নাগরিকদের মধ্যে খুবই উত্তেজনার সৃষ্টি হইল। রাজা বিম্বিসার এবং তাঁহার সর্দাররা বুদ্ধকে অভিনন্দন করিবার জন্য আসিলেন। বিম্বিসার বুদ্ধ ও তাঁহার ভিক্ষুসংঘকে পরদিন রাজবাড়িতে ভিক্ষা লইবার জন নিমন্ত্রণ করিলেন; এবং তাঁহাদের আহার সম্পন্ন হওয়ার পর, তিনি ভিক্ষুসংঘকে তাঁহার বেণুবন নামক উদ্যানটি দান করিলেন।

সারিপুত্ত ও মোগ্‌গল্লান

রাজগৃহের নিকট সঞ্জয় নামক এক বিখ্যাত সন্ন্যাসী তাঁহার বহু শিষ্যের সহিত বাস করিতেন। সারিপুত্ত ও মোগ্‌গল্লান সঞ্জয়ের প্রধান শিষ্য ছিল। কিন্তু সঞ্জয়ের সম্প্রদায়ে ইহাদের মন তৃপ্তি পাইতেছিল না। তাহারা পরস্পরের সহিত এইরূপ একটি শর্তে আবদ্ধ হইয়াছিল যে, উহাদের মধ্যে যে প্রকৃত ধর্মমার্গের প্রদর্শক কোনো সন্ন্যাসীর দেখা পাইবে, সে অন্যকে এই কথা বলিবে এবং তখন উভয়ে মিলিয়া ঐ নূতন ধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করিবে।

একদিন ভিক্ষু অস্‌সজি রাজগৃহে ভিক্ষা করিতেছিল। তাহার শান্ত ও গম্ভীর চেহারা দেখিয়া, সারিপুত্তের মনে হইল যে, এই ব্যক্তি নির্বাণের মার্গ অবলম্বনকারী কোনো সন্ন্যাসী হইবে; অস্‌সজির সহিত কথা কহিয়া, সে জানিতে পারিল যে, অস্‌সজি বুদ্ধের শিষ্য এবং বুদ্ধের ধর্মমার্গই প্রকৃত ধর্মমাগ। তখন সারিপুত্ত এই কথা মোগ্‌গল্লানকে জানাইল; আর তখন উভয়ে সঞ্জয়ের সম্প্রদায় পরিত্যাগ করিয়া, পঞ্চাশজন পরিব্রাজকের সহিত বুদ্ধের নিকট আসিয়া তাঁহার ভিক্ষুসংঘে যোগদান করিল।

ইতিহাসের কষ্টিপাথরে যাচাই

যশ ও অন্যান্য চুয়ান্নজন যুবক ভিক্ষু হইয়াছিল, এই ঘটনা হইতে আরম্ভ করিয়া এখন পর্যন্ত যাহা বর্ণিত হইল, তাহা মহাবগ্‌গ হইতে সংক্ষিপ্তরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে।[১] এখন এসব কথা ইতিহাসের কষ্ঠিপাথরে পরীক্ষা করিয়া দেখা দরকার। বোধিসত্ত্ব উরুবেলাতে তপস্যা করিয়া তত্ত্ব উপলব্ধি করিয়াছিলেন। সুতরাং ভগবান্ বুদ্ধ উরুবেলা প্রদেশের বেশ ভালোরকম খবর রাখিতেন, এইরূপ বলিতে হইবে। উরুবেলকাশ্যপ ও তাঁহার দুইটি ছোটো ভাই এক হাজার জটাধারী শিষ্যের সহিত ঐ দেশে বসবাস করিতেন। অলৌকিক অদ্ভুত ঘটনা দেখাইয়া তাহাদিগকে শিষ্য করিবার উদ্দেশ্য যদি ভগবান্ বুদ্ধের থাকিত, তাহা হইলে তাহাদিগকে ছাড়িয়া, তিনি কাশী পর্যন্ত কেন গেলেন? তাঁহার নূতন ধর্ম পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুরা ছাড়া অন্য কেহ বুঝিতে পারিবেন না, তাঁহার এই রকম মনে হইয়াছিল কেন? ঐ সময়, অলৌকিক অদ্ভুত ঘটনা দেখাইবার ক্ষমতা তাঁহার ছিল না, আর কাশীতে গিয়া পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুদিগকে উপদেশ দেওয়ার পর, তিনি ক্ষমতা লাভ করিয়াছিলেন, এইরূপ বুঝিতে হইবে কি?

ঋষিপত্তনে পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুদের ছাড়া, বুদ্ধ আরো যে পঞ্চান্নজন ভিক্ষু শিষ্যরূপে পাইলেন, তাহাদের মধ্যে শুধু পাঁচজনেরই নাম মহাবগ্‌গে দেওয়া আছে; বাকী পঞ্চাশ জনের মধ্যে একজনেরও নাম নেই। ইহাতে মনে হয় যে, ভিক্ষুদের সংখ্যা বাড়াইয়া দেখাইবার জন্য আরো পঞ্চাশ জন বেশি ধরা হইয়াছে।

পথে ত্রিশজন যুবক তাহাদের স্ত্রীদের সহিত ক্রীড়া করিবার সময়, ভগবান বুদ্ধ তাহাদিগকে সন্ন্যাসী করিয়াছিলেন, ইহা সম্ভবপর নয়। যদি ঐরূপ করাই তাঁহার উদ্দেশ্য

---

১. 'বুদ্ধলীলাসার সংগ্রহ', পৃ. ১৬০-৬৫ এবং 'বৌদ্ধ সংঘাচা পরিচয়', পৃ. ৭-৮

হইত, তাহা হইলে তিনি উরুবেলা হইতে কাশী যাইবার জন্য কেন কষ্ট স্বীকার করিলেন? উরুবেলার আশেপাশে ক্রীড়ারত কোনো যুবকের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হওয়া কি সম্ভবপর ছিল না? হঠাৎ মাঝখানে এই ত্রিশজন যুবকের গল্পটি কেন ঢুকানো হইল, তাহা বুঝা যায় না।

যখন ভগবান বুদ্ধ এক হাজার তিনজন জটাধারীকে ভিক্ষু করিয়া তাহাদের সহিত রাজগৃহে আসিলেন, তখন সমগ্র রাজগৃহ উথলিয়া উঠিয়াছিল। এই অবস্থায় বুদ্ধের সম্বন্ধে সারিপুত্ত যে কিছুই জানিত না, তাহা কি করিয়া হইতে পারে? অস্‌সজি পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুদের একজন। তাহাকে অন্যান্য পঞ্চবর্গীয়দের সঙ্গে কাশীর আশেপাশে ধর্মোপদেশ দেওয়ার জন্য পাঠাইয়া দিয়া, ভগবান প্রথম উরুবেলায় ও তাহার পর রাজগৃহে আসিলেন; এমন অবস্থায় এই অস্‌সজি হঠাৎ রাজগৃহে কি করিয়া আসিল? বক্তব্য এই যে, পঞ্চবর্গীয়দিগকে, যশকে ও তাহার চারজন সাথীকে ভিক্ষুসংঘে গ্রহণ করার পর কাশী হইতে রাজগৃহ পর্যন্ত বুদ্ধের ভ্রমণের যে কাহিনী মহাবগ্‌গে দেওয়া হইয়াছে, তাহা বহুলাংশে পৌরাণিক গল্পের মতো; এইরূপ না বলিয়া উপায় নাই।

ললিতবিস্তরের তালিকা

যদিও ঘটনা ঠিক ঠিক কী ছিল, তাহা নিশ্চতভাবে না বলা যাইতে পারে, তথাপি ললিতবিস্তরের প্রারম্ভে ভিক্ষুদের যে তালিকা দেওয়া আছে, তাহা হইতে ভিক্ষুসংঘের প্রথম অবস্থার অল্পস্বল্প খবর সংগ্রহ করা যাইতে পারে, এই মনে করিয়া এখানে ঐ তালিকাটি দেওয়া হইতেছে।

১. জ্ঞানকৌণ্ডিন্য (অঞ্‌ঞা কোণ্ডঞ্‌ঞ) ২. অশ্বজিৎ (অস্‌সজি) ৩. বাষ্প (বপ্প) ৪. মহানাম ৫. ভদ্রিক (ভদ্দিয়) ৬. যশোদেব (যশ) ৭. বিমল ৮. সুবাহু ৯. পূর্ণ (পুন্নজি) ১০. গবাম্পতি (গবম্পতি) ১১. উরুবেলকাশ্যপ (উরুবেল কস্‌সপ) ১২. নদীকাশ্যপ ১৩. গয়াকাশ্যপ ১৪. শারিপুত্র (সারিপুত্ত) ১৫. মহামৌদগল্যায়ন (মহামোগ্‌গল্লান) ১৬. মহাকাশ্যপ (মহাকস্‌সপ) ১৭. মহাকাত্যায়ন (মহাকচ্চান) ১৮. কফিল (?) ১৯. কৌণ্ডিন্য (?) ২০. চুনন্দ (চুন্দ) ২১. পূর্ণমৈত্রায়ণীপুত্র (পুন্নমন্তাণিপুত্ত) ২২. অনিরুদ্ধ (অনুরুদ্ধ) ২৩. নন্দিক (নন্দক) ২৪. কস্ফিল (কপ্পিন) ২৫. সুভূতি ২৬. রেবত ২৭. খদিরবণিক ২৮. অমোঘরাজ (মোঘরাজ) ২৯. মহাপারণিক (?) ৩০. বক্কুল ৩১. নন্দ ৩২. রাহুল ৩৩. স্বাগত (সাগত) ৩৪. আনন্দ।

মহাবগ্‌গে যেসব ভিক্ষুর নাম নেই, তাহাদের সংখ্যা বাদ দিলে, এই তালিকার পনেরোজন ভিক্ষুর অনুক্রমের সহিত মহাবগ্‌গের কাহিনীটি মিলিয়া যায়; আর ইহা হইতে অনুমান করা যায় যে, পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুদের পর, যশ এবং তাহার চারজন মিত্র ভগবান বুদ্ধের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া তাঁহার সহিত যোগদান করে। এই দশজনকে সঙ্গে লইয়া ভগবান উরুবেলাতে গেলেন। এবং সেখানে তিন কাশ্যপ-ভ্রাতা তাঁহার সংঘে যোগদান করিয়াছিল।

আর এই তেরোজন শিষ্যের সহিত, ভগবান রাজগৃহে গিয়াছিলেন। সেখানে সঞ্জয়ের শিষ্যদের মধ্যে সারিপুত্ত ও মোগ্‌গল্লান সঞ্জয়ের সম্প্রদায় পরিত্যাগ করিয়া ভগবান বুদ্ধের শিষ্য হইয়াছিল। এই দুইজনের আগমনে ভিক্ষুসংঘের গুরুত্ব খুব বাড়িয়া গেল। কেননা, রাজগৃহে ইহাদের খুব খ্যাতি ছিল। এই দুই শিষ্য বুদ্ধের দার্শনিক তত্ত্বের বিকাশ কি রকমভাবে করিয়াছিল, তাহার সাক্ষ্য সুত্ত ও বিনয়পিটকে পাওয়া যায়। এইরূপ মানিয়া লওয়া হয় যে, প্রায় সমগ্র অভিধম্মপিটকটি সারিপুত্তেরই উপদেশ।

ইহার পর, তালিকাতে যে ২৯টি ভিক্ষুর নাম পাওয়া যায়, ইহাদের অনুক্রমটি ঐতিহাসিক বলিয়া মনে হয় না। চুল্লবগ্‌গে (ভাগ ৭) আনন্দ ও অনুরুদ্ধ একই কালে ভিক্ষু হইয়াছিল, এইরূপ বলা থাকা সত্ত্বেও এখানে অনুরুদ্ধের ক্রমিক সংখ্যা ২২ ও আনন্দের ক্রমিক সংখ্যা ৩৪ দেওয়া হইয়াছে। ইহাদের সহিত উপালি নামক এক নাপিতও সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিল ও পরে তাহার বিনয়ধর নাম হইয়াছিল; এতৎসত্ত্বেও এই তালিকাটিতে তাহার নাম দেখা যায় না। এখানে যেসব ভিক্ষুর নির্দেশ করা হইয়াছে, তাহাদের জীবনচরিত 'বৌদ্ধসংঘাচা পচিয়' গ্রন্থের তৃতীয়ভাগে দেওয়া হইয়াছে। জিজ্ঞাসু পাঠকরা তাহা পড়িবেন।

ভিক্ষুদের সংখ্যা

এখন, রাজগৃহে আসা পর্যন্ত বুদ্ধ যে কয়জন ভিক্ষু সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহাদের সংখ্যা এই পনেরো জন ভিক্ষু হইতে বেশি ছিল কিনা, তাহার সম্বন্ধে সামান্য আলোচনা করিব। বুদ্ধ বারাণসীতে ষাট জন ভিক্ষু-শিষ্য পাঠাইয়াছিলেন; উরুবেলাতে যাওয়ার সময়, পথে ত্রিশজন, আর উরুবেলাতে এক হাজার তিনজন, এইভাবে মোট ১০৯৩ জন ভিক্ষুর সংঘ গঠিত হওয়ার পর, ভগবান রাজগৃহে প্রবেশ করিলেন। সেখানে সারিপুত্ত ও মোগ্‌গল্লান, আর তাহাদের সহিত পরিব্রাজক সঞ্জয়ের ২৫০ জন শিষ্য বৌদ্ধসংঘে যোগদান করিল। অর্থাৎ এই সময় ভিক্ষুসংঘে এক হাজার তিনশো পয়তাল্লিশ জন ভিক্ষু ছিল। কিন্তু বুদ্ধের যে এত বড়ো ভিক্ষুসংঘ ছিল, তাহার উল্লেখ সুত্তপিটকের কোথাও দেখা যায় না। পরিনির্বাণের দুই-এক বৎসর পূর্বে, ভগবান বুদ্ধ যখন রাজগৃহে আসিয়াছিলেন, তখন তাঁহার সহিত এক হাজার দুই শত পঞ্চাশ জন ভিক্ষু ছিল, এইরূপ সমাঞ্ঞফলসুত্তে বর্ণিত আছে। কিন্তু দীঘনিকায়ের দ্বিতীয় আটটি সুত্তে ভিক্ষুদের সংখ্যা পাঁচ শত বলিয়া লিখিত আছে; আর তাঁহার শেষ ভ্রমণেও তাঁহার সঙ্গে পাঁচশত ভিক্ষু ছিল, এইরূপ মনে হয়। বুদ্ধের পরিনির্বাণের পর, রাজগৃহে ভিক্ষুদের যে প্রথম সভা হইয়াছিল, তাহাতেও পাঁচশো ভিক্ষু উপস্থিত ছিল। সুতরাং এইরূপ অনুমান করা চলে যে, ভগবান বুদ্ধের পরিনির্বাণ পর্যন্ত, তাঁহার সংঘের ভিক্ষুদের সংখ্যা পাঁচশতের উপরে যায় নাই।

বুদ্ধের পরিনির্বাণের পর, এই সংখ্যা বাড়াইয়া দেখাইবার চেষ্টা শুরু হইয়া থাকিবে। ললিতবিস্তরের প্রারম্ভেই এইরূপ বলা হইয়াছে যে, শ্রাবস্তীতে ভগবানের সহিত বারো হাজার ভিক্ষু এবং বত্রিশ হাজার বোধিসত্ত্ব ছিল। এইভাবে নিজেদের সম্প্রদায়ের গুরুত্ব

বাড়াইবার জন্য তৎকালীন ভিক্ষুরা তাহাদের পূর্বকালীন ভিক্ষুদের সংখ্যা বাড়াইতে আরম্ভ করিল; আর মহাযান গ্রন্থের গ্রন্থকাররা তো বোধিসত্ত্বদের সংখ্যা ইচ্ছামত বাড়াইয়া বর্ণনা করিয়াছেন! বৌদ্ধধর্মের অবনতির যদি কোনো প্রধান কারণ থাকিয়া থাকে, তাহা হইলে ইহাই ঐ কারণ। নিজেদের ধর্ম সংঘের প্রতিষ্ঠা স্থাপন করিবার জন্য, বৌদ্ধ ভিক্ষুরা দিগ্‌বিদিক্ না দেখিয়া, ইচ্ছামত পৌরাণিক কাহিনী রচনা করিতে শুরু করিয়া দিলেন। আর ব্রাহ্মণরা তাহাদের অপেক্ষাও বেশি অদ্ভুত পৌরাণিক কাহিনী রচনা করিয়া, (এই বিষয়ে) ভিক্ষুদিগকে সম্পূর্ণভাবে পরাভূত করিলেন।

প্রসিদ্ধ ছয়টি শ্রমণসংঘ

বুদ্ধের সময়, তাঁহার সংঘ অপেক্ষা বড়ো ও অধিক প্রসিদ্ধ ছয়টি শ্রমণ সংঘ বিদ্যমান ছিল, আর উহাদের নেতা 'পূরণ কস্‌সপ', 'মক্‌খলি গোসাল', 'অজিত কেসকম্বল', 'পকুধ কচ্চায়ন', 'সঞ্জয় বেলট্‌ঠপুত্ত' ও 'নিগণ্ঠ নাথপুত্ত', এই ছয়জনের জনসাধারণের মধ্যে যথেষ্ট সম্মান ও প্রতিপত্তি ছিল। এই সম্বন্ধে মজ্ঝিমনিকায়ের চূলসারোপমসুত্তে নিম্নলিখিত কথা কয়েকটি পাওয়া যায় ঃ

যেমে ভো গোতম সমণব্রাহ্মণা
সংঘিনো গণিনো গণাচরিয়া ত্রাতা

যসস্‌সিনো তিত্থকরা সাধুসম্মতা বহুজনস্‌স সেয্যথীদং পূরণো কস্‌সপো মক্‌খলিগোসালো অজিতোকেসকম্বলো পকুধোকচ্চায়নো, সঞ্জয়ো বেলট্‌ঠপুত্তো নিগণ্ঠো নাথপুত্তো।

(পিঙ্গল কৌৎস ভগবানকে বলিতেছে,)

"হে গোতম, এই যে সংঘী, গণী, গণাচার্য, প্রসিদ্ধ, যশস্বী, তীর্থঙ্কর এবং বহুজনমান্য (ছয়জন আছেন) তাহারা কে কে? পূরণ কস্‌সপ, মক্‌খলি গোসাল, অজিত কেসকম্বল, পকুধ কচ্চায়ন, সঞ্জয় বেলট্‌ঠপুত্ত ও নিগণ্ঠ নাথপুত্ত।"

বৌদ্ধসংঘের কর্তব্যপরায়ণতা

এই ছয়জন আচার্য সকলেই ভগবান বুদ্ধ অপেক্ষা বয়সে বড়ো ছিলেন এবং তাহাদের ভিক্ষুসংখ্যাও বুদ্ধের ভিক্ষুসংখ্যা হইতে অনেক বেশি ছিল। বুদ্ধ ইহাদের সকলের তুলনায় বয়সে ছোটো, আর তাঁহার সংঘের ভিক্ষুদের সংখ্যাও কম; ইহা সত্ত্বেও তাঁহার এই নূতন ভিক্ষুসংঘ অন্যান্য সংঘগুলিকে পিছনে ফেলিয়াছিল। আর শুধু ভারতবর্ষে নয়, সর্ব এশিয়া মহাদেশে, তাঁহার প্রভাব ছড়াইয়াছিল, ইহা কিভাবে সম্ভবপর হইল? ইহার উত্তর এই যে, যদিও উপরে বর্ণিত শ্রমণ-সংঘ ছয়টি সংখ্যায় বৃহৎ ছিল, তথাপি তাহারা সর্বসাধারণের জন্য বিশেষ চিন্তা করিত না। ইহাদের মধ্যে অনেকেরই এই আদর্শ ছিল যে, তপস্যামার্গে মোক্ষ লাভ করিতে হইবে। ইহারা গ্রামে কিংবা শহরে গিয়া গৃহস্থদের নিকট হইতে ভিক্ষা গ্রহণ করিত ও কোনো কোনো প্রসঙ্গে নিজ সম্প্রদায়ের দার্শনিক তত্ত্ব লোকদিগকে শিখাইত। তথাপি গৃহস্থদের মঙ্গল ও সুখের জন্য, ইহারা বিশেষ কিছু চেষ্টা করিত না।

কিন্তু বৌদ্ধ সংঘের কথা ইহার একেবারে বিপরীত। "লোকের মঙ্গলের জন্য এবং সুখের জন্য তোমরা চারিদিকে যাও, একই রাস্তাতে দুইজন যাইয়ো না" বুদ্ধের এই উপদেশের কথা অগ্রেই বলা হইয়াছে। এই উপদেশ মহাবগ্‌গ ও মারসংযুত্তে পাওয়া যায়; আর তৎসদৃশ সুত্তপিটকের অনেক স্থলেও লক্ষিত হয়। বুদ্ধের এই উপদেশ অনুসরণ করিয়া চলায়, তাঁহার ভিক্ষুসংঘ জনসমাজের নিকট প্রিয় ও সম্মানের পাত্র হইয়াছিল এবং সর্বসাধারণ লোকের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদে বলা হইয়াছে যে, পরস্পরের সহিত বিবাদরত লোকদিগের কথা ভাবাতে, বোধিসত্ত্বের মনে বৈরাগ্য আসিয়াছিল। রাজনৈতিক ক্ষমতার দ্বারা এইসব কলহ মিটানো সম্ভবপর ছিল না। যতদিন পর্যন্ত লোকেদের মধ্যে হিংসাবুদ্ধি থাকিবে, ততদিন পর্যন্ত সমাজের কলহ বিবাদ প্রভৃতি মিটানো সম্ভবপর নয়। তাই রাজনৈতিক ক্ষমতার ব্যবহারে, নিবৃত্ত হইয়া, মনুষ্যজাতির মুক্তি রাস্তা বাহির করিবার জন্য, বোধিসত্ত্ব প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। সাত বৎসর তপস্যা করিয়া, অনেক অনুভূতি লাভ করার পর, তিনি পূর্ব পরিচ্ছেদে বর্ণিত মধ্যমমার্গ আবিষ্কার করিলেন। আর এই মধ্যমমার্গ সর্বজনসমাজে প্রচার করিবেন বলিয়া তিনি স্থির করিলেন। এই কাজের জন্য ভগবান বুদ্ধ সংঘ স্থাপন করিলেন। সুতরাং অন্যান্য সংঘের শ্রমণদের তুলনায়, বৌদ্ধ শ্রমণরা যে সাধারণ লোকের মঙ্গল ও সুখের জন্য বেশি যত্ন লইতেন, ইহাতে কিছুই আশ্চর্যের কারণ নাই।

আধ্যাত্মিক কৃষির আবশ্যকতা

মনুষ্যসমাজ যদি চাষবাস, বাণিজ্য, প্রভৃতি জীবিকা অর্জনের ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসায় বা পেশার প্রবর্তন করে, কিন্তু যদি ঐ সমাজে একতা না থাকে, তাহা হইলে জীবিকা অর্জনের এইসব উপায় দ্বারা কোনো লাভ হইবে না; কারণ একতা না থাকিলে, যদি এক ব্যক্তি ক্ষেতে বীজ বপন করে, তাহা হইলে অন্য ব্যক্তি ক্ষেতের শস্য কাটিয়া লইবে এবং একজন ব্যবসায়ীর লাভ অন্যজন চুরি করিয়া কিংবা লুটিয়া লইবে, এবং এইভাবে একবার সমাজে বিশৃঙ্খলা শুরু হইলে, সর্বসাধারণ লোককে খুব কষ্ট ভোগ করিতে হইবে। অস্ত্রবল দ্বারা সমাজের এই একতার সৃষ্টি করিতে পারিলেও, তাহা স্থায়ী হয় না।

পরস্পরের সৌজন্যে এবং ত্যাগে যে একতা উৎপন্ন হয়, তাহাই প্রকৃত একতা। সর্বসাধারণ লোকের মধ্যে এই ধরনের একতা উৎপন্ন করা বুদ্ধের একটি উদ্দেশ্য ছিল। এই কথা সুত্তনিপাতের কাসিভারদ্বাজ-সুত্ত হইতে বুঝা যায়। এই সুত্তের সারমর্ম এখানে দেওয়া হইতেছে।

একদিন ভগবান বুদ্ধ ভিক্ষা করিতে বাহির হইয়া ভারদ্বাজ নামক এক ব্রাহ্মণের ক্ষেতে গেলেন। সেখানে ভারদ্বাজ নিজের মজুরদিগকে খাওয়াইতেছিলেন। ভগবান বুদ্ধ ভিক্ষার জন্য দাঁড়াইয়া আছেন, ইহা দেখিতে পাইয়া, ব্রাহ্মণ বলিলেন, "তুমিও আমার মতো চাষবাস, লাঙ্গল দেওয়া, বীজ বপন, শস্য গোলা করা ইত্যাদি কাজ করিয়া খাও। ভিক্ষা চাহিতেছ কেন?"

ভগবান কহিলেন, "আমিও চাষী; আমি শ্রদ্ধার বীজ বপন করি। তাহার উপর তপস্যার (প্রযত্নের) বৃষ্টি পড়ে। প্রজ্ঞা হইতেছে আমার লাঙ্গল, পাপলজ্জা হইতেছে ঈর্ষা, চিত্ত হইতেছে দড়ি, স্মৃতি (জাগ্রদবস্থা) হইতেছে লাঙলের ফাল ও ঠেঙ্গা (চাবুক)। শরীরে ও বচনে আমি সংযম পালন করি। আহার নিয়মিত করিয়া, সত্যের সাহায্যে আমি (মনের দোষগুলিকে) নিড়াই। সন্তোষ হইতেছে আমার ছুটি (বিশ্রাম)। উৎসাহ আমার বলদ; আর আমার বাহন আমাকে এইরকম সব জায়গায় লইয়া যায় যে, সেখানে শোকের কোনো সম্ভাবনা নাই।"

ভারদ্বাজ এইসব কথার অর্থ সঙ্গে সঙ্গেই বুঝিতে পারিলেন এবং তিনি বুদ্ধের শিষ্য হইলেন।

এই উপদেশে বুদ্ধ চাষবাসের নিষেধ করেন নাই; কিন্তু চাষবাস যদি নৈতিক শক্তির আশ্রয় না পায়, তাহা হইলে উহার দ্বারা সমাজের সুখ না হইয়া দুঃখই হইবে, ইহাই বুদ্ধের উক্ত উপদেশের তাৎপর্য। যে ক্ষেতে এক ব্যক্তি বীজ বপন করিল, শস্য কাটিবার সময়, তাহা যদি অন্যে জোর করিয়া লইয়া যায়, তাহা হইলে আর কেহ কৃষিকার্যে প্রবৃত্ত হইবে না এবং সমাজে ভয়ানক বিশৃঙ্খলা দেখা দিবে। সুতরাং সর্বপ্রথমে পরস্পরের সম্বন্ধ অহিংসামূলক হওয়া দরকার। ঐরকম মনের কৃষি না করিলে, মাটিতে চাষবাসও কোনো কাজে লাগিবে না, ইহা বুঝিতে পারিয়া বুদ্ধ নিজের সংঘকে সমাজের নৈতিক জাগরণ সম্পাদনের কাজে নিয়োজিত করিয়াছিলেন। এইজন্য, বৌদ্ধসংঘ সংখ্যায় অল্প হইলেও অতি অল্প সময়ের মধ্যেই, সর্বসাধারণ লোকের প্রিয় হইয়াছিল, এবং নিজেদের কর্তব্যনিষ্ঠার শক্তিতে অন্যান্য শ্রমণসংঘগুলিকে পশ্চাতে ফেলিয়াছিল।

সংঘের মূল নিয়মাবলী

বুদ্ধ যাহাতে তাঁহার সংঘ সর্বদা কার্যক্ষম থাকিতে পারে সেইজন্য যথেষ্ট যত্ন লইয়াছিলেন। তিনি সংঘের সংবিধানটি এইভাবে রচনা করিয়াছিলেন যে, তাঁহার মৃত্যুর পরেও যেন উহাতে একতা থাকে এবং উহাদ্বারা অবিচ্ছিন্নভাবে জনসেবা হয়। বজ্জীদের গণমূলক রাজ্যগুলিতে সমাজের নেতারা একত্র হইয়া চিন্তার আদান-প্রদান দ্বারা, পরস্পরের হিতের জন্য, আইন-কানুন নির্ধারণ করিত। ভগবান বুদ্ধ এই পদ্ধতিটিই অল্পবিস্তর পরিমাণে, নিজের ভিক্ষুসংঘের জন্য গ্রহণ করিয়া থাকিবেন—মহাপরিনির্বাণসুত্তের প্রারম্ভে যেসব তথ্য পাওয়া যায়, তাহা হইতে ইহা পরিলক্ষিত হয়।

বস্‌সকার নামক জনৈক ব্রাহ্মণ বুদ্ধের নিকট আসিয়া তাহাকে বলিলেন যে, তাহার প্রভু অজাতশত্রু বজ্জীদের উপর আক্রমণ করিতে মনস্থ করিয়াছেন। বুদ্ধ বস্‌সকারকে বলিলেন, "আমি বজ্জীদের জন্য যে সাতটি নিয়ম বাঁধিয়া দিয়াছি, যতদিন পর্যন্ত তাহারা তদনুসারে চলিবে, ততদিন পর্যন্ত তাহাদিগকে কেহ জয় করিতে পারিবে না।" আর বস্‌সকার চলিয়া যাওয়ার পর, বুদ্ধ ভিক্ষুসংঘকে বলিলেন, "হে ভিক্ষুগণ, আমি তোমাদিগকে

শ্রীবৃদ্ধির কয়েকটি নিয়ম বলেতেছি ঃ ১. যতকাল ভিক্ষুরা বার বার এক জায়গায় সম্মিলিত হইবে, ততকাল ভিক্ষুদের শ্রীবৃদ্ধি হইবে, হানি হইবে না। ২. যতদিন পর্যন্ত ভিক্ষুরা একমত হইয়া (সভায়) মিলিত হইবে এবং সংঘের কর্ম সম্বন্ধে বিচার করিয়া (সভা হইতে) উঠিবে, ততদিন পর্যন্ত ভিক্ষুদের শ্রীবৃদ্ধি হইবে, হানি হইবে না। ৩. যতদিন পর্যন্ত সংঘ যে নিয়ম করে নাই, তাহা করা হইয়াছে এইরূপ বলিবে না, আর যে নিয়ম করা হইয়াছে, তাহা ভাঙিবে না, এবং নিয়মের প্রকৃত উদ্দেশ্য বুঝিয়া তদনুসারে আচরণ করিবে, ততদিন পর্যন্ত ভিক্ষুদের শ্রীবৃদ্ধি হইবে, হানি হইবে না। ৪. যতদিন পর্যন্ত ভিক্ষুরা বৃদ্ধ ও চরিত্রবান নেতাদিগকে সম্মান করিবে, ৫. যতদিন পর্যন্ত ভিক্ষুরা মনে বার বার যে সব তৃষ্ণা উৎপন্ন হয়, তাহাদের অধীন হইবে না, ৬. যতদিন পর্যন্ত ভিক্ষুরা নির্জনতা ভালোবাসিবে, ৭. যতদিন পর্যন্ত ভিক্ষুরা যে সব সুজ্ঞ ও সুব্রহ্মচারী এখনো সংঘে আসে নাই, তাহারা যাহাতে সেখানে আসে, আর যে সব সুজ্ঞ সুব্রহ্মচারী সংঘে আসিয়াছে, তাহারা যাহাতে সেখানে সুখে থাকে, তাহার জন্য সদা জাগ্রত থাকিবে, ততদিন পর্যন্ত ভিক্ষুদের শ্রীবৃদ্ধি হইবে, হানি হইবে না।'' ইহা হইতে বুঝা যায় যে, সংঘের লোকেরা একত্র মিলিত হইবে, এক মতে সংঘের কার্য করিবে, বৃদ্ধ ও চরিত্রবান ভিক্ষুদিগকে সম্মান করিবে প্রভৃতি যে সব নিয়ম বিনয়পিটকে পাওয়া যায়, সেগুলি ভগবান বুদ্ধ বজ্জীদের মতো স্বাধীন গণমূলক রাজ্যগুলিতে যে শাসনপদ্ধতি প্রচলিত ছিল, তাহা হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

সংঘের কোনো কোনো নিয়ম লোকাচার অনুযায়ী নির্ধারিত হইয়াছিল

কিন্তু রাজ্যশাসনের সবরকম নিয়মই সংঘে প্রয়োগ করা সম্ভবপর ছিল না। সংঘের কোনো ভিক্ষু অপরাধ করিলে, তাহাকে সর্বাপেক্ষা বেশি শাস্তি দেওয়া মানে সংঘ হইতে তাহাকে বাহির করিয়া দেওয়া, শুধু এইটুকু করা হইত; ইহা অপেক্ষা কঠোর শাস্তি ছিল না। কেননা সংঘের সব নিয়ম অহিংসামূলক ছিল এইসব নিয়মের মধ্যে অনেকগুলি (তৎকালের) লোকাচার হইতে গৃহীত হইয়াছিল। উদাহরণস্বরূপ, নিম্নলিখিত নিয়মটি দেখা যাউক—

ভগবান বুদ্ধ আলবী নামক স্থানে অগ্‌গালবচেতিয় নামক মহল্লায় থাকিতেন। ঐসময় 'আলবক' নামক এক ভিক্ষু গৃহনির্মাণের কাজে জমি খনন করাইতেছিল। ইহা দেখিয়া, অন্য লোকে তাহার সমালোচনা করিতেছিল। এই কথা জানিতে পারিয়া ভগবান বুদ্ধ ভিক্ষুদের জন্য জমি খনন করা নিষিদ্ধ বলিয়া নিয়ম করিয়া দিলেন। নিয়মটি এই—

যে ভিক্ষু জমি খনন করিবে, অথবা করাইবে সে পাতকী হইবে।[১]

ভগবান ভিক্ষুদিগকে অবশ্য এইটুকু অনুমতি দিয়াছিলেন যে, তাহারা ছোটোখাটো কুটির কিংবা বেতের বিহার বানাইয়া, তাহাতে থাকিতে পারিবে; আর এই কাজে জমি খনন করা অথবা করানো পাপ হইবে, এমন নয়। তথাপি ঐ নিয়মটি শুধু লোকের

১. 'বৌদ্ধসংঘাচা পরিচয়', পৃ. ৯৭

মনস্তুষ্টির জন্যই করিতে হইয়াছিল। যাহাতে ছোটোখাটো প্রাণীর হত্যা না হয়, তাহার জন্য অধিকাংশ শ্রমণ সাবধানতা অবলম্বন করিত। তাহারা রাত্রিতে বাতি জ্বালাইত না। কেননা, বাতিতে কীট-পতঙ্গ প্রভৃতি প্রাণী উড়িয়া পড়া সম্ভবপর ছিল। আর তাহাদের এইরূপ আচরণের কথা জনসাধারণের মধ্যেও ছড়াইয়াছিল। তাই যদি কোনো শ্রমণ নিজে কোদাল হাতে লইয়া জমি খনন করিতে যাইত, তাহা হইলে সর্বসাধারণ লোকের মনে বিসদৃশ লাগা খুবই স্বাভাবিক ছিল। উহাদের সহিত আলাপ আলোচনা করিয়া, তাহাদের মত বদলানো, ভগবান বুদ্ধের নিকট আবশ্যক মনে হয় নাই। ভগবান বুদ্ধ জানিতেন যে, তপস্যায় বৃথা সময় না কাটাইয়া যদি ভিক্ষুরা সর্বসাধারণ লোককে ধর্ম শিক্ষা দেয়, এবং নিজেরা ধ্যান-ধারণার সাহায্যে চিত্ত দমন করিবার অবকাশ পায়, তাহা হইলে সংঘের কার্য সুসম্পাদিত হইবে; আর এইজন্যই, যেসব প্রচলিত প্রথা অনিষ্টকর ছিল না, সেগুলি সংঘে গ্রহণ করিতে, ভগবান বুদ্ধ কোনো আপত্তির কারণ দেখেন নাই।

ভিক্ষুসংঘের সাদাসিধা চালচলন

অন্যান্য সম্প্রদায়ে তপস্যার যেসব পদ্ধতি প্রচলিত ছিল, ভগবান বুদ্ধ তাহা মোটেই পছন্দ করিতেন না; তথাপি তাঁহার নিজের সংঘের ভিক্ষুরা যাহাতে খুব সাদাসিধাভাবে চলাফেরা করে, সেইজন্য তিনি খুব যত্ন লইতেন। ভিক্ষুরা যদি দান গ্রহণ করে, তাহা হইলে তাহারা দানের জিনিসপত্র সঙ্গে লইয়া কিভাবে চারিদিকে গিয়া প্রচারকার্য চালাইতে সমর্থ হইবে? সামঞ্‌ঞফল সুত্তে ভগবান বুদ্ধ রাজা অজাতশত্রুকে কহিতেছেন,

সেয্যথাপি মহারাজ পক্‌খী সকুণো যেন যেনেব ডেতি সপত্তভারো ব ডেতি। এবমেব মহারাজ ভিক্ষু সন্তুট্‌ঠো হোতি, কায় পরিহারিকেন চীবরেন, কুচ্ছি পরিহারিকেন পিণ্ডপাতেন। সো যেন যেনের পক্কমতি সমাদায়ের পক্কমতি।

'হে মহারাজ, যেমন কোনো পক্ষী যেদিকে উড়ে, সেইদিকে সে নিজের পাখাসহই উড়ে, তেমনই, হে মহারাজ, ভিক্ষুও শরীরের জন্য প্রয়োজনীয় চীবর (বস্ত্র) এবং পেটের জন্য প্রয়োজনীয় অন্ন (ভিক্ষা) শুধু ইহাতেই সন্তুষ্ট হয়। সে যে-যে দিকে যায়, সেই সেই দিকে, নিজের জিনিসপত্রও সঙ্গে লইয়া যায়।'

এইভাবে, ভিক্ষুর নিকট, খুব বেশি হয়তো, নিম্নলিখিত গাথায় বর্ণিত আটটি জিনিস থাকিত ঃ

তিচীবরং চ পত্তো চ বাসি সূচি চ বন্ধনং।
পরিস্সাবনেন অট্‌ঠেতে যুওযোগস্স ভিক্‌খু নো॥

'তিনটি বস্ত্রখণ্ড, একটি পাত্র, একটি বাসি (ছোটো কাঠার), একটি সূঁচ, কেমারের একটি তাগা ও জল ছাঁকার একটি নেকড়া, এই আটটি জিনিস যোগী ভিক্ষুর পক্ষে যথেষ্ট।'

চলাফেরার নিয়ম

এইভাবে ভিক্ষুরা অত্যন্ত সাদাসিধাভাবে চলাফেরা করিবে, ভগবান বুদ্ধের এইরূপ উপদেশ

ছিল। তথাপি মনুষ্যস্বভাব অনুযায়ী, কোনো কোনো ভিক্ষু এইসব জিনিসও কিছু বেশি মাত্রায় সঙ্গে রাখিত; অর্থাৎ তিনটির বেশি চীবর সঙ্গে লইত; মাটি কিংবা লোহার পাত্র না রাখিয়া, তামা কিংবা পিতলের পাত্র রাখিত; চীবরও সাধারণ আকার অপেক্ষা বড়ো বানাইত। ইহাতে ভিক্ষুরা লোকেদের নিকট হইতে দান গ্রহণ করিবার সুযোগ পাইত। এসব বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে অনেক নিয়ম করিতে হইয়াছিল। এই নিয়মগুলির সংখ্যা বেশ বড়ো।

বিনয়পিটকে ভিক্ষুসংঘের জন্য মোট ২২৭টি নিষেধাত্মক নিয়ম দেওয়া হইয়াছে। এইগুলিকে 'পাতিমোক্‌খ' বলে। ইহাদের মধ্যে দুইটি নিয়ম অনিয়ত (অর্থাৎ সর্বদা পালনীয় নয় এইরূপ) ছিল। শেষের ৭৫টিকে "সেখিয়" বলা হইত। অর্থাৎ এই নিয়মগুলি আহার, পান, চলাফেরা ও কথাবার্তায় কিভাবে শিষ্টাচার রক্ষা করা যায়, তাহার সম্বন্ধে। এইগুলি বাদ দিয়া, বাকী ১৫০টি নিয়মকেই অশোকের নিকটবর্তী কালে পাতিমোক্‌খ বলা হইত বলিয়া মনে হয়। তৎপূর্বে, ইহাদের সবগুলি অস্তিত্ব লাভ করে নাই। আর যেগুলি বিদ্যমান ছিল, তাহাদের মধ্যে মূল নিয়মগুলি ব্যতীত বাকীগুলি প্রয়োজনমত পরিবর্তন করিবার পূর্ণ অধিকার সংঘের ছিল। পরিনির্বাণ লাভ করিবার পূর্বে, ভগবান বুদ্ধ আনন্দকে বলিয়াছিলেন, 'হে আনন্দ, আমার মৃত্যুর পর, সংঘ ইচ্ছা করিলে, ছোটোখাটো নিয়মগুলি বাদ দিতে পারিবে।'

ইহা হইতে স্পষ্ট হয় যে, ভগবান বুদ্ধ ছোটোখাটো নিয়ম বাদ দিতে কিংবা দেশকালানুযায়ী সাধারণ নিয়মগুলি অদলবদল করিতে, সংঘকে সম্পূর্ণ অনুমতি দিয়াছিলেন।

শরীরের প্রয়োজনীয় জিনিস ব্যবহারে সাবধানতা

প্রয়োজনীয় জিনিসগুলির মধ্যে চীবর, পিণ্ডপাত (খাদ্য), শয়নাসন (শোয়া-বসার জন্য পাতা যায়, এমন কিছু) এবং ঔষধ, এই চারিটি প্রধান ছিল। ভগবানের এইরূপ নির্দেশ ছিল যে, পাতিমোক্‌খের নিয়ম অনুসারেও এইগুলি ব্যবহার করিবার সময়, বিচারপূর্বক ব্যবহার করিতে হইবে।

চীবর পরিধান করিবার সময় বলিতে হইত—'নিখুঁতভাবে বিচার করিয়া আমি এই চীবর ব্যবহার করিতেছি, ইহা শুধু শীত, গ্রীষ্ম, মশা, মাছি, বাতাস, রোদ, সাপ প্রভৃতি হইতে যাহাতে কোনো অনিষ্ট না হয়, এই উদ্দেশ্যে এবং গুহ্যেন্দ্রিয় ঢাকিয়া রাখিবার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করিতেছি।'

পিণ্ডপাত (অর্থাৎ ভিক্ষান্ন) খাইবার সময় তাহাকে বলিতে হইত—'নিখুঁতভাবে বিচার করিয়া আমি এই অন্ন খাইতেছি; তাহা শরীরকে ক্রীড়াক্ষম কিংবা অতিশয় বলশালী, অথবা সুন্দর ও সুশোভন করিবার উদ্দেশ্যে নয়। শুধু যাহাতে দেহ রক্ষা রয়, দেহের কষ্ট দূর হয় এবং ব্রহ্মচর্যের সাহায্য হয়, এই উদ্দেশ্যেই আমি অন্ন খাইতেছি। এইভাবে পরিমিত আহার করিয়া, আমি (ক্ষুধার) প্রাচীন বেদনা দূর করিব এবং (বেশি খাইয়া)

নূতন যন্ত্রণার সৃষ্টি করিব না। ইহা করিলে, আমার শরীর ঠিকভাবে চলিবে, লোকাপবাদ হইবে না এবং জীবন সুখকর হইবে।'

শয়নাসন ব্যবহার করিবার সময় ভিক্ষুকে বলিতে হইত—'নিখুঁতভাবে বিচার করিয়া আমি এই শয়নাসন ব্যবহার করিতেছি। উহা শুধু শীত, গ্রীষ্ম, মাছি, মশা, বাতাস, রোদ, সাপ এইগুলি হইতে যাহাতে কোনো অনিষ্ট না হয়, এই উদ্দেশ্যে, এবং নির্জনে বিশ্রান্তির জন্য ব্যবহার করিতেছি।' ঔষধ ব্যবহার করিবার সময় ভিক্ষুকে বলিতে হইত—'নিখুঁত বিচার করিয়া আমি এই ঔষধ ব্যবহার করিতেছে। তাহা শুধু যে রোগ উৎপন্ন হইয়াছে, উহা দূর করিবার উদ্দেশ্যে, এবং তাহাও আবার আমি সুস্থ হওয়া পর্যন্তই ব্যবহার করিব।'[১]

দেবদত্ত কর্তৃক ভিক্ষুসংঘের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি

সংঘে যাহাতে সাদাসিধাপনা ও পরস্পরের প্রতি মৈত্রীভাব অক্ষুণ্ণ থাকে, এইজন্য ভগবান বুদ্ধ খুব সাবধানতা অবলম্বন করিতেন। তথাপি মানুষের স্বভাব এমনই অদ্ভুত যে, তাহারা একত্র হইলে তাহাদের মতভেদ উৎপন্ন হইয়া, বিভিন্ন দল গড়িয়া উঠিবেই। ইহার প্রধান কারণ হইতেছে গর্ব ও তাহারই ছোটো ভাই অজ্ঞান। মানুষ যতই না কেন সাদাসিধাভাবে চলুক, তবুও সে যদি নেতা হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করে, তাহা হইলে অপরের গুণকে দোষ বলিয়া দেখাইয়া, নিজের মহত্ত্ব বাড়াইবার চেষ্টা না করিয়া পারে না। আর এই নেতা হওয়ার ইচ্ছার জালে যদি কোনো অজ্ঞানী লোক আবদ্ধ হয়, তাহা হইলে সে সহজেই এক নূতন সম্প্রদায় স্থাপন করিতে পারে। বৌদ্ধসংঘে এইরূপ (ক্ষমতালোলুপ) প্রথম ভিক্ষু বলিতে গেলে, হইতেছে দেবদত্ত। এই ব্যক্তি শাক্যজাতীয় এবং বুদ্ধের আত্মীয় ছিলেন। তিনি ভগবান বুদ্ধের নিকট এইরূপ প্রার্থনা করিলেন যে, সংঘের নেতৃত্ব তাঁহার হস্তেই অর্পিত হউক। ভগবান এই প্রার্থনা মঞ্জুর করিলেন না। তখন সে অজাতশত্রুর নিকট হইতে বুদ্ধকে মারিবার জন্য কয়েকজন আততায়ী পাঠাইলেন। কিন্তু ইহারা বুদ্ধকে হত্যা না করিয়া বরং তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিল। তখন দেবদত্ত গৃধ্রকূট পর্বতশ্রেণীর একটি পাহাড় হইতে বুদ্ধের উপর একটি পাথর নিক্ষেপ করিল। তাহার একখণ্ড বুদ্ধের পায়ে পড়ায়, সেখানে জখম হইল। জখম ভালো হওয়ার পর, যখন ভগবান রাজগৃহে ভিক্ষা করিতেছিলেন, তখন দেবদত্ত তাঁহার উপর নীলগিরি নামক একটি পাগলা হাতি ছাড়িয়া দিলেন। হাতিটি ভগবানের পদধূলি মাথায় তুলিয়া লইল এবং পুনরায় স্বস্থানে গিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। এইভাবে তাহার সকল ফন্দি পণ্ড হওয়ার পর দেবদত্ত বুদ্ধকে সংঘে তপস্যার জন্য কড়া কড়া নিয়ম প্রবর্তন করিতে অনুরোধ করিলেন, আর ইহাতেও ভগবান সম্মত না হওয়ায়, দেবদত্ত সংঘের ভিতর বিভেদ সৃষ্টি করিয়া কয়েকজন ভিক্ষুকে সঙ্গে লইয়া গয়াতে চলিয়া গেলেন।

---

১. এইভাবে চারিটি শরীরোপযোগী জিনিস সাবধানে ব্যবহার করাকে পচ্চবেক্‌খণ (প্রত্যবেক্ষণ) বলে, আর এই প্রথাটি আজও (বৌদ্ধভিক্ষুদের মধ্যে) প্রচলিত আছে।

দেবদত্তের এই কাহিনী বিস্তৃতভাবে চুল্লবগ্‌গে বর্ণিত হইয়াছে।[১] কিন্তু এই কাহিনীতে অতি অল্পই তথ্যাংশ আছে বলিয়া মনে হয়। কেননা, যদি দেবদত্ত বুদ্ধকে হত্যা করিবার মতো লোক হইতেন, তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে সংঘে অনৈক্য সৃষ্টি করা সম্ভবপর হইত না। এবং সংঘের কোনো কোনো ভিক্ষু তাঁহার ভক্তও হইত না।

লাভসৎকারসংযুত্তের ষট্‌ত্রিংশৎসুত্ত হইতে বুঝা যায় যে, অজাতশত্রু যুবরাজ থাকা কালেই তাঁহার সহিত দেবদত্তের বন্ধুত্ব জন্মিয়াছিল, এবং তখন হইতেই দেবদত্ত সমাজের একজন গণ্যমান্য নেতা হওয়ার জন্য চেষ্টা করিতেছিল। ঐ সুত্তটির সারমর্ম এই ঃ

"ভগবান বুদ্ধ রাজগৃহে বেলুবনে বাস করিতেন। তখন রাজকুমার অজাতশত্রু পাঁচশো রথ সঙ্গে লইয়া সকাল ও সন্ধ্যায় দেবদত্তকে দেখিবার জন্য যাইত এবং দেবদত্তকে পাঁচশো লোকের উপযুক্ত আহার পাঠাইত। এই কথা কোনো কোনো ভিক্ষু ভগবানকে কহিল। তখন ভগবান কহিলেন, 'হে ভিক্ষুগণ, তোমরা দেবদত্তের অর্থলাভ ও সম্মানের স্পৃহা করিয়ো না। এই লাভে দেবদত্তের অবনতিই হইবে, উন্নতি হইবে না।"

তাহা ছাড়া দেবদত্তকে উদ্দেশ করিয়া ভগবান নিম্নলিখিত যে গাথাটি বলিয়াছিলেন, তাহা দুই জায়গায় উপলব্ধ হয়।

ফলং বে কদলিং হন্তি ফলং বেলুং ফলং নলং।
সক্কারো কাপুরিসং হন্তি গব্ভো অস্‌সতরিং যথা॥[২]

'ফল কলার নাশ করে, ফল বেলুর ও ফল নলের নাশ করে; আর খেচরীর গর্ভ খেচরীর নাশ করে। তেমনই সম্মান কাপুরুষের নাশ করে।'

দেবদত্ত অধিকার লাভের জন্য অজাতশত্রুর সাহায্যে কিভাবে চেষ্টা করিতেন, তাহা উপরের গাথা হইতে অনুমান করা যায়। অজাতশত্রু তাহার পিতাকে হত্যা করিয়া সিংহাসনে বসিল, তথাপি দেবদত্ত তাহার সঙ্গ ছাড়ে নাই এবং তাহারই সাহায্যে সংঘে বিভেদ উৎপন্ন করিয়া অনেক ভিক্ষুকে নিজের অনুগামী করিয়াছিলেন। তাঁহার এই কাজ যে ভগবান বুদ্ধের ভালো লাগে নাই, ইহাতে আশ্চর্যের কী আছে? কিন্তু দেবদত্ত সংঘের ভিতর যে বিভেদ সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহা সংঘের বিশেষ হানি করে নাই, এবং সংঘ এই সংকট হইতে নিরাপদে বাহির হইতে পারিয়াছিল।[৩]

ভিক্ষুসংঘের অপর একটি কলহ

কৌশাম্বীতে ভিক্ষুসংঘে আর একটি সামান্য কলহ উৎপন্ন হইয়াছিল বলিয়া মহাবগ্‌গে বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে। মহাবগ্‌গের রচয়িতা কিংবা রচয়িতারা এই কাহিনীটি এমন ভাবে লিখিয়াছেন, যাহাতে উহা অনুরূপ অন্য প্রসঙ্গে সংঘের কাজে লাগিতে পারে।

১. 'বুদ্ধলীলাসার সংগ্রহ', পৃ. ১৭৯-৮৮।

২. 'সংযুত্তনিকায়' (P. T. S.) ভাগ দুই, পৃ ২৪১ এবং 'অঙ্গুত্তরনিকায়' (P. T. S.) ভাগ দুই, পৃ. ৭৩।

৩. 'বুদ্ধলীলাসার সংগ্রহ' পৃ. ১৮৭-১৮৮।

গল্পটির সারমর্ম এই ঃ দুইজন বিদ্বান্ ভিক্ষুর মধ্যে বিনয়ের একটি ক্ষুদ্র নিয়ম লইয়া মতভেদ হওয়ায়, এই ঝগড়া উপস্থিত হইয়াছিল। সেই সময় ভগবান বুদ্ধ তাহাদিগকে দীর্ঘায়ুর গল্প বলিয়াছিলেন। কিন্তু তাহারা বুদ্ধের কথা শুনিয়া প্রস্তুত ছিল না। উহাদের মধ্যে একজন কহিল, "মহাশয়, আপনি স্থির হইয়া থাকুন, আমরাই এই ঝগড়ার কি হয়, দেখিয়া লইব।" ইহাদের সকলের মন অত্যন্ত কলুষিত হইয়াছে দেখিয়া, ভগবান্ কৌশাম্বী হইতে প্রাচীন বংসবাদ উপবনে গেলেন। সেখানে অনুরুদ্ধ, নন্দিয় এবং কম্বিল, এই তিনজন ভিক্ষু থাকিত। তাহাদের একতা দেখিয়া, ভগবান তাহাদিগকে অভিনন্দন করিলেন। আর সেখান হইতে ভগবান পারিলেয্যপ বনে গেলেন। ঐ সময়েই, একটি হস্তিযুথের সর্দার হস্তীটি নিজের দলের প্রতি বিরক্ত হইয়া, ঐ বনে একাকী বাস করিতেছিল। সে ভগবান বুদ্ধকে অভ্যর্থনা করিল। ভগবান কিছুকাল সেখানে থাকিয়া শ্রাবস্তীতে আসিলেন।

এদিকে কৌশাম্বীর উপাসকরা (গৃহী ভক্তরা) ঐ কলহরত ভিক্ষু দুইটিকে প্রকৃতিস্থ করিবার উদ্দেশ্যে স্থির করিল যে, ইহাদিগকে কোনোরকম সম্মান দেখানো হইবে না এবং ভিক্ষাও দেওয়া হইবে না। ইহাতে ভিক্ষু দুইটি প্রকৃতিস্থ হইয়া শ্রাবস্তীতে গেল। তখন ভগবান বুদ্ধ ঝগড়া উপস্থিত হইলে তাহা কিভাবে মিটাইতে হয়, সে সম্বন্ধে কয়েকটি নিয়ম নির্দেশ করিয়া, উপালি প্রভৃতি ভিক্ষুদের দ্বারা ঐ ঝগড়ার মিটমাট করিলেন।[1]

মজ্ঝিমনিকায়ের উপক্কিলেসসুত্তে (নং ১২৮) উপরে বর্ণিত মহাগ্‌গস্থ গল্পটির অনেকটাই রহিয়াছে। কিন্তু উহার মধ্যে দীর্ঘায়ুর গল্পটি আদৌ নাই, তাহা ছাড়া, সুত্তটির সমাপ্তিও প্রাচীন-বংসবাদ বনে করা হইয়াছে। পারিলেয্যক বনে যে ভগবান গিয়াছিলেন, সেই অংশটিও ঐ সুত্তে নাই। তাহা উদানবগ্‌গে পাওয়া যায়।

কোশম্বিয়সুত্তে ইহা অপেক্ষা অন্যরকম তথ্যই দেওয়া আছে। তাহার সার এই—

ভগবান বুদ্ধ কৌশাম্বীতে ঘোষিতারামে থাকিতেন। তখন কৌশাম্বীর ভিক্ষুরা পরস্পরের সহিত ঝগড়া করিতেছিল। ভগবান এই কথা বুঝিতে পারিয়া, ঐ ভিক্ষুদিগকে তাঁহার নিকট ডাকাইলেন, এবং তাহাদিগকে বলিলেন, "হে ভিক্ষুগণ, যখন তোমরা পরস্পরের সহিত ঝগড়া কর, তখন পরস্পরের প্রতি তোমাদের বাচনিক এবং মানসিক কর্ম মৈত্রীপূর্ণ হওয়া সম্ভবপর কি?"

ভিক্ষুরা উত্তর দিল, 'না'। তখন ভগবান কহিলেন, "যদি সম্ভবপর নয়, তাহা হইলে তোমরা কেন ঝগড়া কর? হে উদ্দেশ্যবিহীন মনুষ্যগণ, এইরূপ ঝগড়াতে চিরকাল তোমাদের ক্ষতি ও দুঃখ হইবে।"

ভগবান আবার কহিলেন, "হে ভিক্ষুগণ, এই ছয়টি স্মরণীয় নিয়মের সাহায্যে ঝগড়া মিটাইতে, সামগ্রী লাভ করিতে এবং ঐক্য লাভ করিতে পারা যায়। ঐ নিয়মগুলি কি? ১. মৈত্রীপূর্ণ শারীরিক কর্ম, ২. মৈত্রীপূর্ণ বাচনিক কর্ম, ৩. মৈত্রীপূর্ণ মানসিক কর্ম, ৪. ভক্তদিগের নিকট হইতে প্রাপ্ত দানসামগ্রী সংঘের সকলের সঙ্গে সমানভাবে ভাগ করিয়া

---

১. 'বৌদ্ধসংঘাচা পরিচয়', পৃ. ৩৭-৪৩।

উপভোগ করা, ৫. নিজের চরিত্রে কিছুমাত্র ত্রুটি থাকিতে না দেওয়া, এবং ৬. আর্য শ্রাবককে শোভা পায়, এমন সম্যক্ দৃষ্টি রাখা।''

এই সম্যক্ দৃষ্টি সম্বন্ধে ভগবান বুদ্ধ যথেষ্ট বিচার করিয়াছেন। এখানে তাহার বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া আবশ্যক বলিয়া মনে হয় না। এই উপদেশের শেষদিকে, সেই ভিক্ষুরা ভগবানের বক্তৃতার অভিনন্দন করিল।

ইহার অর্থ এই যে, ঐ ঝগড়া সেখানেই মিটিয়া গেল। তাহা না হইলে ঐ ভিক্ষুরা ভগবানের ভাষণটি কি করিয়া অভিনন্দন করিতে পারিল? মহাবগ্‌গে এবং উপক্কিলেসসুত্তে ঐ ভিক্ষুরা বুদ্ধকে অভিনন্দন করিয়াছিল বলিয়া উল্লেখ নাই, সেখানে এইরূপ বলা হইয়াছে যে, তাহারা কলহই করিতে থাকিল এবং তাহাদের প্রতি বিরক্ত হইয়া, ভগবান সেখান হইতে প্রাচীন বংসদাব বনে চলিয়া গেলেন। তাহা হইলে, উক্ত দুই বর্ণনার বৈষম্য কি করিয়া দূর করা যাইতে পারে?

অঙ্গুত্তরনিকায়ে চতুক্কনিপাতের ২৪১তম সুত্তে এই সংবাদটুকু পাওয়া যায় ঃ

এক সময়, ভগবান কৌশাম্বীতে ঘোষিতারামে থাকিতেন। ঐ সময় আয়ুষ্মান আনন্দ তাঁহার নিকট আসিয়া, অভিবাদনপূর্বক তাঁহার কাছেই বসিল। ভগবান তাহাকে বলিলেন, "হে আনন্দ, ঐ ঝগড়া মিটিল কি?"

আ.—মহাশয়, ঝগড়া মিটিবে কি করিয়া? অনুরুদ্ধের শিষ্য বাহিয় যেন সংঘভেদ করিবার জন্যই প্রবৃত্ত হইয়াছে; আর অনুরুদ্ধ তাহাকে একটি কথাও বলে না।

ভ.—কিন্তু হে আনন্দ, অনুরুদ্ধ কি কখনো সংঘে ঝগড়া মিটাইবার জন্য হস্তক্ষেপ করে? তুমি আর সারিপুত্ত মোগ্‌গল্লান, তোমারই তো ঝগড়া মিটমাট কর, নয় কি?

ইহা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, বাহিয় দ্বারা এই ঝগড়া সৃষ্টি হইয়া, উহা যখন সকলের আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া গেল, তখন তাহা মিটাইবার জন্য স্বয়ং বুদ্ধকে চেষ্টা করিতে হইয়াছিল। ভিক্ষুদের সভা হইতে ভগবান কিছুকাল অন্যত্র চলিয়া গেলেও ঝগড়াটি কৌশাম্বীতেই মিটানো হইয়া থাকিবে।

এইরূপ প্রসঙ্গে কলহরত ভিক্ষুদিগকে ঠিক পথে আনিবার জন্য গৃহী ভক্তরা তাহাদিগকে বর্জন করিবে এবং ইহাতে তাহারা প্রকৃতিস্থ হওয়ার পর, কোন উপায়ে তাহাদের ঝগড়া মিটাইবে, ইহা বলিবার উদ্দেশ্যে মহাবগ্‌গের রচয়িতারা এই গল্পটি লিখিয়াছিলেন বলিয়া প্রমাণিত হয়। এইরকম ছোটোখাটো ঝগড়াতে সংঘের উপর খুব খারাপ পরিণাম হওয়া আদৌ সম্ভবপর ছিল না।

ভিক্ষুণীসংঘের প্রতিষ্ঠা

ভিক্ষুণীসংঘের প্রতিষ্ঠার কথা চুল্লবগ্‌গে বর্ণিত হইয়াছে। ইহার সার এই—

ভগবান বুদ্ধ কপিলবস্তুর নিগ্রোধারামে থাকিতেন। সেইসময় মহাপ্রজাপতী গোতমী ভগবানের নিকট আসিয়া কহিলেন, 'মহাশয়, নারীদিগকে তোমার সম্প্রদায়ে সন্ন্যাস গ্রহণ করিবার অনুমতি দাও।'' ভগবান এই অনুরোধ তিনবার প্রত্যাখ্যান করিলেন এবং গোতমী

সেখান হইতে বৈশালীতে আসিলেন। এতটা পথ হাঁটায় তাহার পা ফুলিয়া গিয়াছিল, শরীর ধুলায় মলিন হইয়াছিল, আর মুখে উদাসীনতা দেখা যাইতেছিল। আনন্দ তাহাকে দেখিয়া তাহার উদাসভাবের কারণ জিজ্ঞাসা করিল। গোতমী কহিলেন, "ভগবান স্ত্রীলোককে বৌদ্ধসম্প্রদায়ের মধ্যে সন্ন্যাস গ্রহণের অনুমতি দিতেছেন না; ইহাতে আমার এই উদাসভাব হইয়াছে।" তাহাকে সেখানেই থাকিতে বলিয়া আনন্দ ভগবানের নিকট গেল এবং নারীদিগকেও সন্ন্যাস গ্রহণের অনুমতি দিতে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিল। কিন্তু ভগবান এই অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করিলেন। তখন আনন্দ কহিল, "মহাশয় তথাগত যে ধর্মসম্প্রদায় স্থাপন করিয়াছেন, তাহাতে ভিক্ষুণী হইয়া কোনো নারীর পক্ষে স্রোতআপত্তিফল, সকৃদাগামী ফল, অনাগামিফল ও অর্হৎফল* প্রাপ্ত হওয়া সম্ভবপর কি না?" ভগবান যখন কহিলেন সম্ভবপর, তখন আনন্দ বলিল "যদি সম্ভবপর, তাহা হইলে যে মাসীমা ভগবানকে মায়ের অভাবে দুধ খাওয়াইয়া লালনপালন করিলেন, তাঁহার অনুরোধে ভগবান নারীদিগকে সন্ন্যাস দিন।"

ভগবান কহিলেন, "যদি মহাপ্রজাপতী গোতমী আটটি দায়িত্বপূর্ণ নিয়ম (অট্‌ঠগরুধম্মা) মানিয়া লন, তাহা হইলে আমি নারীদিগকে সন্ন্যাস লইতে অনুমতি দিব। ১. সংঘে ভিক্ষুণী যত দীর্ঘকালই থাকুক না কেন, সে ছোটোবড়ো সকল ভিক্ষুকেই নমস্কার করিবে। ২. যে যে গ্রামে ভিক্ষুরা নাই, তথায় ভিক্ষুণীরা থাকিবে না। ৩. প্রত্যেক পক্ষে (১৫ দিন পর) উপবাস কোন কোন দিনে করিতে হইবে, এবং ধর্মোপদেশ শুনিবার জন্য কখন আসিতে হইবে, এই দুইটি কথা ভিক্ষুণীরা ভিক্ষুসংঘকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়া লইবে। ৪. চাতুর্মাসের পর ভিক্ষুণীরা ভিক্ষুসংঘ ও ভিক্ষুণী সংঘের প্রবারণা[১] করিবে। ৫. যেসব ভিক্ষুণীর হাতে "সংঘাদিশেষ আপত্তি" ঘটিয়াছে, তাহারা উভয় সংঘের নিকট হইতে ১৫ দিনের মানত্ত[২] গ্রহণ করিবে। ৬. দুই বৎসর সংঘে সাধনা করিবার পর ভিক্ষুণীকে উভয় সংঘই উপসম্পদা দিবে। ৭. কোনো কারণেই ভিক্ষুণী ভিক্ষুকে গালাগালি করিতে পারিবে না। ৮. ভিক্ষুণী ভিক্ষুকে উপদেশ দিবে না; ভিক্ষুই ভিক্ষুণীকে উপদেশ দিবে।

আনন্দ এই আটটি নিয়ম মহাপ্রজাপতী গোতমীকে জানাইল এবং তিনি এইগুলি অনুমোদন করিলেন। এই পর্যন্ত কাহিনীটি বলা হইয়াছে, তাহা অঙ্গুত্তরনিকায়ের অট্‌ঠকনিপাতেও দেখিতে পাওয়া যায়। আর তাহার পর, ভগবান আনন্দকে বলিলেন, 'হে আনন্দ, যদি আমাদের ধর্মশিক্ষায় নারীকে সন্ন্যাস দেওয়া না হইত, তাহা হইলে এই ধর্ম (ব্রহ্মচর্য) ১০০০ বৎসর টিকিয়া থাকিত। যেহেতু এখন নারীকেও সন্ন্যাসের অধিকার দেওয়া হইল, সেইজন্য এই সৎধর্ম শুধু পাঁচশো বছরই টিকিবে।'

---

* এই চারিটি ফলের সম্পর্কে আরো বিস্তৃত ব্যাখ্যা পরে এই পরিচ্ছেদেই দেওয়া হইয়াছে। পৃ. ১৭৮ দ্রষ্টব্য।

১. স্ব দোষ বলিবার জন্য (দেখাইয়া দেওয়ার জন্য) সংঘকে অনুরোধ করা। 'বৌদ্ধ সংঘাচা পরিচয়' পৃ. ২৪-২৬।

২. সংঘের সন্তুষ্টির জন্য বিহারের বাহিরে রাত্রি কাটানো। 'বৌদ্ধ সংঘাচা পরিচয়' পৃ. ৪৭।

এইভাবে বিনয় ও অঙ্গুত্তরনিকায়ের মধ্যে এই ব্যাপারের বর্ণনায় সাম্য আছে বটে, তথাপি এই আটটি কঠোর ধর্ম (গুরুধর্ম) পরে রচিত হইয়াছিল, এইরূপই বলিতে হইবে; কেননা, বিনয়ের নিয়ম বিধান করিবার সময় ভগবান যে-পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহার সহিত বর্তমান নিয়মগুলির স্পষ্ট বিরোধ রহিয়াছে।

ভগবান বুদ্ধ বেরঞ্জাগ্রামের নিকট থাকিতেন। ঐ সময় বেরঞ্জার আশেপাশে দুর্ভিক্ষ ছিল বলিয়া ভিক্ষুদের খুব কষ্ট হইতে লাগিল। তখন সারিপুত্ত ভগবানকে অনুরোধ করিল যে, আচার-বিচার সম্বন্ধে ভিক্ষুদের জন্য নিয়ম বাঁধিয়া দেওয়া হউক। ভগবান কহিলেন, 'হে সারিপুত্ত, তুমি একটু থামো। কখন নিয়ম বাঁধিয়া দেওয়া দরকার, তাহা তথাগতের জানা আছে। যতদিন পর্যন্ত সংঘে কোনোরকম পাপাচার প্রবেশ না করে, ততদিন পর্যন্ত ঐরূপ পাপ নিবারণ করিবার জন্য তথাগত কোনো নিয়ম করেন না।''[১]

বুদ্ধের এই উক্তি অনুসারেই সংঘের সর্বনিয়ম রচিত হইয়াছিল। প্রথম কোনো ভিক্ষু কিছু একটা অপরাধ অথবা ভুল করিত, আর সেই কথা বুদ্ধের কানে আসিলে, তিনি ভিক্ষুসংঘের সভা করিয়া, দুই-একটি নিয়ম প্রবর্তন করিতেন। আর ভিক্ষুরা ঐ নিয়মের ঠিক ঠিক অর্থ করিতে পারে না, এইরূপ বুঝিতে পারিলে, তিনি পরে ঐ নিয়মের সংস্কার করিতেন।

কিন্তু (পূর্বোক্ত কাহিনীতে) মহাপ্রজাপতী গোতমীর ব্যাপারে এই পদ্ধতি অবলম্বন করা হয় নাই। ভিক্ষুণীসংঘে কোনো দোষ ঘটে নাই, আর তাহার আগেই ভিক্ষুণীদের উপর এই আটটি নিয়ম চাপানো হইল, ইহা বিলক্ষণ বলিয়া মনে হয়। সুতরাং অনুমান করা যায় যে, বুদ্ধের মৃত্যুর পর, ভিক্ষুসংঘ নিজের হাতে সকল ক্ষমতা রাখিয়া দেওয়ার জন্য এইসব নিয়ম করিয়া বিনয়ে এবং অঙ্গুত্তরনিকায়ে ঢুকাইয়াছিল।

বিনয়পিটকে হইতে সুত্তপিটক বেশি প্রাচীন। তথাপি উহাতে কোনো কোনো নূতন সুত্ত পরে সমাবিষ্ট হইয়াছিল এবং উক্ত আটটি নিয়মও এইরূপই। খৃস্টপূর্ব প্রথম অথবা দ্বিতীয় শতাব্দীতে, যখন মহাযান সম্প্রদায়ের দ্রুত গতিতে প্রসার হইতেছিল, ঐ সময় এইগুলি লিখিত হইয়া থাকিবে। ইহাতে যে সদ্ধর্ম শব্দটি ব্যবহার করা হইয়াছে, তাহার অর্থ 'স্থবিরবাদী পন্থ।' এই কাহিনীতে সুত্তের রচয়িতা যেন এইরূপ ভবিষ্যদ্‌বাণী করিতেছেন যে, ভিক্ষুণী সংঘের প্রতিষ্ঠা হওয়াতে এই ধর্ম পাঁচশো বছর টিকিবে, আর তাহার পর, সর্বত্র মহাযান সম্প্রদায়ের প্রসার হইবে। এই ভবিষ্যদ্‌বাণী হইতেই প্রমাণিত হয় যে, উক্ত সুত্তটি ভগবান বুদ্ধের পরিনির্বাণের পাঁচশো বছর পরে লিখিত হইয়াছিল।

ভারতবর্ষের প্রথম ভিক্ষুণীসংঘ যদি বুদ্ধ দ্বারাই স্থাপিত হইত, তাহা হইলে হয়তো এই আটটি ''গুরুধর্ম''কে কিয়ৎপরিমাণে ঐতিহাসিক তথ্য বলিয়া মনে করা যাইতে পারিত। কিন্তু বাস্তবিক অবস্থা সেইরূপ নয়। জৈন এবং অন্যান্য সম্প্রদায় বৌদ্ধসম্প্রদায় হইতে দুই এক শতাব্দী পূর্বে অস্তিত্ব লাভ করিয়াছিল। এবং ঐ সকল সম্প্রদায়ে ভিক্ষুণীদের বেশ

---

১. 'বৌদ্ধ সংঘাচা পরিচয়', পৃ ৫২-৫৩।

বড়ো বড়ো সংঘ ছিল, এবং উহাদের কোনো কোনো ভিক্ষুণী বুদ্ধিমতী ও বিদুষী ছিলেন, এই কথার সাক্ষ্য পালি সাহিত্যের অনেক জায়গায় দেখিতে পাওয়া যায়। আসলে এইসব সংঘের অনুকরণেই বুদ্ধের ভিক্ষুণীসংঘ স্থাপন করা হইয়াছিল। গণমূলক রাজ্যগুলিতে এবং যেসব দেশে একচ্ছত্র রাজতন্ত্র সবেমাত্র দেখা দিয়াছিল, সেইসব দেশেও নারীদের সম্মান বেশ ভালোভাবেই রাখা হইত। সুতরাং ভিক্ষুণীসংঘের রক্ষণার্থ কতকগুলি অদ্ভুত নিয়ম করার কিছুমাত্র প্রয়োজন ছিল না। সম্রাট অশোকের মৃত্যুর পর, সমাজে নারীদের এই স্থান পরিবর্তিত হইয়াছিল। এই দেশের উপর যবন ও শকদের আক্রমণ আরম্ভ হইল, এবং উত্তরোত্তর মেয়েদের সামাজিক স্থান একেবারে নীচে নামিয়া গেল। সমাজে তাহাদের আর পূর্বের মানসম্মান রহিল না। তৎকালে, ভিক্ষুণীদের সম্বন্ধে ঐ ধরনের নিয়ম প্রবর্তিত হইয়া থাকিলে, ইহাতে বিস্মিত হইবার কি আছে?

রাহুল "শ্রামণের"

ভিক্ষুসংঘ এবং ভিক্ষুণীসংঘ স্থাপিত হওয়ার পর, উহাদের মধ্যে 'শ্রামণের' ও 'শ্রামণেরী' গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। মহাবগ্‌গে লিখিত আছে যে, ভগবান বুদ্ধ সর্বপ্রথম রাহুলকে শ্রামণের করিয়াছিলেন। মহাবগ্‌গের কাহিনীটি এইরূপ ঃ

ভগবান কিছুকাল রাজগৃহে থাকিয়া কপিলবস্তুতে আসিলেন। সেখানে তিনি নিগ্রোধারামে থাকিতেন। একদিন তিনি শুদ্ধোদনের বাড়ির নিকট ভিক্ষা করার সময়, রাহুলের মা তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন, তখন তিনি রাহুলকে বলিলেন, 'ঐ দেখ রাহুল, ইনি তোমার পিতা, তাঁহার নিকট গিয়া তুমি তোমার পৈতৃক সম্পত্তি চাহিয়া লও।' মায়ের এই কথা শুনিয়া, রাহুল বুদ্ধের সম্মুখে দাঁড়াইয়া কহিল, 'হে শ্রমণ, তোমার ছায়া সুখকর।' ভগবান সেখান হইতে চলিয়া গেলেন। 'আমার পৈতৃক সম্পত্তি আমাকে দাও' এইরূপ বলিতে বলিতে, রাহুল তাঁহার পিছনে পিছনে গেল। ভগবান বিহারে যাওয়ার পর, রাহুলকে তাঁহার পৈতৃক সম্পত্তি দেওয়ার উদ্দেশ্যে সারিপুত্তকে ডাকিয়া রাহুলকে 'শ্রামণের' করাইলেন। ইহা শুদ্ধোদনের ভালো লাগিল না। অল্পবয়সের ছেলেদিগকে সন্ন্যাস দিলে, তাহাদের অভিভাবকরা কতখানি দুঃখ পায়, এই কথা বলিয়া, শুদ্ধোদন বুদ্ধকে দিয়া এইরকম নিয়ম করাইলেন যে, অল্প বয়সে কাহাকেও সন্ন্যাস দেওয়া হইবে না।

ইতিহাসের কষ্টিপাথরে পরীক্ষা করিলে, এই কাহিনী টিকিতে পারে না। হয়, শুদ্ধোদন কপিলবস্তুতে থাকিতেন না, নয় নিগ্রোধারামটি বুদ্ধের শেষবয়সে নির্মিত হইয়াছিল, এবং ঐ সময় রাহুলের বয়স খুব কম ছিল না। সুতরাং বলিতে হইবে যে, এই গল্পটি বহু শতাব্দী পর রচিত হইয়া মহাবগ্‌গে প্রবেশ লাভ করিয়াছিল।

ভগবান বুদ্ধ যখন রাহুলকে শ্রামণেরের দীক্ষা দিয়াছিলেন, তখন তাহার বয়স সাত বৎসর, অম্বলট্‌ঠিকরাহুলোবাদসুত্তের অট্‌ঠকথাতে এইরূপ বলা হইয়াছে এবং এইরূপ ধারণাই আজও বৌদ্ধদের ভিতর প্রচলিত। বোধিসত্ত্ব যেদিন গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন, ঐ

দিনই রাহুলের জন্ম হইয়াছিল, এইরূপ ধরিয়া লইলে শ্রামণের দীক্ষার সময়, তাহার বয়স সাত বৎসর হইত পারে না। কেননা গৃহত্যাগের পর, বোধিসত্ত্ব সাত বৎসর তপস্যা করিলেন এবং তত্ত্ব উপলব্ধির পর প্রথম চাতুর্মাস বারাণসীতে কাটাইলেন এবং সংঘস্থাপন করিতে আরো এক বৎসর সময় নিশ্চয়ই লাগিয়াছিল। সুতরাং শ্রামণের দীক্ষার সময় রাহুলের বয়স সাত বৎসর হওয়া সম্ভবপর ছিল না।

রাহুলকে কিভাবে শ্রামণের করা হইয়াছিল, তাহা সুত্তনিপাতের রাহুলসুত্ত হইতে অনুমান করা যাইতে পারে, তাই ঐ সুত্তের অনুবাদ এখানে দিতেছি ঃ

(ভগবান—) (১) নিরন্তর পরিচয়ের ফলে তুমি পণ্ডিতলোককে অবজ্ঞা কর না তো? মানুষকে যিনি জ্ঞানের আলোক দেখাইতে পারেন, তাহাকে তুমি যথাযোগ্য সেবা কর তো?

(রাহুল—) (২) আমি যে নিরন্তর পরিচয়ের ফলে পণ্ডিতলোককে অবজ্ঞা করি, তাহা নহে। যিনি মানুষকে জ্ঞানের আলোক দেখাইতে পারেন, তাহাকে আমি সর্বদা যথাযোগ্য সেবা করি।

(এই গাথাগুলি প্রস্তাবনা স্থানীয়)

(ভগবান—) (৩) তোমার প্রিয় ও মনোরম (পঞ্চেন্দ্রিয়ের) পাঁচটি ভোগ্য বিষয় ছাড়িয়া দিয়া, শ্রদ্ধাপূর্ণ হৃদয়ে গৃহ হইতে বাহিরে যাও, এবং দুঃখের বিনাশক হও।

(৪) কল্যাণকর বন্ধুদের সঙ্গ কর। যেখানে বিশেষ গোলমাল নাই, এমন নিভৃত নির্জন জায়গায় তোমার বাসস্থান হউক; আর তুমি মিতাহারী হও।

(৫) চীবর (বস্ত্র), পিণ্ডপাত্র (অন্ন), ঔষধ ও শোওয়াবসার জায়গা, এইগুলির জন্য লিপ্সা রাখিয়ো না এবং পুনরায় যেন জন্মগ্রহণ না কর।

(৬) বিনয়ের নিয়মগুলির ব্যাপারে এবং পঞ্চেন্দ্রিয়ের ব্যাপারে, সংযম রক্ষা করিবেঃ অনবরত স্মৃতি জাগ্রত রাখিবে, আর বৈরাগ্যসম্পন্ন হইবে।

(৭) কামমিশ্রিত বিষয়ের যে-সব শুভ নিমিত্ত (মনোযোগের উৎপাদক বিষয়) আছে, সেইগুলি ছাড়িয়া দাও, আর একাগ্রতা এবং সমাধি যে-সব অশুভ নিমিত্ত দ্বারা হয়, সেই-সব অশুভ নিমিত্তের ভাবনা কর।[১]

(৮) আর অনিমিত্তের (নির্বাণের) ভাবনা কর ও অহংকার ছাড়। অহংকার নষ্ট হইলে তুমি শান্তিতে থাকিবে।

এইভাবে ভগবান এই গাথাগুলি দ্বারা রাহুলকে বারবার উপদেশ দিয়াছিলেন।

এই সুত্তে, মোটের উপর, আটটি গাথা আছে। অট্‌ঠকথার রচয়িতার মতে, এই গাধাগুলির দ্বিতীয়টি রাহুলের ও বাকীগুলি বুদ্ধের কথা। অট্‌ঠকথার গ্রন্থকার ইহাও বলেন যে, প্রথম গাথাটিতে ভগবান বুদ্ধ যাহাকে পণ্ডিত বলিয়াছেন, তিনি সারিপুত্ত। ভগবান রাহুলকে ছোটোবেলা হইতেই শিক্ষার জন্য সারিপুত্তের অধীনে রাখিয়াছিলেন। আর তাহার

---

১. অশুভ ভাবনা সম্বন্ধে 'সমাধিমাগ', পৃ. ৪৯-৫৮ দ্রষ্টব্য

দুই-এক বৎসর পর, যখন রাহুল কিছু বয়স্ক হইল, তখন ভগবান তাহাকে এইসব উপদেশ দিয়া থাকিবেন। কেননা, এই সুত্তে যে-সব কথা বলা হইয়াছে, তাহা অল্পবয়স্ক বালকের পক্ষে বুঝা সম্ভবপর নয়। রাহুল 'শ্রামণের' হইয়া থাকিলে, তাহাকে 'তুমি শ্রদ্ধাপূর্বক গৃহের বাহিরে গিয়া দুঃখের নাশক হও' এইরূপ উপদেশ দেওয়ার কোনো প্রয়োজনই ছিল না।

ব্রাহ্মণের অল্পবয়স্ক ছেলে গুরুর গৃহে গিয়া ব্রহ্মচর্য পালন পূর্বক বেদাধ্যয়ন করিত, এবং তাহার পর, যাহার যেমন ইচ্ছা, হয় গৃহস্থাশ্রম নয় তপস্যার মার্গ অবলম্বন করিত। রাহুলের ব্যাপারেও ঠিক এই রকমই হইয়া থাকিবে। সে মোটামুটিভাবে সকল বিষয়ে সাধারণ জ্ঞান লাভ করুক, (হয়তো) এই উদ্দেশ্যে ভগবান তাহাকে সারিপুত্তের হাতে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন; আর সারিপুত্তের সহবাসে থাকায়, ব্রহ্মচর্য পালন করা তাহার অত্যাবশ্যকই ছিল। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর, যাহাতে সে পুনরায় গৃহে ফিরিয়া না যায়, তজ্জন্য ভগবান তাহাকে এইসব উপদেশ দিয়াছিলেন। আর রাহুলের এই কাহিনীটির উপর ভিত্তি করিয়া, মহাবগ্‌গের গ্রন্থকার শ্রামণেরদের সম্বন্ধে তাঁহার লম্বা-চওড়া গল্পটি রচনা করিয়াছিলেন।

অন্যান্য শ্রামণের

ভগবান বুদ্ধ জীবিত থাকাকালে, সংঘে অল্পবয়স্ক যে-সব বালক লওয়া হইয়াছিল, তাহাদের সংখ্যা খুবই অল্প। কিন্তু অন্য সম্প্রদায় হইতে যে-সব পরিব্রাজক বুদ্ধের সংঘে আসিত, তাহাদিগকে চারমাস শিক্ষানবিসী করিতে হইত এবং এইপ্রকার শ্রামণেরদের সংখ্যাই অধিক ছিল বলিয়া মনে হয়। দীঘনিকায়ে মহাসীহনাদসুত্তের শেষদিকে লিখিত আছে যে, পরিব্রাজক কাশ্যপ বুদ্ধের ভিক্ষুসংঘে প্রবেশ করিতে চাহিলে, ভগবান তাহাকে বলিয়াছিলেন, "হে কাশ্যপ, যাহারা এই সম্প্রদায়ে সন্ন্যাস লইয়া সংঘে প্রবেশ করিতে চায়, তাহাদিগকে চারি মাস শিক্ষানবিসী করিতে হয়। চারি মাস পর, যখন ভিক্ষুরা তাহার যোগ্যতা সম্বন্ধে স্থিরনিশ্চয় হয়, তখন তাহাকে সন্ন্যাস দিয়া সংঘে গ্রহণ করা হয়। (অবশ্য) আমি জানি যে, এই নিয়মের কয়েকটি ব্যতিক্রমও আছে।"

তদনুসারে, কাশ্যপ চারি মাস শিক্ষানবিসী করিল, এবং তাহার যোগ্যতা সম্বন্ধে ভিক্ষুরা নিঃসন্দিগ্ধ হওয়ার পর, তাহাকে সংঘে গ্রহণ করা হইল।

শ্রামণেরদের প্রতিষ্ঠানের উন্নতি

শ্রামণেরদের প্রতিষ্ঠান ভগবান বুদ্ধের পরিনির্বাণের পর বাড়িয়া গেল, এবং ক্রমে যাহারা অল্প বয়সে শ্রামণের হইয়া ভিক্ষুপদে উন্নীত হইয়াছিল, তাহাদের সংখ্যা বেশ বড়ো হইয়া উঠিল। ইহাতে সংঘে অনেক দোষ ঢুকিল। স্বয়ং বুদ্ধ এবং তাঁহার সংঘের ভিক্ষুদের যথেষ্ট সাংসারিক অভিজ্ঞতা ছিল, এবং (এই জন্য) পুনরায় সংসারের দিকে তাহাদের মন ধাবিত হওয়া সম্ভবপর ছিল না। কিন্তু অল্পবয়সেই যাহাদিগকে সন্ন্যাসধর্মে দীক্ষা দিয়া সংসারের বাহিরে আনা হইয়াছিল, তাহাদের মন যে সংসারের দিকে আকৃষ্ট হইবে, তাহা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু সামাজিক প্রথা এই আকর্ষণের প্রতিবন্ধক হওয়ায়, তাহাদের দ্বারা অনেক

দোষত্রুটি সংঘটিত হইতে থাকিল। সংঘের বিনাশের বহু কারণের মধ্যে, ইহা একটি মুখ্য কারণ বলিয়া বুঝিতে হইবে।

শ্রামণেদের প্রতিষ্ঠানের অনুকরণেই শ্রামণেরীদের প্রতিষ্ঠানও দাঁড় করানো হইয়াছিল। শ্রামণেররা ভিক্ষুদের তত্ত্বাবধানে এবং শ্রামণেরীরা ভিক্ষুণীদের তত্ত্বাবধানে থাকিত, তাহাদের মধ্যে শুধু এইটুকুই যা পার্থক্য ছিল।

শ্রাবক সংঘের চারিটি বিভাগ

কিন্তু সংঘের যে চারিটি বিভাগ ছিল, তাহাদের মধ্যে শ্রামণের এবং শ্রামণেরীদিগকে ধরা হয় নাই! এইজন্য বুদ্ধের জীবদ্দশায় ইহাদের কোনো গুরুত্ব ছিল না, এইরূপ বুঝিতে হইবে। ভিক্ষু, ভিক্ষুণী উপাসক এবং উপাসিকা এই কয়টিই বুদ্ধের শ্রাবক সংঘের বিভাগ।

ভিক্ষুসংঘের কাজ যে বেশ বড়ো রকমের ছিল, ইহাতে সন্দেহ নাই। তথাপি ভিক্ষুণী, উপাসক এবং উপাসিকা, ইহারাও যে সংঘের উন্নতিতে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিল, তাহার অনেক প্রমাণ ত্রিপিটক সাহিত্যে উপলব্ধ হয়।

নারীদের স্থান

বুদ্ধের ধর্মমার্গে নারীদের স্থান পুরুষদের সমান ছিল, এই কথা সোমা নামক ভিক্ষুণীর সহিত মারের যে কথোপকথন হইয়াছিল, তাহা হইতে প্রতীয়মান হয়। কথোপকথনটি নীচে দেওয়া হইতেছে।

দুপুরবেলা সোমা ভিক্ষুণী শ্রাবস্তীর নিকটস্থ অন্ধবনে ধ্যান করিবার জন্য বসিয়াছিল। তখন মার তাহার নিকট আসিয়া বলিল,

যন্তং ইসীহি পত্তব্বং ঠানং দুরভিসম্ভবং।
ন তং দ্বঙ্গুলপঞ্‌ঞায় সক্কা পপ্পোতু-মিত্থিয়া॥

'যে (নির্বাণ) স্থান ঋষিদের পক্ষেও পাওয়া কঠিন, তাহা (ভাত সিদ্ধ হইলে তাহা পরখ করিয়া দেখার মতো) দুই আঙুলের বুদ্ধি আছে যাহার, সেই নারীর পক্ষে পাওয়া অসম্ভব।

সোমা ভিক্ষুণী কহিল,

ইত্থিভাবো কিং করিয়া চিত্তম্হি সুসমাহিতে।
ঞাণম্হি বত্তমানম্হি সম্মা ধম্মং বিপস্সতো॥
যস্স নূন সিয়া এবং ইত্থাহং পুরিসো তি বা।
কিঞ্চি বা পন অস্মীতি তং মারো বত্তুমরহতি॥[১]

'চিত্ত ভালো রকমে সমাহিত হইলে এবং জ্ঞানলাভ হইলে, সম্যক্‌ভাবে যে ব্যক্তি ধর্ম জানে, তাহার স্ত্রীত্ব (নির্বাণ মার্গে) কি করিয়া অন্তরায় হয়? যাহার 'আমি স্ত্রী, আমি পুরুষ কিংবা আমি কোনোকিছু এই প্রকার অহংকার[২] আছে, তাহাকেই মার এই-সব কথা বলুক!'

---

১. ভিক্ষুণীসংযুত্ত, সুত ২

২. অহংকার তিন রকমের : ১. আমি শ্রেষ্ঠ. এই ধারণা। ২. আমি একই রকম আছি এই ধারণা, এবং ৩. আমি নীচ, এই ধারণা। বিভঙ্গ (P. T. S.) পৃ. ৩৪৬ ও ৩৫৩।

"সোমা ভিক্ষুণী আমাকে ভালোভাবে চিনিতে পারিয়াছে", ইহা বুঝিতে পারিয়া, মার বিষণ্ণ চিত্তে সেখান হইতে অন্তর্ধান করিল।

এই কথোপকথনটি কবিত্বপূর্ণ। তথাপি ইহা হইতে বৌদ্ধ সংঘে নারীদের স্থান কিরূপ ছিল, তাহা স্পষ্ট প্রতিভাত হয়।

নির্মাণ মার্গে প্রবিষ্ট শ্রাবকদের চারিটি ভেদ

নির্বাণের পথে চলিতে আরম্ভ করিয়াছে, এখন শ্রাবকদিগকে চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইত। ভাগগুলির নাম এই—সোতাপন্ন, সকদাগামী, অনাগামীও অরহা। সক্কায়দিট্‌ঠি (আত্মা একটি স্বতন্ত্র ও নিত্য পদার্থ এইরূপ দৃষ্টি) বিচিকিচ্ছা (বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘ ইহাদের সম্বন্ধে সন্দেহ অথবা অবিশ্বাস), সীলব্বতপরামাস (স্নানাদি ব্রতদ্বারা এই উপবাস দ্বারা মুক্তি পাওয়া যাইবে, এইরূপ বিশ্বাস), এই তিনটি সংযোজন (বন্ধন) নাশ করিলে, শ্রাবক সোতাপন্ন হয়, আর এই মার্গে সে স্থিরভাবে প্রতিষ্ঠিত হইলে, তাহাকে সোতাপত্তিফলট্‌ঠো[১] বলে। তদনন্তর কামরাগ (কামবাসনা), এবং পটিঘ (ক্রোধ) এই দুইটি সংযোজন শিথিল হইয়া, অজ্ঞান কমিলে, শ্রাবক সকদাগামী হয়; এবং এই পথে স্থিরভাবে প্রতিষ্ঠিত হইলে, তাহাকে সকদাগামিফলট্‌ঠো বলে। এই পাঁচটি সংযোজন সম্পূর্ণবাবে ক্ষয় করার পর, শ্রাবক অনাগামী হয়, আর সেই মার্গে স্থিরতা লাভ করিলে, তাহাকে অনাগামিফলট্‌ঠো বলে। তাহার পর রূপরাগ (ব্রহ্মলোকাদি প্রাপ্তির ইচ্ছা), মান (অহংকার), উদ্ধচ্চ (ভ্রান্তচিত্ততা), এবং অবিজ্জা (অবিদ্যা), এই পাঁচটি সংযোজন নাশ করিয়া, সে অরহা (অহন্) হয়, এবং এই মার্গে স্থিরত্ব লাভ করিলে, তাহাকে অরহপ ফ-লট্‌ঠো (অর্হৎফলস্থ) বলে। এইভাবে শ্রাবকদের মধ্যে চারিটি কিংবা আটটি ভেদ বা শ্রেণী করা হয়।

চিত্র ও বিশাখ, এই দুই ব্যক্তি, গৃহী হইয়াও অনাগামী ছিলেন, আর আনন্দ ভিক্ষু হইয়াও ভগবান বুদ্ধের জীবিতাবস্থায় শুধু সোতপন্ন ছিল। ক্ষেমা উৎপলবর্ণা প্রভৃতি ভিক্ষুণীরা অর্হৎপদ প্রাপ্ত হইয়াছিল। অর্থাৎ নির্বাণ মার্গে স্ত্রীত্ব কিংবা গৃহিত্ব আদৌ কোনোরকম বাধা ঘটাইত না।

সংঘের গুরুত্ব

বুদ্ধং সরণং গচ্ছামি।
ধম্মং সরণং গচ্ছামি।
সংঘং সরণং গচ্ছামি।

ইহাকে শরণগমন বলে। আজও বৌদ্ধ জনসাধারণ এই 'ত্রিশরণ' বলিয়া থাকে। এই প্রথা বুদ্ধের জীবদ্দশাতেই আরম্ভ হইয়া থাকিবে। ইহা লক্ষ্য করিবার মতো যে, ভগবান বুদ্ধ তাঁহার ধর্মকে যতখানি গুরুত্ব দিতেন, সংঘকেও ততখানি গুরুত্বই দিয়াছিলেন। অন্য

১. ফলট্‌ঠো = ফলস্থঃ

কোনো ধর্মেই এই রকমটি নাই। যীশুখৃষ্ট বলেন, "হে দুঃখী ও ভারাক্রান্ত জনগণ, তোমরা সকলে আমার নিকট আইস, তাহা হইলে, আমি তোমাদিগকে বিশ্রান্তি দিব[১]।"

আর ভগবান কৃষ্ণ বলেন,

সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বা সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥[২]

"সকল ধর্ম ছাড়িয়া তুমি শুধু একা আমাকেই আশ্রয় কর; আমি তোমাকে সকল পাপ হইতে মুক্ত করিব। তুমি শোক করিয়ো না।"

পৃথিবীর জ্ঞানবান ও সুশীল স্ত্রী-পুরুষদিগকে লইয়া, যদি আমরা বৃহৎ সংঘ নির্মাণ করিয়া, তাহার আশ্রয় লই, তাহা হইলে দুঃখবিনাশের পথ সুগম হইবে না কি?

সংঘই সকলের নেতা

ভগবান বুদ্ধ, তাঁহার পরে সংঘের নেতা কে হইবে, তাহা বলিয়া যান নাই; বরং সংঘের সকলে মিলিয়া সংঘকার্য সম্পাদন করিতে হইবে, তিনি এইরূপ নিয়ম করিয়া দিলেন। একচ্ছত্র রাজতন্ত্রের প্রথায় যাহারা অভ্যস্ত, তাহাদের নিকট বুদ্ধের এই নিয়মটি অদ্ভুত বলিয়া মনে হইবে, ইহাতে আশ্চর্যের কারণ নাই।

ভগবান বুদ্ধের পরিনির্বাণের পর, খুব বেশি দিন অতীত হয় নাই, এমন সময়, আনন্দ রাজগৃহে অবস্থান করিতেছিলেন। প্রদ্যোতের ভয়ে রাজা অজাতশত্রু রাজগৃহের দুর্গপ্রাচীর মেরামত ও সুদৃঢ় করার কাজ চালাইতেছিলেন, এবং এই কার্যের তত্ত্বাবধান করিবার জন্য, গোপক মোগ্গল্লান নামক ব্রাহ্মণকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। একদিন আয়ুষ্মান আনন্দ রাজগৃহে ভিক্ষা করিবার জন্য রওনা হইলেন। কিন্তু এখনো ভিক্ষায় বাহির হওয়ার কিছু সময় আছে, এই ভাবিয়া, তিনি গোপক মোগ্গল্লান যেখানে কাজকর্ম দেখিতেছিলেন, সেখানে গেলেন। ব্রাহ্মণ তাহাকে বসিতে আসন দিয়া, নিজে নীচের আসনে বসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ভগবান বুদ্ধের মতো গুণসম্পন্ন ভিক্ষু আছি কি? আনন্দ উত্তর দিলেন 'নাই'।

এই আলাপটি যখন চলিতেছিল, তখন মগধদেশের প্রধানমন্ত্রী বস্সকার নামক ব্রাহ্মণ সেখানে আসিলেন, আর তিনি যে-আলাপ চলিতেছিল, তাহা শুনিয়া লইয়া, আনন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ভগবান বুদ্ধ এমন-কোনো ভিক্ষু নির্বাচন করিয়াছেন কি, যিনি তাঁহার অবর্তমানে এই ভিক্ষুসংঘ পরিচালনা করিবেন?' আনন্দ যখন উত্তর দিলেন, 'না', তখন বস্সকার বলিলেন, 'এমন-কোনো ভিক্ষু আছে কি, যাহাকে সংঘের ভিক্ষুরা বুদ্ধের জায়গায় নির্বাচন করিয়াছে?' আনন্দ উত্তর দিলেন, 'না'; বস্সকার বলিলেন, 'তাহা হইলে, তোমাদের এই ভিক্ষুসংঘের কোনো নেতা নাই। এরকম অবস্থায় এই সংঘের জিনিসপত্র টাকাপয়সা কিভাবে থাকে? আনন্দ কহিলেন 'আমাদের কেহ নেতা নাই, এইরূপ বুঝা ঠিক হইবে না।

---

১. Matthew. 11. 28

২. ভগবদ্গীতা। ১৮ শ্লো ৬৬

ভগবান বুদ্ধ বিনয়ের নিয়ম করিয়া দিয়া গিয়াছেন। এক জায়গায় আমরা যতজন ভিক্ষু থাকি, তাহাদের সকলে একত্র হইয়া, ঐ-সব নিয়ম স্মরণ করি, যদি কাহারো হাতে কোনো দোষ ঘটিয়া থাকে, তাহা হইলে সে তাহা খুলিয়া বলে, এবং তজ্জন্য প্রায়শ্চিত্ত করে....কোনো ভিক্ষু শীলাদিগুণসম্পন্ন হইলে, আমরা তাহাকে সম্মান করি এবং তাহার পরামর্শ গ্রহণ করি।'[১]

ব্রাহ্মণ বস্‌সকার রাজা অজাতশত্রুর দেওয়ান ছিলেন। কোনো সর্বাধিকারী ব্যক্তি না থাকিলে রাজ্যশাসন সুষ্ঠুরূপে চলিতে পারে না, নিশ্চয়ই তাহার এইরূপ সুদৃঢ় মত ছিল। বুদ্ধ যখন তাঁহার আসনে আর কাহাকেও বসাইয়া যান নাই, তখন অন্তত সংঘের উচিত হইবে যে, কোনো ভিক্ষুকে ঐ আসনে নির্বাচন করা, বস্‌সকারের এইরূপ মত ছিল বলিয়া মনে হয়। কিন্তু সর্বাধিকারী নেতা ছাড়াও, বুদ্ধের অবর্তমানে সংঘের কাজ সুষ্ঠুভাবেই চলিয়াছিল, সুতরাং বলিতে হইবে যে, সংঘের জন্য বুদ্ধ যে সংবিধান তৈয়ার করিয়াছিলেন, তাহা যথাযোগ্যই হইয়াছিল।

---

১. মজ্ঝিমনিকায় গোপকমোগ্‌গল্লানসুত্ত (নং ১০৮) দ্রষ্টব্য।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

আত্মবাদ

আত্মবাদী শ্রমণ

নিবাপসুত্তে বুদ্ধের সমকালীন শ্রমণ ব্রাহ্মণদিগকে মোটামুটিভাবে চারিটি শ্রেণীতে ভাগ করা হইয়াছে। প্রথমটি হইতেছে যাহারা যাগযজ্ঞ করিয়া সোমরস পান করিত, এইরকম ব্রাহ্মণদের শ্রেণী। তাহাদের ধারণা ছিল যে, এইরকম আরাম ও সুখের জীবনেই মোক্ষ লাভ হয়। যাগযজ্ঞ ও সোমরস পানে বিরক্তি ধরাতে, যাহারা বনে গিয়া কঠোর তপস্যা করিত, সেই-সব-মুনি-ঋষিরা দ্বিতীয় শ্রেণীর শ্রমণ ব্রাহ্মণ। অবশ্য, তাহারা চিরকাল বনে তিষ্ঠাইতে পারে নাই। আবার সংসারে প্রবেশ করিয়া, আরামের জীবনেই সুখ আছে বলিয়া, তাহারা স্বীকার করিয়াছিল। এইরকম মুনি-ঋষির উদাহরণ হইতেছে, পরাশর, ঋষ্যশৃঙ্গ প্রভৃতিরা। তৃতীয় শ্রেণীর শ্রমণ ব্রাহ্মণরা গ্রামের আশেপাশে বাস করিয়া মিতাহারে জীবন কাটাইত। কিন্তু তাহারা আত্মার স্বরূপ-সম্বন্ধে দার্শনিক বাদবিবাদ করিত। ''আত্মা শাশ্বত' অথবা ''আত্মা অশাশ্বত', এইরূপ নানা বাদবিবাদে রত থাকিয়া, তাহারাও ''মারে''র জারে আবদ্ধ হইয়াছিল। ভগবান বুদ্ধ এই আত্মবাদ ছাড়িয়া দিয়া, সত্যের দৃঢ় ভিত্তিতে নিজের দার্শনিক তত্ত্ব দাঁড় করাইলেন। এইজন্য, তাঁহার শ্রাবকরা মারের জালে ধরা পড়ে নাই। তাই আমি ইহাদিগকে চতুর্থ শ্রেণীর মধ্যে সমাবিষ্ট করিয়াছি।[১]

ভগবান বুদ্ধ কেন আত্মবাদ ছাড়িয়া দিলেন, তাহা বিচার করিয়া দেখিবার পূর্বে, তাঁহার সমকালীন শ্রমণ ব্রাহ্মণদের আত্মবাদ কোন রকমের ছিল, তাহা লক্ষ্য করা দরকার! তৎকালে মোটের উপর বাযট্টিটি শ্রমণপন্থ ছিল, এই কথা আগেই তৃতীয় পরিচ্ছেদে বলা হইয়াছে।[২] ইহাদের মধ্যে কোনো পন্থই আত্মবাদ হইতে মুক্ত ছিল না। কিন্তু ইহাদের সবগুলি পন্থের দার্শনিক তত্ত্ব আজ উপলব্ধ নয়। ইহাদের মধ্যে যে ছয়টি বৃহৎ সংঘ ছিল, তাহাদের দার্শনিক তত্ত্বগুলি পালিভাষায় বহুলাংশে রক্ষিত হইয়াছে; আর ইহার সাহায্যে, অন্যান্য শ্রমণ ব্রাহ্মণদের আত্মবাদ কি রকম ছিল, তাহাও অনুমান করা সম্ভবপর। এইজন্য প্রথম সেই বৃহৎ ছয়টির দার্শনিক তত্ত্ব আলোচনা করিয়া দেখা সমীচীন বলিয়া মনে হয়।

অক্রিয়বাদ

এই ছয়টি পন্থের মধ্যে প্রথমটির আচার্য ছিলেন পূরণকস্সপ। তিনি অক্রিয়বাদের সমর্থক। তিনি বলেন, ''যদি কেহ কিছু করে, কিংবা কাহাকেও দিয়া করায়, কিছু কাটে কিংবা কাটায়, কাহাকেও কষ্ট দেয় কিংবা দেওয়ায়, শোক করে কিংবা করায়, যদি কেহ যন্ত্রণা পায়, অথবা দেয়, যদি কাহারো ভয় হয়, কিংবা সে অন্যকে ভয় দেখায়, যদি সে কোনো প্রাণীকে হত্যা

১. প্রথমভাগ, পৃ. ৮১-৮৩

২. প্রথমভাগ, পৃ. ৬০-৬১

করে, যদি চুরি করে, ঘরে সিঁধ দেয়, ডাকাতি করে, যদি অতর্কিতে কাহারো গৃহে হানা দেয়, রাস্তায় দস্যুবৃত্তি করে, পরস্ত্রীগমন করে, কিংবা মিথ্যা কথা বলে, তবু তাহার গায়ে কোনো পাপ লাগে না। যদি কেহ খুব ধারাল চক্র দিয়া পৃথিবীর প্রাণীদিগকে বধ করিয়া মাংসের স্তূপ নির্মাণ করে, তবু তাতে কোনো পাপ নাই। উহাতে কোনো দোষই হয় না। গঙ্গানদীর দক্ষিণতীরে গিয়া যদি কেহ নরহত্যা করে, কাহাকেও কাটিয়া ফেলে, কিংবা কাটায়, কষ্ট দেয় কিংবা দেওয়ায়, তবু তাহাতে কোনো পাপ নাই। যদি কেহ গঙ্গার উত্তর তীরে গিয়া দান দেয় অথবা দেওয়ায়, যজ্ঞ করে অথবা করায়, তবু তাহা হইতে কোনো পুণ্য হয় না। দান, ধর্ম সংযম, সত্যভাষণ এইগুলি দ্বারা পুণ্যলাভ করা যায় না।"

নিয়তিবাদ

মক্‌খলি গোসাল সংসারশুদ্ধিবাদ অথবা নিয়তিবাদ সমর্থন করিতেন। তাঁহার বক্তব্য এই, "প্রাণীদের অপবিত্রতার কোনো হেতু নাই, কোনো কারণ নাই। হেতু ছাড়া, কারণ ছাড়া, প্রাণী অপবিত্র হয়। প্রাণীদের শুদ্ধির কোনো হেতু নাই, কোনো কারণ নাই। হেতু ছাড়া, কারণ ছাড়া, প্রাণী শুদ্ধ হয়। নিজের শক্তিতে কিছু হয় না। পরের শক্তিতে কিছু হয় না। পুরুষের শক্তিতে কিছু হয় না। বল নাই, বীর্য নাই, পুরুষ-শক্তি নাই, পুরুষ-পরাক্রম নাই। সর্ব জীব, সর্ব প্রাণী, সর্ব ভূত অবশ, দুর্বল, নির্বীর্য। তাহারা সকলেই নিয়তি (অদৃষ্ট), সঙ্গতি (পরিস্থিতি) ও স্বভাবের বশে নানা পরিণতি প্রাপ্ত হয়। আর ছয় জাতির মধ্যে কোনো একটি জাতিতে থাকিয়া সুখদুঃখ ভোগ করে.....বুদ্ধিমান ও মূর্খ উভয়েরই চুরাশি লক্ষ মহাকল্পের চক্রের মধ্য দিয়া যাওয়ার পর, দুঃখের নাশ হয়, যদি কেহ বলে যে, শীল, ব্রত, তপস্যা অথবা ব্রহ্মচর্য দ্বারা সে অপরিপক্ক কর্ম পক্ক করিবে, অথবা পরিপক্ক কর্মের ফলভোগ করিয়া তাহা নষ্ট করিয়া ফেলিবে, তাহা হইলে (তাহার জানা উচিত যে,) তাহা দ্বারা এই-সব কিছুই হইবে না। এই সংসারের সুখদুঃখ নির্দিষ্ট সংখ্যক দ্রোণের দ্বারা (একরকম মাপ দ্বারা) মাপা যাইতে পারে; সুতরাং উহার পরিমাণ সসীম। এই সুখদুঃখ কমানো কিংবা বাড়ানো যায় না। যেমন সূতার গুটি ছুড়িয়া ফেলিলে, সবটুকু সূতা খুলিয়া যাওয়া পর্যন্ত, গুটিটি চলিতে থাকিবে, সেইরূপ মানুষ বুদ্ধিমান হউক অথবা মূর্খ হউক, সংসারের সবগুলি চক্রের ভিতর দিয়া যাওয়ার পরেই (তাহার পূর্বে নয়,) তাহার দুঃখের অন্ত হইবে।"

উচ্ছেদবাদ

অজিত কেসকম্বল উচ্ছেদবাদী ছিলেন। তাহার মত এই—"দান, যজ্ঞ, হোম,—এইগুলির মধ্যে কিছুই নাই। ভালোমন্দ কোনো কর্মেরই ফল বা পরিণাম নাই; ইহলোক, পরলোক, মাতাপিতা অথবা ঔপপাতিক (দেবতা অথবা নরকবাসী) প্রাণী নাই; ইহলোক ও পরলোক ঠিক ঠিক ভাবে জানিয়া ও বুঝিয়া যিনি অন্যকে তাহার সম্বন্ধে শিক্ষা দিতে পারেন, এমন তত্ত্বজ্ঞ ও সত্যপথের জ্ঞাতা শ্রমণ ব্রাহ্মণ এই পৃথিবীতে নাই। মানুষ চারিটি ভূতে গড়া।

সে যখন মারা যায়, তখন তাহার শরীরের পৃথিবী ভূতটি পৃথিবীতে, জল ভূতটি জলে, তেজ ভূতটি তেজে এবং বায়ু ভূতটি বায়ুতে মিশয়া যায়; আর ইন্দ্রিয়গুলি আকাশের মধ্যে ঢুকিয়া যায়। মৃত মানুষকে খাটিয়ার উপর শোয়াইয়া, চার ব্যক্তি শ্মশানে লইয়া যায়। সেখানে তাহার গুণ ও দোষ সম্বন্ধে লোকে চর্চা করে; কিন্তু তাহার অস্থি সাদা হইয়া ভস্ম হইয়া যায়। দানের মাহাত্ম্য মূর্খ লোকেরাই বাড়াইয়াছে। যাহারা শাস্ত্রের দোহাই দিয়া, পরলোক আছে, এইরূপ বলে, তাহাদের এ-সব কথা একেবারে মিথ্যা ও বৃথা। শরীর নষ্ট হইয়া গেলে, বুদ্ধিমান ও মূর্খ, উভয়েরই উচ্ছেদ হয়, তাহাদের বিনাশ হয়। মৃত্যুর পর তাহাদের আর কিছুই অবশেষ থাকে না।"

অন্যোন্যবাদ

পকুধ কচ্চায়ন অন্যোন্যবাদী ছিলেন। তাঁহার বক্তব্য এই—"নিম্নলিখিত সাতটি পদার্থ কেহ করে নাই, করায় নাই, নির্মাণ করে নাই, কিংবা নির্মাণ করায় নাই; ইহারা বন্ধ্য, কূটস্থ ও নগরতোরণের স্তম্ভের মতো[১] অচল। তাহারা নড়ে না, বদলায় না, পরস্পরের বিরোধিতা করে না এবং পরস্পরের সুখদুঃখ উৎপন্ন করিতে পারে না। ঐ সাতটি পদার্থ কী? সেইগুলি হইতেছে পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু, সুখ, দুঃখ ও জীব। যে ইহাদিগকে মারে, মারায়, শুনে, বলে, জানে অথবা বর্ণনা করে, এমন কেহ নাই। যে ধারাল অস্ত্র দিয়া কাহারো মাথা কাটে, সে তাহাকে হত্যা করে না। শুধু এই সাতটি পদার্থের ভিতরে যে ফাঁকা জায়গা আছে তাহারই মধ্যে অস্ত্রটি প্রবেশ করে, এইরকম বুঝিতে হইবে।"

বিক্ষেপবাদ

সঞ্জয় বেলট্‌ঠপুত্ত বিক্ষেপবাদী ছিলেন। তাহার মত এই—" 'পরলোক আছে কী?', আমাকে এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে, যদি আমার মনে হয় যে তাহা আছে, তাহা হইলে আমি বলিব যে, পরলোক আছে। কিন্তু আমার সেরকম মনে হয় না। পরলোক নাই, এইরকমও মনে হয় না। ঔপপাতিক প্রাণী আছে অথবা নাই, মরণের পর তথাগত থাকেন কিংবা থাকেন না, এই-সব কিছুই আমার মনে হয় না।"[২]

চাতুর্যামসংবরবাদ

নিগণ্ঠ্ নাথপুত্ত চাতুর্যামসংবরবাদী ছিলেন। এই চারিটি যামের যে বিবরণ সামঞ্ঞফলসুত্তে পাওয়া যায়, তাহা অপূর্ব। জৈন গ্রন্থ হইতে দেখা যায় যে, পার্শ্বমুনি অহিংসা, সত্য, অস্তেয়

---

১. নগর-তোরণের উপর যাহাতে হাতি আসিয়া সোজাসুজি আক্রমণ না করিতে পারে, এইজন্য উহার সম্মুখে একটি সুদৃঢ় স্তম্ভ তৈয়ার করা হইত। পালিভাষায় ইহাকে এসিকা কিংবা ইন্দখীল বলে।

২. সামঞ্ঞফলসুত্তে নিগণ্ঠ নাথপুত্তের চাতুর্যামসংবরবাদটি বিক্ষেপবাদের পূর্বে রাখা হইয়াছে। কিন্তু মজ্ঝিমনিকায়ের চুলসারোপমসুত্তে এবং অন্যান্য অনেক সুত্তে নামপুত্তের নাম পরে দেখিতে পাওয়া যায়।

ও অপরিগ্রহ এই চারিটি যাম শিক্ষা দিয়াছিলেন। ইহাদের সহিত মহাবীর ব্রহ্মচর্যও জুড়িয়া দিয়াছিলেন। তথাপি বুদ্ধের সময়, নির্গ্রন্থদের মধ্যে (জৈন লোকদের মধ্যে) উপরে বর্ণিত চারিটি যামেরই বিশেষ গুরুত্ব ছিল। এই চারিটি যামের দ্বারা ও তপস্যার দ্বারা পূর্বজন্মে কৃত পাপ দূর করিয়া, কৈবল্য (মোক্ষ) লাভ করিবে, ইহাই জৈনধর্মের সারকথা।

অক্রিয়বাদ ও সাংখ্যমত

পূরণ কাশ্যপ্যের অক্রিয়বাদ সাংখ্যদর্শনের ন্যায় দেখায়। আত্মা প্রকৃতি হইতে ভিন্ন, আর কাহাকেও মারা কিংবা মারানো ইত্যাদি কর্মের পরিণাম আত্মাতে হয় না, সাংখ্যদের এইরূপ মত। ভগবদ্‌গীতার ভিন্ন ভিন্ন জায়গায়, এই মতেরই প্রতিধ্বনি অঙ্কিত রহিয়াছে।

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্মাণি সর্বশঃ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে॥

প্রকৃতির গুণগুলির দ্বারাই সর্বকার্য হওয়া সত্ত্বেও, অহংকার দ্বারা মোহিত হইয়া, আত্মা মনে করে যে, সে-ই কর্তা। (অ. ৩, শ্লো. ২৭)।

য এনং বেত্তি হন্তারং যশ্চৈনং মন্যতে হতং।
উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে॥

এই আত্মা কাহাকেও মারে এইরূপ যে বুঝে, কিংবা এই আত্মা কাহারো দ্বারা মারা হয় এইরূপ যে বুঝে, এই উভয়ের কেহই সত্য বুঝিতে পারে নাই। কারণ এই আত্মা (কাহাকেও) মারে না, অথবা কাহারো দ্বারা মারা হয় না। (অ. ২ শ্লো. ২১)

যস্য নাহংকৃতো ভাবো বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে।
হত্বাপি স ইমাঁল্লোকান্ন হন্তি ন নিবধ্যতে॥

যাহার অহংভাব নাই, যাহার বুদ্ধি (অহংভাব হইতে) অলিপ্ত থাকে, সে যদি এইসব লোককে মারে, তবু সে তাহাদিগকে মারে না, এবং উহা দ্বারা তাহার কোনোরকম বন্ধনও হয় না। (অ. ১৮, শ্লো. ১৭)

অক্রিয়বাদ ও সংসারশুদ্ধিবাদ

মক্‌খলি গোসালের সংসারশুদ্ধিবাদ এই অক্রিয়বাদ হইতে খুব বেশি ভিন্ন ছিল না। তাহার বক্তব্য এইরূপ বলিয়া মনে হয় যে, যদিও আত্মা প্রকৃতি হইতে অলিপ্ত, তথাপি তাহাকে নির্দিষ্ট-সংখ্যক জন্ম লইতে হয় এবং তাহার পর সে আপনাআপনিই মুক্ত হয়। আজও হিন্দু সমাজে এই ধারণা দেখিতে পাওয়া যায় যে, চুরাশি লক্ষ জন্মগ্রহণ করিবার পর, প্রাণী উন্নত অবস্থা লাভ করে। এইরূপ মনে হয় যে, মক্‌খলি গোসালের সময় এই ধারণাটি খুব প্রচলিত ছিল।

অঙ্গুত্তরনিকায়ের ছক্কনিপাতের একটি সুত্ত হইতে (নং ৫৭) মনে হয় যে. পূরণ কাশ্যপের সম্প্রদায়টি মক্‌খলি গোসালের আজীবক পন্থে সমাবিষ্ট হইয়াছিল। ঐ সুত্তে আনন্দ ভগবান

বুদ্ধকে বলিতেছে, ''মহাশয়, পূরণ কস্সপ কৃষ্ণ, নীল, লোহিত, পীত, শুক্ল ও পরমশুক্ল এই ছয়টি অভিজাতির (প্রধান জাতির) কথা বলিয়াছেন্। কসাই, ব্যাধ প্রভৃতি লোকেরা কৃষ্ণজাতিতে সমাবিষ্ট হয়। ভিক্ষু প্রভৃতি কর্মবাদী লোকেরা নীল জাতিতে, একবস্ত্রধারী নির্গ্রন্থরা লোহিত জাতিতে, শুক্লবস্ত্রধারী অচেলক শ্রাবকরা (আজীবকরা) পীত জাতিতে, আজীবকরা ও আজীবক ভিক্ষুণীরা শুক্ল জাতিতে এবং ''নন্দ বচ্ছ'', ''কিস সঙ্কিচ্চ' ও ''মক্‌খলি গোসাল'', ইহারা পরম শুক্ল জাতিতে সমাবিষ্ট হয়।

ইহা হইতে স্পষ্টই দেখা যায় যে, পূরণ কস্সপের সম্প্রদায় ও আজীবকদের সম্প্রদায় একত্র হইয়াছিল। কস্সপের আত্মবাদ ও তাহাদের আত্মবাদে কোনো পার্থক্য ছিল না, এবং ইহাদের শারীরিক কৃচ্ছ্র সাধনের প্রণালীতে কস্সপ সমর্থন করিতেন।

অজিত কেসকম্বলের নাস্তিকতাবাদ

অজিত কেসকম্বল যে পুরাপুরি নাস্তিক ছিলেন, তাহা তাহার উচ্ছেদবাদ লক্ষ্য করিলেই বুঝা যায়। 'সর্বদর্শন-সংগ্রহে' চার্বাকমতের যে বর্ণনা আছে, অজিত কেসকম্বল সেই চার্বাকমতের প্রতিষ্ঠা না হইলেও, একজন বিখ্যাত সমর্থক ছিলেন। তিনি একদিকে যেমন ব্রাহ্মণদের যাগযজ্ঞ পছন্দ করিতেন না, তেমনই অন্যদিকে আজীবক প্রভৃতি শ্রমণদের তপস্যাব্রতও মানিতেন না। সর্বদর্শনসংগ্রহে বলা হইয়ছে যে,

অগ্নিহোত্রং ত্রয়ো বেদাস্ত্রিদণ্ডং ভস্মগুণ্ঠনম্।
বুদ্ধিপৌরুষহীনানাং জীবিকা ধাতৃনির্মিতা॥

'অগ্নিহোত্র, তিনবেদ, ত্রিদণ্ডধারণ, ও ভস্ম মাখা, এইগুলি বুদ্ধিহীন ও পৌরুষহীন লোকেদের জন্য ব্রহ্মাদেব-নির্মিত জীবিকার্জনের সাধন মাত্র।'

তৎসত্ত্বেও অজিতকে শ্রমণদের মধ্যে গণনা করা হয়। ইহার কারণ এই যে, তিনি বেদবিহিত পশু-হিংসা আদৌ পছন্দ করিতেন না। আর যদিও তিনি তপস্যা করিতেন না, তথাপি তিনি শ্রমণদের আচার-বিচার মানিয়া চলিতেন এবং তাহাদের আত্মবাদ হইতে তিনি অলিপ্ত ছিলেন না। আত্মার সম্বন্ধে তাহার ধারণা এই যে, চারিটি মহাভূত হইতে আত্মার সৃষ্টি হয়, ও মৃত্যুর পর, তাহা আবার সেই চারি মহাভূতের সহিত মিশিয়া যায়। অতএব—

যাবজ্জীবং সুখং জীবেন্নাস্তি মৃত্যোরগোচরঃ।
ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ॥

'যতদিন জীবীত আছে, ততদিন সুখে থাকিবে, কারণ মৃত্যুর কবলে ধরা পড়ে না এমন প্রাণী নাই, এবং দেহ ভস্মে পরিণত হইলে তাহা কোথা হইতে ফিরিয়া আসিবে?'— এইরূপ মত পোষণ করাই তাহার পক্ষে স্বাভাবিক।

এই কেসকম্বলের দার্শনিক তত্ত্ব হইতেই লোকায়ত অর্থশাস্ত্রের উৎপত্তি হইয়াছিল এবং কৌটিল্যের মতো আচার্যরা এই অর্থশাস্ত্রের বিকাশ করিয়াছিলেন।

অন্যোন্যবাদ ও বৈশেষিক দর্শন

পকুধ কচ্চায়নের অন্যোন্যবাদ বৈশেষিক দর্শননের ছিল। কিন্তু তিনি যে,-সাতটি পদার্থ মানিতেন, তাহাদের সহিত বৈশেষিক-সম্মত পদার্থগুলির অতি সামান্যই সাদৃশ্য আছে। কচ্চায়নের শ্রমণ-সংঘ বেশ বড়ো ছিল। তথাপি তাঁহার পরম্পরা স্থায়ী হয় নাই। অর্বাচীন বৈশেষিক দর্শন তাঁহারই দর্শন হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকিবে। কিন্তু এইরূপ দর্শন গ্রহণ করে, এরকম শ্রমণসম্প্রদায় হয়তো বুদ্ধের পরবর্তী কালে স্থায়ী হয় নাই।

বিক্ষেপবাদ ও স্যাদ্‌বাদ

সঞ্জয় বেলট্‌ঠপুত্তের বিক্ষেপবাদ জৈনদের স্যাদ্‌বাদের মতো ছিল; আর জৈনরা কালে এই মত নিজেদের দর্শনে গ্রহণ করিয়াছিল। 'হয়তো এইরূপ, হয়তো এইরূপ নয়' (স্যাদস্তি স্যান্ন্যাস্তি) ইত্যাদি স্যাদ্‌বাদ আর পূর্ব-বর্ণিত বেলট্‌ঠপুত্তের বিক্ষেপবাদ, এই দুইটির মধ্যে খুব পার্থক্য নাই। সুতরাং জৈন সম্প্রদায় বিক্ষেপবাদকেই নিজেদের প্রধান দার্শনিক তত্ত্বরূপে গ্রহণ করিয়াছিল, এইরূপ বলিলে আপত্তি কি?

নির্গ্রন্থ ও আজীবক

বুদ্ধের সময় জৈনদের চতুর্বিংশ তীর্থংকর মহাবীর স্বামী (যাহাকে নিগণ্ঠনাথপুত্ত বলে) ও মক্‌খলি গোসাল, এই দুইজন, ছয় বৎসর একই স্থানে তপস্যা করিয়াছিলেন, ইহা জৈনদের গ্রন্থ হইতে জানা যায়। আজীবক ও নির্গ্রন্থদের সম্প্রদায় দুইটি এক করার জন্য, ইহারা উভয়েই চেষ্টা করিয়া থাকিবেন। পার্শ্বমুনির সন্ন্যাসীরা একবস্ত্র অথবা তিনবস্ত্র পরিধান করিত। কিন্তু মহাবীর স্বামী মক্‌খলি গোসালের দিগম্বর-ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন; আর সেই সময় হইতে নির্গন্থরা নির্বস্ত্র হইল। কিন্তু নির্গ্রন্থ ও আজীবকদের দার্শনিক মতবাদ এক করা সম্ভবপর হয় নাই। যদি মহাবীর স্বামী চুরাশি লক্ষ জন্মের মতবাদটি স্বীকার করিতেন, তাহা হইলে নির্গ্রন্থদের পরম্পরায় প্রচলিত চাতুর্যামের মূল্য বজায় থাকিত না। আর যদি তিনি মানিতেন যে নিয়তি (অদৃষ্ট), সংগতি (পরিস্থিতি) ও স্বভাব এই তিনটির বশে প্রাণীদের মধ্যে পরিণাম ঘটে, তাহা হইলে অহিংসা, সত্য, অস্তেয় ও অপরিগ্রহ এই চারিটি যামের উপযোগিতা কি? সুতরাং এই দুই আচার্য একসঙ্গে থাকিতে পারিলেন না।

আজীবকদের চুরাশি লক্ষ আবর্তনের মতবাদ হইতে নির্গ্রন্থদের চাতুর্যামসংবরবাদ যে সর্বসাধারণের বেশি ভালো লাগিয়াছিল, ইহাতে বিস্ময়ের কারণ নাই। কেননা, এই মতবাদে চাতুর্যাম ও তপস্যার দ্বারা বিগত জন্মসমূহের পাপ ধুইয়া, একই জন্মে মোক্ষ সম্পাদন করা সম্ভবপর ছিল।

নির্গ্রন্থদের সম্বন্ধে খুঁটিনাটি খবর

সুত্তপিটকে নির্গ্রন্থদের মতের সম্বন্ধে অনেক খবর পাওয়া যায়। ইহার মধ্যে মজ্ঝিমনিকায়ের চুলদুক্‌খক্‌খন্ধসুত্তে বুদ্ধ ও নির্গ্রন্থদের মধ্যে একটি কথোপকথন দেওয়া আছে। উহার সারমর্ম এই—

রাজগৃহে কয়েকজন নির্গ্রন্থ দণ্ডায়মান অবস্থায় তপস্যা করিতেছিল, এমন সময় বুদ্ধ তাহাদের নিকট গিয়া কহিলেন, 'হে বন্ধুগণ, এইভাবে তোমরা নিজের শরীরকে কষ্ট দিতেছ কেন?

তাহারা কহিল, 'নির্গ্রন্থ নাথপুত্ত সর্বজ্ঞ। 'চলিবার সময়, দাঁড়ানো থাকা কালে, ঘুমাইবার সময়, অথবা জাগ্রদবস্থায় আমার জ্ঞানদৃষ্টি অক্ষুন্ন থাকে', এইরূপ তিনি বলেন; আর তিনি আমাদিগকে এই উপদেশ দেন যে, 'হে নির্গ্রন্থগণ, তোমরা পূর্বজন্মে পাপ করিয়াছ, তাহা এই প্রকার দৈহিক কৃচ্ছ্রসাধনে জীর্ণ কর (নিজ্জরেথ), এবং এই জন্মে কায়মনোবাক্যে কোনোরকম পাপই করিয়ো না। এইভাবে, পূর্বজন্মের পাপ তপস্যার দ্বারা নাশ হওয়ায়, ও নূতন পাপ না হওয়ায়, আগামী জন্মে কর্মক্ষয় হইবে, আর ইহাতে সর্বদুঃখের অবসান হইবে।' —তাঁহার এই কথা আমাদের খুব ভালো লাগে।'

ভগবান বুদ্ধ কহিলেন, 'হে নির্গ্রন্থগণ, তোমরা পূর্বজন্মে ছিলে, কিংবা ছিলে না, তাহা তোমরা জান কি?"

নি.—আমরা জানি না।

ভগবান—বেশ। পূর্বজন্মে তোমরা পাপ করিয়াছিলে অথবা কর নাই, অন্তত এইটুকু তোমরা জান কি?

নি.—ইহাও আমরা জানি না।

ভ.—আর সেই পাপ অমুক রকম ছিল, অথবা তমুক রকম ছিল, অন্তত এইটি তোমরা জান কি?

নি.—ইহাও আমরা জানি না।

ভ.—তোমাদের এতখানি দুঃখ নষ্ট হইয়াছে, আর এতখানি বাকি আছে, ইহাও তোমরা জান কি?

নি.—তাহাও আমরা জানি না।

ভ.—যদি এই সব কথা তোমরা জান, তাহা হইলে আগের জন্মে তোমরা ব্যাধের মতো নিষ্ঠুর ছিলে, আর এই জন্মে সেই পাপ নাশ করিবার জন্য তপস্যা করিতেছ, এইরূপই হইবে না কি?

নি.—হে আয়ুষ্মান গোতম, সুখে সুখ পাওয়া যায় না, দুঃখেই সুখ পাওয়া যায়। যদি সুখ-দ্বারা সুখ পাওয়া যাইত, তাহা হইলে রাজা বিম্বিসার আয়ুষ্মান গোতম অপেক্ষা অধিক সুখ পাইত।

ভ.—হে নির্গ্রন্থগণ, বিচার না করিয়াই তোমরা এই কথা বলিলে। আমি শুধু এখানে তোমাদিগকে এইটুকু জিজ্ঞাসা করি, রাজা বিম্বিসার অনবরত সাত দিন সোজা হইয়া বসিয়া, একটি কথাও না বলিয়া, নির্জনসুখ অনুভব করিতে পারিবেন কি?

নির্গ্রন্থরা উত্তর দিল, 'হে আয়ুষ্মান, তাঁহার পক্ষে তাহা সম্ভবপর নয়।' তখন ভগবান বুদ্ধ কহিলেন, 'শুধু একদিন নয়, কিন্তু সাত দিনই আমি এইরকম সুখ অনুভব করিতে

পারি; এখন আমি তোমাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, রাজা বিম্বিসার (নিজের ঐশ্বর্যহেতু) বেশি সুখী, না আমি বেশি সুখী?'

নি.—যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে আয়ুষ্মান গোতমই রাজা বিম্বিসার অপেক্ষা অধিক সুখী।

বৌদ্ধমতের বৈশিষ্ট্য দেখাইবার জন্য এই কথোপকথনটি রচিত হইলেও, ইহাতে জৈনমতের বিকৃতি করা হয় নাই। তপস্যা ও চাতুর্যামের অভ্যাসে পূর্বকর্ম ক্ষয় করা যায়, ইহা জৈনদেরই মত; আর এই পরম্পরা অদ্যাপি বিদ্যমান আছে।

আত্মার স্বরূপ সম্বন্ধে ধারণা

এই সব আচার্যের এবং তৎকালীন অন্যান্য শ্রমণদের মধ্যে আত্মার স্বরূপ সম্বন্ধে কত রকম ভিন্ন ভিন্ন ধারণা ছিল, তাহার কিছু কিছু তথ্য উপনিষদ্‌গুলিতে দেখিতে পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ, আত্মা তণ্ডুল হইতে ও যব হইতেও ছোটো, ও তাহা হৃদয়ের মধ্যে থাকে, এই ধারণাটি লওয়া যাউক।

এষ ম আত্মান্তর্হৃদয়েঽণীয়ান্ ব্রীহের্বা
যবাদ্বা সর্ষপাদ্বা শ্যামাকাদ্বা শ্যামাকতণ্ডুলাদ্বা (ছান্দোগ্য, ৩।১৪।৩)

'আমার এই আত্মা অন্তর্হৃদয়ে (থাকে)। উহা ধান হইতে, যব হইতে, সর্ষপ হইতে, শ্যামাক হইতে, কিংবা শ্যামাক-তণ্ডুল হইতে ছোটো।'

আবার এই আত্মা আকারে এই সকল পদার্থের তুল্যও!

মনোময়োঽয়ং পুরুষো ভাঃ সত্যস্তস্মিন্নন্তর্হৃদয়ে
যথা ব্রীহির্বা যবোবা............ (বহদারণ্যক ৫।৬।১)

'এই পুরুষরূপী আত্মা মনোময়, ভাস্কর ও সত্যরূপী; উহা এই অন্তর্হৃদয়ে থাকে। ইহার আকার ধানের মতো, কিংবা যবের মতো।'

তাহার পর আত্মার আকার অঙ্গুষ্ঠের মতো, এই ধারণাও প্রচলিত হইয়াছিল।

অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো মধ্য আত্মনি তিষ্ঠতি। (কঠ ২।৪।১২)

'অঙ্গুষ্ঠের মতো এই পুরুষ শরীরের মধ্যভাগে থাকে।'

আর মানুষ যখন নিদ্রা যায়, তখন এই আত্মা তাহার শরীরের বাহিরে বেড়াইতে যায়।

স যথা শকুনিঃ সূত্রেণ প্রবদ্ধো দিশং
দিশং পতিত্বান্যত্রায়তনমলব্ধা বন্ধনমেবোপ-
-শ্রয়ত এবমেব খলু সোম্য তন্মনো দিশং
দিশং পতিত্বান্যত্রায়তনমলব্ধা প্রাণমেবোপ-
-শ্রয়তে প্রাণবন্ধনং হি সোম্য মন ইতি॥ (ছান্দোগ্য ৬।৮।২)

'সূত্রে বাঁধা পাখি যেমন চারিদিকে উড়ে ও সেখানে থাকিতে না পারিয়া নিজের বন্ধনের জায়গাতেই ফিরিয়া আসে, তেমনই, হে সৌম্য, মনের সাহায্যে আত্মা চারিদিকে উড়ে ও

সেখানে জায়গা না পাওয়ায়, প্রাণকেই আশ্রয় করে; কারণ প্রাণ হইতেছে মনের বন্ধন।'

শাশ্বতবাদ ও উচ্ছেদবাদ

বুদ্ধের সময় শ্রমণ ব্রাহ্মণদের আত্মার স্বরূপ সম্বন্ধে এইরূপ অদ্ভুত ও বিবিধ ধারণা ছড়াইয়াছিল। এই সব ধারণা শুধু দুইটি শ্রেণীতে ভাগ করা হইত। ইহাদের মধ্যে একদলের কথা এই যে,

সস্সতো অত্তা চ লোকো চ বঞ্ঝো কূটট্ঠো এষিকট্ঠায়ী ঠিতো।।

'আত্মা ও জগৎ শাশ্বত। উহারা বন্ধ্য, কূটস্থ ও নগর তোরণের সম্মুখস্তম্ভের মতো স্থির।'[১]

এই দার্শনিক মতটিতে পূরণ কস্সপ, মক্খলি গোসাল, পকুধ কচ্চায়ন এবং নিগণ্ঠনামপুত্ত, এই চারিজনের মত সমাবিষ্ট করা হইত।

আর দ্বিতীয় শ্রেণীর শ্রমণ ব্রাহ্মণরা উচ্ছেদবাদ প্রতিপাদন করিত। তাহারা বলিত—

অয়ং অত্তা রূপী চাতুম্মাহাভূতিকো
মাতাপেত্তিসম্ভবো কায়স্স ভেদা উচ্ছিজ্জতি
বিনস্সতি ন হোতি পরং মরণা॥

'এই আত্মা জড়, চার মহাভূতের দ্বারা নির্মিত ও মাতাপিতা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে; দেহপাত হইলে, ইহা ছিন্ন ও বিনষ্ট হয়। মৃত্যুর পর, উহার অস্তিত্ব থাকে না।'

এই মতের প্রতিপাদক শ্রমণদের মধ্যে, অজিত কেসকম্বল প্রমুখ ছিলেন। তৎকালের কাছাকাছি সময়ে, এমন শ্রমণ ব্রাহ্মণও ছিলেন, যাঁহারা বলিতেন যে, আত্ম কিয়দংশে শাশ্বত ও কিয়দংশে অশাশ্বত। সঞ্জয় বেলট্ঠপুত্তের মত ইহার সদৃশ বলিয়া মনে হয়; আর এই মতটিই পরে জৈনরা গ্রহণ করিয়াছিল।

আত্মবাদের ফল

এই সব আত্মবাদের ফল বিশেষভাবে দুইটি। প্রথমটি হইতেছে আরামের জীবনেই সুখ আছে বলিয়া মানা, আর দ্বিতীয়টি হইতেছে তপস্যা দ্বারা শরীরকে কষ্ট দেওয়া। পূরণ কস্সপের মত অনুসারে যদি এই কথাই ঠিক হয় যে, আত্মা কাহাকে মারেও না, কিংবা মারায়ও না, তাহা হইলে নিজের আরামের জন্য অন্যকে হত্যা করায় আপত্তি কি? জৈনদের মতানুসারে যদি বলা যায় যে, আত্মা পূর্বজন্মের কর্মদ্বারা বদ্ধ হয়, তাহা হইলে, এই কর্ম হইতে মুক্ত হইবার জন্য কঠোর তপস্যা করা প্রয়োজন, এইরূপ দার্শনিক মত উৎপন্ন হওয়া খুবই স্বাভাবিক। আত্মা অশাশ্বত এবং মৃত্যুর পর তাহার অস্তিত্ব থাকে না,

১. দীঘনিকায়ের ব্রহ্মজালসূত্রে আত্মার স্বরূপ সম্বন্ধে এই মতটি এবং অন্যান্য অনেক মত বর্ণিত হইয়াছে। অন্যান্য নিকায়েও বিভিন্ন আত্মবাদের উল্লেখ লক্ষিত হয়।

যদি এইরূপ ধরিয়া লওয়া হয়, তাহা হইলে, 'যতদিন প্রাণ থাকে, ততদিন আরামে ও মজায় কাল কাটাইবে' অথবা 'এই বিষয়ভোগের স্থিরতাই বা কি? সুতরাং তপস্যা করাই উচিত', এইরূপ দুইরকমের মতই উৎপন্ন হইতে পারে।

আত্মবাদের বর্জন

কিন্তু ভগবান বুদ্ধের নিকট আরাম ও তপস্যা, এই দুই পথই ত্যাজ্য বলিয়া মনে হইল। কেননা, উহাদের দ্বারা মনুষ্যজাতির দুঃখ কমে না। পরস্পরের সহিত কলহ-রত জনতার পক্ষে এই দুই অন্তের মধ্যে শান্তির রাস্তা পাওয়া সম্ভবপর নয়। এই দুইটি অন্তের মূল কারণ হইতেছে কোনো একরকমের আত্মবাদ, এই সম্বন্ধে বোধিসত্ত্ব একেবারে নিশ্চিত হইয়াছিলেন; তাই তিনি এই আত্মবাদ একপাশে সরাইয়া দিয়া, এক নূতন পথ আবিষ্কার করিলেন। আত্মা শাশ্বত হউক অথবা অশাশ্বত হউক, যাহাই হউক না কেন, এই জগতে দুঃখ তো আছেই আছে; আর এই দুঃখ মানুষের তৃষ্ণার ফল। আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গের সাহায্যে, এই তৃষ্ণার ক্ষয় হইলেই, মনুষ্যজাতি শান্তি ও সন্তোষ লাভ করিবে। এই নূতন পথ আত্মবাদ পরিত্যাগ না করিলে, বুঝিতে পারা সম্ভবপর ছিল না। এইজন্যই খন্ধসংযুত্তে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ভগবান বুদ্ধ পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুদিগকে চারিটি আর্যসত্য শিখাইয়া, তাহার পরই অনাত্মবাদ সম্বন্ধে উপদেশ দিয়াছিলেন।[১]

ভগবান বারাণসীর ঋষিপত্তনে মৃগদাবে থাকিতেন। সেখানে পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুদিগকে উদ্দেশ করিয়া তিনি বলিলেন, 'হে ভিক্ষুগণ, জড় শরীর অনাত্মা; শরীর যদি আত্মা হইত, তাহা হইলে উহা দ্বারা কোনো উপদ্রব হইত না, আর আমার শরীর এইরকম হউক ও এইরকম না হউক, ঐরূপ বলা যাইতে পারিত। কিন্তু যেহেতু শরীর অনাত্ম, সেইজন্য উহাদ্বারা উপদ্রব হয় এবং উহা এইরকম হউক ও সেইরকম না হউক, এইরূপ বলিতে পারা যায় না।

'হে ভিক্ষুগণ, বেদনা অনাত্মা। উহা যদি আত্মা হইত, তাহা হইলে উপদ্রবকারী হইত না, এবং আমরা বলিতে পারিতাম, 'আমার বেদনা এইরূপ হউক ও ঐরূপ না হউক।' কিন্তু যেহেতু বেদনা অনাত্মা অতএব তাহা উপদ্রবকারী হয়, উহা এইরূপ হউক এবং ঐরূপ না হউক, এইরকম বলা চলে না। একইভাবে, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞানও অনাত্মা। যদি বিজ্ঞান আত্মা হইত, তবে তাহা দ্বারা উপদ্রব ঘটিত না। এবং আমি বলিতে পারিতাম যে, আমার বিজ্ঞান এইরকম হউক ও ঐরকম না হউক। কিন্তু যেহেতু বিজ্ঞান অনাত্মা, অতএব উহা উপদ্রবকারী হয়, এবং আমি বলিতে পারি না যে, আমার বিজ্ঞান এইরূপ হউক ও ঐরূপ না হউক।'

'হে ভিক্ষুগণ, জড় শরীর, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান এইগুলি কি নিত্য অথবা অনিত্য?'

---

১. এই সুত্তটি মহাবগ্‌গেও আছে।

'হে মহাশয়, এইগুলি অনিত্য'—ভিক্ষুরা এইরূপ উত্তর দিল।

ভগবান—যাহা অনিত্য, তাহা দুঃখদায়ক, কি সুখদায়ক?

ভিক্ষু—মহাশয়, ইহারা দুঃখদায়ক।

ভ.—আর যাহা দুঃখদায়ক, যাহার পরিণাম হয়, তাহা আমার, আমিই তাহা, তাহা আমার আত্মা, এইরূপ মনে করা যোগ্য হইবে কি?

ভি.—না, মহাশয়।

ভ.—অতএব, হে ভিক্ষুগণ, যাহা কিছু জড় পদার্থ, যাহা অতীত, যাহা অনাগত, বর্তমান, যাহা আমাদের শরীরের ভিতরকার, অথবা বাহিরের যাহা স্থূল, সূক্ষ্ম, হীন, উৎকৃষ্ট, দূরস্থ কিংবা নিকটস্থ, সে সবই আমরা নয়, সেগুলি আমি নই, সেগুলি আমার আত্মা নয়, এইরূপ যথার্থভাবে সম্যক্‌জ্ঞানের দ্বারা উপলব্ধি করিবে। তেমনই, যে কোনো বেদনা, যে কোনো সংজ্ঞা, যে কোনো সংস্কার, যে কোনো বিজ্ঞানই হউক না, উহারা অতীত হউক, ভবিষ্যৎ হউক বা বর্তমান হউক, আমাদের শরীরের ভিতরকার অথবা বাহিরর হউক, স্থূল, সূক্ষ্ম, হীন, উৎকৃষ্ট, দূরস্থ অথবা নিকটস্থ হউক, তাহাদের মধ্যে একটাও আমার নয়, একটাও আমি নই, একটাও আমার আত্মা নয়, এইরূপ যথার্থভাবে সম্যক্ জ্ঞানের দ্বারা জানিবে। হে ভিক্ষুগণ, যে বিদ্বান এইভাবে জানে, ঐ আর্যশ্রাবকের জড় পদার্থ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞানের সম্বন্ধে বৈরাগ্য হয়, এবং সে এই বৈরাগ্যদ্বারা বিমুক্ত হয়।

আত্মার পাঁচটি বিভাগ

যখন কেহ জিজ্ঞাসা করে, 'আত্মা শাশ্বত, না অশাশ্বত?' তখন তাহার সোজাসুজি উত্তর দিলে, গোলমাল হওয়ার সম্ভাবনা আছে। তাই ভগবান বুদ্ধ আত্মার প্রকৃত অর্থ সম্বন্ধে নিখুত ধারণা দেওয়ার জন্য, প্রথমে আত্মা পদার্থটিকে পাঁচটি স্কন্ধে বিশ্লেষণ করিয়াছেন। জড় পদার্থ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান, আত্মাকে এই অবয়বে পাঁচ অংশ বা অবয়বে ভাগ করা যায়। আত্মাকে এই পাঁচ অংশে বিভক্ত করার পর, স্পষ্টই বুঝা যায় যে, আত্মা শাশ্বত অথবা অশাশ্বত নয়। কেননা এই পাঁচটি স্কন্ধই সর্বদা পরিবর্তনশীল অর্থাৎ অনিত্য ও দুঃখদায়ক। সুতরাং এইগুলি আমার, অথবা এইগুলি আমার আত্মা, এইরূপ বলা যোগ্য হইবে না। ইহাই বুদ্ধেব অনাত্মবাদ। আর এই মতটি শাশ্বতবাদ ও অশাশ্বতবাদ, এই দুই অন্তের কোনোটিরই অন্তর্গত নয়। ভগবান বুদ্ধ কাত্যায়নগোত্র নামক ভিক্ষুকে সম্বোধন করিয়া কহিতেছেন, 'হে কাত্যায়ন, অধিকাংশ লোকই অস্তিতা ও নাস্তিতা, এই দুই অন্তের একটিতে যায়। তথাগত এই দুইটি অন্ত এড়াইয়া, মধ্যমপথের উপদেশ দেন।'[১]

---

১. নিদানসংযুত্ত, বগগ ২, সুত্ত ৫

অনাবশ্যক বাদবিবাদ

এতসব কথা স্পষ্ট করিয়া বলার পরও, যদি কেহ একগুঁয়েমি করিয়া প্রশ্ন করে, 'শরীর ও আত্মা কি এক, না ভিন্ন?' তাহা হইলে ভগবান বুদ্ধ বলেন, 'এই বাদ বিবাদে আমি পড়ি না। কেননা ইহাতে মনুষ্যজাতির কোনো কল্যাণ হইবে না।' ইহার কিছু তথ্য চূলমালুঙ্ক্যপুত্তসুত্তে[১] পাওয়া যায়। এই সুত্তের সারমর্ম এই—

'ভগবান বুদ্ধ যখন শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিকের বাগানে থাকিতেন, তখন একদিন মালুঙ্ক্যপুত্ত নামক একজন ভিক্ষু তাঁহার নিকট আসিল এবং তাঁহাকে প্রণাম করিয়া তাঁহার একপাশে বসিল। তাহার পর ভগবান বুদ্ধকে সে কহিল, 'মহাশয়, আমি নির্জনে বসিয়া থাকা কালে, আমার মনে এইরূপ চিন্তা আসিল যে, এই জগৎ শাশ্বত অথবা অশাশ্বত, শরীর ও আত্মা এক অথবা পৃথক, মরণের পর তথাগতের পুর্নজন্ম আছে অথবা নাই, এই সব প্রশ্নের মীমাংসা তো ভগবান করেন নাই; অতএব আমি ভগবানকে এই প্রশ্নগুলি জিজ্ঞাসা করিব, আর তিনি যদি এই প্রশ্নগুলির ঠিকঠিক মীমাংসা করিতে পারেন, তাহা হইলে আমি তাঁহার শিষ্য হইব। কিন্তু যদি ভগবান এই প্রশ্নগুলির মীমাংসা করিতে না পারেন, তাহা হইলে তিনি তাহা সোজাসুজি স্বীকার করুন।''

ভ.—হে মালুঙ্ক্যপুত্ত, আমি কি তোমাকে কখনো এইরকম বলিয়াছিলাম যে, তুমি যদি আমার শিষ্য হও, তাহা হইলে আমি তোমার এই সব প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া দিব?

মা.—না, মহাশয়।

'ভ.—আচ্ছা, অন্তত তুমি তো আমাকে বলিয়াছ যে, 'যদি ভগবান এইসব প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া দেন, তাহা হইলেই আমি ভগবানের ভিক্ষুসংঘে যোগদান করিব।'

'মা.—না, মহাশয়।

'ভ.—তাহা হইলে, 'এইসব প্রশ্নের মীমাংসা না করিলে, আমি ভগবানের শিষ্য থাকিব না,' এই রকম কথার অর্থ কি? হে মালুঙ্ক্যপুত্ত, যদি কোনো ব্যক্তির শরীরে বাণের বিষাক্ত কাঁটা ঢুকে ও তজ্জন্য সে ছট্ফট্ করিতে থাকে, আর যদি তখন তাহার আত্মীয়স্বজনরা অস্ত্রোপচারের জন্য বৈদ্যকে ডাকিয়া আনে, কিন্তু যদি ঐ ব্যক্তি বৈদ্যকে বলে, 'এই বাণ কে মারিয়াছে, সে ব্রাহ্মণ না ক্ষত্রিয়, বৈশ্য না শূদ্র, তাহার গায়ের রঙ কালো না ফরসা, তাহার ধনুটি কিরকম ছিল, ধনুর ছিলাটি কী পদার্থ দিয়া তৈয়ার করা হইয়াছিল, ইত্যাদি সমস্যার সমাধান না করিলে, আমি এই কাঁটাতে কাহাকেও হাত দিতে দিব না', তাহা হইলে, হে মালুঙ্ক্যপুত্ত, এই অবস্থায় ঐ ব্যক্তি এই সব প্রশ্নের কী মীমাংসা তাহা বুঝিবার আগেই মরিয়া যাইবে। তেমনই যদি কেহ একগুঁয়েমি করিয়া এইরূপ স্থির করে যে, জগৎ শাশ্বত কিংবা অশাশ্বত, এই সব প্রশ্নের মীমাংসা না করিলে সে ব্রহ্মচর্য পালন করিবে না, তাহা হইলে তাহাকে এই সব কথা না বুঝিয়াই যমলোকে যাইতে হইবে।

---

১. মজ্ঝিমনিকায়, নং. ৬৩

'হে মালুঙ্ক্যপুত্ত, জগৎ শাশ্বত কিংবা অশাশ্বত, এইরূপ দৃষ্টি ও বিশ্বাস থাকিলেও, উহাতে ধর্মাচরণে সাহায্য হইবে, এমন নয়। জগৎ শাশ্বত, এইরূপ বিশ্বাস পোষণ করেলেও, জরা, মরণ, শোক, পরিদেব, এইগুলির হাত হইতে রেহাই নাই। তেমনই, জগৎ শাশ্বত নয়, শরীর ও আত্মা এক, শরীর ও আত্মা পৃথক, মৃত্যুর পর তথাগতের পূনর্জন্ম হয়, অথবা হয় না ইত্যাদি কথা বিশ্বাস করিলেও, অথবা না করিলেও জন্ম, জরা, মরণ, পরিদেব এইগুলি থাকেই থাকে। সুতরাং, হে মালুঙ্ক্যপুত্ত, এই সব কথার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচারে আমি প্রবৃত্ত হই নাই। কেননা, এইরূপ বাদ বিবাদে ব্রহ্মচর্যে স্থৈর্য লাভ করার কোনো সম্ভাবনা নাই। এইরূপ বাদ বিবাদে বৈরাগ্য উৎপন্ন হইবে না, পাপের নিরোধ হইবে না, এবং শান্তি, প্রজ্ঞা, সংবোধ ও নির্বাণলাভ হইবে না।'

'কিন্তু হে মালুঙ্ক্যপুত্ত, ইহা দুঃখ, ইহা দুঃখের সমুদয়, ইহা দুঃখের নিরোধ, এবং ইহা দুঃখ নিরোধের মার্গ (উপায়), এইগুলি আমি স্পষ্টভাবে দেখাইয়া দিয়াছি। কারণ, এই চারিটি আর্যসত্য ব্রহ্মচর্যে স্থৈর্য আনে, ইহাদের দ্বারা বৈরাগ্য উৎপন্ন হয়, পাপের নিরোধ হয়, শান্তি, প্রজ্ঞা, সংবোধ ও নির্বাণ লাভ হয়। অতএব, হে মালুঙ্ক্যপুত্ত, যে সব বিষয়ের চর্চা আমি করি নাই, সেই সব বিষয়ের চর্চা তুমি করিয়ো না; আমি যে সব বিষয়ে মীমাংসা করিয়াছি, সেইগুলি মীমাংসার যোগ্য বলিয়া জানিবে।'

ইহার অর্থ এই যে, আত্মা পঞ্চস্কন্ধে গঠিত, আর তাহার আকার কী, তাহা অবিকৃতভাবেই পরলোকে যায় কিনা, ইত্যাদি প্রশ্নের চর্চায় শুধু গোলযোগেরই সৃষ্টি হইবে। পৃথিবীতে দুঃখ প্রচুর, আর তাহা মনুষ্যজাতির তৃষ্ণা হইতে উৎপন্ন। সুতরাং অষ্টাঙ্গিক মার্গের সাহায্যে, এই তৃষ্ণা নিরোধ করিয়া, জগতে সুখ ও শান্তি স্থাপন করা প্রত্যেক ব্যক্তির কর্তব্য। ইহাই (দুঃখনিরোধের) সোজা রাস্তা এবং ইহাই বুদ্ধের দার্শনিক তত্ত্ব।

ঈশ্বরবাদ

কাহারো কাহারো ধারণা এই যে, বুদ্ধ ঈশ্বর মানিতেন না, সুতরাং তিনি নাস্তিক ছিলেন। বৌদ্ধসাহিত্য অথবা প্রাচীন উপনিষদ্‌সমূহ পাঠ করিলে বুঝা যায় যে, এই ধারণাটিতে কোনো তথ্য নাই; তথাপি এই ভ্রান্তি দূর করিবার উদ্দেশ্যে, বুদ্ধের সময় ঈশ্বর সম্বন্ধে যে সব মতবাদ প্রচলিত ছিল, সংক্ষেপে এখানে তাহার দিগ্‌দর্শন করা সংগত বলিয়া মনে হয়।

প্রত্যক্ষ 'ঈশ্বর' শব্দটি অঙ্গুত্তরনিকায়ের টিকনিপাতে (সুত্ত-সংখ্যা ৬১) এবং মজ্ঝিমনিকায়ের দেবদহসুত্তে (সংখ্যা ১০১) দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথম সুত্তটিতে ঈশ্বর সম্বন্ধে যে বিবরণ আছে তাহা এই ঃ

ভগবান বলিতেছেন, 'হে ভিক্ষুগণ, মনুষ্য প্রাণী যে সব সুখ, দুঃখ অথবা উপেক্ষা ভোগ করে, সে সব ঈশ্বরসৃষ্ট (ইস্‌সর নিম্মানহেতু), এইরূপ যাহারা প্রতিপাদন ও স্বীকার করে, তাহাদিগকে আমি জিজ্ঞাসা করি যে, বাস্তবিকই কি এই তাহাদের মত? আর তাহারা যদি উত্তর দেয় 'হাঁ', তাহা হইলে আমি জিজ্ঞাসা করি, তোমরা যদি প্রাণঘাতক,

চোর, অব্রহ্মচারী, অসত্যবাদী অথবা ঝগড়াটে হও, কিংবা গালাগালি কর, বৃথা কথা বল, অপরের ধনে অভিলাষী হও, অন্যকে দ্বেষ কর, কিংবা তোমরা মিথ্যাদর্শী হও, তাহা হইলে তোমাদের এই সব দোষ কি ঈশ্বরই নির্মাণ করিয়াছেন? হে ভিক্ষুগণ, যদি এইরূপ মানিয়া লও যে, ঈশ্বরই এইগুলির নির্মাতা, তাহা হইলে, (সৎ কর্মে) ইচ্ছা ও উৎসাহ থাকিবে না; অমুক করিবে কিংবা অমুক করিবে না, এইসব কথারও সার্থকতা বুঝা যাইবে না।'

এই ঈশ্বর কর্তৃক সৃষ্টির কথা দেবদহসুত্তেও আছে। কিন্তু এই কথাগুলি প্রক্ষিপ্ত হইবে বলিয়া খুব সন্দেহ হয়। কারণ, অন্য কোনো সুত্তেই এই ধারণাটি নাই। বুদ্ধের সময়, সকলের চেয়ে বড়ো ঠাকুর ছিলেন ব্রহ্মদেব। কিন্তু তিনি কিছু অন্য ধরনের স্রষ্টা ছিলেন, বাইবেলে বর্ণিত ঈশ্বরের মতো নয়। জগৎ উৎপন্ন হওয়ার পূর্বে ব্রহ্মদেব ছিলেন না। বিশ্ব উৎপন্ন হওয়ার পর, সর্বপ্রথম ব্রহ্মদেব অবতীর্ণ হইলেন, ও তাহার পর অন্যান্য প্রাণীরা উৎপন্ন হইল; এইজন্য তাঁহাকে অতীত ও ভবিষ্যতের কর্তা বলিয়া মানা হইল। ব্রহ্মজালসুত্তে তাহার সম্বন্ধে যে বর্ণনা আছে, তাহার সারমর্ম এই—

'বহুকাল অতীত হওয়ার পর, এই জগতের সংবর্ত (নাশ) হয়। আর তখন পৃথিবীর অধিকাংশ প্রাণী আভাস্বর দেবলোক যায়। তাহার পর, বহুকাল অতীত হইলে, এই জগতের বিবর্ত (বিকাশ) শুরু হয়। তখন সকলের আগে, শূন্যগর্ভ ব্রহ্মগোলক উৎপন্ন হয়। তাহার পর, আভাস্বর দেবলোকের এক প্রাণী সেখান হইতে বিচ্যুত হইয়া, এই গোলকে জন্মগ্রহণ করে। ঐ প্রাণী মনোময়, প্রীতিভক্ষ্য, স্বয়ংপ্রভ, অন্তরীক্ষচর, শুভস্থায়ী এবং দীর্ঘজীবী হইয়া থাকে। তাহার পর, অন্য অনেক প্রাণী ঐ আভাস্বর দেবলোক হইতে বিচ্যুত হইয়া, সেই গোলকে জন্মগ্রহণ করে। তাহাদের মনে হয়, এই যে পূজনীয় ব্রহ্মা (বা) মহাব্রহ্মা, তিনি অভিভূ, সর্বদর্শী, বশবর্তী, ঈশ্বর, কর্তা, নির্মাতা, শ্রেষ্ঠ, স্রষ্টা, বশী এবং ভূতভবিষ্যতের পিতা।'

'ব্রহ্মদেবানাং প্রথমঃ সংবভূব বিশ্বস্য কর্তা ভুবনস্য গোপ্তা' এই মুণ্ডকোপনিষদের বাক্যটিকে (১।১), উপরে বর্ণিত ব্রহ্মদেবের কল্পনাটি সংক্ষেপে দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে, ব্রহ্মদেবকে জগতের কর্তারূপে স্থাপন করিবার জন্য, ব্রাহ্মণদের চেষ্টা স্পষ্ট পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু তাহাদের এই প্রযত্ন তৎকালীন শ্রমণ সংস্কৃতির সম্মুখে ফলপ্রসূ হইতে পারে নাই। স্বয়ং ব্রাহ্মণদিগকে এই চেষ্টা ছাড়িয়া দিয়া, 'ব্রহ্ম' শব্দটিকে ক্লীবলিঙ্গ বলিয়া স্বীকার করিতে হইয়াছিল; আর প্রায় সব উপনিষদেই এই ক্লীবলিঙ্গীয় ব্রহ্ম শব্দটিকেই গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে।

ব্রহ্ম কিংবা আত্মা হইতে জগতের উৎপত্তি কি করিয়া হইল, ইহার একটি কল্পনা বৃহদারণ্যক উপনিষদে পাওয়া যায়। তাহা এইরূপ ঃ

আত্মৈবেদমগ্র আসীৎ পুরুষবিধঃ........স বৈ নৈব রেমে তস্মাদেকাকী ন রমতে। স দ্বিতীয়মৈচ্ছৎ। স হৈতাবানাস যথা স্ত্রীপুমাংসৌ সম্পরিষ্বক্তৌ। স ইমমেবাত্মানং দ্বেধা পাতয়ত্ততঃ পতিশ্চ পত্নী চাভবতাং তস্মাদিদমর্ধবৃগলমিব স্ব ইতি।

'সকলের আগে শুধু পুরুষরূপী আত্মাই ছিল......তাহার ভালো লাগিল না; তাই (মনুষ্য) একাকী আনন্দ পায় না। সে দ্বিতীয় কাহাকেও ইচ্ছা করিল; আর যেমন স্ত্রী ও পুরুষ পরস্পরকে আলিঙ্গন দেয়, সেই রকম হইয়া গেল। সে নিজেই নিজেকে দুই ভাগে বিভক্ত করিল। ইহাতে পতি ও পত্নী উৎপন্ন হইল। এইজন্য, এই শরীর (দ্বিদল ধান্যের) একটি দলের মতো।' (বৃ. উ. ১।৪।১-৩)

এখন বাইবেলে জগৎসৃষ্টির যে বর্ণনা আছে, তাহা বিবেচনা করা যাউক। 'তার পর, পরমেশ্বর জমির মাটি দিয়া মানুষ বানাইলেন.....তাহার পর, ভগবান আদমের উপর (সে মানুষের উপর) গাঢ় নিদ্রা রাখিয়া দিলেন, আর তাহার পাঁজর হইতে নারী সৃষ্টি করিলেন। এইজন্য পুরুষ নিজের পিতা মাতাকে ত্যাগ করিয়া, স্ত্রীর সহিত থাকিবে; তাহারা উভয়ে একদেহ হইবে।' (বাইবেল, উৎপত্তি, অ. ২)

এই সৃষ্টির কাহিনী, আর উপরের সৃষ্টিকাহিনী, এই দুইয়ের ভিতর কত বড়ো পার্থক্য! এখানে, পরমেশ্বর সমস্ত পৃথিবী নির্মাণ করিয়া, তারপর মানুষ ও মানুষের পাঁজর হইতে স্ত্রী উৎপন্ন করেন; এবং ঈশ্বর জগৎ হইতে একেবারেই ভিন্ন। আর সেখানে, পুরুষরূপী আত্মা নিজেই দুইভাগে বিভক্ত হইয়া, স্ত্রী ও পুরুষ হয়।

প্রজাপতির উৎপত্তি

প্রজাপতি মানে জগৎকর্তা ব্রহ্মা। তাহার উৎপত্তি বৃহদারণ্যকে বর্ণিত হইয়াছে। তাহা এইরূপ ঃ

> আপ এবেদমগ্র আসুস্তা আপঃ সত্যমসৃজন্ত, সত্যংব্রহ্ম, ব্রহ্ম প্রজাপতিং,
> প্রজাপতির্দেবাংস্তে দেবাঃ সত্যমেবোপাসতে॥ (৫।৫।১)

'সকলের পূর্বে, শুধু জলই ছিল। এই জল সত্যকে, সত্য ব্রহ্মাকে, ব্রহ্ম প্রজাপতিকে এবং প্রজাপতি দেবতাদিগকে উৎপন্ন করিলেন; এ দেবতারা সত্যেরই উপাসনা করে।'

বাইবেলেও এক জগৎপ্রলয়কারী মহাজলপ্লাবনের পর, জগতের পুনরুৎপত্তির কথা বর্ণিত আছে। কিন্তু সেখানে বলা হইয়াছে যে, উক্ত মহাবন্যার পূর্বেই ঈশ্বর একটা বড়ো জাহাজে 'নোয়া' ও তাহার পরিবার এবং বিভিন্ন জাতীয় পশুপক্ষীর একটি মদ্দা ও একটি মাদী তুলাইয়া রাখিয়াছিলেন, এবং ইহার পর, তিনি সেই মহাজলপ্লাবন উৎপন্ন করিয়াছিলেন।[১] উপনিষদে জলপ্রলয়ের পূর্বে কি ছিল, সে সম্বন্ধে কিছুই বলা হয় নাই। শুধু তাহাই নহে, অধিকন্তু সত্যকে ব্রহ্মদেবের এবং ব্রহ্মতত্ত্বেরও উপরে রাখা হইয়াছে। ব্রহ্মজালসুত্তে ব্রহ্মোৎপত্তির যে কাহিনী দেওয়া হইয়াছে, তাহা বাইবেলের তুলনায়, উপনিষদের এই বর্ণনার অনেক বেশি নিকটে।

ঈশ্বর জগৎ হইতে ভিন্ন, এবং তিনি জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, এই কল্পনাটি ভারতবর্ষে 'শক' রা আনিয়া থাকিবে। কেননা, তাহার পূর্বকালীন সাহিত্যে, সৃষ্টির এই কল্পনা দেখিতে

১. বাইবেল, উৎপত্তি, অ. ৭

পাওয়া যায় না। সুতরাং বুদ্ধ ঈশ্বর মানিতেন না বলিয়া নাস্তিক ছিলেন, এইরূপ আরোপ তাঁহার বিরুদ্ধে আনা আদৌ সম্ভবপর ছিল না। অবশ্য তিনি বেদনিন্দক বলিয়া নাস্তিক, ব্রাহ্মণরা তাঁহার উপর এইরূপ আরোপ করিত। কিন্তু বুদ্ধ যে বেদের নিন্দা করিয়াছিলেন, তাহার নিদর্শন কোথাও পাওয়া যায় না। আর ব্রাহ্মণরা যাহার প্রামাণ্য স্বীকার করিয়াছে, এমন যে সাঙ্খ্যাকারিকার মতো গ্রন্থ, তাহাতেও বেদ নিন্দা কি কম আছে?

দৃষ্টবদানুশ্রবিকঃ স হ্যবিশুদ্ধিক্ষয়াতিশয়যুক্তঃ।

'দৃষ্ট উপায়ের মতোই বৈদিক উপায়ও (অকর্মণ্য)। কারণ, তাহাও অবিশুদ্ধি, নাশ ও অতিশয় দ্বারা যুক্ত।'

আর 'ত্রৈগুণ্য বিষয়া বেদাঃ' ইত্যাদি বেদনিন্দা ভগবদ্‌গীতাতেও দেখা যায় না কি? কিন্তু সাঙ্খ্যেরা ব্রাহ্মণদের জাতিভেদের উপর আক্রমণ করে নাই; এবং ভগবদ্‌গীতা তো খোলাখুলিভাবে জাতিভেদের সমর্থনই করিয়াছে। তাই, ব্রাহ্মণরা ঐরূপ বেদনিন্দা হজম করিতে পারিত। আর বুদ্ধ বেদনিন্দা না করিলেও ইহার ঠিক বিপরীত কাজটি, অর্থাৎ জাতিভেদের উপর আক্রমণ করিয়াছিলেন। সুতরাং তাহাকে কি করিয়া বেদনিন্দক বলা যাইবে না? বেদ মানে জাতিভেদ, আর জাতিভেদ মানে বেদ, এইভাবে এই দুইটির মধ্যে ঐক্য আছে যে! আর যদি জাতিভেদ না থাকে, তাহা হইলে বেদ থাকিবে কি করিয়া? আর যদি জাতিভেদ থাকে এবং বেদের একটি অক্ষরও কেহ না বুঝিলেও, যদি উহাতে প্রামাণ্য বুদ্ধি অক্ষুণ্ণ থাকে, তাহা হইলে বেদ থাকিয়াই গেল, এইরূপ বলিতে হইবে!

বুদ্ধের সময় শ্রমণ ব্রাহ্মণদের মধ্যে ঈশ্বরবাদের যে আদৌ গুরুত্ব ছিল না, তাহা উপরের আলোচনা হইতে বুঝা যাইবে। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ ঈশ্বরের পরিবর্তে কর্মবাদে বিশ্বাস করিত এবং তাহারা কখনো বুদ্ধের উপর এইরূপ আরোপ করিত যে, বুদ্ধ কর্মবাদী নয় ও সেইজন্য তিনি নাস্তিক। পরের পরিচ্ছেদে এই মতের নিরসন করা হইবে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

কর্মযোগ

বুদ্ধ নাস্তিক কি আস্তিক?

এককালে ভগবান বুদ্ধ বৈশালীর নিকট মহাবনে থাকিতেন। তখন কয়েকজন বিখ্যাত লিচ্ছবী রাজা সংস্থাগারে (নগর মন্দিরে) কোনো কারণে মিলিত হইয়াছিলেন। এমন সময়, তাহাদের মধ্যে বুদ্ধ সম্বন্ধে কথা উঠিল। তাহাদের মধ্যে অধিকাংশ রাজাই বুদ্ধ, ধর্ম ও সঙ্ঘের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। এই প্রশংসা শুনিয়া সেনাপতি সিংহ বুদ্ধ দর্শনে ইচ্ছুক হইলেন। তিনি নির্গ্রন্থ সম্প্রদায়ের ভক্ত ছিলেন বলিয়া, তাহাদের প্রধান গুরু নাথপুত্তের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, তিনি তাহাকে বলিলেন, 'মহাশয়, আমি শ্রমণ গোতমের দর্শন লইতে চাই।'

নাথপুত্ত কহিলেন, 'হে সিংহ, তুমি হইতেছ ক্রিয়াবাদী, তবে কেন অক্রিয়বাদী গোতমের দর্শন লইতে চাও?' নিজগুরুর এই রকম কথা শুনিয়া, সেনাপতি সিংহ বুদ্ধদর্শনে যাইবার বাসনা ছাড়িয়া দিলেন। পুনরায় দুই-একবার তিনি লিচ্ছবীদের সংস্থাগারে বুদ্ধ, ধর্ম ও সঙ্ঘের প্রশংসা শুনিলেন। তথাপি নাথপুত্তের কথায়, তাহাকে বুদ্ধদর্শনে যাইবার ইচ্ছা পুনরায় স্থগিত রাখিতে হইল। সর্বশেষে নাথপুত্তকে জিজ্ঞাসা না করিয়াই, সিংহ স্থির করিল যে, বুদ্ধের দর্শন লইতে হইবে এবং বহু লোক সঙ্গে লইয়া তিনি মহাবনে আসিলেন, এবং ভগবানকে প্রণাম করিয়া একপাশে বসিলেন। তারপর তিনি ভগবানকে বলিলেন, 'মহাশয়, এই কথা কি ঠিক যে, আপনি অক্রিয়বাদী এবং শ্রাবকদিগকে অক্রিয়বাদ শিখান?'

ভগবান কহিলেন, 'এক অর্থে সত্যবাদী মানুষ বলিতে পারে যে, শ্রমণ গোতম অক্রিয়বাদী। ঐ অর্থটি কি? হে সিংহ, আমি শারীরিক দুরাচরণের, বাচনিক দুরাচরণের, ও মানসিক দুরাচরণের অক্রিয়া পালন করিতে উপদেশ দেই।'

'হে সিংহ, আবার অন্য অর্থে সত্যবাদী মানুষ বলিতে পারে যে, শ্রমণ গোতম ক্রিয়াবাদী। ঐ অর্থটি কি? আমি শারীরিক সদাচরণের, বাচনিক সদাচরণের, ও মানসিক সদাচরণের ক্রিয়া করিতে উপদেশ দেই।'

'অন্য এক অর্থে সত্যবাদী মানুষ আমাকে উচ্ছেদবাদীও বলিতে পারে। সেই অর্থটি কি? হে সিংহ, আমি লোভ, দ্বেষ, মোহ ইত্যাদি সব পাপজনক মনোবৃত্তির উচ্ছেদ করিতে উপদেশ দেই।'

'আবার অন্য অর্থে, সত্যবাদী মানুষ আমাকে জুগুপ্সী বলিতে পারে। সেই অর্থটি কি? হে সিংহ, আমি শারীরিক দুরাচরণের, বাগ্‌দুরাচরণের ও মনোদুরাচরণের জুগুপ্সা (ঘৃণা) করি। পাপজনক কর্মে আমার অতিশয় বিতৃষ্ণা।

'অন্য এক অর্থে, সত্যবাদী মানুষ আমাকে বিনাশক বলিতে পারে। ঐ অর্থটি কি? আমি লোভ, দ্বেষ ও মোহের বিনাশ করিতে উপদেশ দেই।'

'হে সিংহ, আবার এমনও একটি অর্থ আছে, যে অর্থে, সত্যবাদী মানুষ আমাকে তপস্বী বলিতে পারিবে। সেই অর্থটি কি? হে সিংহ, পাপজনক অকুশল ধর্ম তপস্যা দ্বারা ত্যাগ করিবে, আমি এইরূপ বলি। যাহার পাপজনক অকুশল ধর্ম বিগলিত ও নষ্ট হইয়াছে ও পুনরায় উৎপন্ন হইবে না, তাহাকে আমি তপস্বী বলি।'[১]

নাস্তিকতার আরোপ

এই সুত্তে বুদ্ধের উপর প্রধানতঃ অক্রিয়বাদের আরোপ করা হইয়াছে। এই আরোপ স্বয়ং মহাবীর স্বামী করিয়া থাকুন বা না থাকুন, তথাপি ইহাতে কোনো সন্দেহ নাই যে, তৎকালে বুদ্ধের উপর এইরকমের আরোপ করা হইত।

গোতম ক্ষত্রিয়কুলে জন্মাইয়াছিলেন। কোলিয় ক্ষত্রিয়রা শাক্যবংশীয় ক্ষত্রিয়দের প্রতিবেশী ও আত্মীয় ছিল। এই দুই ক্ষত্রিয়বংশের মধ্যে রোহিণী নদীর জল লইয়া বারবার ঝগড়া হইত, ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে (প্রথম ভাগ, পৃ. ১০৫)। আজও উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে, পাঠানদের মধ্যে এই প্রথা প্রচলিত আছে যে, যদি কোনো উপদল নিজ উপদলের লোকের ক্ষতি কিংবা প্রাণনাশ করে, তাহা হইলে সেই উপদলের লোকের লোকসান ও প্রাণহানি করিয়া প্রতিশোধ লইতে হইবে; সুতরাং প্রাচীনকালে ভারতবর্ষের ক্ষত্রিয়দের মধ্যে এইরূপ প্রথা থাকিলে, আশ্চর্যান্বিত হওয়ার কিছুই নাই। আসলে আশ্চর্যের কথা এই যে, গোতম এইসব ক্ষত্রিয়েরই এক গোষ্ঠীতে জন্মগ্রহণ করিয়া নিজেদের প্রতিবেশী ও আত্মীয়দের উপর প্রতিশোধ লইতে সম্পূর্ণ অসম্মত হইলেন এবং একেবারে তপস্বীদের দলে গিয়া ভিড়িলেন।

গৃহস্থাশ্রমের উপর বিরক্তি ধরিলে, তৎকালীন ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়রা গৃহত্যাগ করিয়া পরিব্রাজক হইত, ও কঠোর তপস্যা করিত। সুতরাং গোতম তপস্বী হওয়ায়, কাহারো তেমন বিশেষ কিছু মনে হওয়ার কথা নয়। খুব বেশি হয় তো, লোকে এইরকম বলিয়া থাকিবে যে, এই তরুণ গৃহস্থ নিজের আশ্রমের অযোগ্য বলিয়া প্রমাণিত হইল। কিন্তু সাত বৎসর তপস্যা করিয়া যখন বোধিসত্ত্ব গৌতম বুদ্ধত্ব লাভ করিলেন, এবং গৃহস্থাশ্রমের আরাম ও সন্ন্যাসআশ্রমের কৃচ্ছ্রসাধন এই দুইয়েরই সমানভাগে নিষেধ করিতে থাকিলেন, তখন তাহার উপর লোক টীকা করিতে লাগিল।

ব্রাহ্মণরা প্রচলিত সমাজপদ্ধতি থাকুক, ইহাই চাহিত। কর্মযোগ বলিতে তাহারা বুঝিত যে, ব্রাহ্মণরা যাগযজ্ঞ করিবে, ক্ষত্রিয়রা যুদ্ধ করিবে, বৈশ্যরা বাণিজ্য করিবে এবং শূদ্ররা সেবা করিবে। এই কর্মযোগ যাহার ভালো লাগিবে না, তিনি অরণ্যে গিয়া তপস্যা দ্বারা আত্মবোধ করিয়া লইতে পারেন, আর তাহার পর সেখানেই মরিয়াও যাইতে পারেন; কিন্তু সমাজের ব্যবস্থায় অদলবদল হইবে, এমন কিছু করা তাহার কর্তব্য হইবে না।

বিভিন্ন শ্রমণ-সংঘে বিভিন্ন দার্শনিক তত্ত্ব প্রতিপাদিত হইত, তথাপি তপস্যার ব্যাপারে,

১. বুদ্ধলীলা সারসংগ্রহ, পৃ. ২৭৯-২৮১ দ্রষ্টব্য।

অধিকাংশ শ্রমণরাই একমত ছিল। ইহাদের মধ্যে, নির্গ্রন্থ সম্প্রদায়ের শ্রমণরা কর্মের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিত। এই জন্ম দুঃখজনক, এবং ইহা পূর্বজন্মের পাপকর্মবশতঃ উৎপন্ন হইয়াছে, সুতরাং এই পাপ নাশ করিবার জন্য কঠোর তপস্যা করা প্রয়োজন—এইরূপ এই সম্প্রদায়ের নায়করা প্রতিপাদন করিতেন। আর বুদ্ধ তো তপস্যার নিষেধকারী। এমন অবস্থায়, নির্গ্রন্থরা যে তাঁহাকে অক্রিয়বাদী (অকর্কবাদী) বলিবে, ইহা খুবই স্বাভাবিক। ব্রাহ্মণদের দৃষ্টিতে, বুদ্ধ অস্ত্র ত্যাগ করিয়াছেন বলিয়া অক্রিয়বাদী, আবার তাপসদের দৃষ্টিতে, তিনি তপস্যা করা ছাড়িয়া দিয়াছেন বলিয়া অক্রিয়বাদী।

বিপ্লবকারী দার্শনিক তত্ত্ব

এখানে লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, গোতম যে গৃহত্যাগ করিলেন, তাহা শুধু আত্মবোধ সম্পাদন করিয়া মোক্ষলাভের জন্য নয়। নিজের প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে অস্ত্র উত্তোলন করা, তাঁহার যোগ্য বলিয়া মনে হয় নাই। অস্ত্র ছাড়া, শুধু পরস্পরের মৈত্রীর দ্বারা পরিচালিত কোনো সমাজ-ব্যবস্থা রচনা করা যায় কিনা, এই সম্বন্ধে তিনি সর্বদাই চিন্তা করিতেন। তপস্যা দ্বারা ও তাপসের দার্শনিক তত্ত্বদ্বারা মনুষ্যজাতির জন্য হয়তো এইরকম একটি সহজ পথ বাহির করা যাইতে পারে, এইরূপ মনে হওয়াতেই, তিনি গৃহত্যাগ করিয়া তপস্যা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। আর যখন তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, তপস্যা দ্বারা সেরকম কিছুই হইবে না, তখন তিনি তাহাও ছাড়িয়া দিলেন, ও একটি অভিনব মধ্যমমার্গ খুঁজিয়া বাহির করিলেন।

আজকাল যেমন রাজনৈতিক নেতা এ ধার্মিক লোকেরা বিপ্লববাদীদের নামের সঙ্গে বৈনাশিক (Nihilist) প্রভৃতি বিশেষণ লাগায়, ও সমাজের কাছে উহাদিগকে অশিক্ষিত বলিয়া দেখাইবার চেষ্টা করে, তেমনই বুদ্ধের তৎকালীন সমালোচকরা তাঁহাকে অক্রিয়বাদী বলিয়া নির্দেশ করিত। এবং তাঁহার নূতন দার্শনিক তত্ত্ব অর্থহীন বলিয়া জনসাধারণের কাছে দেখাইবার চেষ্টা করিত—এইরূপ মনে করিলে, আপত্তির কারণ নাই।

দুরাচরণ ও সদাচরণ

উপরে দুরাচরণ ও সদাচরণের কথা আসিয়াছে। এইগুলি কী, সংক্ষেপে তাহার সম্বন্ধে এখানে আলোচনা করা সমীচীন বলিয়া মনে হয়। ভগবান সালেয্যক ব্রাহ্মণদিগকে বলিতেছেন, "হে গৃহিগণ, শরীর দ্বারা তিনরকমের অধর্মাচরণ হইতে পারে। সেই অধর্মাচরণগুলি কি? কোনো কোনো মানুষ প্রাণিহত্যা করে; তাহার স্বভাব নিষ্ঠুর ও হাত রক্তাক্ত; এবং সে মারামারিতে ব্যস্ত থাকে। অথবা সে চুরি করে, যে বস্তু নিজের নয়, তাহা—গ্রামেই থাকুক অথবা অরণ্যেই থাকুক—মালিককে না বলিয়া লইয়া যায়। অথবা সে ব্যভিচার করে; মাতা, পিতা, ভগিনী, পতি কিংবা আত্মীয়ের গৃহে যে-সব স্ত্রীলোক আছে, তাহাদের সহিত ব্যভিচার করে। এইভাবে শরীর দ্বারা ত্রিবিধ অধর্মাচরণ সংঘটিত হয়।

"আর হে গৃহিগণ, বচন দ্বারা যে চার রকম অধর্মাচরণ হয়, সেইগুলি কি? কোনো কোনো মানুষ মিথ্যা বলে, যখন সে সভায়, পরিষদে, আত্মীয়দের মধ্যে অথবা রাজদ্বারে যায়, তখন তাহার সাক্ষ্য লইবার জন্য তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হয়, 'তুমি যাহা জান, তাহা বলো'; কিন্তু সে যাহা জানে না, তাহা জানে, এবং যাহা দেখে নাই, তাহা দেখিয়াছে, এইরূপ বলে; এইভাবে নিজের জন্য, পরের জন্য, কিংবা অল্পস্বল্প লাভের জন্য, জানিয়া শুনিয়া, মিথ্যা বলে। অথবা সে পাজি; ইহাদের কথা শুনিয়া ঝগড়া বাধাইবার জন, উহাদের কাছে গিয়া, তাহা লাগায়; অথবা উহাদের কথা শুনিয়া, ইহাদের মধ্যে ঝগড়া বাধাইবার জন্য, ইহাদিগকে তাহা বলে; এইভাবে যাহাদের মধ্যে ঐক্য আছে, তাহাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে, অথবা কলহরত লোকদিগকে উৎসাহ দেয়; ঝগড়া বাড়াইতে তাহার আনন্দ; যেরকম কথায় ঝগড়া বাড়ে, সেই কথাই সে বলে। অথবা সে গালাগলি করে, দুরভিসন্ধিপূর্ণ, কর্কশ, কটু, মর্মভেদী, ক্রোধব্যঞ্জক ও শান্তিভঞ্জক শব্দ উচ্চারণ করে। অথবা সে বৃথা বকে, অসময়ে কথা বলে; যে ঘটনা ঘটে নাই, নিজে তাহা বানাইয়া বলে; সে অধার্মিক, অভদ্র; এবং যাহা লক্ষ্য না দেওয়ার যোগ্য, অপ্রাসঙ্গিক এবং অযথা অধিক ও নিরর্থক, এমন কথা বলে। এইভাবে বচন-দ্বারা চতুর্বিধ অধর্মাচরণ সংঘটিত হয়।

"হে গৃহিগণ, তিনরকমের মানসিক অধর্মাচরণগুলি কি? কোনো কোনো মানুষ অপরের দ্রব্যের কথা ভাবে, অপরের ধনাগমের সাধনগুলি পাইবার ইচ্ছা করে। অথবা সে অন্যের দ্বেষ করে, এই প্রাণীটি মারা হউক, ইহার নাশ হউক, এইরকম ভাবে। অথবা তাহার দৃষ্টি মিথ্যা—সে এইরূপ নাস্তিক মত মনে মনে পোষণ করে যে, দান বলিয়া কিছু নাই, ধর্ম বলিয়া কিছু নাই, সৎকৃত্যের এবং দুষ্কৃত্যের কোনো ফল নাই, ইহলোক নাই, পরলোক নাই। এইভাবে মনের দ্বারা ত্রিবিধ অধর্মাচরণ সংঘটিত হয়।

"হে গৃহিগণ, তিনরকমের শারীরিক ধর্মাচরণ কি? কোনো কোনো মানুষ প্রাণিহত্যা করে না, অন্যের উপরে অস্ত্র উদ্যত করে না, তাহাকে হত্যা করিতে সে লজ্জাবোধ করে, সকল প্রাণীর প্রতিই তাহার ব্যবহার সদয় হয়। সে চুরি করে না, গ্রামে অথবা বনে অন্যের দ্রব্য, তাহাকে না দিলে, গ্রহণ করে না। সে ব্যভিচার করে না; মা, বাবা, বোন, ভাই, পতি, আত্মীয়স্বজন প্রভৃতির গৃহে প্রতিপালিত মেয়েদের সঙ্গে কোনো সম্বন্ধ রাখে না। এইভাবে শরীরদ্বারা ত্রিবিধ ধর্মাচরণ সংঘটিত হয়।

"আর হে গৃহিগণ, বচনের দ্বারা যে চারি ধর্মাচরণ হয়, সেইগুলি কি? কোনো কোনো মানুষ মিথ্যা বলা একেবারে ছাড়িয়া দেয়, সভাতে, পরিষদে, কিংবা রাজদ্বারে তাহাকে সাক্ষ্য দিতে বলিলে, সে যাহা জানে না, তাহার সম্বন্ধে, 'আমি জানি না', এইরূপ বলে। আর সে যাহা দেখে নাই তাহার সম্বন্ধে, 'আমি দেখি নাই', এইরূপ বলে। এইভাবে নিজের জন্য, পরের জন্য, কিংবা অল্পস্বল্প লাভের জন্য, সে মিথ্যা বলে না। সে পাজিপনা করা ছাড়িয়া দেয়, ইহাদের কথা শুনিয়া উহাদের মদ্যে ঝগড়া সৃষ্টি করিবার জন্য ঐ কথা উহাদিগের বলে না, কিংবা উহাদের কথা শুনিয়া ইহাদিগকে বলে না; এইভাবে, যাহাদের

মধ্যে ঝগড়া আছে, তাহাদের মধ্যে একতা নির্মাণ করে, আর যাহাদের মধ্যে ঐক্য আছে, তাহাদিগকে উৎসাহিত করে। ঐক্যের মধ্যে সে আনন্দ পায়, এবং যাহাতে ঐক্য হয়, ঐরকম কথাই বলে। সে গালাগালি করা ছাড়িয়া দেয়। সে সরল, কর্ণমধুর, হৃদয়গ্রাহী, নাগরিক-সুলভ এবং বহুজনপ্রিয় কথা বলে। সে বৃথা বকে না, প্রসঙ্গানুযায়ী, সত্য, অর্থযুক্ত, ধর্মসংগত, ভদ্র, লক্ষ্য দেওয়ার যোগ্য, সময়োচিত, হেতুযুক্ত, তথ্যপূর্ণ এবং সার্থক ভাষণ করে। এইভাবে বচনের দ্বারা চতুর্বিধ ধর্মাচরণ সংঘটিত হয়।

"হে গৃহিগণ, তিনরকমের মানসিক ধর্মাচরণগুলি কি? কোনো কোনো মানুষ পরদ্রব্যে লোভ করে না; পরের সম্পত্তি নিজের হউক, এইরূপ চিন্তা মনে আনে না। তাহার চিত্ত দ্বেষ-হইতে মুক্ত থাকে; এই প্রাণীদের কোনো শত্রু না থাকুক, তাহাদের জীবনে কোনো বাধা না আসুক, তাহারা দুঃখ-রহিত ও সুখী হউক, তাহার মনের অভিলাষ এইরূপ শুদ্ধ থাকে। সে সম্যগ্‌দৃষ্টি হয়; দান একটি বড়ো ধর্ম, ভালো ও খারাপ কর্মের ফল আছে; ইহলোক ও পরলোক আছে, ইত্যাদি কথায় তাহার বিশ্বাস আছে। এইভাবে মনের দ্বারা ত্রিবিধ ধর্মাচরণ সংঘটিত হয়।"[১]

সংক্ষেপে বলা যায় যে, প্রাণনাশ, অদত্তাদান (চুরি) ও কামমিথ্যাচার (ব্যভিচার), এই তিনটি কায়িক পাপকর্ম, অসত্য, পাজিপনা, গালাগালি ও বৃথা বকা, এই চারিটি বাচনিক পাপকর্ম; এবং পরদ্রব্যে লোভ, অন্যের সর্বনাশের ইচ্ছা ও নাস্তিকদৃষ্টি, এই তিনটি মানসিক পাপকর্ম। এই দশটিকেই অকুশল কর্মপথ বলে। ইহাদের আচরণ হইতে নিবৃত্ত হওয়াকে কুশলকর্মপথ বলে। ইহারাও সংখ্যায় দশটি এবং উপরে তাহার বর্ণনাও দেওয়া হইয়াছে। দশটি অকুশল ও দশটি কুশল কর্মপথের বর্ণনা ত্রিপিটক সাহিত্যের অনেক জায়গায় পাওয়া যায়। উপরের উদ্ধৃত অংশটিতে অকুশল কর্মপথকে অধর্মাচরণ ও কুশলকর্মপথকে ধর্মাচরণ বলা হইয়াছে।

কুশলকর্ম ও অষ্টাঙ্গিক মার্গ

ইহাদের মধ্যে কুশলকর্মপথগুলির আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গে সমাবেশ হয়। তিন প্রকার কুশল শারীরিক কর্মকে সম্যক্ কর্ম বলে; চার প্রকার কুশল বাচনিক কর্মকে সম্যক্ বাক্ বলে; আর তিন প্রকার মানসিক কুশলকর্মকে সম্যক্ দৃষ্টি ও সম্যক্ সংকল্প বলে। অষ্টাঙ্গিক মার্গের বাকি চারিটি অঙ্গ এই কুশলকর্মপথেরই পরিপোষক। সম্যক্ আজীব, সম্যক্ ব্যায়াম, সম্যক্ স্মৃতি ও সম্যক্ সমাধি, এই চারিটি অঙ্গের যথার্থ ভাবনা ব্যতীত কুশলকর্মপথের অভিবৃদ্ধি ও পূর্ণতা হইতে পারে না।

অনাসক্তি যোগ

শুধু কুশলকর্ম, করিয়া গেলেও, যদি তাহাতে আসক্ত হইয়া পড়া যায়, তাহা হইলে, উহা হইতে অকুশলকর্ম উৎপন্ন হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

---

১. মজ্ঝিমনিকায়ের (নং ৪১) সালেয্যকসুত্ত দ্রষ্টব্য।

কুসলো ধম্মো অকুসলস্‌স ধম্মস্‌স আরম্মণপচ্চয়েন পচ্চয়ো। দানং দত্বা সীলং সমাদিয়িত্বা উপোসথকম্মং কত্বা তং অস্‌সোদেতি অভিনন্দিত। তং আরব্ভ রাগো উপ্পজ্জতি দিট্‌ঠি উপ্পজ্জতি বিচিকিচ্ছা উপ্পজ্জতি উদ্ধচ্চং উপ্পজ্জতি দোমনস্‌সং উপ্পজ্জতি। (তিকপট্‌ঠান)

'কুশল মনোবিচার অকুশলের নিকট আলম্বনপ্রত্যয় দ্বারা প্রত্যক্ষ হয়। (কোনো মানুষ) দান দেয়, শীল রক্ষা করে; উপোসথ কর্ম করে; আর উহার আস্বাদ লয়, উহাকে অভিনন্দন করে। এইজন্য লোভ উৎপন্ন হয়, দৃষ্টি উৎপন্ন হয়, সন্দেহ উৎপন্ন হয়, ভ্রান্তি উৎপন্ন হয়, দৌর্মনস্য উৎপন্ন হয়।'

এইভাবে, কুশল মনোবৃত্তি অকুশল মনোবৃত্তির কারণীভূত হয় বলিয়া, কুশলবিচারে আসক্তি রাখিলে চলিবে না। কুশলকর্ম নিরাসক্তভাবে করিয়া যাওয়া দরকার। এই কথাই ধম্মপদের নিম্নলিখিত গাথাটিতে সংক্ষেপে বলা হইয়াছে ঃ

সব্বপাপস্‌স অকরণং কুসলস্‌স উপসম্পদা।
সচিত্তপরিয়োদপনং এতং বুদ্ধান সাসনং॥

'সকল পাপের অকরণ, সর্বকুশলের সম্পাদন ও স্বচিত্তের সংশোধন, ইহা বুদ্ধের শাসন (উপদেশ)।'

অর্থাৎ উপরে বর্ণিত সর্ব অকুশল কর্মপথ পূর্ণভাবে বর্জন করিতে হইবে; আর কুশলকর্মের সর্বদা আচরণ করিয়া, তাহাতে নিজের মন আসক্ত হইতে দিবে না। এই সবই অষ্ঠাঙ্গিক মার্গের অভ্যাস দ্বারা সম্পাদিত হয়।

কুশলকর্মে সচেতনতা ও উৎসাহ

কুশলকর্মে অত্যন্ত সচেতনতা ও উৎসাহ বজায় রাখা দরকার, এইপ্রকার উপদেশ ত্রিপিটক সাহিত্যে অনেক স্থলে দেখা যায়। ইহাদের সবগুলি এখানে সংগ্রহ করা সম্ভবপর নয়। তথাপি নমুনা হিসাবে, উহাদের মধ্যে একটি ছোট উপদেশ এখানে দিতেছি।

ভগবান বুদ্ধ কহেন, "হে ভিক্ষুগণ, স্ত্রী, পুরুষ গৃহী অথবা সন্ন্যাসী, ইহারা সকলেই পাঁচটি কথা সর্বদা চিন্তন করিবে। ১. বারবার এই চিন্তা করিবে, 'আমি জরাধর্মী'; কেননা, যে যৌবনমদে জীব কায়মনোবাক্যে দুরাচরণ করে, সেই মদ (বা অহংকার) এই চিন্তনে নাশ হয়; অন্তত হ্রাস পায়। ২. 'আমি ব্যাধিধর্মী', বারবার এইরূপ বিচার করিবে। কেননা, যে স্বাস্থ্যমদে জীব কায়মনোবাক্যে দুরাচরণ করে, সেই মদ (বা অহংকার) এই চিন্তনে নাশ হয়; অন্তত হ্রাস পায়। ৩. 'আমি মরণধর্মী', এইরূপ বারবার বিচার করিবে। কেননা, যে জীবনমদে জীব কায়মনোবাক্যে দুরাচরণ করে, সেই মদ এই চিন্তনে নাশ হয়; অন্তত হ্রাস পায়। ৪. 'প্রিয় হইতে (প্রিয় প্রাণী কিংবা পদার্থ হইতে) আমার বিয়োগ হইবে', এইরূপ পুনঃ পুনঃ চিন্তা করিবে। কেননা, যে প্রিয় প্রাণী অথবা পদার্থের ভালোবাসাবশতঃ জীব কায়মনোবাক্যে দুরাচরণ করে, সেই ভালোবাসা এই চিন্তা দ্বারা নাশ হয়; অন্তত হ্রাস পায়। ৫. 'আমি কর্মস্বকীয়, কর্মদায়াদ, কর্মযোনি, কর্মবন্ধু, কর্মপ্রতিশরণ; আমি যে-কল্যাণকর

কিংবা পাপজনক কর্ম করিব, তাহার দায়াদ হইব, এইরূপ বারবার বিচার করিবে। কেননা, ইহাতে শারীরিক বাচনিক ও মানসিক দুরাচরণ নাশ হইবে; অন্তত কমিবে।

" 'শুধু আমি একাই নই, কিন্তু সর্বপ্রাণীই জরাধর্মী, ব্যাধিধর্মী, মরণধর্মী, ইহাদের সকলেরই প্রিয় বস্তু হইতে বিয়োগ হয়, এবং তাহারাও কর্মদায়াদ', আর্যশ্রাবক সর্বদা এইরূপ মনন করে; তখন সে সত্যমার্গের সন্ধান পায়। সেই মার্গের অভ্যাস দ্বারা তাহার সংযোজনগুলি নষ্ট হয়।"[১]

এই উদ্ধৃত বাক্যগুলিতে যে 'কর্মস্বকীয়' শব্দটি আছে, তাহার অর্থ 'একমাত্র কর্মই আমার স্বকীয় (অর্থাৎ আমি কর্মসর্বস্ব); বাকি সব বস্তু কখন আমাহইতে বিভক্ত হইবে, তাহার কোনো স্থিরতা নাই'; 'আমি কর্মের দায়াদ', ইহার অর্থ এই যে, 'আমি যদি ভালো কর্ম করি, তাহা হইলে আমি সুখ পাইব, আর যদি খারাপ কর্ম করি, তাহা হইলে আমাকে দুঃখভোগ করিতে হইবে', 'কর্মযোনি' মানে 'কর্ম হইতেই আমার জন্ম হইয়াছে'; 'কর্মবন্ধু' মানে 'সংকটে আমার কর্মই একমাত্র বান্ধব', আর 'কর্মপ্রতিশরণ' মানে 'কর্মই আমাকে রক্ষা করিতে সমর্থ'। ইহা হইতে ভগবান বুদ্ধ কর্মের উপর কতখানি জোর দিয়াছেন, তাহা ভালোভাবে বুঝা যায়। এইরূপ গুরুকে নাস্তিক বলা কি করিয়া সংগত হইবে?

মনের পূর্ণ উৎসাহ দিয়া সৎকর্ম করিবে, এই উপদেশটি সম্বন্ধে ধম্মপদের নিম্নলিখিত গাথাটিও বিচারের যোগ্য।

অভিত্থরেথ কল্যাণে পাপা চিত্তং নিবারয়ে।
দন্ধং হি করোতো পুঞ্ঞং পাপস্মিং রমতো মনো॥

কল্যাণকর্ম অবিলম্বে করিবে, এবং পাপ হইতে চিত্তকে নিবারণ করিবে। কারণ, আলস্যবশতঃ পুণ্যকর্মকারীর মনও পাপকর্মে রস পায়।

ব্রাহ্মণদের কর্মযোগ

এই পর্যন্ত বুদ্ধের কর্মযোগ সম্বন্ধে আলোচনা হইল। এখন তৎকালীন ব্রাহ্মণদের মধ্যে কোন্ রকমের কর্মযোগ প্রচলিত ছিল, সংক্ষেপে তাহা আলোচনা করা ভালো হইবে। ব্রাহ্মণদের জীবিকা অর্জনের উপায় ছিল যাগযজ্ঞ; আর এইগুলি বিধিপূর্বক করা, ইহাকেই ব্রাহ্মণ নিজের কর্মযোগ বলিয়া মানিত; তাহারা ইহাও প্রতিপাদন করিত যে, ক্ষত্রিয় যুদ্ধ করিবে, বৈশ্য ব্যবসা করিবে, আর শূদ্র সেবা করিবে, এবং এইগুলি তাহাদের কর্মযোগ, আর এই সব কর্মে কাহারো বিতৃষ্ণা হইলে, সে সর্বসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া বনে জঙ্গলে গিয়া, তপস্যা করিবে—ইহাকে সন্ন্যাসযোগ বলা হইত। সন্ন্যাসে তাহার কর্মযোগের শেষ হইত। কোনো কোনো ব্রাহ্মণ সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াও, অগ্নিহোত্রাদি কর্মযোগ করিত, আর উহাকেই তাহারা শ্রেষ্ঠ ধর্ম বলিয়া বুঝিত। এই সম্বন্ধে ভগবদ্গীতাতে বলা হইয়াছে—

যজ্ঞার্থাৎ কর্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্মবন্ধনঃ।
তদর্থং কর্মকৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর॥

---

১. অঙ্গুত্তরনিকায়, পঞ্চকনিপাত সুত্ত ৫৭

'যজ্ঞের উদ্দেশ্যে কৃতকর্ম ছাড়া, অন্য কর্ম লোকেদের বন্ধনকারক হয়। অতএব, হে কৌন্তেয়, আসক্তি ছাড়িয়া, যজ্ঞের উদ্দেশ্যে তুমি কর্ম কর।'

সহ যজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ।
অনেন প্রসবিস্যধ্বমেষ বোহস্ত্বিষ্ট কামধুক্॥

'পূর্বে (সৃষ্টির প্রারম্ভে) যজ্ঞের সহিত প্রজা উৎপন্ন করিয়া, ব্রহ্মদেব কহিলেন, "তোমরা এই যজ্ঞের সাহায্যে শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিবে; ইহা তোমাদের মনোবাঞ্ছার কামধেনু হউক।" এবং এইজন্য,

এবং প্রবর্তিতং চক্রং নানুবর্তয়তীহ যঃ।
অঘায়ুরিন্দ্রিয়ারামো মোঘং পার্থ স জীবতি॥

'এইভাবে প্রবর্তিত (যজ্ঞের) চক্র এই পৃথিবীতে যে ব্যক্তি চালায় না, তাহার জীবন পাপময় এবং সেই ইন্দ্রিয়পরায়ণ ব্যক্তি বৃথাই বাঁচিয়া থাকে।'[১]

ব্রাহ্মণদের লোকানুগ্রহ

কিন্তু যদি কাহারো মনে এইরূপ চিন্তা আসে যে, প্রজাপতি কর্তৃক প্রবর্তিত এই যজ্ঞের চক্র ভালো নয়, কারণ, তাহার মূলে জীবহিংসা রহিয়াছে, তাহা হইলে ঐ চিন্তা মনে আসিতে দিবে না; তাহাতে অজ্ঞজনের বুদ্ধিভেদ হইবে।

ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্মসঙ্গিনাম্।
জোষয়েৎ সর্বকর্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্॥

'কর্মে আসক্ত অজ্ঞ ব্যক্তিদের বুদ্ধিভেদ করিবে না, বিদ্বান্ ব্যক্তি যুক্ত হইয়া অর্থাৎ সর্বকর্ম ভালোভাবে আচরণ করিয়া, অন্যকে দিয়া তাহা করাইবে।' (ভ. গী. ৩।২৬. গীতার এই সমগ্র অধ্যায়টিই বিচার করিয়া দেখিবার মতো।)

ভগবদ্গীতা যে কোন্ শতাব্দীতে লিখিত হইয়াছিল, তাহার সম্বন্ধে এখানে বাদ বিবাদ করার কোনো কারণ নাই। কিন্তু কোনো লেখকই ভগবদ্গীতাকে বুদ্ধের সমকালীন বলিয়া মনে করেন না। এই গ্রন্থের কাল নির্ণয়ে ভিন্ন ভিন্ন পাশ্চাত্য পণ্ডিত বুদ্ধের পর পাঁচশো হইতে এক হাজার বৎসর পর্যন্ত ভিন্ন ভিন্ন সময়ের অনুমান করিয়াছেন। ইহাতে সন্দেহ নাই যে, এই গ্রন্থরচনার কাল বেশ আধুনিক। তথাপি উপরিলিখিত শ্লোকগুলিতে যে-বিচার ব্যক্ত করা হইয়াছে, তাহা বুদ্ধকালীন ব্রাহ্মণদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। কোসলদেশবাসী লোহিত্য নামক এক ব্রাহ্মণ এইরূপ প্রতিপাদন করিতেন যে, যদি আমরা কোনো কুশল-তত্ত্ব বুঝিতে পারি, তাহা হইলে তাহা জনসাধারণের নিকট প্রকাশ করা উচিত নয়।[২] লোহিত্য ব্রাহ্মণের গল্পটি সংক্ষেপে এইরকম—

---

১. ভগবদ্গীতা, অ. ৩ শ্লো. ৯ ১০ ও ১৬।

২. দীঘনিকায়, ভাগ ১. জোহিচ্চসুত্ত দ্রষ্টব্য।

ভগবান কোসলদেশে ভ্রমণ করিতে করিতে, শালবতিকা নামক গ্রামের নিকট আসিলেন। এই গ্রামটি কোসলরাজ পসেনদি লোহিত্যকে দান করিয়াছিলেন। লোহিত্য এইরূপ একটি পাপজনক মত প্রতিপাদন করিতেন যে, 'যদি কোনো শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ কোনো কুশল-তত্ত্ব জানিতে পারে, তাহা হইলে তাহার পক্ষে উহা অন্যকে বলা ঠিক নয়। এক ব্যক্তি অন্যকে কীই-বা সাহায্য করিতে পারে? সে শুধু অন্যের পুরাতন বন্ধন ছিন্ন করিয়া, তাহার মধ্যে নূতন বন্ধনই উৎপন্ন করিবে; এইজন্য, আমি এইরূপ স্বার্থপরের মতো আচরণ করিতে বলিতেছি।'

লোহিত্য যখন জানিতে পরিলেন যে, ভগবান বুদ্ধ তাহাদের গ্রামের নিকট আসিয়াছেন, তখন তিনি রোসিকা নামক একজন নাপিতকে তাঁহার নিকট পাঠাইয়া তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিলেন, এবং পরের দিন, অন্ন-ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া, ভগবানকে ও তাঁহার ভিক্ষু-সংঘকে জানাইলেন যে, এই অন্নব্যঞ্জন ঐ নাপিতের হাতে প্রস্তুত হইয়াছে। ভগবান নিজে ভিক্ষাপাত্র ও চীবর লইয়া লোহিত্যের গৃহে যাইবার জন্য রওয়ানা হইলেন। পথে রোসিকা নাপিত ভগবান বুদ্ধকে লোহিত্য-ব্রাহ্মণের পূর্বোক্ত মতটি কহিল। যে ইহাও বলিল, "মহাশয়, আপনি লোহিত্যকে এই পাপজনক মত হইতে মুক্ত করুন।"

লোহিত্য ভগবানকে এবং ভিক্ষু-সংঘকে সাদরে ভোজন করাইলেন। খাওয়াদাওয়ার পর, ভগবান তাহাকে বলিলেন, "হে লোহিত্য, যদি কাহারো কোনো কুশল-তত্ত্বের জ্ঞান হয়, তাহা হইলে সে তাহা অন্যকে বলিবে না, তুমি কি এইরূপ মত প্রতিপাদন কর?"

লো.—হাঁ, হে গোতম।

ভ.—হে লোহিত্য, তুমি এই শালবতিকা গ্রামে বাস কর। এখন কেহ এইরূপ বলিতে পারে যে, এই শালবতিকা গ্রামের যাহা আয়, তাহা শুধু একা লোহিত্যই ভোগ করিবে, অন্য কাহাকেও দিবে না। যে-ব্যক্তি ঐরকম বলিবে, সে তোমার আশ্রিত (এই তোমার) লোকেদের অমঙ্গলকারী হইবে না কি?"

লোহিত্য উত্তর দিল, 'হইবে'। তাহার পর, ভগবান বুদ্ধ কহিলেন, "যে অন্যের অসুবিধা করে, সে তাহার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, কি অমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী?"

লো.—হে গোতম, সে তাহার অমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী।

ভ.—এইরূপ ব্যক্তির মন মৈত্রীপূর্ণ হইবে, কি শত্রুতাময় হইবে?

লো.—হে গোতম, শত্রুতাময় হইবে।

ভ.—যে মানুষের চিত্ত শত্রুতাপূর্ণ, তাহার দৃষ্টি মিথ্যা হইবে, কি সম্যক্ হইবে?

লো.—হে গোতম, তাহার দৃষ্টি মিথ্যা হইবে।

কুশলকর্মদ্বারা অকুশলকে জয় করিবে

এখানে এবং অনেক স্থলে, ভগবান বুদ্ধ বলিয়াছেন যে, যে-সব খারাপ প্রথা সমাজে চলিয়া আসিতেছে, তাহাদের বিরুদ্ধে কাহারো মনে কোনো চিন্তা উদিত হইলে, সেই চিন্তা সকলের

মধ্যে প্রসার করা প্রত্যেক সদ্‌ব্যক্তির শ্রেষ্ঠ কর্তব্য; যাহারা খারাপ কাজ করে, তাহাদিগকে কিছু না বলিয়া, এবং নিজে তাহাদের মতো আচরণ করিয়া, সেই-সব খারাপ কাজ করিতে দেওয়া, কাহারো কর্তব্য নয়।

ব্রাহ্মণদের কথা এইরূপ ছিল যে, যাগযজ্ঞ ও বর্ণ-ব্যবস্থা স্বয়ং প্রজাপতিই সৃষ্টি করিয়াছেন বলিয়া, তদনুযায়ী যে-সব কাজ করা হয়, সে সবই পবিত্র। কিন্তু ভগবান বুদ্ধের কথা এই যে, তৃষ্ণা হইতে উৎপন্ন প্রাণিহিংসাদি কর্ম কখনো পবিত্র হইতে পারে না। এইরূপ কর্মদ্বারাই মানুষ বিষমমার্গে বাঁধা পড়িয়াছে; আর এইরূপ কর্মের বিরুদ্ধে কুশল কর্ম করিয়া গেলেই, মানুষ এই বিষমমার্গ হইতে মুক্ত হইবে। মজ্ঝিমনিকায়ের সল্লেখসুত্তে (নং ৮) ভগবান বলিতেছেন, "হে চুন্দ, অন্যেরা যেখানে হিংসাচরণ করে, চল, আমরা সেখানে অহিংসা আচরণ করি; আর এইভাবে (অন্তঃকরণ) পরিষ্কার[1] করিবে। অন্য লোকে যখন প্রাণিহত্যা করে, চল, আমরা তখন প্রাণিহত্যা হইতে নিবৃত্ত হই, ও এইভাবে (অন্তঃকরন) পরিষ্কার করিবে। অন্য লোকে চোর হয়; চল আমরা সেখানে চুরি হইতে নিবৃত্ত হই; অন্যেরা যদি অব্রহ্মচারী হয়, তাহা হইলে, চল, আমরা ব্রহ্মচারী হই; অন্যে মিথ্যা বলিলে, চলা, আমরা মিথ্যা হইতে নিবৃত্ত হই; যদি অন্যে পাজিপনা করে, তাহা হইলে, চল, আমরা পাজিপনা হইতে নিবৃত্ত হই; অন্যে যদি গালাগালি করে, তাহা হইলে, চল, আমরা গালাগালি হইতে নিবৃত্ত হই; অন্যে যদি বৃথা কথা বলে, তাহা হইলে, চল, আমরা বৃথা-প্রলাপ হইতে নিবৃত্ত হই; অন্যে যদি পরের ধনে লোভ করে, তাহা হইলে, চল, আমরা ধনের লোভ হইতে মুক্ত থাকি; অন্যে যদি দ্বেষ করে, তাহা হইলে, চল, আমরা দ্বেষ হইতে মুক্ত থাকি; যদি অন্যের দৃষ্টি মিথ্যা হয়, তাহা হইলে, চল, আমাদের দৃষ্টি সম্যক্ হউক; এইভাবে পরিষ্কার করিবে।..........

"হে চুন্দ, যেমন কোনো ব্যক্তি বিষম পথে পড়িয়া, তাহা হইতে বাহির হইবার জন্য কোনো সোজা রাস্তার সন্ধান পায়, তেমনই জীবহিংসাকারীর জীবহিংসা হইতে বাহিরে আসিবার রাস্তা হইতেছে সর্বজীবে অহিংসা। যে প্রাণিহত্যা করে, তাহার মুক্তির জন্যে প্রাণিহত্যা হইতে বিরতি, চোরের মুক্তির জন্য চুরি হইতে বিরতি, অব্রহ্মচারীর মুক্তির জন্য অব্রহ্মচর্য হইতে বিরতি, দুষ্ট ব্যক্তির মুক্তির জন্য দুষ্টামি হইতে বিরতি, পাজি লোকের মুক্তির জন্য পাজিপনা হইতে বিরতি, কর্কশ ভাষীর মুক্তির জন্য কর্কশ-কথা হইতে বিরতি, বৃথা-প্রলাপকারী ব্যক্তির মুক্তির জন্য বৃথা প্রলাপ হইতে বিরতি' ইহাই একমাত্র উপায়..........

"হে চুন্দ, যে নিজেই গভীর পঙ্কে পতিত হইয়াছে, তাহার পক্ষে অন্যকে সেই পঙ্ক হইতে বাহিরে আনা সম্ভবপর নয়। তেমনই যে-ব্যক্তি নিজে নিয়ম মানিয়া চলে না, নিজে শান্ত নয়, সে অন্যকে দমন করিবে, অন্যকে দিয়া নিয়ম মানাইবে, অন্যকে শান্ত করিবে, ইহা সম্ভবপর নয়। কিন্তু যে নিজে নিয়মানুগত, শিক্ষিত ও শান্ত, সে-ই অন্যকে দমন করিবে, অন্যকে শিক্ষিত করিবে, ও অন্যকে শান্ত করিবে, ইহাই সম্ভবপর।"

---

১. লোকে শঙ্খ প্রভৃতি জিনিস মাজিয়া পরিষ্কার করে, ইহাকে সল্লেখ বলে। এখানে আত্মশুদ্ধিকেই 'পরিষ্কার করা' বলা হইয়াছে।

এই কথাই ধম্মপদের একটি গাথাতে সংক্ষেপে বলা হইয়াছে। গাথাটি এই—

অক্কোধেন জিনে কোধং অসাধুং সাধুনা জিনে।

জিনে কদরিয়ং দানেন সচ্চেনালীকবাদিনং॥

'অক্রোধদ্বারা ক্রোধকে জয় করিবে, অসাধুকে সাধুতাদ্বারা জয় করিবে, কৃপণকে দানের দ্বারা জয় করিবে, ও মিথ্যাবাদীকে সত্যদ্বারা জয় করিবে' (ধম্মপদ ২২৩)

দশ কুশলকর্মপথের তত্ত্বে ব্রাহ্মণদের দ্বারা প্রবর্তিত পরিবর্তন

বৈদিক লেখকদিগকে উপরে বর্ণিত কুশল ও অকুশল কর্মপথগুলি অনেক ঘুরিয়া ফিরিয়া গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু এইগুলি গ্রহণ করিবার সময়, যাহাতে তদ্দারা তাহাদের অধিকারে কোনোরকম ধক্কা না লাগে, তাহার জন্য তাহারা সাবধানতা অবলম্বন করিয়াছিলেন। মনুসংহিতায় এই দশটি অকুশল-কর্মপথ কিভাবে স্বীকার করা হইয়াছে, তাহা দেখুন—

স তানুবাচ ধর্মাত্মা মহর্ষীন্ মানবো ভৃগুঃ।

অস্য সর্বস্য শৃণুত কর্মযোগস্য নির্ণয়ম্॥

'সেই মনুকুলোৎপন্ন ধর্মাত্মা ভৃগু সেই মহর্ষিদিগকে কহিলেন, এই সম্পূর্ণ কর্মযোগের সিদ্ধান্ত শুন।'

পরদ্রব্যেষ্বভিধ্যানং মনসানিষ্টচিন্তনম্।

বিতথাভিনিবেশশ্চ ত্রিবিধিং কর্ম মানসম্॥

'পরদ্রব্যে অভিলাষ করা, অপরের অনিষ্ট চিন্তা করা, এবং খারাপ পথ অবলম্বন করা (নাস্তিকতা), এই তিনটিকে মানসিক (পাপ) কর্ম বলিয়া জানিবে।'

পারুষ্যমন্থৃতং চৈব পৈশুন্যং চাপি সর্বশঃ।

অসংবদ্ধপ্রলাপশ্চ বাঙ্ময়ং স্যাচ্চতুর্বিধম্॥

'কঠোর কথা, অসত্য কথা, সর্বপ্রকার পাজিপনা ও বৃথা বকা, এই চারিটি হইতেছে বাচনিক পাপকর্ম।'

অদত্তানামুপাদানং হিংসা চৈবাবিধানতঃ।

পরদারোপসেবা চ শারীরং ত্রিবিধং স্মৃতম্॥

'অদত্তের গ্রহণ (চুরি), বেদে বিহিত হয় নাই এমন হিংসা, ও পরদারগমন, এই তিনটি শারীরিক পাপকর্ম।'

ত্রিবিধং চ শরীরেণ বাচা চৈব চতুর্বিধম্।

মনসা ত্রিবিধং কর্ম দশ কর্মপথাং স্ত্যজেৎ॥

'(এইরূপ) ত্রিবিধ শারীরিক, চতুর্বিধ বাচনিক ও ত্রিবিধ মানসিক, এইভাবে (মোট) দশটি (অকুশল) কর্মপথ ত্যাগ করিবে।' (মনু. ১২।৫-৯)

এই শ্লোকগুলির মধ্যে প্রথম শ্লোকে যে 'কর্মযোগ' শব্দটি আছে, তাহা খুবই যথাযোগ্য হইয়াছে। মনুসংহিতার লেখকের নিকট বুদ্ধোপদিষ্ট কর্মযোগ ভালো লাগিয়াছিল সত্য, তবু তিনি তাহাতে একটি ব্যতিক্রম রাখিয়া দিয়াছেন। তাহা হইতেছে এই যে, যে-প্রাণি-হিংসা বেদ-বিহিত নয়, শুধু সেই প্রাণিহিংসাই করিবে না, বেদ-বিহিত প্রাণি-হিংসা করিলে, তাহা প্রাণি-হিংসাই হয় না।

যুদ্ধ ধর্মসংগত বলিয়া নির্ধারিত হওয়ায়, অকুশল কর্মপথও যোগ্য বলিয়া নির্ধারিত হইল

যাগযজ্ঞে যে পশু হিংসা করিতে হয়, তাহা ত্যাগ করা উচিত, যদি এইরূপ মানিয়া লওয়া হইত, তাহা হইলে, যাগযজ্ঞ করার আর কোনো হেতুই থাকিত না। আর এই-সব যাগযজ্ঞেরও উদ্দেশ্য কি ছিল? উদ্দেশ্য ছিল যুদ্ধে জয়লাভ হউক এবং জয়লাভের পর প্রাপ্ত রাজ্য চিরস্থায়ী হউক। অবশ্য যুদ্ধের জীবহিংসা ধর্মসংগত বলিয়া মানা না হইলে, বেদবিহিত জীবহিংসার কোনো হেতুই পাওয়া যাইত না; আর এইজন্যই যুদ্ধকে পবিত্র বলিয়া গ্রহণ করা আবশ্যক ছিল।

শ্রীকৃষ্ণ বলেন—

স্বধর্মমপি চাবেক্ষ্য ন বিকম্পিতু-মর্হসি।
ধর্ম্যাদ্ধিযুদ্ধাচ্ছ্রেয়োহন্যৎ ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে॥

'আর স্বধর্মের দিক হইতে বিচার করিলেও, পশ্চাৎপদ হওয়া তোমার পক্ষে যোগ্য হইবে না। ক্ষত্রিয়ের পক্ষে ধর্মযুদ্ধ হইতে শ্রেয়স্কর অন্য কিছু নাই।'

যদৃচ্ছয়া চোপপন্নং স্বর্গদ্বারমপাবৃতম্।
সুখিনঃ ক্ষত্রিয়াঃ পার্থ লভন্তে যুদ্ধমীদৃশম্॥

'আর হে পার্থ, এইরূপ যুদ্ধ হইতেছে যেন সহজলব্ধ স্বর্গের উন্মুক্ত দ্বার। খুব ভাগ্যবান ক্ষত্রিয়রাই এইরূপ যুদ্ধের সুযোগ পায়।'

অথ চেত্ত্বমিমং ধর্ম্যং সংগ্রামং ন করিষ্যসি।
ততঃ স্ব-ধর্মং কীর্তিং চ হিত্বা পাপমবাপস্যসি॥

'আর যদি তুমি এই ধর্মযুদ্ধ না কর, তাহা হইলে তুমি স্বধর্ম ও কীর্তি হারাইয়া পাপের ভাগী হইবে।' (গীতা, অ. ২।৩১—৩৩)

যুদ্ধ ধর্মসংগত বলিয়া নির্ধারিত হওয়ায়, সর্ব অকুশল কর্মপথও ধর্মসংগত বলিয়া নির্ধারিত হওয়া স্বাভাবিক ছিল। অর্থাৎ যুদ্ধ ব্যতীত অন্যত্র জীবহিংসা করিবে না, যুদ্ধ ছাড়া লুটপাট ব্যভিচার করিবে না, তেমনই অসত্যভাষণ, ঝগড়া, কর্কশ শব্দ, এইগুলিও যুদ্ধের কাজ ছাড়া, অর্থাৎ রাজনৈতিক ক্ষেত্র ছাড়া, অন্যত্র আচরণে আনিবে না। পরদ্রব্যে লোভ তো যুদ্ধে খুবই প্রয়োজনীয়। বিপক্ষ সৈন্যদের সম্বন্ধে বিদ্বেষ উৎপন্ন না করিয়া, সৈনিককে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করাই সম্ভবপর নয়; আর 'আমরা স্বধর্মের জন্য, স্বরাষ্ট্রের জন্য, অথবা

এইরূপ অন্য কোনো-না-কোনো কাল্পনিক পবিত্রকার্যের জন্য কলহ করিতেছি', এইরূপ তীব্র মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন না হইলে, যুদ্ধে জয়লাভ করা অসম্ভব। আমার কথার তাৎপর্য এই যে, এক যুদ্ধের জন্য, সকল কুশলকর্মকেই জলাঞ্জলি দেওয়া পবিত্র বলিয়া নির্ধারিত হয়!

অশ্বত্থামা মারা গিয়াছে, এইরূপ স্পষ্ট মিথ্যাকথা বলিতে যুধিষ্ঠির প্রস্তুত ছিলেন না; তখন শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে 'নরো বা কুঞ্জরো বা' (মানুষ কিংবা হাতি মারা গিয়াছে) এইরূপ বলাইলেন। বর্তমান রাজনীতিতে এইরকমই হয় ঃ আধা মিথ্যা ও আধা সত্য। আর যদি নিজের দেশের উন্নতি হয়, তাহা হইলে যে-কোনোরকম অকুশল কর্মই পবিত্র বলিয়া নির্ধারিত হইতে পারে!

ধর্মযুদ্ধের বিকাশ

জৈন ও বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে বেদবিহিত জীব-হিংসাজনক কার্য বন্ধ হইয়া গেল। কিন্তু ক্ষত্রিয়ের ধর্মযুদ্ধ এই দেশে চিরস্থায়ী হইয়া রহিল; পরস্পরের মধ্যে গৃহবিবাদ করিতে তাহারা উৎসাহ পাইল। মহম্মদ পয়গম্বর এইরকম ধর্মযুদ্ধের বিকাশ করিয়াছেন। তিনি প্রতিপাদন করিয়াছেন যে, নিজেরা পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ করা যোগ্য নয়, কিন্তু অন্য সম্প্রদায়ের লোকের বিরুদ্ধে জিহাদ (যুদ্ধ) ঘোষণা করা খুব ধর্মসংগত। ইহার প্রতিক্রিয়ারূপে খ্রিষ্টানদের মধ্যেও ধর্মযুদ্ধ (ক্রুসেড্স্) প্রবর্তিত হইল। আর স্বদেশভক্তিতে এ-সবই ঢাকা পড়িয়া গেল। আজকাল স্বদেশগর্ব খুব উচ্চ ধার্মিকতা বলিয়া গণ্য হয়। তাহার জন্য, যে-কোনোরকম কুকর্মই হউক-না-কেন, তাহাও সংগত বলিয়া ধার্য হয়। কিন্তু উহাতে সমগ্র মনুষ্যজাতি এক বিষমমার্গে পতিত হইয়াছে। ইহা হইতে বাহির হইবার জন্য বুদ্ধের কর্মযোগ ছাড়া আর কিছু উপায় থাকিতে পারে কি?

নবম পরিচ্ছেদ

যাগযজ্ঞ

পৌরাণিক বুদ্ধ

হিন্দুরা বুদ্ধকে বিষ্ণুর নবম অবতার বলিয়া মানে। বিষ্ণু বুদ্ধরূপী অবতার হইয়া অসুরদিগকে মোহে ফেলিলেন এবং দেবতাদের দ্বারা তাদের বিনাশ করিলেন, বিষ্ণুপুরাণে এইরূপ কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। ইহার সারমর্ম ভাগবতের নিম্নলিখিত শ্লোকটিতে পাওয়া যায়—

ততঃ কলৌ সম্প্রয়াতে সম্মোহায় সুরদ্বিষাম্।
বুদ্ধো নামাহজনসুতঃ কীকটেষু ভবিষ্যতি॥

'তাহার পর, কলিযুগ আসিলে, অসুরদিগকে মোহিত করিবার জন্য, বুদ্ধ নামক অজনের পুত্র কীকটদেশে জন্মগ্রহণ করিবে।'

সর্বসাধারণ হিন্দুদের বুদ্ধাবতার সম্বন্ধে বিশেষ কোনো জ্ঞান নাই। যিনি শাস্ত্রপাঠ করিয়াছেন, এমন পণ্ডিত এবং যে পুরাণাদি শ্রবণ করে, এইরকম সাধারণ হিন্দু, ইহারা বুদ্ধসম্বন্ধে যাহা জানে, তাহা বিষ্ণুপুরাণ কিংবা ভাগবত হইতে সংগৃহীত।

বিষ্ণুশাস্ত্রীর ধারণা

পাশ্চাত্য দেশে সকলের আগে ম্যাক্স মুলার-এর গুরু বিখ্যাত ফরাসী পণ্ডিত বুর্ণফ্-এর লক্ষ্য বৌদ্ধধর্মের দিকে আকৃষ্ট হইয়াছিল; কিন্তু পর্যাপ্ত তথ্য না পাওয়ায়, তিনি এই ধর্মের পুরাপুরি খবর পাশ্চাত্যদের সম্মুখে রাখিতে পারেন নাই। তথাপি বৌদ্ধধর্মে বিচারার্হ কিছুই নাই, এবং উহা একেবারে ত্যাগ করিবারই যোগ্য, পাশ্চাত্যদের মধ্যে এই ভ্রান্ত ধারণা ছিল, তাহা বুর্ণফ্-এর চেষ্টায় অনেকটা বাধা পাইল; আর ইহার পরিণাম এই হইল যে, ডক্টর উইল্সন-এর মতো খৃষ্টভক্ত পণ্ডিতও বৌদ্ধধর্ম অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করিলেন; এবং তাহাদের সংস্পর্শে আসিয়া, আমাদের দেশের কলেজগুলিতে শিক্ষালাভ করিয়া যে-সব যুবক বাহির হইয়াছেন, তাহাদেরও বৌদ্ধধর্ম-বিষয়ক ধারণা বদলাইতেছে।

বিষ্ণুশাস্ত্রী চিপলূণকর[১] তাহার "বাণ কবি" সম্বন্ধে লিখিত প্রবন্ধে বলেন— "আর্যলোকদের যে মূল বৈদিকধর্ম ছিল, তাহার সম্বন্ধে বুদ্ধই সর্বপ্রথম মতভেদ ব্যক্ত করিয়াছিলেন। কালের গতিতে, বহুলোক তাঁহার মত অনুসরণ করায়, ভারতীয় ধর্মে দুইটি ভাগ পড়িয়া গেল; এবং এই নূতন ধর্মের লোকেরা নিজেদের বৌদ্ধ বলিয়া পরিচয় দিতে লাগিল। এই নূতন ধর্মমত কিরূপ, ইহার উৎপত্তি, প্রসার ও লয় কখন এবং কিজন্য হইল, প্রভৃতি কথা ঐতিহাসিকদের নিকট একটি খুব মনোরঞ্জক বিষয়; কিন্তু এখন তাহা বলিয়া লাভ কি? কিন্তু অতীতের এই খেদদায়ক কাহিনীটি আবার একবার এখানে বলা প্রয়োজন

১. ইনি ইংরেজ আমলের প্রথমদিকের একজন বিখ্যাত মারাঠী সাহিত্যিক ছিলেন।

যে, ইতিহাসের অভাবে, আমরাও, সমস্ত জগতের সহিত, এই মহালাভ হইতে দূরে সরিয়া গেলাম। সেইকথা এখন থাকুক; বুদ্ধ-সম্বন্ধে যদিও আমরা কিছুই জানি না, তবু একটি কথা খুবই স্পষ্ট বলিয়া প্রতীয়মান হয় যে, তাঁহার বুদ্ধি অলৌকিক ছিল। কেননা, তাঁহার প্রতিপক্ষীরা অর্থাৎ ব্রাহ্মণরাই তাঁহাকে ঈশ্বরের সাক্ষাৎ নবম অবতার বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন! জয়দেব গীতগোবিন্দের প্রারম্ভে বলিয়াছেন—

নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহ শ্রুতিজতিং।
সদয়হৃদয়দর্শিতপশুঘাতং।
কেশব ধৃতবুদ্ধশরীর জয় জগদীশ হরে॥ (ধ্রুবপদ)

.........খৃষ্টীয় অব্দের প্রারম্ভের কাছাকাছি সময়ে বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণদের মধ্যে ধর্মসম্বন্ধে বাদবিবাদ হইয়া, তাহাতে শঙ্করাচার্য বৌদ্ধধর্মের খণ্ডন করিলেন, এবং পুনরায় ব্রাহ্মণ্যধর্ম স্থাপন করিলেন। এইভাবে বৌদ্ধদের পরাজয় হওয়ার পর, তাহারা স্বেচ্ছায়ই হউক কিংবা রাজাদেশেই হউক, দেশত্যাগ করিয়া, কেহ তিব্বতে, কেহ চীনদেশে, আবার কেহ লঙ্কাতে গিয়া থাকিল।''

উপরে উদ্ধৃত অংশটি হইতে তৎকালীন ইংরাজী-শিক্ষিত হিন্দুদের বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে কিরকম ধারণা ছিল, তাহা অনুমান করা যায়।

'লাইট অব এশিয়া'র পরিণাম

ইহার পর, ১৮৭৯ সালে, এড্উইন অর্নলড্-এর 'লাইট অব্ এশিয়া' নামক প্রসিদ্ধ কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হইল। ইহা পড়িয়া, ইংরাজী-শিক্ষিত হিন্দুদের মনে বুদ্ধের সম্বন্ধে আদর ও সম্মানের ভাব বাড়িল। যাগযজ্ঞের প্রথা নষ্ট করিয়া, অহিংসাকে পরমধর্মরূপে প্রতিষ্ঠা করার জন্য, বুদ্ধাবতার জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, এই ধারণা দৃঢ় হইতে লাগিল, ও এই ধারণা আজও কম-বেশি মাত্রায় সমাজে প্রচলিত আছে। এই ধারণাটির মধ্যে কতটুকু সত্যতা আছে, তাহা দেখিবার জন্য, বুদ্ধের সমকালীন শ্রমণদের ও স্বয়ং বুদ্ধের যাগযজ্ঞ সম্বন্ধে কী মত ছিল, তাহা বিচার করিয়া দেখা যোগ্য বলিয়া মনে হয়।

হরিকেশিবলের কাহিনী

শ্রমণপন্থগুলির মধ্যে, শুধু জৈন ও বৌদ্ধ, এই দুই পন্থেরই গ্রন্থাদি বর্তমান সময়ে পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে জৈনদের উত্তরাধ্যয়নসূত্রে হরিকেশিবলের গল্প দেখা যায়। উহার সারমর্ম এই—

হরিকেশিবল চণ্ডালের (শ্বপাকের) ছেলে ছিলেন। তিনি জৈন ভিক্ষু হইয়া, খুব বড়ো তপস্বী হইয়াছিলেন। কোনো-এক সময়, একমাস উপবাস করিয়া, পারণের দিন, যখন তিনি ভিক্ষায় বাহির হইলেন, তখন এমন-এক জায়গায় আসিয়া পড়িলেন, যেখানে এক

মহাযজ্ঞ হইতেছিল। তাহার মলিনবস্ত্রে ঢাকা কৃশ শরীর দেখিয়া, যজ্ঞের পুরোহিতেরা তাহাকে তিরস্কার করিল এবং তাহাকে সেখান হইতে চলিয়া যাইতে বলিল। সেখানে, নিকটেই একটি গাব গাছের উপর, এক যক্ষ থাকিত। যক্ষ অদৃশ্য হইয়া, হরিকেশিবলের আওয়াজ অনুকরণ করিয়া ঐ পুরোহিত ব্রাহ্মণদিগকে কহিল, "হে ব্রাহ্মণগণ, তোমরা শুধু শব্দের ভার বহন কর; তোমরা বেদ অধ্যয়ন কর বটে, কিন্তু বেদের অর্থ তোমরা বুঝ না।" তখন এই ব্রাহ্মণরা মনে করিল যে, ঐ ভিক্ষু তাহাদিগকে অপমান করিয়াছে। সুতরাং তাহারা তাহাদের যুবক ছেলেদের দ্বারা উহাকে খুব মারধর করাইল। ছেলেরা লাঠি, বেত ও চাবুক নিয়া তাহাকে মারিতে আরম্ভ করিল। ইহা দেখিয়া, কোসলিক রাজার কন্যা ও একজন পুরোহিতের ভদ্রা-নামক স্ত্রী ইহার প্রতিবাদ করিল। এদিকে বহু যক্ষ সেখানে আসিয়া, ঐ যুবকদিগকে, রক্তাক্ত হওয়া পর্যন্ত, খুব মারধর করিল। ইহাতে ব্রাহ্মণরা ঘাবড়াইয়া গেল, ও সর্বশেষে তাহারা হরিকেশিবলের নিকট ক্ষমা চাহিয়া তাহাকে বহু উপকরণসহ খুব ভালো চাউলের ভাত খাইতে দিল।

ঐ অন্ন গ্রহণ করিয়া, হরিকেশিবল তাহাদিগকে বলিলেন, "হে ব্রাহ্মণগণ, তোমরা আগুন জ্বালাইয়া, জলের সাহায্যে, বাহ্যশুদ্ধিলাভ করিবার পিছনে কেন ছুটিয়াছ? তোমাদের এই বাহ্যশুদ্ধি যথাযোগ্য নয়, তত্ত্বজ্ঞরা এইরূপ বলিয়া থাকেন।"

ইহার উপরে ঐ ব্রাহ্মণরা কহিল, "হে ভিক্ষু, তাহা হইলে আমরা কোন্ রকম যজ্ঞ করিব এবং কিভাবে আমাদের কর্ম-ক্ষয় হইবে?"

হরি.—ছয় জীবকায়ের[১] হিংসা না করিয়া, অসত্য ভাষণ ও চুরি না করিয়া, পরিগ্রহ, স্ত্রী, মান ও মায়া পরিত্যাগ করিয়া, সাধুরা দান্তভাবে (নিয়মানুগ হইয়া) চলাফেরা করে। পাঁচ সংবর[২] দ্বারা সংবৃত হইয়া, জীবনের লিপ্সা না রাখিয়া, শরীরের আশা পরিত্যাগ করিয়া, তাহারা দেহ সম্বন্ধে অনাসক্ত হয়, ও (এইভাবে) তাহারা শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ করিয়া থাকে।

ব্রা.—তোমার অগ্নি কি? অগ্নিকুণ্ড কোন্‌টি? স্রুক্ (যজ্ঞপাত্রবিশেষ) কোন্‌টি? সমিধ্ কোন্‌টি? শান্তি কোন্‌টি? আর কোন্ হোমবিধির সাহায্যে তুমি যজ্ঞ কর?

হরি.—তপস্যা আমার অগ্নি; জীব অগ্নিকুণ্ড; যোগ স্রুক্; শরীর ঘুঁটে, কর্ম সমিধ্, সংযম শান্তি; এই বিধি-অনুসারে আমি ঋষিদের দ্বারা বর্ণিত যজ্ঞ করিয়া থাকি।

ব্রা.—তোমার দীঘি কোন্‌টি, শান্তিতীর্থ কোন্‌টি?

হরি.—ধর্মই আমার দীঘি, এবং ব্রহ্মচর্য আমার শান্তিতীর্থ.......এখানে স্নান করিয়া, বিমল ও বিশুদ্ধ মহর্ষি উত্তমপদ লাভ করেন।

---

১. পৃথ্বীকায়, অপ্‌কায়, বায়ুকায়, অগ্নিকায়, বনস্পতিকায়, ও ত্রসকায়, এই ছয়টি জীব-ভেদ। পৃথিবীর পরমাণু প্রভৃতিতে জীব থাকে, জৈনরা এইরকম মানে। 'বনস্পতিকায়' মানে বৃক্ষাদি বনস্পতিবর্গ। ত্রসকায়ে সর্বজঙ্গম অথবা চর প্রাণীদের সমাবেশ হয়।

২. পাঁচ সংবর মানে অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য ও অপরিগ্রহ। ইহাদিগকেই যোগসূত্রে যম বলা হইয়াছে। 'সাধনপাদ', সূত্র ৩০ দ্রষ্টব্য।

ইহা ছাড়া এই উত্তরাধ্যয়নসূত্রেরই ২৫তম অধ্যায়ে এমন আর একটি গাথা দেখিতে পাওয়া যায়, যাহাতে যাগযজ্ঞের নিষেধ করা হইয়াছে। গাথাটি এই—

পসুবন্ধা সব্বে বেয়া জট্‌ঠং চ পাবকম্মুণা।

ন তং তায়ন্তি দুস্‌সীলং কম্মাণি বলবন্তিহ॥

'সমস্ত বেদে পশুহত্যা বিহিত হইয়াছে বলিয়া, যাগযজ্ঞ পাপকর্মের সহিত মিশ্রিত। যজ্ঞকারীর ঐ পাপকর্ম তাহাকে রক্ষা করিতে পারে না।'

হরিকেশিবলের কাহিনীটিতে শুধু যজ্ঞের নিষেধ করা হইয়াছে। কিন্তু উপরের গাথাটিতে শুধু যজ্ঞেরই নয়, বেদেরও নিষেধ স্পষ্ট লক্ষিত হয়।

শ্রমণপন্থগুলির দ্বারা বেদের বিরোধিতা

সর্বদর্শনসংগ্রহে চার্বাকমতের যে বিবরণ আছে, তাহা হইতে অনুমান করা যায় যে, অজিতকেসকম্বল নাস্তিকতার প্রবর্তক ছিলেন বলিয়া, শুধু যাগযজ্ঞেরই নয়, কিন্তু বেদেরও সমালোচনা করিয়া থাকিবেন। চার্বাক মতের সমর্থনে সর্বদর্শনসংগ্রহে যে বারোটি শ্লোক আছে, উহাদের মধ্য হইতে নীচে দেড়খানা শ্লোক তুলিয়া দেওয়া হইতেছে—

পশুশ্চেন্নিহতঃ স্বর্গং জ্যোতিষ্টোমে গমিষ্যতি।

স্বপিতা যজমানেন তত্র কস্মান্ন হিংস্যতে॥.......

ত্রয়ো বেদস্য কর্তারো ভণ্ড-ধূর্তনিশাচরাঃ

'অগ্নিষ্টোম-যজ্ঞে যে পশু মারা হয়, যদি সেই পশু স্বর্গে যায়, তাহা হইলে ঐ যজ্ঞে যজমান নিজের পিতাকে বধ করে না কেন? ....বেদের গ্রন্থকাররা ভণ্ড, ধূর্ত, রাক্ষস, এই তিনই।'

ইহা হইতে বুঝা যায় যে, অধিকাংশ শ্রমণসম্প্রদায়, কম-বেশি মাত্রায়, বেদের স্পষ্ট নিষেধ করিয়া থাকে, আর তাহাদিগকে বেদনিন্দক বলিলে আপত্তির কোনো কারণ নাই; কিন্তু ভগবান বুদ্ধ বেদের নিন্দা করিয়াছেন বলিয়া কোথাও কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। বরং অপর-পক্ষে, বৌদ্ধসাহিত্যে যেখানে সেখানে বেদাধ্যয়নের প্রশংসা দেখিতে পাওয়া যায়। বুদ্ধের ভিক্ষুসংঘে মহাকাত্যায়নের মতো বেদ-পারদর্শী ব্রাহ্মণ ছিলেন। সুতরাং ভগবান বুদ্ধ যে বেদ নিন্দা করিতেন, ইহা সম্ভবপর নয়। কিন্তু যাগযজ্ঞে যে গাভী, ষাঁড় ও অন্যান্য প্রাণী বলি দেওয়া হইত, তাহা অন্যান্য শ্রমণদের মতোই বুদ্ধও সমর্থন করিতেন না।

যজ্ঞের নিষেধ

কোসলসংযুক্তে যাগযজ্ঞের নিষেধকারী একটি সুত্ত আছে। সুত্তটি এই—"ভগবান বুদ্ধ শ্রাবস্তীতে থাকিতেন। ঐ সময়, কোসলরাজ পসেনদি এক মহাযজ্ঞ শুরু করেন। তাহাতে পাঁচশত ষাঁড়, পাঁচশত এঁড়ে বাছুর, পাঁচশত মাদী বাছুর, পাঁচশত পাঁঠা ও পাঁচশত ভেড়া

বলির জন্য যূপকাষ্ঠে বাঁধা ছিল। রাজার ভৃত্য, দূত ও মজুররা লাঠির ভয়ে ভীত হইয়া চোখের জল ফেলিতেছিল ও কাঁদিতে কাঁদিতে যজ্ঞের কাজকর্ম করিতেছিল।

"এই সব দেখিয়া ভিক্ষুরা ভগবানকে তাহা কহিল। তখন ভগবান বলিলেন,—

অস্‌সমেধং পুরিসমেধং সম্মাপাশাং বাজপেয়ং।
নিরগ্‌গলং মহারম্ভা ন তে হোন্তি মহপ্‌ফলা॥
অজেলকা চ গাবো চ বিবিধা যত্থ হঞ্‌ঞরে।
ন তং সম্মগ্‌গতা যঞ্‌ঞং উপযন্তি মহেসিনো॥
যে চ যঞ্‌ঞা নিরারম্ভা যজন্তি অনুকূলং সদা।
অজেলকা চ গাবো চ বিবিধা নেত্থ হঞ্‌ঞরে॥
এতং সম্মগ্‌গতা যঞ্‌ঞং উপযন্তি মহেসিনো।
এতং যজেথ মেধাবী এসো যঞ্‌ঞো রমহপ্‌ফলো॥
এতং হি যজমানস্য সেয়্যো হোতি ন পাপিয়ো।
যঞ্‌ঞো চ বিপুলো হোতি পসীদন্তি চ দেবতা॥

"অশ্বমেধ, পুরুষমেধ, সম্যকপাশ, বাজপেয় ও নিরর্গল, এই-সব যজ্ঞ অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য; কিন্তু ইহারা মহাফলদায়ক হয় না। যে-যজ্ঞে পাঁঠা, ভেড়া ও গোরু, এইরূপ বিবিধ প্রাণী মারা হয়, তাহাতে কোনো সদাচারী মহর্ষি (কখনো) যান না। কিন্তু যে-যজ্ঞে প্রাণী-হিংসা হয় না, যাহা লোকেরা ভালো মনে করে, ও যাহাতে পাঁঠা, ভেড়া, গোরু প্রভৃতি বিবিধ প্রাণী মারা হয় না, এইরূপ যজ্ঞে সদাচারী মহর্ষি উপস্থিত থাকেন। সুতরাং বিবেচক মানুষ এইরূপ যজ্ঞই করিবে। এইরূপ যজ্ঞ মহাফলদায়ক। কারণ, এই যজ্ঞে যজমানের কল্যাণ হয়, অকল্যাণ হয় না। আর এই যজ্ঞে শ্রীবৃদ্ধি হয়, এবং ইহাতে দেবতা প্রসন্ন হন।"

যজ্ঞে কেন পাপ হয়?

বুদ্ধের বক্তব্য এই ছিল যে, যজ্ঞে প্রাণিবধ করাতে যজমান কায়মনোবাক্যে অকুশল কর্মের আচরণ করে, সুতরাং যজ্ঞ অমঙ্গলের জনক। এই সম্বন্ধে অঙ্গুত্তরনিকায়ের সত্তকনিপাতে একটি সুত্ত আছে। নীচে তাহার সংক্ষিপ্ত রূপান্তর দিতেছি।

এক সময় ভগবান শ্রাবস্তীতে জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের বাগানে থাকিতেন। তখন উদ্‌গতশরীর নামক (উগ্‌গতসরীর) এক ব্রাহ্মণ এক মহাযজ্ঞের আয়োজন করিতেছিলেন। পাঁচশত ষাঁড়, পাঁচশত এঁড়ে বাছুর, পাঁচশত মাদী বাছুর, পাঁচশত পাঁঠা ও পাঁচশত ভেড়া যজ্ঞে বলি দেওয়ার যূপকাষ্ঠে বাঁধা ছিল। উদ্‌গতশরীর ভগবান বুদ্ধের নিকট আসিয়া কুশল-প্রশ্নাদির পর একপাশে বসিয়া কহিলেন, "হে গোতম, যজ্ঞের জন্য অগ্নি প্রজ্বলিত করা ও যূপকাষ্ঠ স্থাপন করা মহাফলদায়ক বলিয়া আমি শুনিয়াছি।"

ভগবান কহিলেন, "হে ব্রাহ্মণ, যজ্ঞের জন্য অগ্নি প্রজ্বলিত করা ও যূপকাষ্ঠ স্থাপন করা মহাফলদায়ক বলিয়া আমিও শুনিয়াছি।"

উপরিলিখিত বাক্যটি ঐ ব্রাহ্মণ আরো দুইবার উচ্চারণ করিল, এবং ভগবান বুদ্ধ তাহার একই উত্তর দিলেন। তখন ব্রাহ্মণ কহিল, "তাহা হইলে দেখা যায় যে, আপনার ও আমার মত সম্পূর্ণভাবে মিলিয়া যাইতেছে।"

ইহার উপর আনন্দ কহিল, "হে ব্রাহ্মণ, তোমার এই প্রশ্নটি ঠিক হয় নাই। 'আমি এইরূপ শনিয়াছি', এরকম না কহিয়া, তুমি এইরূপ বল যে, 'আমি যজ্ঞের জন্য অগ্নি প্রজ্বলিত করার ও যূপকাষ্ঠ স্থাপন করার চেষ্টায় আছি; এই সম্বন্ধে, ভগবান আমাকে এইরকম উপদেশ দিন, যাহাতে আমার চিরকালের জন্য কল্যাণ হইবে'।"

আনন্দের পরামর্শ অনুসারে, ব্রাহ্মণ ভগবানকে আবার প্রশ্ন করিলেন। তখন ভগবান কহিলেন, "যে ব্যক্তি যজ্ঞের জন্য আগুন জ্বালে ও যূপকাঠ মাটিতে পোঁতে, সে দুঃখজনক তিনটি অকুশল অস্ত্র উদ্যত করে। ঐগুলি কি? ঐগুলি হইতেছে 'দেহের অস্ত্র', 'বচনের অস্ত্র' ও 'চিত্তের অস্ত্র'। যে যজ্ঞের আয়োজন করে, তাহার মনে এতগুলি ষাঁড়, এতগুলি এঁড়ে বাছুর, এতগুলি মাদী বাছুর, এতগুলি পাঁঠা, এতগুলি ভেড়া মারা হইবে, এইরূপ অকুশল চিন্তা উঠে। এইভাবে, ঐ ব্যক্তি প্রথম দুঃখজনক অকুশল 'চিত্তের অস্ত্র' উত্তোলন করে। তাহার পর, সে প্রাণিহত্যা করিবার জন্য নিজমুখে (অনুচরদিগকে) আদেশ দেয়; ইহাতে সে দ্বিতীয় দুঃখজনক অকুশল 'বাগস্ত্র' উত্তোলন করে। তাহার পর, ঐ প্রাণীগুলিকে মারিবার জন্য, সে নিজেই প্রথম উহাদিগকে মারিবার আয়োজন করে, আর ইহাতে তৃতীয় দুঃখোৎপাদক অকুশল 'শারীরিক অস্ত্রটি' উত্তোলন করে।

"হে ব্রাহ্মণ, এই তিনটি অগ্নি বর্জন করার যোগ্য, তাহাদের সেবা করা উচিত নয়। অগ্নি তিনটি কি? কামাগ্নি, দ্বেষাগ্নি ও মোহাগ্নি। যে মানুষ কামে অভিভূত হয়, সে কায়মনোবাক্যে কুকর্মের আচরণ করে এবং তজ্জন্য মৃত্যুর পর দুর্গতি প্রাপ্ত হয়। তাহারই মত, যে মানুষ দ্বেষ ও মোহে অভিভূত হয় সেও কায়মনোবাক্যে কুকর্ম আচরণ করায়, খারাপ গতি প্রাপ্ত হয়। সুতরাং এই তিনটি অগ্নি ত্যাগ করা উচিত; ইহাদের সেবা করা কর্তব্য নয়।

"হে ব্রাহ্মণ, তিনটি অগ্নির সেবা করা উচিত, ইহাদিগকে সম্মান করা, পূজা করা ও ভালোভাবে মনের আনন্দে সেবা করা কর্তব্য। ঐ অগ্নিগুলি কি? আহবনীয় অগ্নি (আহুনেয্যগ্‌গি), গার্হপত্য অগ্নি (গহপতগ্‌গি) ও দক্ষিণ অগ্নি (দক্‌খিণেয্যগ্‌গি)।[১] পিতামাতাকে আহবনীয় অগ্নি বলিয়া বুঝিবে, আর উহাদিগকে খুব আদর ও সম্মানের সহিত পূজা করিবে। স্ত্রী-পুত্র, ভৃত্যকর্মচারী, ইহাদিগকে গার্হপত্য অগ্নি বলিয়া মনে করিবে ও তাহাদিগকে আদরের সহিত পূজা করিবে। শ্রমণ-ব্রাহ্মণকে দক্ষিণ-অগ্নি বলিয়া বুঝিবে ও তাহাকেও সম্মানের সহিত পূজা করিবে। হে ব্রাহ্মণ, এই কাঠের আগুন কখনো জ্বালিতে হয়, কখনো উপেক্ষা করিতে হয়, ও কখনো নিভাইতে হয়।"

---

১. ব্রাহ্মণদের গ্রন্থে এই তিনটি অগ্নি প্রসিদ্ধ। "দক্ষিণাগ্নি গার্হপত্যাববহনীয়ৌ ত্রগ্নোহগ্নয়ঃ।" (অমরকোষ)। এই অগ্নিগুলির পরিচর্যা কিভাবে করিতে হইবে, এবং তাহার ফল কি, ইত্যাদি খবর গৃহ-সূত্রাদি গ্রন্থে পাওয়া যায়।

ভগবানের এই কথা শুনিয়া উদ্‌গতশরীর তাঁহার ভক্ত হইলেন এবং কহিলেন, "হে গোতম, পাঁচশত ষাঁড়, পাঁচশত এঁড়ে বাছুর, পাঁচশত মাদী বাছুর, পাঁচশত পাঁঠা ও পাঁচশত ভেড়া, এই পশুগুলিকে আমি যূপকাষ্ঠ হইতে মুক্ত করিয়া দিতেছি। আমি উহাদিগকে বাঁচাইতেছি। তাহারা তাজা ঘাস খাইয়া ও শীতল জল পান করিয়া, শীতল ছায়ায় আনন্দে থাকুক।"

যজ্ঞে তপস্যাপদ্ধতির মিশ্রণ

বুদ্ধের সময়, ব্রাহ্মণরা যাগযজ্ঞের মধ্যে তপস্যার কিছু কিছু প্রক্রিয়াও ঢুকাইয়াছিলেন। বৈদিক মুনিরা বনে বাস করিয়া তপস্যা করিতে আরম্ভ করিলেন বটে, তথাপি তাহারা সেখানেও অবসর-মতো মাঝে মাঝে, ছোটো কিংবা বড়ো রকমের যজ্ঞও করিতেন। ইহার দুই-একটি উদাহরণ তৃতীয় পরিচ্ছেদে দেওয়া হইয়াছে।[১] তাহা ছাড়া, এখানে যাজ্ঞবল্ক্য একজন বড়ো তপস্বী ও ব্রহ্মজ্ঞ বলিয়া পরিগণিত হইতেন। তাহা সত্ত্বেও, তিনি রাজা জনকের যজ্ঞে যোগদান করিয়াছিলেন এবং যজ্ঞশেষে এক হাজার গোরু ও দশ হাজার স্বর্ণমুদ্রা দক্ষিণারূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন।[২]

কিন্তু ভগবান বুদ্ধ কহিতেন যে, যজ্ঞ ও তপস্যার মিশ্রণে দুইগুণ বেশি দুঃখ হয়। কন্দরকসুত্তে[৩] ভগবান চার রকমের মানুষ বর্ণনা করিয়াছেন—১. আত্মন্তপ কিন্তু পরন্তপ নয়; ২. পরন্তপ কিন্তু আত্মন্তপ নয়; ৩. আত্মন্তপ ও পরন্তপ; ৪. আত্মন্তপও নয়, আর পরন্তপও নয়।

ইহাদের মধ্যে, প্রথম প্রকারের মানুষ হইতেছে কঠোর তপস্যাকারী তপস্বী। তিনি নিজেকে কষ্ট দেন, কিন্তু অন্যকে কষ্ট দেন না। দ্বিতীয় রকমের মানুষ হইতেছে ব্যাধ প্রভৃতি। সে অন্য প্রাণীদিগকে কষ্ট দেয়, কিন্তু নিজেকে কষ্ট দেয় না। তৃতীয় প্রকারের মানুষ হইতেছে, যাহারা যাগযজ্ঞ করে। তাহারা নিজদিগকে কষ্ট দেয়, আবার অন্যান্য প্রাণীদিগকেও কষ্ট দেয়। চতুর্থ প্রকারের মানুষ হইতেছে তথাগতের (বুদ্ধের) শ্রাবক। ইহারা নিজেকে কিংবা অপরকে দুঃখ দেয় না।

এই চার রকমের মানুষের প্রত্যেকটিরই বিস্তৃত বর্ণনা ঐ সুত্তে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে তৃতীয় প্রকার মানুষের যে বর্ণনা আছে, তাহার সারমর্ম এই ঃ

ভগবান বলিতেছেন, "হে ভিক্ষুগন, আত্মন্তপ ও পরন্তপ মানুষ কে?" কোনো ক্ষত্রিয় রাজা কিংবা কোনো ধনী ব্রাহ্মণ একটি নূতন সংস্থাগার (নগর মন্দির) নির্মাণ করেন, ও মস্তক মুণ্ডন করিয়া গাধার চামড়া পরিধান করিয়া ঘি ও তেল শরীরে মাখেন ও হরিণের শিঙ দিয়া পিঠ চুলকাইতে চুলকাইতে নিজের স্ত্রী ও পুরোহিত ব্রাহ্মণের সহিত ঐ সংস্থাগারে

---

১. প্রথমভাগ, পৃ. ৭২-৭৩ দ্রষ্টব্য।

২. বৃহদারণ্যক উপনিষদ্‌, ৩।১।১-২ দ্রষ্টব্য।

৩. মজ্ঝিমনিকায়, নং ৫১

প্রবেশ করেন। যেখানে গোবর দিয়া লেপা মেঝের উপর আর কিছু না পাতিয়া, তিনি শয়ন করেন। একটি ভালো গোরুর একটি বাঁট হইতে যতটুকু দুধ পাওয়া যায়, তিনি শুধু তাহাই খাইয়া থাকেন, দ্বিতীয় বাঁটে যে দুধ পাওয়া যায়, তাহা খাইয়া তাঁহার স্ত্রী থাকেন, আর তৃতীয় বাঁটে যে দুধ পাওয়া যায়, তাহা পুরোহিত ব্রাহ্মণ খাইয়া থাকে। চতুর্থ বাঁটে যে দুধ পাওয়া যায়, তাহার দ্বারা হোম করা হয়। চারি বাঁটের দুধ হইতে যেটুকু অবশিষ্ট থাকে, ঐ দুধ খাইয়া বাছুরকে ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতে হয়।

"তাহার পর, তিনি বলেন, 'আমার এই যজ্ঞের জন্য এতগুলি ষাঁড় মার, এতগুলি এঁড়ে বাছুর মার, এতগুলি মাদী বাছুর মার, এতগুলি পাঁঠা মার, এতগুলি ভেড়া মার, যূপের জন্য এতগুলি গাঠ কাট, কুশাসনের জন্য এই পরিমাণ দর্ভ কাট।' তখন তাহার ভৃত্য, দূত ও কর্মচারীরা লাঠির ভয়ে ভীত হইয়া চোখের জল ফেলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ঐ কাজ করে। ইহাকে বলে আত্মন্তপ ও পরন্তপ মানুষ।"

সর্বসাধারণ লোক গোহত্যা চাহিত না

এই ভৃত্য, দূত ও কর্মচারীরা যজ্ঞের কাজ কেন কাঁদিতে কাঁদিতে করিত? কারণ, এই-সব যজ্ঞে যে-পশু মারা হইত, তাহা গরিব চাষীদের নিকট হইতে জোর করিয়া আনা হইত এবং এইজন্যই চাষীদের খুব দুঃখ হইত। সুত্তনিপাতের ব্রাহ্মণধম্মিকসুত্তে খুব প্রাচীনকালের ব্রাহ্মণদের আচরণ বর্ণনা করা হইয়াছে। উহাতে নিম্নলিখিত গাথা কয়টি পাওয়া যায়—

যথা মাতা পিতা ভাতা অঞ্ঞে বাহপি চ ঞাতকা।
গাবো নো পরমা মিত্তা যাসু জায়ন্তি ওসধা॥
অন্নদা বলদা চেতা বণ্ণদা সুখদা তথা।
এতমত্থবসং ঞত্বা নাস্‌সু গাবো হনিংসু তে॥

'মা, বাবা, ভাই ও অন্যান্য আত্মীয়স্বজন, ইহাদের মতো, গোরুও আমাদের মিত্র। কেননা, ইহাদের উপর চাষ-বাস নির্ভর করে। গোরু আমাদিগকে অন্ন, বল, ক্লান্তি ও সুখ দেয়। এই-সব কারণে, প্রাচীনকালের ব্রাহ্মণরা গোহত্যা করিত না।'

ইহা হইতে দেখা যায় যে, সর্বসাধারণের লোকের চোখে গোরু নিজের আত্মীয়স্বজনেরই মতো মনে হইত, ও যাগযজ্ঞে অপরিমিতভাবে উহাদিগকে হত্যা করা তাহাদের নিকট মোটেই ভালো লাগিত না। যদি রাজা ও ধনী লোকেরা যজ্ঞে নিজেদের গোরু বধ করিত, তাহা হইলে, তাহাদের ভৃত্য ও কর্মচারীদের কাঁদিবার প্রসঙ্গ আরো কম হইত। কিন্তু যেহেতু এই-সব পশু তাহাদেরই মতো গরিব চাষীদের নিকট হইতে বলপূর্বক কাড়িয়া লওয়া হইত, সেইজন্য তাহাদের মনে অতিশয় দুঃখ হওয়া খুবই স্বাভাবিক ছিল। যজ্ঞের জন্য সাধারণ লোকের উপর কিরকম অত্যাচার হইত, তাহা নীচের গাথাগুলি হইতে বুঝা যাইবে।

দদন্তি একে বিসমে নিবিট্‌ঠা
ছেত্বা বধিত্বা অথ সোচয়িত্বা!
সা দক্‌খিণা অস্‌সুখুমা সদণ্ডা।
সমেন দিন্নস্‌স ন অগ্‌ঘমেতি॥

'কেহ কেহ বিষমমার্গে নিবিষ্ট হওয়ায়, মারধর করিয়া, লোকদিগকে কাঁদাইয়া, দান-ধর্ম পালন করে। লোকেদের অশ্রুমিশ্রিত ও দণ্ডযুক্ত এই দক্ষিণা সমত্বদৃষ্টিতে দেওয়া দানের সমান মূল্য লাভ করিতে পারে না।'

তৎকালে যেমন যাগযজ্ঞের জন্য, তেমনই খাওয়ার জন্যও, অনেক পশু মারা হইত; গোরু মারিয়া উহার মাংস খোলা বাজারে বিক্রয় করার খুব প্রচলন ছিল।[১]

কিন্তু বুদ্ধ যাগযজ্ঞের যতখানি নিষেধ করিয়াছেন, খাওয়ার জন্য পশুহত্যার ততটা নিষেধ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। অবশ্য, বাজারে খোলা জায়গায় মাংস বিক্রয় করিবার পদ্ধতি বুদ্ধের ভালো লাগিত, এইরূপ বুঝা ঠিক হইবে না। কিন্তু যাগযজ্ঞে পশুহত্যার তুলনায়, ইহার তেমন গুরুত্ব ছিল না। কসাইয়ের হাতে যে গোরু পড়ে, তাহা দুধালো নয় এবং চাষেরও উপযুক্ত নয়। তাহার জন্য, কেহই চোখের জল ফেলে না। কিন্তু যজ্ঞের কথা একেবারে পৃথক। পাঁচশত কিংবা সাতশত মাদী বাছুর কিংবা এঁড়ে বাছুর একই যজ্ঞে মারিতে হইবে—ইহাতে চাষবাসের কত লোকসান হইত, আর সেইজন্য চাষীরা মনে কত কষ্ট পাইত, ইহার শুধু কল্পনাই করিতে হইবে! বুদ্ধ এই অত্যাচারের নিষেধ করিয়াছিলেন; আর এইজন্য তাঁহাকে বেদনিন্দক বলা উচিত হইবে কি?

সুযজ্ঞ কি?

রাজা ও ধনী ব্রাহ্মণরা কী প্রণালীতে যজ্ঞ করিবে, তাহা ভগবান বুদ্ধ দীঘনিকায়ের কূটদন্তসুত্তে সূচনা করিয়াছেন। ঐ সুত্তের সারমর্ম এই—

একসময় ভগবান বুদ্ধ মগধদেশে ভ্রমণ করিতে করিতে খণুমত নামক একটি ব্রাহ্মণপ্রধান গ্রামে আসিলেন। মগধদেশের রাজা বিম্বিসার এই গ্রামটি কূটদন্ত নামক ব্রাহ্মণকে দান করিয়াছিলেন। ঐ ব্রাহ্মণ একটি মহাযজ্ঞ করিবার উদ্দেশ্যে, সাতশত ষাঁড়, সাতশত এঁড়ে বাছুর, সাতশত মাদী বাছুর, সাতশত পাঁঠা ও সাতশত ভেড়া আনিয়াছিলেন।

ভগবান তাহাদের গ্রামের নিকট আসিয়াছেন, এই খবর পাইয়া খণুমতগ্রামের ব্রাহ্মণরা একত্র হইয়া, ভগবানের দর্শনের জন্য, কূটদন্তের বাড়ির পাশ দিয়া যাইতেছিল। তাহারা কোথায় যাইতেছে, কূটদন্ত তাহার অনুসন্ধান করিলেন ও তিনি তাহার ভৃত্যকে কহিলেন, "এই ব্রাহ্মণদিগকে বলো যে, আমিও ভগবানের দর্শনে যাইতে চাই, তাহারা যেন একটু অপেক্ষা করে।"

---

১. সেয়্যথাপি ভিক্‌খবে দক্‌খো গোঘাতকো বা গোঘাতকন্তেবাসী বা গাবিং বধিত্ব। চাতুম্মহাপথে বিলসো বিভজিত্বা নিসিন্নো অস্‌স। (সতিপট্‌ঠানসুত্ত)

কূটদন্তের যজ্ঞ করিবার জন্য, বহু ব্রাহ্মণ তাহার বাড়িতে সম্মিলিত হইয়াছিল। কূটদন্ত ভগবানের দর্শনের জন্য যাইবেন, এই খবর পাওয়া মাত্র, তাহারা তাহার নিকট আসিয়া কহিল, ''হে কূটদন্ত'' গোতমের দর্শনের জন্য তুমি যাইতেছ, এই কথা কি ঠিক?

কূটদন্ত—হাঁ, গোতমের দর্শনের জন্য আমরা যাওয়া উচিত বলিয়া মনে হইতেছে।

ব্রাহ্মণগণ—হে কূটদন্ত, গোতমের দর্শনের জন্য যাওয়া তোমার পক্ষে যোগ্য নয়। যদি তুমি তাহার দর্শনের জন্য যাও, তাহা হইলে তাহার যশের বৃদ্ধি ও তোমার যশের হানি হইবে। সুতরাং গোতমই তোমার দর্শনের জন্য আসুক, ও তুমি তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য যাইবে না, ইহাই ভালো। তুমি উত্তম বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, তুমি ধনী, বিদ্বান্ ও সুশীল; তুমি বহুলোকের আচার্য, তোমার নিকট বেদমন্ত্র শিখিবার জন্য, চারি দিক হইতে অনেক শিষ্য আসে। গোতম হইতে তুমি বয়সেও বড়ো; আর মগধের রাজা তোমাকে কত সম্মানের সহিত এই গ্রামটি দান করিয়াছেন। সুতরাং গোতমই তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য আসুক ও তুমি তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য যাইবে না ইহাই যথাযোগ্য হইবে।

কূটদন্ত—এখন তোমরা আমার কথা শুন। শ্রমণ গোতম উচ্চকূলে জন্মগ্রহণ করিয়া, খুব বড়ো সম্পত্তি ত্যাগ করিয়া, শ্রমণ হইয়াছেন। অল্পবয়সে তিনি সন্ন্যাস লইয়াছেন। তিনি তেজস্বী ও সুশীল। তিনি মধুর ও কল্যাণপ্রদ কথা বলেন; এবং তিনি বহুলোকের আচার্য ও প্রাচার্য। তিনি বিষয়বাসনা হইতে মুক্ত হইয়া শান্ত হইয়াছেন। তিনি কর্মবাদী এবং ক্রিয়াবাদী। সর্বদেশের লোক তাঁহার ধর্ম শ্রবণ করিবার জন্য তাঁহার নিকট আসে। তিনি সম্যক্ সম্বুদ্ধ, বিদ্যা ও আচার-সম্পন্ন, লোকবিদ্, ও দম্যপুরুষদের সারথী। তিনি দেবতা ও মনুষ্যের শিক্ষক বলিয়া, তাঁহার কীর্তি সর্বত্র ছড়াইয়াছে। রাজা বিম্বিসার এবং কোশলদেশের রাজা পসেনদি সপরিবারে তাঁহার শ্রাবক (শিষ্য) হইয়াছেন। তিনি যেমন এই রাজাদের পূজ্য, তেমনই পৌষ্করসাদির মতো ব্রাহ্মণদেরও পূজ্য। এতখানি যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি অধুনা আমাদের গ্রামে আসিয়াছেন। তিনি আমাদের সকলের অতিথি, এইরূপ মানা আমাদের কর্তব্য। আর অতিথি হিসাবে, তাঁহার দর্শনে যাওয়া এবং তাঁহার সম্মান ও অভ্যর্থনা করা, আমাদের কর্তব্য।

ব্রাহ্মণগণ—হে কূটদন্ত, তুমি যে গোতমের এইরূপ প্রশংসা করিতেছ, তাহাতে আমাদের মনে হইতেছে যে, প্রত্যেক ভালো মানুষের পক্ষে একশত যোজন দূর হইতেও তাঁহাকে দেখিতে আসা উচিত হইবে। চলো, আমরা সকলেই তাঁহার দর্শনের জন্য যাই।

তখন কূটদন্ত এই ব্রাহ্মণসমুদায়ের সহিত আম্রযষ্টিবনে, যেখানে ভগবান বুদ্ধ থাকিতেন সেখানে, আসিলেন, ও ভগবানকে কুশলপ্রশ্নাদি করিয়া, তাঁহার এক পাশে বসিলেন। ঐ ব্রাহ্মণদের মধ্যে কেহ কেহ ভগবানকে প্রণাম করিয়া, কেহ কেহ তাঁহাকে নিজের নাম ও গোত্র বলিয়া এবং কেহ কেহ তাঁহাকে কুশলপ্রশ্নাদি জিজ্ঞাসা করিয়া, এক পাশে বসিল।

আর কূটদন্ত ভগবানকে কহিলেন, "আমি শুনিয়াছি যে, আপনি খুব ভালো যজ্ঞবিধি জানেন। উহা যদি আপনি আমাদিগকে বুঝাইয়া বলেন, তাহা হইলে ভালো হয়।"

ভগবান তখন নিম্নলিখিত গল্পটি বলিলেন—

প্রাচীনকালে মহাবিজিত নামক একজন বিখ্যাত রাজা ছিলেন। একদিন তিনি নির্জনে বসিয়া আছেন, এমন সময় তাঁহার মনে এই চিন্তা উদিত হইল যে, আমার নিকট অনেক সম্পত্তি আছে, এই সম্পত্তি কোনো মহাযজ্ঞে ব্যয় করিলে, তাহা চিরকালের তরে আমার হিতাবহ ও সুখাবহ হইবে। তিনি মনের এই কথা তাঁহার পুরোহিতের নিকট প্রকাশ করিয়া, তাহাকে কহিলেন, "হে ব্রাহ্মণ, আমি মহাযজ্ঞ করিতে চাই। তাহা কী প্রণালীতে করিলে, আমার হিতাবহ ও সুখাবহ হইবে, তাহা আমাকে বলো।

পুরোহিত কহিল, "আজকাল আমাদের রাজ্যে বেশি শান্তি নাই; গ্রাম ও শহরে লুণ্ঠন চলিতেছে। এইরূপ অবস্থায়, আপনি যদি এখন লোকেদের নিকট কর আদায় করেন, তাহা হইলে আপনি কর্তব্য হইতে বিমুখ হইবেন। আপনি হয়তো মনে করিতে পারেন যে, শিরশ্ছেদ করিয়া, জেলে পুরিয়া, জরিমানা করিয়া, কিম্বা আপনার রাজ্য হইতে বাহির করিয়া দিয়া, চুরিচামারি বন্ধ করিতে পারিবেন। কিন্তু এই-সব উপায়ে উচ্ছৃঙ্খলতা পুরাপুরি বন্ধ করা যাইবে না। কেননা, যে-সব উচ্ছৃঙ্খল লোক বাকী থাকিবে, তাহারা পুনরায় গোলমাল সৃষ্টি করিবে। উচ্ছৃঙ্খলতা পুরাপুরি নাশ করিবার উপায় এই—যাহারা আপনার রাজ্যে চাষবাস করিতে চায়, তাহারা যাহাতে পর্যাপ্ত পরিমাণে বীজধান্য পায়, তাহার ব্যবস্থা করুন। যাহারা ব্যবসায় করিতে চায়, তাহাদের মূলধন কম পড়িতে দিবেন না। যাহারা সরকারী চাকরি করিতে চায়, তাহাদিগকে যোগ্য বেতন দিয়া যথাযোগ্য কার্যে নিযুক্ত করুন। এইভাবে, প্রত্যেক মানুষ নিজ নিজ কাজে নিযুক্ত থাকায়, রাজ্যে উচ্ছৃঙ্খলতা উৎপন্ন হওয়ার সম্ভাবনা থাকিবে না; এবং মাঝে মাঝে কর আদায়ের দ্বারা রাজভাণ্ডারের শ্রীবৃদ্ধি হইবে। উচ্ছৃঙ্খল লোকদের উপদ্রব নষ্ট হওয়ায়, প্রজারা নির্ভয়ে ঘরের দরজা খোলা রাখিয়া ছেলেপিলেসহ খুব সুখে দিন কাটাইবে।"

পুরোহিত উচ্ছৃঙ্খলতা নাশ করার যে উপায় রাজাকে কহিল, তাহা তাহার পছন্দ হইল। নিজের রাজ্যে যাহারা চাষবাস করিতে সমর্থ, তিনি তাহাদিগকে বীজধান্য সরবরাহ করিয়া চাষবাসের কাজে লাগাইলেন; যাহারা ব্যবসায় করিতে সমর্থ ছিল, তাহাদিগকে মূলধন দিয়া ব্যবসায়ের উন্নতি করিলেন, ও যাহারা সরকারী চাকরির যোগ্য ছিল, তাহাদিগের জন্য সরকারী চাকরিতে যথাযোগ্য স্থানের ব্যবস্থা করিলেন। এই উপায় অবলম্বন করায়, মহাবিজিতের রাজ্য অল্প সময়ের মধ্যেই সমৃদ্ধ হইল। চুরি, ডাকাতি একেবারে নামেমাত্রে পর্যবসিত হওয়ায়, কর আদায় হইয়া, রাজকোষের শ্রীবৃদ্ধি হইল, এবং প্রজারা নির্ভয়ে দরজা খোলা রাখিয়া নিজেদের ছেলেমেয়েদিগকে খেলাইয়া, আদর করিয়া, কাল অতিবাহন করিতে লাগিল।

একদিন রাজা মহাবিজিত পুরোহিতকে কহিলেন, "হে ব্রাহ্মণ, তোমার উপায় অবলম্বন

করাতে রাজ্যের সমস্ত বিশৃঙ্খলা নষ্ট হইয়াছে। আমার রাজকোষের আর্থিক অবস্থা এখন খুব ভালো, আর রাজ্যের সব লোক নির্ভয়ে ও আনন্দে বাস করিতেছে। এখন আমার মহাযজ্ঞ করিতে ইচ্ছা হইতেছে। উহা কিভাবে করিতে হইবে, তাহা আমাকে বলো।"

পুরোহিত কহিল, "আপনি যদি মহাযজ্ঞ করিতে চান, তাহা হইলে এই ব্যাপারে প্রজাদের অনুমতি লওয়া আপনার কর্তব্য। ইহার জন্য প্রথম রাজ্যের সমস্ত লোকের নিকট আপনার এই ইচ্ছা প্রকাশ্যভাবে বলুন, এবং এই কাজের জন্য তাহাদের সম্মতি লউন।

রাজার ইচ্ছা অনুযায়ী দেশের সব লোক যজ্ঞ করিতে সম্মতি দিল। আর তদনুসারে, পুরোহিত যজ্ঞের আয়োজন করিল ও রাজাকে কহিল, "এই যজ্ঞে বহু অর্থব্যয় হইবে, যজ্ঞের আরম্ভে, এইরূপ চিন্তা মনে আসিতে দিবেন না। যজ্ঞ হওয়ার সময়, আমার সম্পত্তি নাশ হইতেছে, ও যজ্ঞ সম্পূর্ণ হওয়ার পর, আমার সম্পত্তি নাশ হইল, এইরূপ চিন্তাও আপনি মনে আনিবেন না। আপনার যজ্ঞে ভালোমন্দ দুইরকম লোকই আসিবে। কিন্তু ইহাদের মধ্যে ভালো লোকের দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই আপনি যজ্ঞ করিবেন ও নিজের চিত্ত সর্বদাই আনন্দিত রাখিবেন।"

মহাবিজিতের এই যজ্ঞে গোরু, ষাঁড়, পাঁঠা ও ভেড়া মারা হইল না; গাছ কাটিয়া যূপ বানানো হইল না; দর্ভ দিয়া আসন বানানো হইল না; ভৃত্য, দূত ও মজুরদিগকে জোর করিয়া কাজকর্মে লাগানো হইল না। যাহাদের ইচ্ছা হইল, তাহারাই কাজ করিল, ও যাহাদের ইচ্ছা হয় নাই, তাহারা কাজ করে নাই। ঘি, তেল, মাখন, মধু এইসব পদার্থ দ্বারাই ঐ যজ্ঞ সম্পাদন করা হইল।

তাহার পর, রাজ্যের ধনীলোকেরা বড়ো বড়ো উপঢৌকন লইয়া, রাজা মহাবিজিতের দর্শনের জন্য আসিল। রাজা তাহাদিগকে কহিলেন, "ভদ্রলোকগণ, তোমাদের এই উপহার আমার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। ধর্মসংগত উপায়ে কর আদায় করিয়াই আমার নিকট বহু অর্থ সঞ্চিত হইয়াছে। তোমাদের প্রয়োজন হইলে, উহা হইতে স্বচ্ছন্দে কিছু কিছু তোমরা লইয়া যাও।"

এইভাবে যখন রাজা ঐ ধনীদের উপহার প্রত্যাখ্যান করিলেন, তখন তাহার উপহারের দ্রব্যগুলি খরচ করিয়া যজ্ঞশালার চারিধারে ধর্মশালা তৈয়ার করিয়া, দরিদ্রদিগের প্রতি দয়াদাক্ষিণ্য দেখাইল।

ভগবানের নিকট এই যজ্ঞকাহিনীটি শুনিয়া, কূটদন্তের সহিত যে-সব ব্রাহ্মণ আসিয়াছিল, তাহারা উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "খুবই ভালো যজ্ঞ! খুবই ভালো যজ্ঞ!"

তাহার পর, ভগবান কূটদন্তকে নিজের ধর্মসম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে উপদেশ দিলেন। এই উপদেশ শুনিয়া, কূটদন্ত ভগবানের ভক্ত হইল এবং কহিল, "হে গোতম, সাতশত ষাঁড়, সাতশত এঁড়ে বাছুর, সাতশত মাদী বাছুর, সাতশত পাঁঠা, ও সাতশত ভেড়া, এই-সব পশু আমি যূপ হইতে মুক্ত করিয়া দিতেছি। উপাদিগকে প্রাণদান করিতেছি। তাজা ঘাস খাইয়া ও ঠাণ্ডা জল পান করিয়া তাহারা শীতল ছায়ায় আনন্দে থাকুক।"

বেকারি নষ্ট করা—ইহাই প্রকৃত যজ্ঞ

উপরের সুত্তটিতে যে 'মহাবিজিত' শব্দটি ব্যবহার করা হইয়াছে, উহার অর্থ হইতেছে 'যাহার রাজ্য বিস্তৃত সে'। এইরকম ব্যক্তিই মহাযজ্ঞ করিতে পারে। এই মহাযজ্ঞের প্রধান বিধি হইল এই যে, রাজ্যে কাহাকেও বেকার থাকিতে দেওয়া হইবে না; সকলকে সৎকার্যে লাগাইতে হইবে। এই বিধানটিই কিছু ভিন্ন রকমে চক্কবত্তিসীহনাদসুত্তে বলা হইয়াছে। তাহার সারমর্ম এই—

দৃঢ়নেমি নামক জনৈক চক্রবর্তী রাজা ছিলেন। বৃদ্ধ হওয়ার পর, তিনি নিজের পুত্রকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া, নিজে যোগাভ্যাস করিবার জন্য উপবনে গিয়া বাস করিতে থাকিলেন। তাঁহার উপবনে যাওয়ার সপ্তম দিবসে, প্রাসাদের সম্মুখে যে একটি অত্যুজ্জ্বল চক্র ছিল, তাহা অন্তর্হিত হইয়া গেল। তখন দৃঢ়নেমি পুত্র খুব ঘাবড়াইয়া, রাজর্ষি পিতার নিকট গেলেন এবং তাঁহাকে এই সংবাদ জানাইলেন। রাজর্ষি কহিলেন, "বৎস, তুমি ঘাবড়াইয়ো না। এই চক্রটি তোমার পুণ্যে উৎপন্ন হয় নাই। তুমি যদি চক্রবর্তী রাজার ব্রত পালন কর, তাহা হইলে উহা পুনরায় স্বস্থানে আসিয়া স্থির হইয়া থাকিবে। তুমি প্রজাদিগকে ন্যায় ও সমতার সহিত রক্ষণ করো, তোমার রাজ্যে অন্যায়ের দিকে লোকের প্রবৃত্তি হইতে দিয়ো না। যাহারা দরিদ্র, (তাহাদিগকে কোনো কাজে লাগাইয়া) যাহাতে তাহারা অর্থ উপার্জন করিতে পারে, ঐরূপ ব্যবস্থা করো, এবং তোমার রাজ্যে যে-সব সৎ-শ্রমণ ব্রাহ্মণ আছেন, তাঁহাদিগের নিকট হইতে সময় সময় কী কর্তব্য ও কী অকর্তব্য, সেই সম্বন্ধে জানিয়া লইয়ো। তাঁহাদের উপদেশ শুনিয়া, অকর্তব্য হইতে দূরে থাকিবে এবং নিজ কর্তব্যে রত থাকিবে।"

যুবকরাজা পিতার এই উপদেশ মাথায় পাতিয়া লইলেন। আর তিনি তদনুসারে আচরণ করাতে ঐ অত্যুজ্জ্বল চক্র আবার স্বস্থানে ফিরিয়া আসিল। তখন রাজা বাম হাতে জলের ঝারি লইলেন ও ডান হাতে সেই চক্রটি ঘুরাইয়া ছাড়িয়া দিলেন। চক্র তাহার সাম্রাজ্যের চারিদিকে ঘুরিয়া আসিল। রাজা তাহার পিছনে পিছনে গিয়া সর্বলোককে উপদেশ দিলেন ঃ "প্রাণীহত্যা করিবে না, চুরি করিবে না, ব্যভিচার করিবে না, মিথ্যা বলিবে না, সৎ উপায়ে জীবিকা অর্জন করিবে।" তাহার পর, ঐ চক্ররত্ন ফিরিয়া আসিয়া চক্রবর্তী রাজার সভাস্থলের সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিল। উহাতে রাজাবাড়ির শোভা বাড়িল।

এই চক্রবর্তি-ব্রতের পরিপালন ঐ রাজবংশের সাতপুরুষ পর্যন্ত চলিয়াছিল। সপ্তম চক্রবর্তীরাজা সন্ন্যাস লওয়ার সপ্তমদিবসে, ঐ চক্র অন্তর্ধান করিল; আর এইজন্য যুবক রাজা খুব দুঃখ করিলেন। কিন্তু তিনি রাজর্ষি পিতার নিকট গিয়া, চক্রবর্তী-ব্রতের বিধি বুঝিয়া লইলেন না। তাঁহার অমাত্যেরা এবং অন্যান্য ভালো লোকেরা তাঁহাকে ঐ চক্রবর্তী-ব্রত বুঝাইয়া দিল। তাহা শুনিয়া, রাজা লোকদিগকে ন্যায়-সংগত ভাবে পালন করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু দরিদ্র লোকেরা জীবিকা অর্জনের জন্য যাহাতে কাজ পায়, তিনি ঐরূপ ব্যবস্থা করিলেন না। ইহাতে দেশে ভয়ংকর দারিদ্র্য বাড়িল তখন, এক ব্যক্তি চুরি

করিল। তাহাকে লোকেরা রাজার নিকট আনিয়া হাজির করার পর, রাজা কহিলেন, "ওরে বেটা, তুই চুরি করিয়াছিস, এই কথা কি ঠিক?"

ঐ ব্যক্তি—হাঁ, মহারাজ ঠিক।

রাজা—কেন চুরি করিলি?

ঐ ব্যক্তি—মহারাজ, পেট ভরিতে পারি না, তাই।

তাহাকে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র দিয়া, রাজা কহিলেন, "এখন তুই এসব বস্তু দিয়া সংসার চালাইবি, পরিবারের ভরণ-পোষণ করিবি, কোনো একটা ব্যবসায় বা কাজকর্ম ও দানধর্ম করিবি।"

এই কথা জানিয়া, অপর এক বেকারও চুরি করিল। আর রাজা তাহাকেও প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র দিলেন। লোকেরা বেশ ভালোভাবে বুঝিল যে, যে চুরি করে, রাজা তাহাকে পুরস্কার দেন। তখন যে-কেহ চুরি করিতে আরম্ভ করিল। তাহাদের মধ্যে একজনকে ধরিয়া, রাজার নিকট আনা হইল। রাজা মনে মনে ভাবিলেন, 'যদি আমি চোরকে তাহার প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র দিতে থাকি, তাহা হইলে, সমস্ত রজ্যে কত যে চুরি হইবে, তাহার আর ইয়ত্তা থাকিবে না। সুতরাং এই ব্যক্তির শিরশ্ছেদ করাই ভালো'। তদনুসারে ঐ ব্যক্তিকে তিনি রজ্জু দিয়া বাঁধাইয়া, তাহার মস্তক মুণ্ডন করাইয়া, তাহাকে দিয়া রাস্তার ময়লা পরিষ্কার করাইয়া, তাহাকে নগরের দক্ষিণদিকে আনিয়া, তাহার শিরচ্ছেদের হুকুম দিলেন।

এইসব দেখিয়া চোরেরা ঘাবড়াইয়া গেল। ইহার পর, সোজাসুজিভাবে চুরি করা বিপজ্জনক, এইরূপ বুঝিতে পারিয়া, তাহারা ধারাল অস্ত্র তৈয়ার করাইল, ও খোলাখুলিভাবে ডাকাতি আরম্ভ করিল।

এইভাবে দরিদ্র লোকেরা জাবিকা অর্জনের জন্য কাজ না পাওয়ায়, দারিদ্র্য বাড়িয়া গেল। দারিদ্র্য বাড়াতে, চুরি ও লুণ্ঠন বাড়িল; চুরি ও লুণ্ঠন বাড়াতে, অস্ত্রও বাড়িল; অস্ত্র বাড়াতে প্রাণনাশ বাড়িল; প্রাণনাশ বাড়াতে, অসত্য বাড়িল; অসত্য বাড়াতে, প্রতারণা বাড়িল; প্রতারণা বাড়াতে, ব্যভিচার বাড়িল; আর ইহাতে গালাগালি দেওয়া ও বৃথা কথা বাড়িল। এইগুলির বৃদ্ধি হওয়াতে, লোভ ও দ্বেষ বাড়িল। আর ইহাতে মিথ্যা-দৃষ্টি বাড়িয়া যাওয়ায়, অন্য সব অসৎ কর্ম অতিমাত্রায় বর্ধিত হইল।

রাজা মহাবিজিতের পুরোহিত তাহাকে যজ্ঞের যে বিধি বলিয়াছিল, এই চক্কবত্তিসীহনাদসুত্তে তাহারই ব্যাখ্যা ও সমর্থন করা হইয়াছে। প্রজাদের নিকট হইতে জোর করিয়া তাহাদের গবাদি পশু আনিয়া যজ্ঞে ঐ পশুগুলিকে বধ করা, ইহা যজ্ঞ করার প্রকৃত পদ্ধতি নয়; কিন্তু রাজ্যের লোকদিগকে সমাজের উপযোগী কার্যে নিযুক্ত করিয়া, বেকারি নষ্ট করা, ইহাই প্রকৃত যজ্ঞ। বলিদানের সহিত যাগযজ্ঞ করা অনেকদিন হইল লোপ পাইয়াছে। কিন্তু আজও প্রকৃত যজ্ঞ করার চেষ্টা ক্বচিৎ দেখিতে পাওয়া যায়। বেকারি

কমাইবার জন্য, জার্মানী ও ইটালী যুদ্ধসামগ্রীর পরিমাণ বাড়াইয়াছে; ইহাতে ফ্রান্স, ইংল্যান্ড ও আমেরিকা এই দেশগুলিকেও যুদ্ধসামগ্রী বাড়াইতে হইয়াছে। আর এখন সংকট অত্যন্ত দ্রুতবেগে ঘনাইয়া আসিতেছে। এদিকে জাপান চীনকে তো আক্রমণ করিয়াছেই; আবার ঐ দিকে মুসোলিনী ও হিটলার আগামীকল্য কি করিবে, ইহার সম্বন্ধে কিছুই বিশ্বাস করা চলে না।[১] অবশ্য এই একটি কথা সত্য যে, এইসবের পর্যবসান রণযজ্ঞেই হইবে! আর এই যজ্ঞে অন্যান্য প্রাণীর তুলনায়, মনুষ্য প্রাণীর আহুতিই বেশি হইবে! এই রণযজ্ঞ থামাইতে হইলে, লোকদিগকে যুদ্ধসামগ্রী নির্মাণের কাজে না লাগাইয়া সমাজের উন্নতির কাজে লাগাইতে হইবে। সেইরূপ করিলেই, ভগবান বুদ্ধ যজ্ঞের যে-বিধান দিয়াছেন, তাহা আচরণে আনিতে পারা যাইবে। এখন এই প্রসঙ্গ থাক্।

এইসব আলোচ্য বিষয়ের কিছু বাহিরের। বুদ্ধের যজ্ঞ-বিধির ব্যাখ্যার জন্য, ইহা প্রয়োজনীয় মনে হইল। যদি ধরিয়া লই যে, উপরে দেওয়া সুত্তগুলি বুদ্ধের কিছুকাল পর রচিত হইয়াছিল, তথাপি স্বীকার করিতে হইবে যে, এইগুলির মধ্যে বুদ্ধোপদিষ্ট মূলীভূত তত্ত্বগুলিরই স্পষ্ট ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। এইরূপ সুযজ্ঞের উপদেষ্টা গুরুকে বেদনিন্দক বলিয়া অবজ্ঞা করা যোগ্য কিনা, তাহা সুজ্ঞ ব্যক্তিরাই বিচার করিয়া দেখিবেন।

---

১. এই কথাগুলি গত মহাযুদ্ধের (অর্থাৎ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের) পূর্বে লিখিত হইয়াছিল ও যেরকম লেখা হইয়াছিল, সেই রকম রাখিয়া দেওয়া হইয়াছে।

দশম পরিচ্ছেদ

জাতিভেদ

জাতিভেদের উৎপত্তি

'ব্রাহ্মণোহস্য মুখমাসীদ্ বাহু রাজন্যঃ কৃতঃ।
উরূ তদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত॥''

—ঋ. ১০।৯০।১২

এইরকম ধরিয়া লওয়া হয় যে, উপরের পুরুষসূক্তের ঋক্‌টিতে ভারতীয় জাতিভেদের মূল আছে। কিন্তু এই ধারণা ভুল। বেদকালের পূর্বেও সপ্তসিন্ধুদেশে এবং মধ্য ভারতে অহিংসা ধর্মের মতো জাতিভেদ-ধর্মও বিদ্যমান ছিল। আর্যদের আগমনে এবং বৈদিক সংস্কৃতির প্রসারে অহিংসাধর্মকে কিভাবে বনবাস স্বীকার করিতে হইয়াছিল, তাহা প্রথম পরিচ্ছেদে প্রদর্শিত হইয়াছে (প্রথমভাগ, পৃ. ১১-১৩)। কিন্তু জাতিভেদের এই দুরবস্থা ঘটে নাই। উহাতে সামান্য পরিবর্তন হওয়ার পর, উহা আগের মতোই প্রচলিত রহিয়া গেল।

ক্ষত্রিয়দের প্রাধান্য

সুমেরীয় দেশে প্রায়শ পুরোহিতই রাজা হইত। আর সপ্তসিন্ধু দেশেও এই প্রথাই প্রচলিত ছিল। সপ্তসিন্ধু দেশে যে-সব ছোটোখাটো রাজ্যের রাজা ছিল, তাহাদের মধ্যে প্রধান ছিলেন বৃত্র; ইন্দ্র বৃত্রকে বধ করেন, আর তাহাতে ইন্দ্রের গায়ে ব্রাহ্মণহত্যার পাপ লাগিল, মহাভারতে এইরূপ বর্ণিত আছে।[১] উপরের ঋক্‌টিতে আর্যরা এইদেশে আসিবার পূর্বে (সমাজের) অবস্থা কিরকম ছিল, তাহা বলা হইয়াছে। ঋষি কহিতেছেন, ''এককালে বিরাট পুরুষের মুখ ছিল ব্রাহ্মণ, বাহু ছিল রাজন্য, তাহার উরু ছিল বৈশ্য, আর তাহার পা হইতে শূদ্র উৎপন্ন হইয়াছিল।'' আর্যদের আক্রমণে ক্ষত্রিয়দের গুরুত্ব বাড়িল ও ব্রাহ্মণদের প্রাধান্য নষ্ট হইল। তথাপি পুরোহিতের কাজ ব্রাহ্মণদের হাতেই থাকিয়া গেল। এই অবস্থা বুদ্ধের সময় পর্যন্ত চলিয়াছিল। পালি সাহিত্যের যত্রতত্র ক্ষত্রিয়দিগকে প্রধান স্থান দেওয়া হইয়াছে; আর উপনিষদ্‌গুলিতেও তাহারই প্রতিধ্বনি প্রতিফলিত হইয়াছে বলিয়া লক্ষিত হয়। উদাহরণস্বরূপ নিম্নলিখিত বিবরণটি বিবেচনা করা যাউক।

ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীদেকমেব। তদেকং সন্ন ব্যভবত্তচ্ছ্রেয়োরূপমত্যসৃজত ক্ষত্রং যান্যেতানি দেবত্রা ক্ষত্রাণীন্দ্রো বরুণঃ সোমা রুদ্রঃ পর্জন্যো যমো মৃত্যুরীশান ইতি তস্মাৎ ক্ষত্রাৎ পরং নাস্তি। তস্মাদ্ ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়মধস্তাদুপাস্তে। (বৃহদারণ্যক ১।৪।১১)

'পূর্বে শুধু ব্রহ্মই ছিল। কিন্তু তাহা এক ছিল বলিয়া, তাহার বিকাশ হয় নাই। তাই

---

১. 'হিন্দী সংস্কৃত আণি অহিংসা', পৃ. ১৫ দ্রষ্টব্য।

ঐ ব্রহ্ম উৎকৃষ্টরূপে ক্ষত্রিয়জাতি উৎপন্ন করিল। ঐ ক্ষত্রিয় মানে দেবলোকের ইন্দ্র, বরুণ, সোম, রুদ্র, পর্জন্য, যম, মৃত্যু ও ঈশান। এইজন্য ক্ষত্রিয় জাতি হইতে শ্রেষ্ঠ অন্য জাতি নাই, এবং এইজন্যই ব্রাহ্মণরা নিম্ন হইতে ক্ষত্রিয়দিগকে উপাসনা করে।'

জাতিভেদের নিষেধ

এইভাবে ক্ষত্রিয় জাতি গুরুত্বলাভ করিলেও, তাহার প্রধান কর্তব্য যে যুদ্ধ, তাহাই বুদ্ধের নিকট আদৌ ভালো না লাগায়, তাঁহার নিকট সমগ্র জাতিভেদ-প্রথাই অকর্মণ্য বলিয়া মনে হইল, এবং তিনি সর্বতোভাবে জাতিভেদের নিষেধ করিলেন। অন্যান্য শ্রমণ-নেতারা বুদ্ধের মতো জাতিভেদের নিষেধ করিয়াছেন বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায় না। তাঁহাদের সংঘগুলিতে অবশ্য জাতিভেদের কোনো স্থান ছিল না; কিন্তু তাঁহাদের ভক্তশ্রেণীর মধ্যে যে জাতিভেদ বিদ্যমান ছিল, তাঁহারা উহার নিষেধ করেন নাই বলিয়াই মনে হয়। এই নিষেধের কাজটুকু বুদ্ধই করিয়াছেন। তিনি কিভাবে এই নিষেধ করিয়াছেন, এখন আমরা তাহা আলোচনা করিব।

জাতিভেদের বিরুদ্ধে বুদ্ধ যে-সব সুত্তে উপদেশ দিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন হইতেছে বাসেট্‌ঠসুত্ত। এই সুত্তটি সুত্তনিপাতে এবং মজ্ঝিমনিকায়ে দেখিতে পাওয়া যায়। উহার সারমর্ম এই—

একসময়, ভগবান বুদ্ধ ইচ্ছানঙ্গল নামক গ্রামের সন্নিকটে, ইচ্ছানঙ্গল উপবনে বাস করিতেন। তৎকালে বহু বিখ্যাত ব্রাহ্মণ ঐ গ্রামে থাকিত। তন্মধ্যে বাসিষ্ঠ ও ভারদ্বাজ এই দুই তরুণ ব্রাহ্মণের ভিতর "মনুষ্য জন্মবশত শ্রেষ্ঠ হয়, না কর্মবশত শ্রেষ্ঠ হয়", এই বিষয় লইয়া একটি বাদবিবাদ হয়।

ভারদ্বাজ তাহার বন্ধুকে কহিল, "হে বাসিষ্ঠ, যাহার মাতৃবংশে ও পিতৃবংশে সাতপুরুষ পর্যন্ত শুদ্ধ আছে, যাহার কুলে সাতপুরুষ পর্যন্ত বর্ণসঙ্কর হয় নাই, সেই ব্রাহ্মণই শ্রেষ্ঠ।"

বাসিষ্ঠ কহিল, "হে ভারদ্বাজ, যে মনুষ্য শীল-সম্পন্ন ও কর্তব্য-পরায়ণ তাহাকেই ব্রাহ্মণ বলা উচিত।"

এই বিষয় লইয়া খুব বাদবিবাদ হইল। তথাপি তাহারা উভয়ের সন্তোষজনক কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিল না। শেষে বাসিষ্ঠ কহিল, "হে ভারদ্বাজ, আমাদের এই তর্কবিতর্ক এখানে মিটিবে না। আমাদের গ্রামের নিকট এই শ্রমণ গোতম বাস করিতেছেন। তিনি বুদ্ধ, পূজ্য এবং সর্বলোকের গুরু, তাঁহার সম্বন্ধে এইরূপ কীর্তি সর্বত্র প্রসৃত হইয়াছে। আমরা তাঁহার নিকট গিয়া আমাদের মতভেদের কথা বলিব এবং এই সম্বন্ধে তিনি যে সিদ্ধান্ত দিবেন, তাহাই আমরা মানিয়া লইব।"

তখন ঐ দুইজন বুদ্ধের নিকট গেল এবং বুদ্ধকে কুশলপ্রশ্নাদি করার পর একপাশে বসিল। আর বাসিষ্ঠ কহিল, "হে গোতম, আমরা দুইজন শিক্ষিত ব্রাহ্মণপুত্র। সে তারুক্ষ্যের শিষ্য, আর আমি পৌষ্করসাদির শিষ্য। আমাদের মধ্যে জাতিভেদ সম্বন্ধে বাদবিবাদ চলিয়াছে।

সে বলে যে, জন্মদ্বারাই মনুষ্য ব্রাহ্মণ হয়। আমরা আপনার কীর্তি শুনিয়া, এখানে আসিয়াছি। আপনি আমাদের এই বাদবিবাদ মিটাইয়া দিন।"

ভগবান কহিলেন, "হে বাসিষ্ঠ, তৃণ, বৃক্ষ ইত্যাদি বনস্পতিদের মধ্যে, ভিন্ন ভিন্ন জাতি দেখিতে পাওয়া যায়। তেমনই পোকা, পিঁপড়া, প্রভৃতি ছোটো ছোটো প্রাণীদের মধ্যে, ভিন্ন ভিন্ন জাতি দেখা যায়। সর্প, শ্বাপদ, জলচর মৎস্য এবং আকাশগামী পাখিদের মধ্যেও অনেক জাতি আছে। উহাদের এই জাতিভেদের ভিন্ন ভিন্ন চিহ্ন সেই সেই প্রাণীদের মধ্যে স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু মানুষের মধ্যে, সেইরূপ ভিন্নতার চিহ্ন লক্ষিত হয় না। চুল, কান, চোখ, মুখ, নাক, ঠোঁট, ভ্রূ, ঘাড়, পেট, পিঠ, হাত, পা ইত্যাদি অবয়ব দ্বারা এক মানুষ অন্য মানুষ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন হইতে পারে না। সুতরাং পশুপক্ষীদের মধ্যে যেরূপ আকারাদিতে ভিন্ন ভিন্ন জাতি দেখিতে পাওয়া যায়, সেইরূপ মনুষ্যপ্রাণীর মধ্যে নাই। সব মানুষের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ প্রায় একই রকম বলিয়া, মানুষের মধ্যে জাতিভেদ নির্ধারণ করা যায় না। কিন্তু মানুষের জাতি কর্মদ্বারা নির্ধারণ করা সম্ভবপর।

"যদি কোনো ব্রাহ্মণ গোপালন করিয়া জীবিকা নির্বাহ করে, তাহা হইলে তাহাকে গোয়ালা বলিবে, ব্রাহ্মণ বলিবে না। যে শিল্পকলার দ্বারা জীবিকা অর্জন করে, সে কারিকর; যে ব্যবসায় করে, সে বণিক্; যে দূতের কাজ করে, সে দূত; যে চুরিদ্বারা জীবিকা অর্জন করে, সে চোর; যে যুদ্ধদ্বারা জীবিকা অর্জন করে, সে যোদ্ধা; যে যাগযজ্ঞদ্বারা জীবিকা অর্জন করে, সে যাজক; এবং যে রাজ্যদ্বারা জীবিকা অর্জন করে, সে রাজা। কিন্তু ইহাদের মধ্যে কাহাকেও শুধু জন্মবশত ব্রাহ্মণ বলা যাইবে না।

"যে সংসারের সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করিয়া, সংসারের দুঃখকে ভয় করে না, যাহার কোনো ব্যাপারেই কিছুমাত্র আপত্তি নাই, তাহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি। অন্যের দেওয়া গালি, অন্যকৃত লোকসান ও অসুবিধা যে ব্যক্তি সহন করে, ক্ষমাই যাহার বল, তাহাকে আমি ব্রাহ্মণ বলি। পদ্মপত্রে জলবিন্দুর ন্যায়, যে-ব্যক্তি ইহলোকের বিষয়সুখ হইতে অলিপ্ত থাকে, তাহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি।

"জন্মদ্বারা কেহ ব্রাহ্মণ হয় না, কিংবা অব্রাহ্মণ হয় না। কর্মদ্বারাই ব্রাহ্মণ হয়, ও কর্মেই অব্রাহ্মণ হয়। কর্মদ্বারাই চাষী হয়, কর্মের দ্বারাই কারিকর হয়, কর্মেই মানুষ চোর হয়, সৈন্য হয়, যাজক হয়, আর রাজাও কর্মবশতই রাজা হয়। কর্মদ্বারাই, এই সমগ্র জগৎ সচল রহিয়াছে। চাকার আলের উপর নির্ভর করিয়া যেমন রথ চলে, তেমনই সর্বপ্রাণী নিজ নিজ কর্মের উপর নির্ভর করে।"

বুদ্ধের এই উপদেশ শুনিয়া, বাসিষ্ঠ ও ভরদ্বাজ তাঁহার ভক্ত হইলেন।

ব্রাহ্মণ ও অব্রাহ্মণ একই রকম!

পূর্বে পুরুষ-সুক্তের যে ঋক্‌টি উদ্ধৃত করা হইয়াছে, তাহার সাহায্যে ব্রাহ্মণরা প্রতিপাদন করিতেন যে, ব্রহ্মদেবের মুখ হইতে উৎপন্ন হওয়ায়, তাহারা চারিবর্ণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

মজ্ঝিমনিকায়ের অস্‌সলায়নসুত্তে এই সম্বন্ধে ভগবান বুদ্ধের একটি কথোপকথন আছে। তাহা খুবই শিক্ষাপ্রদ। ঐ সুত্তের সারমর্ম এই ঃ

এককালে, ভগবান বুদ্ধ শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিকের বাগানে থাকিতেন। তখন বিভিন্ন দেশ হইতে কোনো কারণে পাঁচশত ব্রাহ্মণ শ্রাবস্তীতে আসিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে এইরূপ একটি প্রশ্ন উপস্থিত হইল যে, এই শ্রমণ গোতমের মতে চারিবর্ণের লোকেরাই মোক্ষ লাভ করিতে পারে; তাঁহার সহিত বাদবিবাদ করিয়া, কে তাঁহার এই মত খণ্ডন করিবে? শেষে, তাহারা আশ্বলায়ন নামক এক ব্রাহ্মণপুত্রকে এই কাজে লাগাইবে বলিয়া স্থির করিল।

আশ্বলায়নের অধ্যয়ন সবে মাত্র সমাপ্ত হইয়াছিল। সে নিঘণ্টু, ছন্দঃশাস্ত্র, ইত্যাদি বেদাঙ্গের সহিত চারি বেদই মুখস্থ বলিতে পারিত। তথাপি ভগবান বুদ্ধের সহিত বাদবিবাদ করা যে সহজ নয়, তাহা সে ভালো করিয়াই জানিত। বুদ্ধের সহিত বিচারের জন্য যখন তাহাকে নির্বাচন করা হইল, তখন সে ঐ ব্রাহ্মণদিগকে বলিল, "দেখুন, শ্রমণ গোতম ধার্মিক ব্যক্তি, এবং ধার্মিক ব্যক্তির সহিত বিচার করা সহজ নয়। যদিও আমি সকল বেদে পারদর্শী হইয়াছি, তথাপি গোতমের সহিত বিচার করিবার শক্তি আমার নাই।"

বুদ্ধের সহিত সে বিচার করিবে কিনা, এই সম্বন্ধে অনেকক্ষণ কথা কাটাকাটির পর, ব্রাহ্মণরা আশ্বলায়নকে কহিল, "দেখ, আশ্বলায়ন, তুমি পরিব্রাজক-ধর্ম অধ্যয়ন করিয়াছ, আর যুদ্ধ ছাড়া পরাজয় স্বীকার করা তোমার পক্ষে যোগ্য নয়।"

আশ্বলায়ন কহিল, "যদিও গোতমের সহিত বাদবিবাদ করা কঠিন, তথাপি তোমাদের আগ্রহাতিশয্যে তোমাদের সহিত আমি আসিতেছি।"

তাহার পর, আশ্বলায়ন ঐ ব্রাহ্মণ-সমুদায়ের সহিত ভগবান বুদ্ধের নিকট গেল ও কুশলাদি-প্রশ্নের পর, তাহারা সকলে একপাশে উপবেশন করিল। তখন আশ্বলায়ন কহিল, "হে গোতম, ব্রাহ্মণরা বলে যে, ব্রাহ্মণবর্ণই শ্রেষ্ঠ, অন্যান্য বর্ণ নীচ, ব্রাহ্মণবর্ণই শুক্ল, অন্যান্য বর্ণ কৃষ্ণ, ব্রাহ্মণরাই মোক্ষ লাভ করে, অন্যেরা নহে, ব্রাহ্মণ ব্রহ্মদেবের মুখ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহারা তাঁহার ঔরসপুত্র, এইজন্য তাহারাই ব্রহ্মদেবের উত্তরাধিকারী। হে গোতম, এই সম্বন্ধে আপনার মত কি?"

ভগবান—হে আশ্বলায়ন, ব্রাহ্মণদের মেয়েরা ঋতুমতী হয়, তাহারা গর্ভে সন্তান ধারণ করে, তাহাদের প্রসব হয়, আর তাহারা নিজের সন্তনাকে স্তন্য দান করে। এইভাবে, ব্রাহ্মণের সন্তান অন্যান্য বর্ণের মতোই মায়ের পেট হইতে উৎপন্ন হয়। ইহা সত্ত্বেও, যদি ব্রাহ্মণরা বলে যে, তাহারা ব্রহ্মদেবের মুখ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা হইলে ইহা আশ্চর্যজনক নয় কি?

আ.—হে গোতম, আপনি যাহাই বলুন-না কেন, ব্রাহ্মণ ব্রহ্মদেবের উত্তরাধিকারী, ইহাতে ব্রাহ্মণদের পূর্ণ বিশ্বাস আছে।

ভ.—হে আশ্বলায়ন, যৌন, কাম্বোজ, প্রভৃতি সীমান্ত প্রদেশগুলিতে কেবল আর্য ও

দাস এই দুইটি বর্ণ বাস করে, এবং কখনো কখনো আর্য দাস হয়, এবং দাস আর্য হয়, এই কথা তুমি শনিয়াছ কি?

আ.—হাঁ, আমি এইরূপ শুনিয়াছি।

ভ.—যদি এই কথা ঠিক হয়, তাহা হইলে ব্রহ্মদেব যে ব্রাহ্মণদিগকে মুখ হইতে উৎপন্ন করিয়াছিলেন, এবং তাহারা যে সর্ববর্ণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, এই কথার ভিত্তি কি?

আ.—আপনার কথা যাহাই হউক, ব্রাহ্মণদের কিন্তু এইরূপ দৃঢ় ধারণা আছে যে, ব্রাহ্মণবর্ণই সবশ্রেষ্ঠ ও অন্যান্য বর্ণ তাহার তুলনায় হীন।

ভ.—ক্ষত্রিয়, বৈশ্য কিংবা শূদ্র যদি প্রাণিহত্যা, চুরি, ব্যভিচার, মিথ্যা-ভাষণ, প্রতারণা গালমন্দ, বৃথা-ভাষণ ইত্যাদি করে, যদি অন্যের ধনের উপর লোভ রাখে, যদি অপরকে দ্বেষ করে, যদি নাস্তিকতায় বিশ্বাস করে, তাহা হইলে শুধু তাহারাই মৃত্যুর পর নরকে যাইবে, কিন্তু ব্রাহ্মণরা যদি এই-সব খারাপ কর্ম করে, তাহা হইলে তাহারা কিন্তু নরকে যাইবে না, তোমার কি এইরূপ মনে হয়?

অ.—হে গোতম, যে-কোনো বর্ণের মানুষই হউক-না, সে যদি এই-সব পাপকর্ম করে, তাহা হইলে মৃত্যুর পর, সে নরকে যাইবে। ব্রাহ্মণ হইলেই বা কি, অথবা অব্রাহ্মণ হইলেই বা কি, সকলকেই নিজ নিজ পাপের প্রায়শ্চিত্ত ভোগ করিতে হইবে।

ভ.—যদি কোনো ব্রাহ্মণ প্রাণনাশ হইতে নিবৃত্ত হয়, চৌর্য, ব্যভিচার, অসত্য-কথন, প্রতারণা, গালমন্দ, বৃথা-প্রলাপ, পরদ্রব্যে লোভ, দ্বেষ ও নাস্তিকতা, এই-সকল (দশটি) পাপ হইতে নিবৃত্ত হয়, তাহা হইলে শুধু সে-ই কি দেহাবসানের পর স্বর্গে যাইবে, কিন্তু অন্য বর্ণের লোক যদি এই সকল পাপ হইতে নিবৃত্ত হয়, তাহা হইলে তাহারা স্বর্গে যাইবে না এইরূপ কি তোমার মনে হয়?

আ.—যে-কোনো বর্ণের মানুষই হউক-না-কেন, যে যদি এই-সব পাপ হইতে নিবৃত্ত হয়, তাহা হইলে সে স্বর্গে যাইবে; পুণ্যাচরণের ফল, কি ব্রাহ্মণ কি অব্রাহ্মণ, সকলেই সমানভাবে পাইবে।

ভ.—এই দেশে শুধু ব্রাহ্মণই বিদ্বেষ ও শত্রুতা বিরহিত হইয়া, মৈত্রী-ভাবনা করিতে পারে, কিন্তু ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র তাহা করিতে পারে না, তোমার কি এইরূপ মনে হয়?

আ.—চারি বর্ণের লোকের পক্ষেই মৈত্রী-ভাবনা করা সম্ভবপর।

ভ.—তবে আর ব্রাহ্মণবর্ণই শ্রেষ্ঠ ও অন্যান্য বর্ণ নিকৃষ্ট, এই কথার অর্থ কি?

আ.—আপনি যাহাই বলুন-না-কেন, এই কথা ঠিক যে, ব্রাহ্মণরা নিজদিগকে শ্রেষ্ঠ ও অন্যান্য বর্ণগুলিকে হীন বলিয়া মনে করে।

ভ.—হে আশ্বলায়ন, মনে করো যে, কোনো সার্বভৌম চক্রবর্তী রাজা প্রত্যেক বর্ণের একশত জন পুরুষ একত্র করিলেন, ও তাহাদের মধ্যে যাহারা ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ ও রাজকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহাদিগকে বলিলেন, "ওহে তোমরা এইদিকে আইস, এবং শাল

কিংবা চন্দনের মতো উৎকৃষ্ট বৃক্ষের কাষ্ঠ লইয়া অগ্নি উৎপন্ন কর'', ও তাহাদের মধ্যে যাহারা চণ্ডাল, নিষাদ ইত্যাদি হীনকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহাদিগকে বলিলেন, ''ওহে তোমরা এইদিকে আইস, এবং যে গর্তে, কুকুরকে খাইতে দেওয়া হয়, যে গর্তে শূকরকে খাইতে দেওয়া হয় সেই গর্তে, অথবা রঞ্জকের গর্তে এরণ্ডের কাষ্ঠদ্বারা, অগ্নি উৎপন্ন কর।'' হে আশ্বলায়ন, ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণের মানুষরা উৎকৃষ্ট কাষ্ঠদ্বারা যে অগ্নি উৎপন্ন করিবে, কেবল সেইটিই উজ্জ্বল ও তেজঃপূর্ণ হইবে, আর চণ্ডালাদি হীনবর্ণের লোকেরা এরাণ্ডাদির মতো নিকৃষ্ট কাষ্ঠদ্বারা যে অগ্নি উৎপন্ন করিবে, তাহা উজ্জ্বল ও তেজঃপূর্ণ হইবে না, এবং তাহা হইতে আগুনের কাজ হইবে না, তোমার কি এইরূপ মনে হয়?

আ.—হে গোতম, যে কোনো বর্ণের মানুষই হউক না, সে উৎকৃষ্ট কিংবা নিকৃষ্ট রকমের কাঠ দিয়া যে-রকম জায়গাতেই আগুন তৈয়ার করুক-না কেন, তাহা সর্বত্র একই রকম উজ্জ্বল ও তেজঃপূর্ণ হইবে, এবং তাহা হইতে একই রকম অগ্নি-কার্য পাওয়া যাইবে।

ভ.—কোনো ক্ষত্রিয়ের ছেলে যদি ব্রাহ্মণের কন্যাকে বিবাহ করে ও তাহাদের একটি ছেলে হয়, তাহা হইলে ঐ ছেলেটি যে তাহার পিতামাতার মতোই মানুষ হইবে, এই রকম তোমার মনে হয় না কি? তেমনই, কোনো ব্রাহ্মণ-পুত্র যদি ক্ষত্রিয়-কন্যাকে বিবাহ করে, ও তাহাদের একটি ছেলে হয়, তাহা হইলে সে তাহার পিতামাতার মতো না হইয়া, একটা কিম্ভূতকিমাকার প্রাণী হইবে এইরূপ তোমার মনে হয় কি?

আ.—এইরূপ মিশ্র বিবাহের যে সন্তান হয়, তাহা পিতামাতার মতোই মনুষ্য হইয়া থাকে। তাহাকে ব্রাহ্মণও বলা যাইতে পারিবে, অথবা ক্ষত্রিয়ও বলা যাইতে পারিবে।

ভ.—কিন্তু হে আশ্বলায়ন, একটি ঘোড়া ও একটি গাধার সম্বন্ধ হইতে যে সন্তান হয়, তাহা উহার মায়ের মতো কিংবা বাপের মতো বলা যায় কি? উহাকে কি ঘোড়াও বলা যাইতে পারিবে, আবার গাধাও বলা যাইতে পারিবে?

আ.—হে গোতম, উহাকে ঘোড়া কিংবা গাধা বলিতে পারা যায় না। উহা তৃতীয় এক শ্রেণীর জাতি হইয়া যায়। উহাকে আমরা খচ্চর বলি। কিন্তু ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের সম্বন্ধ হইতে যে সন্তান জন্মে, তাহার মধ্যে এইরূপ কিছু বৈশিষ্ট্য দেখিতে পাওয়া যায় না।

ভ.—হে আশ্বলায়ন, দুইটি ব্রাহ্মণভ্রাতার মধ্যে যদি একজন বেদাধ্যয়ন করিয়া ভালো পণ্ডিত হয়, ও অপরজন অশিক্ষিত থাকিয়া যায়, তাহা হইলে উহাদের মধ্যে কাহাকে ব্রাহ্মণরা শ্রাদ্ধে ও যজ্ঞে প্রথম নিমন্ত্রণ করিবে?

আ.—যে পণ্ডিত, তাহাকেই প্রথম নিমন্ত্রণ দেওয়া হইবে।

ভ.—এখন মনে কর, এই দুই ভাইয়ের মধ্যে, একজন খুব বিদ্বান্ কিন্তু অত্যন্ত দুঃশীল, আর অপরজন বিদ্বান্ নয় কিন্তু সুশীল; তাহা হইলে, ইহাদের মধ্যে প্রথম কাহাকে নিমন্ত্রণ দেওয়া হইবে?

আ.—হে গোতম, যে-ব্যক্তি সচ্চরিত্র, তাহাকেই প্রথম নিমন্ত্রণ দেওয়া হইবে। যে-দান দুষ্ট মানুষকে দেওয়া হয়, তাহা কি করিয়া মহাফলদায়ক হইবে?

ভ.—হে আশ্বলায়ন, তুমি প্রথম 'জাতিকে' গুরুত্ব দিয়াছিলে, তাহার পর 'বেদাভ্যাসকে' ও এখন 'চরিত্রকে' গুরুত্ব দিতেছ। অর্থাৎ চাতুবর্ণ্যে যে-সংস্কার করিতে চাই, তাহাই তুমি মানিয়া লইয়াছ।

ভগবান বুদ্ধের এই কথা শুনিয়া, আশ্বলায়ন মাথা নীচু করিয়া চুপ করিয়া রহিল। ইহার পরে, কি বলা যাইতে পারে, সে তাহা ভাবিয়া পাইল না। তাহার পর, ভগবান তাহাদিগকে অসিত দেবল ঋষির গল্প কহিলেন। শেষে আশ্বলায়ন বুদ্ধের উপাসক (বা ভক্ত) হইল।

সর্বসাধারণ লোকের হাত হইতেই ক্ষমতা পাওয়া দরকার

ব্রাহ্মণ বর্ণই সর্বশ্রেষ্ঠ ও অন্যান্য বর্ণ নিকৃষ্ট, শুধু এই কথা বলিয়া, ব্রাহ্মণ বর্ণের নায়করা ক্ষান্ত থাকিত না। তাহারা চারিবর্ণেরই কর্তব্যাকর্তব্য নির্ধারণ করিবার অধিকার সম্পূর্ণভাবে নিজেদের হাতেই রাখিত। ইহা মজ্ঝিমনিকায়ের (নং ৯৬) এসুকারিসুত্ত হইতে বুঝিতে পারা যায়। উহাতে যে-সব কথা আছে, তাহার সারমর্ম এই ঃ

এককালে ভগবান বুদ্ধ শ্রাবস্তীতে জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের বাগানে বাস করিতেন। ঐ সময় এসুকারী নামক একজন ব্রাহ্মণ তাঁহার নিকট আসিল ও কুশলপ্রশ্নাদি করিয়া একপাশে বসিল এবং বলিল, "হে গোতম, ব্রাহ্মণেরা চারিটি পরিচর্যার (সেবার) কথা বলে। ব্রাহ্মণের পরিচর্যাগুলি চার বর্ণের লোকেরাই করিতে পারে; ক্ষত্রিয়ের পরিচর্যা ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই তিন বর্ণের লোকেদেরই কর্তব্য; বৈশ্যের পরিচর্যা বৈশ্য ও শূদ্র এই দুই বর্ণের লোকেই করিবে; ও শূদ্রের পরিচর্যা শুধু শূদ্রই করিবে। অন্য বর্ণের মনুষ্য তাহার পরিচর্যা কি করিয়া করিবে? এই পরিচর্যা সম্বন্ধে আপনার মত কি?"

ভ.—হে ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণদের এই কথায় সর্বলোকের সম্মতি আছে কি? পরিচর্যা করিতে হইবে, এই কথা যাহারা বলে, তাহাদিগকে সর্বসাধারণ লোকে এইরকম কথা বলিবার অধিকার দিয়াছে কি?

এসু.—হে গোতম, না সেরকম কিছু নয়।

ভ.—তাহা হইলে, যদি কোনো গরীব মানুষ মাংস খাইতে না চায়, আর যদি তাহার প্রতিবেশী তাহার উপরে মাংসের এক ভাগ চাপাইয়া তাহাকে, বলে, 'এই মাংসটুকু তুমি খাও ও আমাকে ইহার দাম দাও!' তাহা হইলে যেমন বলিতে হয় যে, প্রতিবেশী জোর করিয়া তাহার ঘাড়ে মাংস চাপাইল, তেমনই ব্রাহ্মণরা সর্বসাধারণ লোকের উপর এই পরিচর্যাগুলি চাপাইয়াছে, এইরূপ বলিতে হইবে। আমার কথ্য এই যে, যে-কোনো বর্ণের মানুষই হউক-না কেন, যাহার পরিচর্যা করিলে কল্যাণ হয়, অকল্যাণ হয় না, তাহার পরিচর্যা করাই যোগ্য। চারিবর্ণেরই বিবেচক লোকদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে, তাহারা এইরূপ কথাই বলিবে। উচ্চকুলে, উচ্চবর্ণে কিংবা ধনীর বংশে জন্মগ্রহণ করা ভালো কিংবা মন্দ,

আমি এইরকম কিছু বলি না। যে-ব্যক্তি উচ্চকুলে, উচ্চবর্ণে কিংবা ধনীর বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, সে যদি প্রাণিহত্যা ইত্যাদি পাপ করিতে থাকে, তাহা হইলে তাহার এই কুলীনত্ব ভালো নহে। কিন্তু সে যদি প্রাণিহত্যা ইত্যাদি পাপ হইতে বিরত হয়, তাহা হইলে তাহার কুলীনতা খারাপ নয়। যে মানুষের পরিচর্যা করিলে শ্রদ্ধাশীল, বিদ্যা, ত্যাগ, ও প্রজ্ঞা এইগুলির শ্রীবৃদ্ধি হয়, তাহার পরিচর্যা করিবে, আমার এই মত।

এসু.—হে গোতম, ব্রাহ্মণরা চারিটি ধনের কথা প্রতিপাদন করে। ভিক্ষা করা ব্রাহ্মণদের নিজস্ব ধন, ধনুর্বাণ ক্ষত্রিয়দের, চাষবাস ও গোরক্ষা বৈশ্যদের এবং কাস্তে ও ঝাঁকা শূদ্রদের ধন। প্রহরী যদি চুরি করে, তাহা হইলে সে যেমন কর্তব্যচ্যুত হয়, তেমনই চারিবর্ণের যে-কোনো বর্ণের লোকই যদি নিজ ধনের প্রতি অবহেলা করে তাহা হইলে ঐ ব্যক্তি নিজ কর্তব্য হইতে বিচ্যুত হইবে। এই সম্বন্ধে আপনার মত কি?

ভ.—হে ব্রাহ্মণ, এই চারিটি ধনের কথা লোকদিগকে বলিবার জন্য লোকেরা ব্রাহ্মণদিগকে অধিকার দিয়াছে কি?

এসু.—না, গোতম, দেয় নাই।

ভ.—তাহা হইলে যে-গরীব মানুষ মাংস খাইতে চায় না, তাহার উপর মাংসের ভাগ চাপাইয়া, তাহার নিকট হইতে মূল্য দাবি করা—ব্রাহ্মণদের এই কাজটি তাহারই মতন বলিয়া বুঝিতে হইবে। হে ব্রাহ্মণ, আমার কথা এই যে, আর্য শ্রেষ্ঠ ধর্মই সকলের নিজস্ব ধন। ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য ও শূদ্র, এই চারকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, এমন মানুষকে যথাক্রমে ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য ও শূদ্র বলে যেরকম কাঠ, শকলিকা, তৃণ ও ঘুঁটে, এই চারি পদার্থ হইতে উৎপন্ন অগ্নিকে ক্রমান্বয়ে কাষ্ঠাগ্নি, শকলিকাগ্নি, তৃণাগ্নি ও গোময়াগ্নি বলে, তেমনই ক্ষত্রিয় প্রভৃতি চারিটি নাম বুঝিতে হইবে। কিন্তু এই চারিকুলের মানুষ যদি প্রাণিহত্যা প্রভৃতি পাপ হইতে নিবৃত্ত হয়, তাহা হইলে উহাদের মধ্যে শুধু ব্রাহ্মণই মৈত্রীভাবনা করিতে সমর্থ হইবে, ও অন্যবর্ণীয় লোক মৈত্রীভাবনা করিতে পারিবে না, তোমার এইরূপ মনে হয় কি?

এসু.—হে গোতম, না আমার সেরকম মনে হয় না। যে-কোনো বর্ণের মানুষই হউক না, সে মৈত্রীভাবনা করিতে সমর্থ।

ভ.—শুধু ব্রাহ্মণই নদীতে গিয়া স্নানচূর্ণ দ্বারা নিজের শরীর পরিষ্কার করিতে পারিবে, কিন্তু অন্যবর্ণীয় লোকেরা নিজের শরীর পরিষ্কার করিতে পারিবে না। তোমার এইরূপ মনে হয় কি?

এসু.—হে গোতম, না, আমার সেইরূপ মনে হয় না। চার বর্ণের লোকই নদীতে গিয়া স্নানচূর্ণ দিয়া নিজের শরীর পরিষ্কার করিতে পারিবে।

ভ.—তেমনই, হে ব্রাহ্মণ, প্রত্যেক কুলের লোকই তথাগতের উপদেশ অনুসারে চলিয়া ন্যায্য ধর্মের আরাধনা করিতে পারিবে।

ব্রাহ্মণবর্ণই শ্রেষ্ঠ, ইহা শুধু শব্দ মাত্র

ভগবান বুদ্ধের পরিনির্বাণের পরও বুদ্ধের প্রধান শিষ্যগণ চাতুর্বর্ণ্য ব্যবস্থায় সম্মতি দিতেন না। তাহারা প্রতিপাদন করিতেন যে, এই চাতুর্বর্ণ্য-ব্যবস্থা কৃত্রিম। ইহার একটি সুন্দর উদাহরণ মজ্ঝিমনিকায়ের (নং ৮৪) মধুরসুত্তে দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার সারমর্ম এইরূপ ঃ

এককালে আয়ুষ্মান্ মহাকচ্চান মধুরার[১] নিকট বৃন্দাবনে অবস্থান করিতেন। মধুরার রাজা অবন্তিপুত্র মহাকচ্চানের কীর্তি শুনিয়াছিলেন। তাই বহু লোক সঙ্গে লইয়া তিনি তাহার নিকট গেলেন ও কুশল প্রশ্নাদি জিজ্ঞাসা করিয়া, একপাশে উপবেশন করতঃ কহিলেন, "হে কাত্যায়ন, ব্রাহ্মণবর্ণই শ্রেষ্ঠ, অন্য বর্ণ হীন, ব্রাহ্মণবর্ণই শুক্ল, অন্যবর্ণ কৃষ্ণ, ব্রাহ্মণরাই মুক্তি পায়, অন্য বর্ণে পায় না, ব্রাহ্মণ ব্রহ্মদেবের মুখ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, ও ব্রাহ্মণ ব্রহ্মদেবের ঔরসপুত্র, ব্রাহ্মণরা এইরূপ প্রতিপাদন করিয়া থাকেন। এই সম্বন্ধে আপনার বক্তব্য কি?

কা.—হে মহারাজ, ইহা শুধু একটি আওয়াজ (ঘোষ)! মনে কর, কোনো ক্ষত্রিয় ধনধান্যে কিংবা রাজ্যে সমৃদ্ধ হইল, তাহা হইলে, চারি বর্ণের মানুষই কি তাহার সেবা করিবে না?

রাজা—হে কাত্যায়ন, চারি বর্ণের লোকই তাহার সেবা করিবে।

কা.—তেমনই অন্য কোনো বর্ণের মানুষও যদি ধনধান্য ও রাজ্যে সমৃদ্ধ হয়, তাহা হইলে চার বর্ণেরই লোকেরা তাহার সেবা করিবে না কি?

রাজা—চার বর্ণের লোকেরাই তাহার সেবা করিবে।

কা.—তাহা হইলে, চার বর্ণের লোকেরাই সমান বলিয়া প্রতিপন্ন হইল না কি?

রাজা—এইভাবে দেখিলে, চার বর্ণের লোকেরাই অবশ্য সমান বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। তাহাদের মধ্যে কোনো ভেদই আছে বলিয়া, আমার মনে হয় না।

কা.—এইজন্যই আমি বলি যে, ব্রাহ্মণই শ্রেষ্ঠ বর্ণ, ব্রাহ্মণদের এই মতটি কেবল একটি আওয়াজ। ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য ও শূদ্র, এই চারি বর্ণের লোকই প্রাণিহত্যাদি পাপ করিলে, একই রকম দুর্গতি পাইবে, মহারাজের এইরকম মনে হয় না কি?

রাজা—চার বর্ণের মধ্যে যে-কোনো বর্ণের মানুষই পাপকর্ম করিলে দুর্গতি প্রাপ্ত হইবে।

কা.—আচ্ছা মহারাজ, এইরকম অবস্থায়, চার বর্ণই সমান বলিয়া প্রতিপন্ন হয় না কি? এই সম্বন্ধে তোমার কি মনে হয়?

রাজা—এইভাবে দেখিলে, নিশ্চয়ই চার বর্ণই সমান বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। উহাদের মধ্যে আমি কোনো ভেদ দেখিতে পাই না।

১. ইহাই বর্তমান কালের মথুরা।

কা.—চার বর্ণের মধ্যে যে-কোনো বর্ণের মনুষ্যই প্রাণিহত্যাদি পাপ হইতে বিরত হইলে, সে স্বর্গে যাইবে না কি?

রাজা—সে স্বর্গে যাইবে, আমার এইরকম মনে হয়।

কা.—আর এইজন্যই আমি বলি যে, ব্রাহ্মণবর্ণই শ্রেষ্ঠ, এই কথাটি শুধু একটি আওয়াজ! হে মহারাজ, মনে কর যে, তোমার রাজ্যে চারি বর্ণের মধ্যে যে-কোনো বর্ণের কোনো ব্যক্তি সিঁধকাটা, লুঠকরা, পরস্ত্রীগমন ইত্যাদি অপরাধ করিয়াছে। যদি রাজপুরুষরা তাহাকে ধরিয়া তোমার সম্মুখে আনিয়া দাঁড় করায়, তাহা হইলে তুমি (তাহার জাতির কথা না ভাবিয়া) তাহাকে যথাযোগ্য শাস্তি দিবে, কি দেবে না?

রাজা—সে যদি বধের যোগ্য হয়, তাহা হইলে আমি তাহাকে বধ করিব। যদি তাহাকে জরিমানা করা উচিত হয়, তাহা হইলে আমি তাহাকে জরিমানা করিব; আর যদি তাহাকে দেশ হইতে নির্বাসন দেওয়া যোগ্য হয়, তাহা হইলে তাহাকে আমি নির্বাসন দিব। কেননা, এখন তাহার 'ক্ষত্রিয়', 'ব্রাহ্মণ' প্রভৃতি পূর্বের নাম নষ্ট হইয়া গিয়াছে, এবং এখন সে দোষী বলিয়া সাব্যস্ত হইয়াছে।

কা.—তাহা হইলে, এই চার বর্ণই সমান নয় কি?

রাজা—এইভাবে দেখিতে গেলে, চার বর্ণই সমান বলিয়া প্রতিপন্ন হয়।

কা.—মনে কর, এই চারি বর্ণের মধ্যে, কোনো-এক বর্ণের মনুষ্য পরিব্রাজক হইল এবং সদাচার পালন করিতে লাগিল। তাহা হইলে, তুমি তাহার সহিত কিরূপ ব্যবহার করিবে?

রাজা—আমি তাহাকে বন্দনা করিব, তাহাকে যোগ্য সম্মান দিব ও তাহার প্রয়োজনীয় অন্নবস্ত্রাদি জোগাইব। কেননা, পূর্বে তাহার ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, শূদ্র ইত্যাদি যে নাম ছিল, তাহা এখন নষ্ট হইয়াছে, এবং সে এখন শ্রমণ নামে লোকের নিকট পরিচিত।

কা.—তাহা হইলে, এই চারি বর্ণই পরস্পরের সমান বলিয়া নির্ধারিত হয় না কি?

রাজা—এইভাবে, নিশ্চয়ই এই চারি বর্ণই সমান বলিয়া সাব্যস্ত হয়।

কা.—এইজন্যই আমি বলি যে, ব্রাহ্মণই শ্রেষ্ঠ, এই কথা শুধু একটি আওয়াজ।

এই কথোপকথন হওয়ার পর, রাজা অবন্তিপুত্র মহাকাত্যায়নকে কহিলেন, "হে কাত্যায়ন, আপনার উপদেশ খুবই সুন্দর। যেমন একটি উপুড়-করা পাত্র কেহ সোজা করিয়া রাখে, অথবা যে ভুল রাস্তায় চলিয়াছে, তাহাকে ঠিক রাস্তা দেখাইয়া দেয়, অথবা যাহাতে চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তি অন্ধকারে দেখিতে পায়, তাহার জন্য মশাল জ্বালিয়া দেয়, তেমনই মাননীয় কাত্যায়ন অনেকভাবে আমাদিগকে ধর্মোপদেশ দিলেন। এইজন্য আমি মাননীয় কাত্যায়নের, ধর্মের ও ভিক্ষুসংঘের শরণ লইতেছি। আমি আজ হইতে মৃত্যু পর্যন্ত আপনার শরণাপন্ন উপাসক (ভক্ত) হইলাম, এইরূপ বুঝিবেন।"

কা.—মহারাজ, তুমি আমার শরণ লইয়ো না। যে ভগবানের আশ্রয় আমি লাইয়াছি, সেই ভগবানেরই তুমিও আশ্রয় লও।

রাজা—হে কাত্যায়ন, সেই ভগবান এখন কোথায় আছেন?

কা.—সেই ভগবান পরিনির্বাণ লাভ করিয়াছেন।

রাজা—সেই ভগবান যদি জীবিত থাকিতেন, তাহা হইলে আমরা তাঁহার দর্শনের জন্য শত যোজন দূর হইতেও তাঁহার কাছে যাইতাম। কিন্তু এখন তিনি পরিনির্বাণ লাভ করিয়া থাকিলেও, আমরা সেই ভগবানেরই আশ্রয় লইতেছি, এবং তাঁহার ধর্ম ও ভিক্ষুসংঘেরও আশ্রয় লইতেছি। আজ হইতে মৃত্যু পর্যন্ত আমি তাঁহাদের শরণাগত উপাসক হইলাম, এইরূপ বুঝিবেন।

বুদ্ধের জীবদ্দশায় যে মথুরাতে বৌদ্ধধর্মের বিশেষ প্রসার হয় নাই, ইহা অবশ্যই দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ উদ্ধৃত অঙ্গুত্তরনিকায়ের সুত্ত হইতে বুঝা যাইবে (পৃ. ৩৮)। রাজা অবন্তিপুত্র বুদ্ধের পরিনির্বাণের পর সিংহাসনে আরূঢ় হইয়া থাকিবেন। কেননা তিনি যদি বুদ্ধের জীবদ্দশাতেই সিংহাসনারূঢ় হইতেন, তাহা হইলে বুদ্ধসম্বন্ধে কমবেশি কিছু খবর তিনি অবশ্যই জানিতেন। উপরি-উক্ত সুত্তের শেষ অংশটি হইতে লক্ষিত হইবে যে, রাজা অবন্তিপুত্র এই কথাও জানিতেন না যে, বুদ্ধ ইহার পূর্বেই পরিনির্বাণ লাভ করিয়াছিলেন। খুব সম্ভবতঃ, বুদ্ধের জীবদ্দশায়, মথুরাতে অবন্তিপুত্তের পিতা রাজত্ব করিতেছিলেন, ও তিনি ব্রাহ্মণ্য-ধর্মকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে করায়, বুদ্ধের দিকে লক্ষ্য দেন নাই। মহাকাত্যায়ন অবন্তিদেশেরই অধিবাসী, মূলতঃ ব্রাহ্মণ ও তদুপরি বিদ্বান্ হওয়ায়, এই অল্পবয়সের রাজা অবন্তিপুত্রের উপর তাঁহার প্রভাব পড়িয়াছিল, এইরূপ বুঝাই সংগত হইবে।

শ্রমণরা জাতিভেদ ভাঙিতে পারে নাই

উপরে যে চারিটি সুত্ত উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে প্রথমটিতে অর্থাৎ বাসিষ্ঠসুত্তে ভগবান বুদ্ধ জাতিভেদ কি করিয়া স্বাভাবিক হইতে পারে না, এই কথা সুষ্ঠুভাবে দেখাইয়াছেন। দ্বিতীয়টিতে অর্থাৎ অস্সলায়নসুত্তে ব্রাহ্মণরা যে ব্রহ্মদেবের মুখ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, এই ধারণা খণ্ডন করা হইয়াছে। আর তৃতীয় এসুকারিসুত্তে প্রমাণ করা হইয়াছে যে, অন্যান্য বর্ণের কর্তব্যাকর্তব্য নির্ধারণ করিবার অধিকার ব্রাহ্মণদের নাই। চতুর্থ মাধুরসুত্তে, মহাকাত্যায়ন আর্থিক ও নৈতিক দৃষ্টিতে জাতিভেদের কল্পনা কিভাবে নিরর্থক বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, তাহা স্পষ্ট করিয়াছেন। এই সুত্তগুলি ভালোভাবে বিচার করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, বুদ্ধ অথবা তাঁহার শিষ্যরা জাতিভেদ প্রথা মোটেই সমর্থন করিতেন না এবং তাহা ভাঙিবার জন্য তাঁহারা যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু এই কার্য তাহাদের ক্ষমতার বহির্ভূত ছিল। ব্রাহ্মণরা শুধু মধ্য ভারতে নয়, গোদাবরীর তীর পর্যন্ত জাতিভেদের বৃক্ষ রোপণ করিয়া রাখিয়াছিল। আর তাহা সম্পূর্ণভাবে উৎপাটন করা, কোনো শ্রমণসংঘের পক্ষেই সম্ভবপর হয় নাই।

শ্রমণদের মধ্যে জাতিভেদ ছিল না

তথাপি মুনিঋষিদের পরম্পরা অনুসরণ করিয়া, শ্রমণরা নিজ নিজ সংঘে জাতিভেদকে

স্থান দেয় নাই। যে-কোনো জাতির মানুষই শ্রমণ হইয়া, যে-কোনো শ্রমণ-সংঘে যোগদান করিতে পারিত। নবম অধ্যায়ে বলা হইয়াছে যে (পৃ. ৫৩ দ্রষ্টব্য), হরিকেশিবল চণ্ডাল হইয়াও নির্গ্রন্থদের (জৈনদের) সংঘে ছিল। বুদ্ধের ভিক্ষুসংঘে তো যাহারা অস্পৃশ্যজাতিতে জন্মিয়াছিলেন, এই রকম শ্বাপকনামক চণ্ডাল এবং সুনীত-নামক মেথর প্রভৃতির মতো ব্যক্তিরা বড়ো বড়ো সাধু হইয়া গিয়াছেন।[১] ভগবান বুদ্ধ বলিতেন যে, তাঁহার সংঘের একটি মস্ত বড়ো গুণ এই যে, উহাতে জাতিভেদের স্থান নাই। ভগবান বলিয়াছেন, "হে ভিক্ষুগণ, গঙ্গা, যমুনা, অচিরবতী, সরভূ (সরযূ), মহী এই মহানদীগুলি মহাসমুদ্রে মিলিত হইলে, নিজ নিজ নাম পরিত্যাগ করিয়া, 'মহাসমুদ্র' এই একই নাম প্রাপ্ত হয়। সেইরূপ ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, শূদ্র, এই চারি বর্ণ তথাগতের সংঘে প্রবেশ করিলে, পূর্বের নাম, গোত্র পরিত্যাগ করিয়া, 'শাক্যপুত্রীয় শ্রমণ', এই একই নামে পরিচিত হইয়া থাকে।" (উদান ৫।৫ ও অঙ্গুত্তরনিকায় অট্‌ঠকনিপাত)।

অশোকের সময় বৌদ্ধসংঘে জাতিভেদ ছিল না

অশোকের সময় যে বৌদ্ধসংঘ মোটেই জাতিভেদ মানিত না, ইহা দিব্যাবদানের যশ অমাত্যের কাহিনী হইতে বুঝা যায়।

তখন রাজা অশোক সবেমাত্র বৌদ্ধ হইয়াছেন। তিনি সর্বভিক্ষুদের পায়ে পড়িয়া নমস্কার করিতেছেন, ইহা দেখিয়া, তাহার যশ-নামক অমাত্য তাঁহাকে বলিলেন, "মহারাজ, এই শাক্যশ্রমণদের মধ্যে সকল জাতির লোকই রহিয়াছে, সুতরাং তাহাদের সম্মুখে আপনার অভিষিক্ত মস্তক নোয়ানো যোগ্য নহে।"

অশোক ইহার কোনো উত্তর না দিয়া, কিছুকাল পর, পাঁঠা, ভেড়া প্রভৃতি প্রাণীদের কয়েকটি মাথা আনাইয়া ঐগুলি বিক্রয় করাইলেন, ও যশকে দিয়া একটি মানুষের মাথা আনাইয়া, তাহা বিক্রয় করিতে বলিলেন। পাঁঠা, ভেড়া প্রভৃতি প্রাণীর মাথাগুলি বিক্রয় করিয়া কিছু মূল্য পাওয়া গেল; কিন্তু মানুষের মাথা কেহই লইতে রাজী হইল না। তখন অশোক আদেশ করিলেন যে, ঐ মাথাটি বিনা পয়সায় কাহাকেও দেওয়া হউক। কিন্তু বিনা পয়সাতেও তাহা লইতে রাজী হয়, এমন লোক অমাত্য যশ খুঁজিয়া পাইলেন না। তখন তিনি অশোকের নিকট এই কথা নিবেদন করিলেন। অশোক কহিলেন, "এই মানুষের মাথাটি বিনা পয়সায় দিলেও, লোকে গ্রহণ করে না কেন?"

যশ—কারণ, মানুষের মাথা দেখিলে তাহাদের ঘৃণা হয়।

অ.—শুধু কি মানুষের মাথাটির প্রতিই তাহাদের ঘৃণা হয়, অথবা সব মানুষের মাথাতেই তাহাদের ঘৃণা হয়?

যশ.—মহারাজ, যে-কোনো মানুষের মাথাই কাটিয়া লোকের নিকট লইয়া গেলে, তাহারা উহাতে ঐ রকম ঘৃণা বোধ করিবে।

---

১. 'বৌদ্ধসংঘাচা পরিচয়', পৃ. ২৫৩-৫৬ দ্রষ্টব্য।

অ.—তাহা হইলে, আমি ভিক্ষুদিগের পায়ে আমার এই মাথাটি রাখিয়া তাহাদিগকে সম্মান করায়, তোমার এত খারাপ লাগিবে কেন?

এই কথোপকথনের পর, কয়েকটি শ্লোক আছে। উহাদের মধ্যে একটি এই—

আবাহকালেহথ বিবাহকালে
জাতেঃ পরীক্ষা ন তু ধর্মকালে।
ধর্ম-ক্রিয়ায়া হি গুণা নিমিত্তা
গুণাশ্চ জাতিং ন বিচারয়ন্তি॥

'ছেলের ও মেয়ের বিবাহে[1] জাতির বিচার করা যোগ্য। ধর্ম সংক্রান্ত ব্যাপারে জাতিবিচারের কারণ নাই। কেননা, ধর্মকৃত্যে গুণ দেখিতে হয়; আর গুণ জাতির উপর নির্ভর করে না।'

জৈনসংঘ জাতিভেদ স্বীকার করিয়াছিল

অন্যান্য শ্রমণসংঘগুলির মধ্যে, একমাত্র নির্গ্রন্থ-সংঘের সম্বন্ধেই বর্তমান কালে সামান্য খবর পাওয়া যায়। এই শ্রমণ-সংঘ যে অশোকের পূর্ব হইতেই এই জাতিভেদের গুরুত্ব স্বীকার করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, তাহা আচারাঙ্গ সূত্রের নিরুক্তি হইতে বুঝা যায়। জৈনদের মধ্যে এইরূপ ধারণা প্রচলিত আছে যে, ভদ্রবাহু এই নিরুক্তিটির লেখক, এবং তিনি চন্দ্রগুপ্তের গুরু ছিলেন। নিরুক্তিটির আরম্ভেই জাতিভেদ-সম্বন্ধে যে বিবরণ পাওয়া যায়, .ঃ সারমর্ম এই—

'চার বর্ণের সংযোগে ষোলো বর্ণ উৎপন্ন হইল। ব্রাহ্মণ-পুরুষ ও ক্ষত্রিয়-স্ত্রী হইতে প্রধান-ক্ষত্রিয়, অথবা সঙ্কর-ক্ষত্রিয় উৎপন্ন হয়। ক্ষত্রিয়-পুরুষ ও বৈশ্য-স্ত্রী হইতে প্রধান-বৈশ্য অথবা সঙ্কর-বৈশ্য উৎপন্ন হয়। বৈশ্য-পুরুষ ও শূদ্র-স্ত্রী হইতে প্রধান-শূদ্র কিংবা সঙ্কর-শূদ্র উৎপন্ন হয়। এইভাবে, সাতটি বর্ণ হইয়া থাকে। এখন অন্যান্য নয়টি বর্ণ দেওয়া যাইতেছেঃ ১. ব্রাহ্মণ-পুরুষ ও বৈশ্য-স্ত্রী হইতে অম্বট্ঠ; ২. ক্ষত্রিয়-পুরুষ ও শূদ্র-স্ত্রী হইতে উগ্র; ৩. ব্রাহ্মণ-পুরুষ ও শূদ্র-স্ত্রী হইতে নিষাদ; ৪. শূদ্র-পুরুষ ও বৈশ্য-স্ত্রী হইতে অযোগব; ৫. বৈশ্য-পুরুষ ও ক্ষত্রিয়-স্ত্রী হইতে মাগধ; ৬. ক্ষত্রিয়-পুরুষ ও ব্রাহ্মণ-স্ত্রী হইতে সূত; ৭. শূদ্র-পুরুষ ও ক্ষত্রিয়-স্ত্রী হইতে ক্ষত্তা; ৮. বৈশ্য-পুরুষ ও ব্রাহ্মণ-স্ত্রী হইতে বৈদেহ; ৯. শূদ্র-পুরুষ ও ব্রাহ্মণ-স্ত্রী হইতে চণ্ডাল উৎপন্ন হয়।'

—আচারাঙ্গ নির্যুক্তি অ. ১, গাথা ২১-২৭

বর্তমান কালে যে মনুসংহিতা পাওয়া যায়, তাহা এই নির্যুক্তির তুলনায় খুবই আধুনিক।

---

১. 'আবাহ' মানে পুত্রবধূকে ঘরে আনা ও বিবাহ মানে নিজের কন্যার বিবাহ দিয়া, তাহাকে তাহার পতিগৃহে প্রেরণ করা।

তথাপি এই নির্যুক্তির সময়, ব্রাহ্মণরা মনুসংহিতায় বর্ণিত অনুলোম ও প্রতিলোম জাতিগুলির উৎপত্তি এইভাবেই ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিত, এইরূপ অনুমান করিবার বিরুদ্ধে কোনো আপত্তি দেখা যায় না। এবং জৈনরা তাহাদের এই ব্যাখ্যা ব্রাহ্মণদের নিকট হইতেই গ্রহণ করিয়া থাকিবে বলিয়া প্রবল সন্দেহ হয়। সে যাহাই হউক, নির্গ্রন্থ শ্রমণরা যে জাতিভেদ প্রথায় সম্পূর্ণ সম্মতি দিয়াছিল, ইহা তাহার একটি উত্তম উদাহরণ।

হীনজাতীয় লোকদিগকে জৈন সাধুসংঘে গ্রহণ করিতে নিষেধ

'বালে বুড্‌ঢে নপুংসে য কীবে জড্‌ডে য বাহি-এ।
তেণে রায়াবগারী য উম্মত্তে য অদংসণে॥
দাসে দুট্‌ঠে য মূঢ়ে য অণত্তে জুঙ্গি-এ ই য।
উবদ্ধ-এ চ ভয়-এ সেহনিপ্‌ফোড়িয়া ই য॥

১. বালক, ২. বৃদ্ধ, ৩. নপুংসক, ৪. ক্লীব, ৫. জড়, ৬. ব্যাধিগ্রস্ত, ৭. চোর, ৮. রাজাপরাধী, ৯. উন্মত্ত, ১০. অদর্শন (?), ১১. দাস, ১২. দুষ্ট, ১৩. মূঢ়, ১৪. ঋণার্ত, ১৫. জুঙ্গিত, ১৬. কয়েদী, ১৭. ভয়ার্ত, ১৮. অন্য সংঘ হইতে ভুলাইয়া আনা শিষ্য, এই আঠারো প্রকারের লোককে জৈন সাধুসংঘে গ্রহণ করিতে নিষেধ আছে। ইহাদের মধ্যে অনেকগুলি বৌদ্ধ-ভিক্ষুসংঘেও গ্রহণ করা চলে না। এই দুই সংঘের প্রবেশবিধির (উপসম্পদের) তুলনামূলক আলোচনা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হইবে।[1] কিন্তু তাহা বর্তমান পরিচ্ছেদের বিষয় নয়। উপরে নির্দিষ্ট আঠারো প্রকার লোকের মধ্যে, পঞ্চদশটির সম্বন্ধে কিছু বিবেচনা করা আবশ্যক। ইহার সম্বন্ধে টীকাকার এইরূপ লিখিয়াছেন—

"তথা জাতি-কর্ম-শরীরাদিভির্দূষিতো জুঙ্গিতঃ। তত্র মাতঙ্গ-কোলিক-বরুড়-সূচিক-ছিম্পা-দয়োহস্পৃশ্যা জাতিজুঙ্গিতাঃ। স্পৃশ্যা অপি স্ত্রী-ময়ূর কুক্কুট-শুকাদি-পোষকা বংশবরত্রারোহণ-নখ-প্রক্ষালন-সৌকরিকত্ব-বাগুরিকত্বাদিনিন্দিত-কর্মকারিণঃ কর্মজুঙ্গিতাঃ। করচরণবার্জিতাঃ পঙ্গু-কুব্জ-বামনক-কাণ প্রভৃতয়ঃ শরীরজুঙ্গিতাঃ। তেহপি ন দীক্ষার্হা লোকেহ বর্ণবাদসম্ভবাৎ।'

'এইভাবেই জাতি, কর্ম, শরীর ইত্যাদিতে দূষিত ব্যক্তিকে জুঙ্গিত বলিয়া জানিবে। ইহার মধ্যে মাতঙ্গ, কোলিক, বরুড়, দর্জি, রঞ্জক প্রভৃতি অস্পৃশ্যরা জাতিতে জুঙ্গিত। স্পৃশ্য হইয়াও, যাহারা স্ত্রী, ময়ূর, মুর্গী, তোতা প্রভৃতি পোষে, বাঁশের ও দড়ির উপর কসরৎ করে, নখ পরিষ্কার করে, শূকর পালে, ব্যাধের কাজ করে,—এইরূপ নিন্দনীয় কাজ করে, তাহারা কর্মজুঙ্গিত হয়। যাহাদের হাত-পা নাই, যাহারা পঙ্গু, কুব্জ, বেঁটে, টেরা, ইত্যাদি

১. বৌদ্ধভিক্ষুসংঘের প্রবেশবিধি সম্বন্ধে 'বুদ্ধ, ধর্ম আণি সংঘ', পৃ. ৫৬-৬০, ও বৌদ্ধসংঘাচা পরিচয়', পৃ. ১৭-১৯ দ্রষ্টব্য।

তাহারা জুঙ্গিত। তাহাদিগকে দীক্ষা দিলে, সমাজে নিন্দা হওয়া সম্ভবপর বলিয়া, তাহাদিগকে দীক্ষা দেওয়া উচিত নয়।'[১]

বৌদ্ধভিক্ষুসংঘে প্রবেশ করার জন্য জাতি মোটেই অন্তরায় হইত না। কাহারো কর্ম নিন্দনীয় হইলে, অবশ্য তাহাকে তাহা ছাড়িতেই হয়, কিন্তু ঐজন্য সে দীক্ষার অযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয় না।

অহিন্দুদের হিন্দুসমাজে প্রবেশ

এইরূপ হইলেও, বৌদ্ধ ও জৈন, এই দুই সম্প্রদায়ই পরদেশের লোকদিগকে হিন্দুসমাজে গ্রহণ করার গুরুত্বপূর্ণ কার্যটি করিয়াছিল। গ্রীক, শক, হূণ, মালব, গুর্জর ইত্যাদি ভিন্নদেশীয় জাতিগুলি ভারতবর্ষে আসিয়া দুই ধর্মের প্রশস্ত দ্বারের ভিতর দিয়া হিন্দুসমাজে প্রবেশ করিয়াছিল। প্রথম এই-সব লোক জৈন কিংবা বৌদ্ধ হইত, এবং তাহার পর, যাহার যেমন ইচ্ছা, সে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় কিংবা বৈশ্য হইত। একই পরিবারে এক ভাইয়ের সন্তানের ক্ষত্রিয়ত্ব ও অন্য ভাইয়ের সন্তানের ব্রাহ্মণত্ব গ্রহণ করার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।[২]

অস্পৃশ্যতার ফল

এইভাবে নানারকম লোক হিন্দু-সমাজে মিশিয়া গেল বটে, তবু অস্পৃশ্যদের অবস্থার কোনো উন্নতি হইল না। জৈন ও বৌদ্ধ শ্রমণরা তাহাদের প্রতি অবহেলা করিয়াছিল ও ঐজন্য উত্তরোত্তর অস্পৃশ্যদের সম্বন্ধে লোকের অনুদার দৃষ্টি বাড়িয়াই গেল; শুধু তাহাই নহে, তাহাদের উপর অত্যাচারও হইতে লাগিল, এবং তাহার বিষময় ফল ধীরে ধীরে সমগ্র সমাজ এবং প্রত্যক্ষ জৈন ও বৌদ্ধদিগকেও ভোগ করিতে হইল।

জাতিভেদ ক্রমেই দৃঢ় হইয়া যাওয়ায়, এবং জৈন ও বৌদ্ধরা সকল জাতির নিকট হইতে ভিক্ষা লইত বলিয়া, তাহার সমাজে নিন্দার পাত্র হইয়া পড়িল। জৈন সংঘে অস্পৃশ্যদিগকে গ্রহণ করা নিষিদ্ধ ছিল ঃ তথাপি তাহারা শূদ্রকে সংঘে গ্রহণ করিত বলিয়া মনে হয়। অবশ্য, বৌদ্ধসংঘে শেষ পর্যন্ত জাতিভেদের কোনো স্থান ছিল না। কিন্তু সাধারণ সমাজে জাতিভেদ প্রবলতর হইল; ও ব্রাহ্মণেরা শম্বুকের গল্পের মতো কাহিনী রচনা করিয়া, লোকপ্রিয় পুরাণগুলিতে ঢুকাইতে সমর্থ হইল। দেখিতে দেখিতে, বৌদ্ধ শ্রমণ

---

১. প্রবচন সরোদ্ধার, দ্বার ১০৭। এই উদ্ধৃতাংশটি মুনি শ্রীজিনবিজয়জী বাহির করিয়া দিয়াছেন; এইজন্য আমি তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা ব্যক্ত করিতেছি।

২. পাঠক এই সম্বন্ধে Dr. D. R. Bhandarkar-এর Indian Antiquarys পত্রিকায় (Volume 40, Jan, 1911, pp 7-37) প্রকাশিত "The Foreign Elements in the Indian Population." প্রবন্ধটি দ্রষ্টব্য। বিশেষত পৃ. ৩৫-৩৬ এর বিবরণটি (অবশ্য পড়িবেন) বিশেষ দ্রষ্টব্য।

একেবারেই লুপ্ত হইল, আর জৈন শ্রমণরা কোনোপ্রকারে প্রাণ বাঁচাইয়া রহিয়া গেল! তাহাদের দ্বারা সমাজসংস্কারের কোনোরকম মহৎ কার্যই হইল না।

অন্য দেশে ভিক্ষুসংঘের কার্যাবলী

জাতিভেদের সম্মুখে বৌদ্ধ ভিক্ষুসংঘ ভারতবর্ষে টিকিয়া থাকিতে পারিল না। তথাপি ভারতের বাহিরে উহা খুব বাড়ো রকমের কার্য সম্পাদন করিয়াছে। দক্ষিণে সিংহলদ্বীপ, পূর্বে ব্রহ্মদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া জাপান পর্যন্ত ও উত্তরে তিব্বত, মঙ্গোলিয়া প্রভৃতি দেশগুলিতে, বৌদ্ধসংঘ এককালে সর্বসাধারণ লোকদিগকে শিক্ষিত ও সভ্য করিয়াছিল। উত্তরে হিমালয়ের ভিতর দিয়া, দক্ষিণে ও পূর্বে সমুদ্রের উপর দিয়া ভ্রমণ করিয়া, অনেক বৌদ্ধ ভিক্ষু বৌদ্ধ সভ্যতার পতাকা এইসকল দেশে উত্তোলন করিয়া রাখিয়াছে। এই সফলতার বীজ উপরি-বর্ণিত বুদ্ধের উপদেশের মধ্যে রহিয়াছে। যদি বুদ্ধ জাতিভেদকে কিছুমাত্র আস্কারা (আশকারা—প্রশ্রয়) দিতেন, তাহা হইলে তাঁহার অনুগামী ভিক্ষুরা ম্লেচ্ছ বলিয়া পরিগণিত দেশগুলিতে গিয়া বৌদ্ধধর্মের প্রসার করিতে পারিত না। জাতিভেদের জন্য আমাদের ক্ষতি হইয়াছে, কিন্তু পূর্ব-এশিয়া দেশের লাভ হইয়াছে, এইরূপ বলিতে হইবে!

একাদশ পরিচ্ছেদ

মাংসাহার

ভগবান বুদ্ধের মাংসাহার

পরিনির্বাণের দিন, ভগবান বুদ্ধ চুন্দ নামক কর্মকারের বাড়িতে শূকরের মাংস খাইয়াছিলেন। আর বর্তমানকালীন বৌদ্ধ ভিক্ষুরাও কম বা বেশি পরিমাণে মাংসাহার করিয়া থাকে অতএব প্রশ্ন উঠে যে, অহিংসাকে পরম ধর্ম বলিয়া মানে, এমন যে বুদ্ধ ও তাঁহার অনুগামী, ইহাদের এই আচরণ কি ক্ষমার যোগ্য? এই প্রশ্নের আলোচনা সংগত বলিয়া মনে হইতেছে।

পরিনির্বাণের দিন, বুদ্ধ যে-পদার্থটি খাইয়াছিলেন, তাহার নাম 'সূকরমদ্দব'। বুদ্ধঘোষাচার্য ইহার এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন—

"সূকর মদ্দবং ভি নাতিতরুণস্‌স নাতিজণ্ণস্‌স এক জেট্‌ঠকসূকরস্‌স পবত্তমং সং। তং কির মৃদুং চেব সিনিদ্ধং চ হোতি। তং পটিয়াদাপেত্বা সাধুকং পচাপেত্বা তি অত্থো। একে ভণন্তি, সূকরমদ্দবং তি পন মুদুত্তদনস্‌স পঞ্চগোরসযুসপাচনবিধানসস নামমেতং, যথা গবপানং নাম পাকনামং তি। কোচি ভণন্তি সূকরমদ্দবং নাম রসায়নবিধি, তং পন রসায়নত্থে আগচ্ছতি, তং চুন্দেন ভগবতো পরিনিব্বানং ন ভবেয্যা তি রসায়নং পটিয়ওং তি।"

'সূকরমদ্দব মানে খুব তরুণও নয়, আবার খুব বৃদ্ধও নয়, কিন্তু যাহা একেবারে ছোটো শিশু হইতে বয়সে বড়ো, এইরূপ শূকরের শিদ্ধ মাংস। তাহা মৃদু এবং স্নিগ্ধ হয়। তাহা প্রস্তুত করাইয়া, অর্থাৎ ভালোভাবে সিদ্ধ করাইয়া, এইরূপ অর্থ বুঝিবে। কেহ কেহ বলে, পঞ্চগোরসে প্রস্তুত মৃদু অন্নের এই নাম, যেমন গবপান শব্দটি একটি বিশিষ্ট মিষ্টান্নের নাম। কেহ বলে, সূকরমদ্দব নামে একটি রসায়ন (অর্থাৎ দীর্ঘায়ুজনক ঔষধ) ছিল। রসায়ন এই অর্থে এই শব্দটি ব্যবহার করা হয়। ভগবানের যাহাতে পরিনির্বাণ না হয়, এই উদ্দেশ্যে চুন্দ ভগবানকে উহা দিয়াছিল।'

এই টীকাতে সূকরমদ্দব শব্দটির প্রধান অর্থ শূকর-মাংস, এইরূপই করা হইয়াছে। তথাপি এই অর্থটি ঠিক কিনা, এই সম্বন্ধে বুদ্ধ ঘোষাচার্যের সন্দেহ ছিল। কেননা, তাহার সময়েই এই শব্দটির আরো দুইটি অর্থ করা হইত। তাহা ছাড়া, আরো দুইটি ভিন্ন অর্থ উদানঅট্‌ঠকথাতে দেখিতে পাওয়া যায়। তাহা এইরূপ—

"কেচি পন সূকরমদ্দবং তি ন সূকর মংসং, সূকরেহি মদ্দিত বংসকলীরো তি বদন্তি। অঞ্‌ঞে সূকরে হি মদ্দিতপদেসে জাতং অহিচ্ছওকং তি।"

'কেহ কেহ বলে, সূকরমদ্দব মানে শূকরের মাংস নয়। উহা শূকরের দ্বারা উৎপাদিত বাঁশ গাছের অঙ্কুর। অন্যেরা বলে যে উহা শূকরদ্বারা বিদারিত ভূমিতে গজায়, এই ধরনের এক প্রকার ব্যাঙের ছাতা।'

এইভাবে সূকরমদ্দব শব্দের অর্থ সম্বন্ধে খুবই মতভেদ আছে। তথাপি, ভগবান বুদ্ধ যে শূকরমাংস খাইতেন, ইহার প্রমাণ অঙ্গুত্তরনিকায়ের পঞ্চকনিপাতে পাওয়া যায়। উগ্‌গ গহপতি বলিতেছে—

"মনাপং মে ভন্তে সম্পন্নবরসূকরমংসং, তং মে ভগবা পটিগ্‌গণ্‌হাতু অনকম্পং উপাদায়া তি। পটিগ্‌গহেসি ভগবা অনুকম্পং উপাদায়া তি।"

'মহাশয়, এইটি উত্তম শূকরের মাংস; ইহা খুব ভালোভাবে সিদ্ধ করিয়া, প্রস্তুত করা হইয়াছে। দয়া করিয়া, ভগবান এইটুকু গ্রহণ করিলেন।'

জৈন শ্রমণদের মাংসাহার

অন্যান্য শ্রমণ-সম্প্রদায়ের মধ্যে যে-সব বড়ো বড়ো তপস্বী ছিল, তাহাদের মধ্যে বিশেষভাবে জৈন সম্প্রদায়ের শ্রমণরা যে মাংসাহার করিত, ইহা আচারাঙ্গ সূত্রের নিম্নলিখিত উদ্ধৃতাংশটি হইতে লক্ষিত হইবে—

'সে ভিক্ষু বা ভিক্ষুণী বা সেজ্জং পুণ জাণেজ্জা বহুঅট্‌ঠিয়ং মংসং বা, মচ্ছং বা বহুকন্টকং, অস্মিং খলু পড়িগাহিতংসি অপ্পে সিয়া ভোয়ণজাএ বহুউজ্ঝিয়ধম্মিএ। তহপ্পগারং বহুঅট্‌ঠিয়ং বা মংসং, মচ্ছং বা বহুকন্টকং, লাভেবি সন্তে ণো পড়িগাহেজ্জা। সে ভিক্ষু বা ভিক্ষুণী বা গাহাবইকুলং পিণ্ডবায়পড়িয়াএ অনুপবিট্‌ঠে সমানে পরো বহু-অট্‌ঠিত্রণ মংসেণ মচ্ছে ণ উবনিমন্তেজ্জা, আউসন্তো সমণা অভিকংখসি খহু-অট্‌ঠিংয়ং মংসং পরিগাহেত্তএ? এরপ্পগারং নিগ্‌ঘোসং সোচ্চা নিসম্ম সে পুব্বমেব আলোএজ্জা, আউসোত্তি বা ভইণীত্তি বা ণো খলু মে কপ্পই বহুঅট্‌ঠিয়ং মংসং পড়িগাহেত্তএ, অভিকংখসি সে দাউং জাবইয়ং তাবইয়ং গোগ্‌গলং দলয়াহি মা অট্‌ঠিয়াইং। সে সবং বদন্তস্স পরো অভিহট্টু অন্তোপড়িগ্‌গহগংসি বহু অট্‌ঠিয়ং মংসং পরিভাএত্তা নিহট্টু দলএজ্জা, তহপ পগারং পড়িগ্‌গহণং পরহৎথংসি বা পরপায়ংসি বা অফাসুয়ং অণেসণিজ্জং লাভে বি সন্তে ণো পড়িগাহেজ্জা। সে আহচ্চ পড়িগাহিত্র সিয়াতং ণোহিত্তি বএজ্জা, অণোবত্তি বএজ্জা। সে ত্তমায়ায় এগন্তমবক্কমেজ্জা। অবক্কমেত্তা অহেআরামংসি বা অহেউবস্সয়ংসি বা অপ্পণ্ডএ জাব সন্তাণএ মংসগং মচ্ছগং ভোচ্চা অট্‌ঠিয়াইং কণ্টএ গহায় সে ত্তমায়াএ এগবন্তমবক্কমেজ্জা। অবক্কমেত্তা অহেজ্ঝামথণ্ডিলংসি বা অট্‌ঠিরাসিংসি বা কট্‌ঠরাসিংসি প্পগারংসি থণ্ডিলংসি পড়িলেহিয় পড়িলেহিয় পমজ্জিয় পমজ্জিয় তত্ত সঞ্জয়ামেব পমজ্জিয় পমজ্জিয় পরি বেজ্জা।"

"আবারও সেই ভিক্ষু কিংবা সেই ভিক্ষুণী যদি এমন মাংস পায়, যাহাতে খুব হাড় আছে, অথবা এমন মাছ পায়, যাহাতে খুব কাঁটা আছে, তাহা হইলে তাহারা জানিবে যে, এইগুলিতে খাদ্যপদার্থ কম এবং ফেলিয়া দেওয়ার পদার্থ বেশি। এই প্রকার খুব হাড় আছে এমন মাংস, অথবা খুব কাঁটা আছে এমন মৎস্য পাইলে, তাহা তাহাদের গ্রহণ করা উচিত নয়। সেই ভিক্ষু কিংবা ভিক্ষুণী গৃহস্থের ঘরে ভিক্ষার জন্য গেলে, গৃহস্থ বলিবে, 'হে আয়ুষ্মান্ শ্রমণ, বহু হাড় আছে, এমন মাংস তুমি গ্রহণ করিতে চাও কি?' তখন এই কথা শুনিয়া,

প্রথমেই সে বলিবে, 'হে আয়ুষ্মান্, অথবা (স্ত্রী হইলে) হে ভগিনী, খুব হাড় আছে, এমন মাংস আমার গ্রহণ করা উচিত নয়। যদি তোমার ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে আমাকে মাংসটুকুই দাও, হাড় দিয়ো না।' এইরূপ বলার পরেও, যদি ঐ ব্যক্তি তাহা দেওয়ার জন্য আগ্রহ করে, তবে তাহা গ্রহণের অযোগ্য বলিয়া মনে করিয়া গ্রহণ করিবে না। যদি ঐ ব্যক্তি সেই পদার্থ ভিক্ষার পাত্রে ফেলিয়া দেয়, তাহা হইলে উহা লইয়া কোথাও এক দিকে যাইবে এবং কোনো বাগানে অথবা আশ্রয়স্থানে, যেখানে প্রাণীর ডিম কম থাকার কথা, এমন জায়গায় বসিয়া শুধু মাংস ও মৎস্যটুকুই খাইয়া, হাড় ও কাঁটা লইয়া এক পাশে যাইবে। সেখানে গিয়া শুষ্ক জমির উপর, হাড়ের স্তূপের উপর, মরিচাপড়া লোহার পুরাতন টুকরার স্তূপে, তুষের ঢিপিতে, শুষ্ক গোবরের ঢিপিতে অথবা এই রকম অন্য কোনো উঁচু জায়গাতে, প্রথমে জায়গাটি ভালোভাবে পরিষ্কার করিয়া, ঐ হাড় কিংবা কাঁটা যত্নের সহিত রাখিয়া দিবে।'

উপরের কথাগুলিরই রূপান্তর দশবৈশালিসূত্রের নিম্নলিখিত গাথাগুলিতে সংক্ষিপ্তভাবে দেওয়া হইয়াছে—

বহুঅট্‌ঠিয়ং পুগ্‌গলং অসিমিসং বা বহুকণ্টয়ং।
অচ্ছিয়ং তিন্দুয়ং বিল্লং, উচ্ছুখণ্ডং ব সিংবলিং॥
অপ্পে সিআ ভোঅণজ্জাএ, বহুউজ্ঝিয ধম্মিয়ং।
দিন্তিয়ং পড়িআইক্খে ন মে কপ্পঈ তারিসং॥

"বহু হাড় আছে এমন মাংস, বহু কাঁটা আছে এমন মাছ, অস্থিবৃক্ষের ফল, বেলফল, আখ, শাল্মলি এই রকমের পদার্থ—যাহাতে খাদ্যের ভাগ কম, ও ফেলিয়া দেওয়ার ভাগ বেশি—যে ব্যক্তি দেয়, তাহাকে 'ইহা আমার পক্ষে যোগ্য নয়', এইরূপ বলিয়া ঐ রকম জিনিস প্রত্যাখ্যান করিবে।"

মাংসাহার সম্বন্ধে বিখ্যাত জৈন সাধুদের মত

গুজরাজ বিদ্যাপীঠে পুরাতত্ত্ব মন্দির নামক একটি শাখা ছিল; ঐ শাখার তরফে 'পুরাতত্ত্ব' নামক একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকা বাহির করা হইত। এই পত্রিকার ১৯২৫ সনের এক সংখ্যায়; আমি বর্তমান পরিচ্ছেদটির মতো একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম এবং উহাতে উপরের উদ্ধৃত অংশ দুইটিও দিয়াছিলাম। আমি যে নিজে এইগুলি গবেষণা করিয়া বাহির করিয়াছিলাম, এমন নয়। মাংসাহার-সম্বন্ধে আলোচনা করার সময়, একজন বিখ্যাত জৈন পণ্ডিতই এইগুলি আমার দৃষ্টিপথে আনেন; আর আমি আমার প্রবন্ধে সেইগুলি কাজে লাগাইয়াছিলাম।

এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হওয়ার পর, আমেদাবাদের জৈনদের মধ্যে খুবই চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইল। তাহারা পুরাতত্ত্ব মন্দিরের সঞ্চালকদিগের নিকট এইরূপ নালিশ করিলেন যে, আমি তাহাদের ধর্মের উচ্ছেদ করিতে চাই। পত্রিকার সঞ্চালকরা নিজেরাই ঐ নালিশের জবাব দিলেন। আমাকে তাহার ধাক্কা সামলাইতে হয় নাই।

ঐ সময়, 'স্থানক' নিবাসী বয়োবৃদ্ধ সাধু গুলাবচন্দ এবং তাঁহার বিখ্যাত শতাবধানী[১] শিষ্য রতনচন্দ আমেদাবাদে থাকিতেন। জনৈক জৈন পণ্ডিতের সহিত আমি একদিন তাঁহার দর্শন লইবার (পাইবার) জন্য গিয়াছিলাম। তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। এবং জৈন সাধুরা নিজেদের নিকট আলো না রাখায়, ঐ সাধু দুইটির চেহারা স্পষ্ট দেখা যাইতেছিল না। আমার সঙ্গের জৈন পণ্ডিতটি রতনচন্দ স্বামীর নিকট আমার পরিচয় করিয়া দিলেন। তখন তিনি বলিলেন, "আমি তোমার খ্যাতি শুনিতেছি। কিন্তু তুমি আমাদের প্রাচীন সাধুরা মাংসাহার করিত, এইরূপ লিখিয়া, আমাদের ধর্মে আঘাত করিয়াছ। ইহা ঠিক নয়।"

আমি বলিলাম, "প্রাচীন শ্রমণ-সম্প্রদায়ের মধ্যে, শুধু বৌদ্ধ ও জৈন, এই দুইটি সম্প্রদায়ই আজ বিদ্যমান রহিয়াছে। আর এই সম্প্রদায় দুইটি সম্বন্ধে আমার মনে কতখানি প্রেম আছে, তাহা (আমার সঙ্গী) এই পণ্ডিত মহাশয়কেই জিজ্ঞাসা করিয়া দেখুন। কিন্তু গবেষণার কাজে, শ্রদ্ধা ভক্তি কিংবা প্রেমকে অন্তরায় হইতে দেওয়া উচিত নয়! আমার মনে হয় না যে, সত্যকথন দ্বারা কোনো সম্প্রদায়েরই লোকসান (ক্ষতি) হইতে পারে। এবং সত্য প্রকাশ করা প্রত্যেক গবেষকের কর্তব্য বলিয়া আমার ধারণা।"

বৃদ্ধ সাধু গুলাবচন্দ আমা-হইতে কিছু দূরে বসিয়াছিলেন এবং সেখান হইতেই তিনি নিজ শিষ্যদিগকে কহিলেন, "এই ভদ্রালোক উদ্ধৃত অংশ দুইটির যে-অর্থ করিয়াছেন, তাহাই ঠিক; আধুনিক টীকাকাররা উহাদের যে-অর্থ করেন, তাহা ঠিক নয়। এই দুইটি উদ্ধৃতাংশ ছাড়া; আরো কয়েক জায়গায়, এককালে জৈন সাধুরা যে মাংস খাইত তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।"

এইরূপ কহিয়া, তিনি জৈন সূত্র হইতে কিয়দংশ আওড়াইতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু তাহার বিদ্বান্ শিষ্যরা বিষয় বদলাইয়া, এই আলাপটি সেখানেই ঐভাবেই ছাড়িয়া দিলেন। তাহাদের গুরু যে-সব তথ্যের কথা বলিয়াছিলেন, সেইগুলি কী, তাহা আর আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করি নাই। ঐরূপ করা আমার নিকট অপ্রাসঙ্গিক বলিয়া মনে হইয়াছিল।

মহাবীর স্বামী মাংসাহার করিতেন কি না সেই সম্বন্ধে বাদবিবাদ

স্বয়ং মহাবীর স্বামী যে মাংসাহার করিতেন, তাহার সম্বন্ধে আজকাল সবল (অকাট্য) প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। 'প্রস্থান' নামক পত্রিকার গত কার্তিক সংখ্যায় (সংবৎ ১৯৯৫, বর্ষ ১৪, সংখ্যা ১) শ্রীযুক্ত গোপালদাস জীবাভাই পটেল "শ্রীমহাবীর স্বামীর মাংসাহার" নামক একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। উহা হইতে বর্তমান বিষয়ের উপযোগী কিছু তথ্য সংক্ষেপে এখানে দিতেছি।

মহাবীর স্বামী শ্রাবস্তী নগরীতে থাকিতেন। মক্‌খলি গোসালও সেখানে উপস্থিত হইলেন। আর উহারা উভয়ে পরস্পরের "জিনত্ব" সম্বন্ধে তীব্র সমালোচনা করিতে লাগিলেন।

---

১. শতাবধানী মানে যে ব্যক্তি এক শত বিষয়ে একই সঙ্গে মনোযোগ দিতে পারে।

পরিশেষে গোসাল মহাবীরস্বামীকে এই শাপ দিলেন, "আমার তপস্যার বলে, তুমি ছয় মাস পর পিত্তজ্বরে মৃত্যুমুখে পতিত হইবে।" মহাবীরস্বামীও তদুত্তরে তাহাকে এই অভিসম্পাত করিলেন, "তুমি আজ হইতে সপ্তম দিনের রাত্রিতে পিত্তজ্বরে ভুগিয়া মরিবে।" তাহার কথামত গোসাল সপ্তম রাত্রিতে মরিয়া গেলেন। কিন্তু তাহার প্রভাবে মহাবীরের শরীরে খুব জ্বালা হইয়া, রক্তবমি আরম্ভ হইল।

তখন মহাবীরস্বামী সিংহ নামক তাহার শিষ্যকে কহিলেন, "তুমি মেণ্‌ঢিক গ্রামে রেবতী নামক মেয়ের কাছে যাও। সে আমার জন্য দুইটি পায়রা সিদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে; তাহা আমার এখন চাই না। 'কাল যে মুরগিটি বিড়ালে মারিয়া ফেলিয়াছিল, তুমি তাহার মাংস প্রস্তুত করিয়াছ। উহাই দাও', তাহাকে গিয়া এইরূপ বল।"

শ্রীযুক্ত গোপালদাস মূল ভগবতী সূত্র হইতে প্রয়োজনীয় বাক্যগুলি ঐ প্রবন্ধে উদ্ধৃত করেন নাই। এখানে তাহা দেওয়া ঠিক হইবে।—

"তং গচ্ছহ ণং তুমং সীহা মেণ্‌ঢিয়গামং নগরং রেবতীএ গাহাবতিণীএ গিহে তৎথ ণং রেবতীএ গাহাবতিণীএ মমং অট্‌ঠাএ দুবে কবোয়সরীরা উবক্খড়িয়া, তেহিং নো অট্‌ঠো। অৎথি সে অন্ন পরিয়াসিএ মজ্জারকড়এ কুক্কুড়মংসএ তং আহরাহি এএণং অট্‌ঠো।"

যিনি অর্ধমাগধী ভাষা কিছু কিছু জানেন, তিনি নিরপেক্ষ-ভাবে এই উদ্ধৃতাংশটি পড়িলে বলিবেন যে, ইহার যেরূপ অর্থ শ্রীযুক্ত গোপাল দাস করিয়াছেন, তাহা ঠিকই হইয়াছে। কিন্তু আজকাল[১] শ্রীযুক্ত গোপাল দাসের বিরুদ্ধে অনেক জৈন পণ্ডিত তীব্র সমালোচনা চালাইয়াছেন!

বৌদ্ধ ও জৈন শ্রমণদের মাংসাহারে পার্থক্য

মাংসাহার সম্বন্ধে জৈন ও বৌদ্ধদের মধ্যে কী ধরনের বাদবিবাদ হইত, তাহা আলোচনা করিলেও শ্রীযুক্ত গোপালদাসের কথা সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হয়।

অষ্টম পরিচ্ছেদে বলা হইয়াছে যে, বৈশালীর সেনাপতি সিংহ নির্গ্রন্থদের উপাসক ছিলেন (পৃ. ১৭৫)। বুদ্ধের উপদেশ শুনিয়া, তিনি বুদ্ধোপাসক হইলেন, এবং বুদ্ধকে ও ভিক্ষুসংঘকে নিজের বাড়িতে নিমন্ত্রণ করিয়া, সাদরে তাহাদিগকে খাওয়াইলেন। কিন্তু নির্গ্রন্থদের ইহা ভালো লাগে নাই। তাহারা বৈশালীতে এইরূপ একটি কথা উঠাইল যে, সিংহ একটি বড়ো পশু মারিয়া, গোতম ও তাহার ভিক্ষুসংঘকে ভোজ দিয়াছে, এবং ইহা পূর্বে জানা সত্ত্বেও, গোতম সিংহের দেওয়া এই ভোজ গ্রহণ করিয়াছেন! এক ভদ্রলোক সিংহের নিকট আসিয়া চুপি চুপি তাহাকে এই কথা বলিল। তখন সিংহ কহিলেন, এই-সব জনশ্রুতির কোনো অর্থ নাই। বুদ্ধকে জব্দ করিতে পারিলে, নির্গ্রন্থদের আনন্দ হয়। কিন্তু আমি জানিয়া শুনিয়া ভোজের জন্য প্রাণিহিংসা করিব, ইহা একেবারেই অসম্ভব।"[২]

---

১. অর্থাৎ ১৯৩৮ সনে।

২. বুদ্ধলীলাসার সংগ্রহ, পৃ. ২৭৯-২৮১ দ্রষ্টব্য।

এইরূপই অপর একটি স্থল মজ্ঝিমনিকায়ের (৫৫ তম) জীবকসুত্তে পাওয়া যায়। তাহা এইরূপ—

এককালে ভগবান রাজগৃহে জীবক কৌমারভৃত্যের আম্রবনে বাস করিতেন। তখন জীবক কৌমারভৃত্য ভগবানের নিকট আসিলেন। ভগবানকে অভিবাদন করিয়া তিনি একপাশে বসিলেন ও কহিলেন, 'মহাশয়, লোকে আপনার উপর এইরূপ আরোপ করে যে, আপনার জন্য প্রাণী মারিয়া তাহার মাংস রাঁধিয়া দিলে, আপনি তাহা খান। এই আরোপ কি সত্য?" ভগবান বলিলেন, "এই আরোপ নিছক মিথ্যা। আমি বলিয়া থাকি যে, নিজের জন্য প্রাণীহত্যা হইয়াছে এইরূপ নিজে দেখিলে শুনিলে অথবা ঐরূপ মনে সন্দেহ আসিলে; ঐ অন্ন নিষিদ্ধ বলিয়া জানিবে।"

ইহা হইতে বুদ্ধের উপর জৈনদের আরোপ কিরকমের ছিল, তাহা বুঝিতে পারা যায়। ভগবান বুদ্ধকে কেহ নিমন্ত্রণ করিয়া মাংস খাইতে দিলে, জৈনরা বলিত যে, শ্রমণ গোতমের জন্য (উদ্দিস্সকটং) পশু মারিয়া তাহার মাংস রাঁধিয়া দিলে তিনি তাহা খান জৈন সাধু নিজে কাহারো নিমন্ত্রণই গ্রহণ করেন না; রাস্তায় চলিতে চলিতে যাহা ভিক্ষা পাওয়া যায়, তাহাই গ্রহণ করে, এবং ঐ সময়, যদি মাংস ভিক্ষা পাওয়া যায়, তবে তাহাও খায়।

কোনো কোনো তাপস মাংসাহার বর্জন করিত

বুদ্ধের সময়, কোনো কোনো তপস্বী মাংসাহার নিষিদ্ধ বলিয়া মানিত। ইহাদের একজন তপস্বী ও কাশ্যপবুদ্ধের মধ্যে যে আলাপ হইয়াছিল, তাহা সুত্তনিপাতের (১৪) আমগন্ধসুত্তে পাওয়া যায়। ঐ সুত্তের অনুবাদ এইরূপ[১]—

১. (তিষ্যতাপস—) ধর্মসংগত উপায়ে শ্যামক, চিঙ্গুলক, চীনক,[২] গাছের পাতা, কন্দমূল ও ফল পাওয়া গেলে যে-ব্যক্তি উহাদ্বারাই উদর পরিপূরণ করে, সে অন্য উপভোগ্য জিনিসের জন্য মিথ্যা কথা বলে না।

২. হে কাশ্যপ, তুমি অন্যের দেওয়া ভালোভাবে প্রস্তুত উৎকৃষ্ট চাউলের রসাল ও উত্তম খাদ্য গ্রহণ করিয়া থাক। ইহাতে তুমি আমগন্ধ (অপবিত্র জিনিস) ভক্ষণ কর!

৩. হে ব্রহ্মবন্ধু, পাখির মাংসের সহিত মিশ্রিত চাউলের দ্বারা প্রস্তুত খাদ্য খাইবার সময়, তুমি বল যে, আমগন্ধ আমাদের যোগ্য নয়! হে কাশ্যপ, তাহা হইলে, আমি তেমাকে জিজ্ঞাসা করি, "তোমার আমগন্ধটি বাবা কিরকম?"

৪. (কাশ্যপবুদ্ধ—) প্রাণিহত্যা, বধ, ছেদন, বন্ধন, চুরি, মিথ্যাভাষণ, ঠকানো, প্রতারণা, তুকতাকের প্রয়োগ ও ব্যভিচার এইগুলি আমগন্ধ; আমগন্ধ মানে মাংসভোজন নয়।

---

১. এই আমগন্ধসুত্তের উপদেশটি খ্রীষ্টের নিম্নলিখিত কথার সহিত তুলনা করার যোগ্য। যাহা মুখে যায়, তাহা মানুষের পক্ষে অপবিত্র নয়, কিন্তু যাহা মুখ হইতে বাহিরে আসে, তাহা অপবিত্র।" (ম্যাথু, ১৫-১১)

২. তিনটিই ভিন্ন ভিন্ন ধান্যবিশেষের নাম।

৫. যাহাদের স্ত্রীলোক সম্বন্ধে সংযম নাই, যাহারা জিহ্বালোলুপ, অশুচিকর্মে রত, নাস্তিক, নির্দয় ও দুর্বিনীত, তাহাদের ধর্ম আমগন্ধ মাংসভোজন আমগন্ধ নয়।

৬. যাহারা রুক্ষ, নিষ্ঠুর, পাজী, মিত্রদ্রোহী, নির্দয়, অতিমানী, কৃপণ, কাহাকেও কিছু দেয় না, তাহাদের কর্ম আমগন্ধ; মাংসভোজন নহে।

৭. ক্রোধ, দেমাক, কঠোরতা, শত্রুতা, মায়া, ঈর্ষা, বৃথা বকা, মানাভিমান ও দুষ্ট লোকের সঙ্গ, এইগুলি আমগন্ধ; মাংসভোজন নহে।

৮. পাপী, যে ঋণ পরিশোধ করে না, পাজী, উৎকোচ-গ্রহণকারী, অসৎকর্মচারী, যে নরাধম এই সংসারেই নরক সৃষ্টি করে, ইহাদের কর্ম আমগন্ধ, মাংসভোজন নহে।

৯. প্রাণীদের প্রতি যাহাদের মায়াদয়া নাই, যাহারা অন্যকে লুটিয়া উপদ্রব করে, যাহারা দুঃশীল, যাহারা ভীষণ, যাহারা গালাগালি করে, যাহারা কাহাকেও সম্মান করে না (ইহাদের কর্ম) আমগন্ধ; মাংসভোজন নহে।

১০. যাহারা এইরূপ কর্মে আসক্ত থাকে, যাহারা অন্যের বিরোধিতা করে, অন্যের সর্বনাশ করে, সর্বদা এমন কাজে ব্যাপৃত থাকে যে, তজ্জন্য পরলোকে অন্ধকারে প্রবেশ করে ও পা উপরে এবং মাথা নীচে, এই অবস্থায়, নরকে পতিত হয়, (তাহাদের কর্ম) আমগন্ধ; মাংসভোজন নহে।

১১. মৎস্যমাংসবর্জন, উলঙ্গ থাকা, মস্তক-মুণ্ডন করা, জটা ধারণ করা, ভস্মমাখা, রুক্ষ হরিণের চামড়া পরিধান করা, অগ্নিহোত্রের উপাসনা অথবা ইহলোকের অন্যান্য বিবিধ তপশ্চর্যা, মন্ত্রাহুতি, যজ্ঞ, শীতোষ্ণ সেবন করিয়া তপস্যা, এইগুলি, যে মরণশীল মানুষ মিথ্যা সংশয়ের অতীতে যাইতে পারে নাই, তাহাকে পবিত্র করিতে পারে না।

১২. ইন্দ্রিয়ের সংযম বজায় রাখিয়া ও ইন্দ্রিয়গুলির স্বভাব জানিয়া, যে সংসারে চলে, যে সর্বদা ধর্মেই স্থিত থাকে, ঋজুতা ও মৃদুতায় যে সন্তুষ্ট থাকে, যে সংজ্ঞাতীত ও যাহার সর্বদুঃখ নাশ হইয়াছে, এমন যে ধীরপুরুষ, তিনি দৃষ্ট এবং শ্রুত পদার্থে আবদ্ধ হন না।

১৩. এই কথা ভগবান বারবার ব্যক্ত করিয়াছেন ও তাহা উক্ত মন্ত্রপারদর্শী (ব্রাহ্মণ তাপস) জানিলেন। ইহা ঐ আমগন্ধহীন, আসক্তিশূন্য ও অদম্য মুনি রম্যগাথাতে প্রকাশ করিলেন।

১৪. আমগন্ধহীন ও সর্বদুঃখনাশক বুদ্ধের এই সুভাষিত বচন শুনিয়া ঐ (তাপস) নম্রভাবে তথাগতের পায়ে পড়িলেন এবং এখানেই তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন।

শ্রমণদের দ্বারা মাংসাহারের সমর্থন

এই সুত্তটি অতীব প্রাচীন। কিন্তু ইহা যে স্বয়ং কাশ্যপ-বুদ্ধের উপদেশ, সেইরূপ বুঝিবার পক্ষে সবল যুক্তি নাই। বুদ্ধকালীন ভিক্ষুরা মাংসাহারের এইভাবে সমর্থন করিতেন, শুধু

ইহাই বুঝিতে হইবে।

এই সুত্তটিতে তপস্যা নিরর্থক বলিয়া মানা হইয়াছে। এই মত জৈন শ্রমণদের ভালো লাগিবার কথা নয়। কেননা, তাহারা বার বার তপস্যা করিত। তথাপি মাংসাহারের সমর্থন করিতে হইলে, তাহাদিগকে উক্ত প্রকারেই মাংসাহারের সমর্থন করিতে হইত। কারণ, তাহারা তাহাদের পূর্বকালীন তপস্বীদের মতো বনেজঙ্গলে থাকিয়া, ফলমূলের সাহায্যে উদরপূরণ করিত না। কিন্তু সর্বসাধারণ লোকের দেওয়া ভিক্ষার উপর নির্ভর করিয়াই, তাহারা জীবনধারণ করিত; আর তৎকালে মাংস-মৎস্যশূন্য ভিক্ষা পাওয়া অসম্ভব ছিল। ব্রাহ্মণরা যজ্ঞে হাজার হাজার প্রাণী বধ করিয়া, উহাদের মাংস চারিদিকের জনসাধারণের মধ্যে বিতরণ করিত। পল্লীগ্রামের লোকেরা ঠাকুর দেবতার নিকট বলি দিয়া, বলির মাংস খাইত। তাহা ছাড়া কসাইরা প্রত্যক্ষ খোলা বাজারে গোরু মারিয়া তাহার মাংস বিক্রয় করিতে বসিত। এই রকম অবস্থায়, রাঁধা অন্ন ভিক্ষা করিয়া যাহারা প্রাণধারণ করিত, এইরূপ শ্রমণদের পক্ষে, মাংস ছাড়া ভিক্ষা পাওয়া কিভাবে সম্ভবপর ছিল?

জৈনদের মতে, পৃথ্বীকায়, অপ্‌কায়, বায়ুকায়, অগ্নিকায়, বনস্পতিকায় ও এসকায়, এইরূপ ছয়টি জীবের শ্রেণী আছে। পৃথ্বীকায় মানে পৃথিবীর পরমাণু; তেমনই জল, বায়ু ও অগ্নির পরমাণু ও সজীব। বনস্পতিকায় মানে বৃক্ষাদি বনস্পতি। ইহারা যে সজীব তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। এসকায় মানে কীট পিপীলিকা হইতে আরম্ভ করিয়া হাতি পর্যন্ত, ছোটো বড়ো সব রকম প্রাণী। এই ছয় রকম কায়ার মধ্যে যে-কোনো প্রাণীর হিংসা করাই জৈন শ্রমণ পাপ বলিয়া মনে করে। এই কারণে, তাহারা রাত্রিতে প্রদীপ জ্বালায় না, ঠাণ্ডা জল খায় না ও পৃথিবীর পরমাণু প্রভৃতির যাহাতে সংহার না হয়, সেইজন্য খুব সাবধানতা অবলম্বন করে।

কিন্তু জৈন উপাসক (গৃহী ভক্ত) ক্ষেত চাষ করে, শস্য জন্মায়, এবং রাঁধিয়া খাদ্য প্রস্তুত করে। এই কাজে পৃথিবী, অপ্‌, তেজ, বায়ু, বনস্পতি ও এস, এই ছয় প্রকার জীবেরই সংহার হয়। মাটিতে চাষ দেওয়ার সময়, শুধু পৃথিবীর পরমাণু নষ্ট হয়, এমন নহে, কিন্তু কীট, পিপীলিকা ইত্যাদি ছোটো ছোটো লক্ষ লক্ষ প্রাণীও মরে। চাউল, ডাল প্রভৃতি ধান্য সিদ্ধ করিবার সময়, বনস্পতিকায়, অপ্‌কায়, অগ্নিকায় ও বায়ুকায়, এই-সব প্রাণীরই উচ্ছেদ ঘটে। এতৎসত্ত্বেও, জৈন সাধুরা রাঁধা অন্নের ভিক্ষা গ্রহণ করেই। তাহা হইলে, জৈন উপাসকের দ্বারা প্রস্তুত মাংস ভিক্ষা লইতে প্রাচীন জৈন শ্রমণদের কি আপত্তি ছিল? আর যদি তাহারা এইরূপ ভিক্ষা গ্রহণের সমর্থন করিতেন, তাহা হইলে উক্ত-আমগন্ধ-সুত্তে কথিত প্রকারেই করিতেন না কি?

গোমাংসাহারের বিরুদ্ধে আন্দোলন

এখন মাংসাহারের বিরুদ্ধে কি করিয়া আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছিল, সেই বিষয়ে অল্পের মধ্যে আলোচনা করিব। সকলের আগে, বৌদ্ধরাই গোমাংসাহারের বিরুদ্ধে আন্দোলন আরম্ভ করিয়া থাকিবেন। নবম পরিচ্ছেদে (পৃ. ২০১) গোজাতির উপকারিতা-দর্শক

ব্রাহ্মণধাম্মিক-সুত্তের দুইটি গাথা উদ্ধৃত করা হইয়াছে; তাহা ছাড়া, নীচের এই গাথাগুলিও দেখুন।

ন পাদা ন বিসানেন নাস্‌সু হিংসন্তি কেন চি।
গাবো এলক সমানা সোরতা কুম্ভ দুহনা।
তা বিসাণে গহেত্বান রাজা সত্থেন ঘাতয়ি॥
ততো চ দেবা পিতরো ইন্দো অসুর-রক্‌খসা।
অধম্মো ইতি পক্কন্দুং যং সত্থং নিপতী গবে॥

"গোরু মেষের মতো নম্র, ও হাঁড়ি ভরিয়া দুধ দেয়; উহা পা, শিং, কিংবা অন্য কোনো অবয়ব দিয়াই কাহারো হিংসা করে না (কাহাকেও মারে না)। এইরূপ গাভীকে (ব্রাহ্মণদের কথায়) রাজা ইক্ষবাকু উহাদের শিং ধরিয়া বধ করিল। তখন গোরুর উপর অস্ত্র প্রহার হওয়ায়, দেবগণ, পিতৃপুরুষরা, ইন্দ্র, অসুর, রাক্ষস 'অধর্ম হইয়াছে', এইরূপ বলিয়া চীৎকার করিতে থাকিলেন!"

বহুকাল ব্রাহ্মণরা গোমাংস ত্যাগ করে নাই

বৌদ্ধ ও জৈনদের চেষ্টায়, গোমাংসাহার নিষিদ্ধ হইতে থাকিল বটে, তথাপি ব্রাহ্মণদের মধ্যে ইহা নিষিদ্ধ হইতে, অনেক শতাব্দী লাগিয়াছিল। প্রথম, যজ্ঞের জন্য দীক্ষা লওয়ার পর, গোমাংস খাইবে না, এইরূপ একটি প্রতিজ্ঞা লওয়ার প্রথা প্রবর্তিত হইল।

"স ধেন্বৈ চানডুহশ্চ নাশ্নীয়াৎ। ধেন্বনডুহৌ বাহইদং সর্বং বিভৃতস্তে দেবা অব্রুবন্ ধেন্বনডুহৌ বাহইদং সর্বং বিভৃতো হন্ত যদন্যেষাং বয়সাং বীর্য্যং তদ্ধেন্বনডুহয়োর্দধামেতি....... তস্মাদ্ধেন্বনডুহয়োর্নাশ্নীয়াৎ তদু হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যোহ শ্নাম্যেবাহং মাংসলং চেদ্ভবতীতি॥"

"গোরু ও ষাঁড় খাইবে না। গোরু ও ষাঁড় (ব্রহ্মাণ্ডের) এই-সমস্ত পদার্থ ধারণ করে। ঐ দেবতারা কহিল, গোরু ও ষাঁড় এই সব-কিছু ধারণ করে, অতএব চলো আমরা অন্য জাতির পশুদের বীর্য গোরু ও ষাঁড়ের মধ্যে রাখিয়া দিই.......সুতরাং গোরু ও ষাঁড় খাইবে না। কিন্তু যাজ্ঞবল্ক্য কহেন (গোমাংসে) শরীর মাংসল হয়, এইজন্য আমি (এই মাংস) অবশ্যই খাইব।' (শতপথ ব্রাহ্মণ ৩।১।২।২১)।

এই আলোচনাটি যজ্ঞশালায় মাংসাহার-সম্বন্ধেই সীমাবদ্ধ ছিল। কাহারো মত এইরূপ ছিল যে, দীক্ষিত ব্যক্তি যজ্ঞশালায় প্রবেশ করার পর, গোমাংস খাইবে না। কিন্তু যাজ্ঞবল্ক্য এই মতের পক্ষপাতী ছিলেন না। (গোমাংসে) শরীর পুষ্ট হয়, এইজন্য তিনি তাহা বর্জন করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। অন্যান্য প্রসঙ্গে, গোমাংসাহার করা সম্বন্ধে ব্রাহ্মণদের মধ্যে মোটেই কোনো মতভেদ ছিল না। শুধু তাহাই নহে, অধিকন্তু কোনো বিশেষ অতিথি ঘরে আসিলে, বড়ো দেখিয়া একটি ষাঁড় মারিয়া অতিথি-সৎকারের পদ্ধতি তাহাদের মধ্যে বেশ সুপরিচিত ছিল। কেবল গৌতম-সূত্রকারই গোমাংসাহার নিষেধ করিয়াছেন। কিন্তু তিনিও মধুপর্ক বিধির পক্ষপাতী ছিলেন বলিয়া মনে হয়। এই বিধি ভবভূতির সময় পর্যন্ত ব্রাহ্মণদের মধ্যে অল্প পরিমাণে প্রচলিত ছিল বলিয়া মনে হয়। উত্তররামচরিতের চতুর্থ

অঙ্কের প্রারম্ভে সৌধাতকি ও দণ্ডায়ণ, এই দুইজনের মধ্যে, একটি কথোপকথন আছে। তাহার কিয়দংশ এইরূপ—

সৌধাতকি—কি বসিষ্ঠ!

দণ্ডায়ণ—তবে কি?

সৌ.—আমার মনে হয়, এই অতিথিটি একটি বাঘ হইবেন।

দ.—কি বলিতেছ!

সৌ.—তিনি আসা মাত্র, আমাদের ঐ বেচারী পিঙ্গলবর্ণের মাদী বাছুরটি একদম গিলিয়া ফেলিলেন!

দ.—মধুপর্কবিধি মাংসযুক্ত হওয় অত্যাবশ্যক, এই ধর্মশাস্ত্রের আজ্ঞা মান্য করিয়া, গৃহস্থরা ঘরে শ্রোত্রিয় অতিথি আসিলে, মাদী বাছুর কিংবা বড়ো ষাঁড় মারিয়া তাহার মাংস রন্ধন করিয়া থাকে। কারণ ধর্মসূত্রকাররা ঐরূপ উপদেশই দিয়াছেন।

ভবভূতির কাল সপ্তম শতাব্দী বলিয়া ধরা হয়। ঐ সময় এখনকার মতো গোমাংসভক্ষণ অত্যন্ত নিষিদ্ধ হইলে, তিনি তাঁহার নাটকে এইরূপ উল্লেখ করিতে পারিতেন না যে, বসিষ্ঠ একটি মাদী বাছুর খাইয়া ফেলিলেন। আজকাল এই রকম কথোপকথন কোনো নাটকে রাখিলে, ঐ নাটক হিন্দু সমাজের নিকট কতখানি প্রিয় হইবে?

প্রাণিবধের বিরুদ্ধে অশোকের প্রচার

প্রাণিহিংসার বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম প্রচার করিয়াছেন, এমন ঐতিহাসিক রাজার নাম নির্দেশ করিতে হইলে, অশোকের নাম বলিতে হয়। তাঁহার প্রথম শিলালিপিটি এইরূপ—

'এই ধর্মলিপি দেবতাদের প্রিয়, প্রিয়দর্শি-রাজা লিখাইয়াছেন। এই রাজ্যে কোনো প্রাণীই মারিয়া হোম-হরণ করিবে না, ও মেলা, যাত্রা প্রভৃতি আরম্ভ করিবে না। কারণ, মেলায় দেবতাদের প্রিয় প্রিয়দর্শি-রাজা অনেক দোষ দেখিতে পান। কোনো কোনো মেলা দেবতাদের প্রিয় প্রিয়দর্শি-রাজা পছন্দ করেন! পূর্বে প্রিয়দর্শি-রাজার পাকশালাতে রন্ধন করিবার জন্য, হাজার হাজার প্রাণী মারা হইত। যখন এই ধর্মলিপি লিখিত হইল, তখন হইতে দুইটি ময়ূর ও একটি হরিণ, এইভাবে শুধু তিনটি প্রাণী মারা হয়। আর হরিণও রোজ মারা হয় না। ভবিষ্যতে এই তিনটি প্রাণীও আর মারা হইবে না।'

উপরের শিলালিপিতে অশোক গাভী ও ষাঁড়ের উল্লেখ করেন নাই। ইহা হইতে অনুমান করা যায় যে, ব্রাহ্মণেতর উচ্চ জাতির মধ্যে তৎকালে গোমাংসাহার প্রায় বন্ধ হইয়া গিয়াছিল! শুধু তাহাই নহে; অধিকন্তু অশোক 'দৈনন্দিন আহারের জন্যও কোনো প্রকার প্রাণিবধ করিবে না', এইরূপ প্রচার চালাইলেন। শিলালিপিতে যে 'সমাজ' শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে আমি এখানে তাহার অনুবাদ 'যাত্রা' (মেলা) করিয়াছি। যদিও ইহা একেবারে নির্ভুল নয়, তথাপি মোটামুটিভাবে এই অনুবাদ গ্রহণযোগ্য বলিয়া মনে হইল। আজকাল যেমন মহারাষ্ট্রে 'যাত্রা', কিংবা উত্তর ভারতে 'মেলা' বসে, অশোকের সময় ঐ

রকম 'সমাজ' বসিত বলিয়া আন্দাজ করা যায় উহাতে দেবদেবীদিগের নিকট পশুবলি দিয়া, বড়ো উৎসব করা অশোক পছন্দ করিতেন না। যাহাতে পশুবলি হইত না, এইরূপ মেলা বসাইতে তাঁহার কোনো আপত্তি ছিল না। কি যজ্ঞে, কি মেলায়, যাহাতে পশুবলি না হয়, ইহার দিকে তাঁহার প্রধান লক্ষ্য ছিল।

আমাদের পূর্বপুরুষরা নিরামিষাশী ছিলেন না

আজকাল যাগযজ্ঞ প্রায় বন্ধ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু মেলাতে বলি দেওয়া অনেক জায়গায় এখনো প্রচলিত আছে। তথাপি অন্য যে-কোনো দেশের তুলনাতেই, ভারতবর্ষের লোক অধিক নিরামিষাশী। ইহার জন্য জৈন ও বৌদ্ধদের ধর্মপ্রচার কারণীভূত হইয়াছিল, ইহাতে সন্দেহ নাই। অবশ্য, আজকাল আমরা নিরামিষাশী, অতএব আমাদের পূর্ব-পুরুষরাও নিরামিষাশী ছিলেন, এইরূপ প্রতিপাদন করা, বাস্তবিক অবস্থার অনুযায়ী হইবে না।

চীনদেশের শূকরের গুরুত্ব

এখন প্রত্যক্ষভাবে শূকরের মাংস সম্বন্ধে দুই-চারিটি কথা লেখা সংগত বলিয়া মনে হয়। প্রাচীন কাল হইতে চীন দেশের লোকেরা শূকরকে ধনসম্পত্তির প্রতীক বলিয়া মনে করিত। তাহাদের লিপি (Script) নানা বস্তুর আকৃতির চিহ্নদ্বারা তৈয়ারি হইয়াছে। এই চিহ্নগুলির মিশ্রণে ভিন্ন ভিন্ন শব্দ তৈয়ার করা যায়। উদাহরণস্বরূপ, মানুষের চিহ্ন আঁকিয়া, তাহার উপর তলোয়ারের চিহ্ন আঁকিলে, উহার অর্থ "শূর" হয়। ঘরের চিহ্নের নীচে ছেলের চিহ্ন আঁকিলে, তাহার অর্থ হয় "অক্ষর"; আর ঘরের চিহ্নের নীচে স্ত্রীর দুইটি চিহ্ন আঁকিলে, তাহার অর্থ হয় "ঝগড়া", ও শূকরের চিহ্ন আঁকিলে, উহার অর্থ হয় "ধনসম্পত্তি"। অর্থাৎ গৃহে শূকর থাকা সম্পত্তির লক্ষণ, প্রাচীন চীনদেশীয়দের এইরূপ ধারণা ছিল; আর বর্তমান চীনদেশেও শূকরের ততখানিই গুরুত্ব আছে।

প্রাচীনকালের হিন্দুরা শূকরকে সম্পত্তির অংশ বলিয়া মানিত

ভারতবর্ষে শূকরের একটা গুরুত্ব কখনো না হইয়া থাকিলেও, উহাকে সম্পত্তির একটি বিশেষ অংশ বলিয়া মনে করা হইত। অরিয়-পরিয়েসনসুত্তে (মজ্ঝিমনিকায় ২৬) ঐহিক সম্পত্তির অনিত্যতা বর্ণনা করা হইয়াছে। তাহা এইরূপ—

'কি ঞ্চভিক্খবে জাতিধম্মং? পুত্তভরিয়ং ভিক্খবে জাতিধম্মং। দাসীদাসং......অজেলকং..... কুক্কুটসূকরং.....হত্তিগবাস্সবলবং......জাতরূপরজতং জাতিধম্মং।'

অর্থাৎ হস্তী, গাভী, অশ্ব প্রভৃতি সম্পত্তির মধ্যে মুরগী ও শূকরেরও সমাবেশ হইত। এইরকম অবস্থায়, শূকর মাংসের সম্বন্ধে আমাদের দেশে এতখানি ঘৃণা কি করিয়া উৎপন্ন হইল? যাগযজ্ঞে যে-সব পশু মারা হইত, তাহাদের মধ্যে শূকরের উল্লেখ পালি সাহিত্যে পাওয়া যায় না। অবশ্য বুদ্ধের সময়ে, এই প্রাণীটি অপবিত্র হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু উহা অভক্ষ্যও হইয়াছিল বলিয়া কোনো প্রমাণ নাই। যদি ঐরূপ হইত, তাহা হইলে ক্ষত্রিয়দের

গৃহসম্পত্তির মধ্যে, উহার সমাবেশ হইত না। সকলের আগে ধর্মসূত্রে শূকর মাংস ভক্ষণের নিষেধ পাওয়া যায়।[১] আর ইহার পরে এই ধর্মসূত্রের কথাগুলিই মনুসংহিতা প্রভৃতি স্মৃতিগ্রন্থে গৃহীত হইয়াছে।[২] কিন্তু বন্য শূকর কখনো নিষিদ্ধ হয় নাই। উহার মাংস পবিত্র বলিয়াই মানা হইয়াছে।[৩]

বুদ্ধ মিতাহারী ছিলেন না বলিয়া মিথ্যা আরোপ

ভগবান বুদ্ধ পরিনির্বাণের পূর্বে যে-পদার্থটি ভক্ষণ করিয়াছিলেন, তাহা শূকরের মাংস ছিল, এইরূপ ধরিয়া লইলেও, তিনি ঐ মাংস বদহজম হইবে এই পরিমাণে খাইয়াছিলেন, ও সেইজন্যই তাঁহার মৃত্যু হইল, এই যে কতক কুৎসিত সমালোচকের মত, তাহা কিন্তু একেবারে মিথ্যা। গোতম বুদ্ধ অমিত আহার করিয়াছেন বলিয়া কোনো উদাহরণ কিংবা প্রমাণ কোথাও পাওয়া যায় না। সুতরাং শুধু এই প্রসঙ্গেই তিনি ঐ পদার্থটি অপরিমিতভাবে খাইয়াছিলেন, এইরূপ বলা, কেবল দোষ দেখাইবার মনোবৃত্তিরই পরিচায়ক। ভগবান বুদ্ধ এই প্রসঙ্গের পূর্বে, বৈশালীতে তিন মাস ভীষণ রোগে ভুগিতেছিলেন, এবং সেইজন্য তাঁহার শরীরে বিশেষ শক্তি ছিল না। চুন্দ তাঁহাকে যাহা খাইতে দিয়াছিল, উহা তাঁহার পরিনির্বাণের শুধু নিমিত্ত কারণ হইয়াছিল। যাহাতে এইজন্য চুন্দ কর্মকারের উপর লোকেরা অনর্থক কোনো দোষ আরোপ না করে, সেইজন্য ভগবান তাঁহার পরিনির্বাণের পূর্বে আনন্দকে কহিলেন, "হে আনন্দ, চুন্দ কর্মকারকে হয়তো কেহ বলিবে 'হে চুন্দ, তুমি তথাগতকে যে-ভিক্ষা দিলে, তাহা খাইয়া ভগবানের পরিনির্বাণ হইল, ইহাতে তোমার পরম হানি।' এইরূপ কহিয়া, যদি তাহারা চুন্দ কর্মকারকে মনে দুঃখ দেয়, তাহা হইলে তোমরা এইভাবে চুন্দের দুঃখ দূর করিবে। তাহাকে বলিয়ো, 'হে চুন্দ, তোমার দেওয়া খাদ্য খাইয়া যে তথাগত পরিনির্বাণ লাভ করিলেন, তাহাতে বাস্তবিকই তোমার পরম লাভ। আমরা তথাগতের নিকট শুনিয়াছি যে, তথাগত যে-সব ভিক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন, তাহদের মধ্যে দুইটি ভিক্ষাই সর্বাপেক্ষা অধিক ফলদায়ক ও প্রশংসনীয়। ওই দুইটি কি? যে-ভিক্ষা গ্রহণ করিয়া, তিনি পরিনির্বাণ পাইলেন, ওইটি। চুন্দ যে-কার্য করিল, তাহা আয়ু, বর্ণ, সুখ, যশ, স্বর্গ ও প্রভুত্ব প্রদান করিবে বলিয়া বুঝিবে।' হে আনন্দ, এইভাবে চুন্দের মনের দুঃখ দূর করিবে।"

---

১. কাককঙ্ক গৃধ্রশ্যেনা জলজরক্তপাদতুন্ড গ্রাম্যকুক্কুট মুকরা—গৌতমসূত্র, ৮।২৯।
'একখুরোষ্ট্রগবয়গ্রামমুকরসরভগবাম্।' আপস্তম্বধর্মসূত্র, প্রশ্ন ১; পটল ৫ খণ্ডিকা ১৭।২৯।

২. মনুসংহিতা, অ. ৫।১৯।

৩. মনুসংহিতা, অ. ৩।২৭০।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

দৈনন্দিন কাজকর্ম

প্রসন্ন মুখকান্তি

যতদিন গৌতম বোধিসত্ত্ব ছিলেন, অর্থাৎ যতদিন তিনি গৃহে থাকিতেন ও পরে গৃহত্যাগ করিয়া নানা জায়গায় তপস্যা করিতেন, ততদিন তাঁহার দৈনন্দিন কার্যকলাপ কিরকম ছিল, তাহা চতুর্থ ও পঞ্চম পরিচ্ছেদেই বলা হইয়াছে। এখন এই পরিচ্ছেদে, বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির পর পরিনির্বাণ পর্যন্ত, তাঁহার প্রাত্যহিক জীবন কিরকম কাজকর্মে অতিবাহিত হইত, তাহার দিগ্‌দর্শন করিতে চাই।

তত্ত্ববোধ হওয়ার পর, ভগবান বুদ্ধ বোধিবৃক্ষের নীচেই নিজের ভবিষ্যৎ জীবনের কার্যতালিকা তৈয়ার করিয়াছিলেন। তপস্যা তো তিনি পূর্বেই ছাড়িয়া দিয়াছিলেন; আর পুনরায় কামভোগের দিকে ফিরিয়া যাইবার বাসনাও তাঁহার ছিল না; সুতরাং তিনি স্থির করিলেন যে, শরীর আচ্ছাদন করার পক্ষে যথেষ্ট বস্ত্র ও ক্ষুধা নিবারণের জন্য যথেষ্ট অন্ন, গ্রহণ করিয়া, তাঁহার অবশিষ্ট জীবন বহু-জনহিতার্থে ব্যয় করিবেন। এই সংকল্পদ্বারা বুদ্ধের মুখকান্তিতে কী পরিবর্তন ঘটিয়াছিল, তাহার বর্ণনা মজ্ঝিমনিকায়ের অরিয়পরিয়েসনসুত্তে এবং বিনয়ের মহাবেগ্‌গ-এ পাওয়া যায়।

ভগবান বুদ্ধ যখন পঞ্চবর্গীয় শিষ্যদিগকে উপদেশ দেওয়ার উদ্দেশ্যে, গয়া হইতে বারাণসীতে যাইতেছিলেন, তখন পথে, তাঁহার সহিত উপক-নামক আজীবক পন্থের একজন শ্রমণের দেখা হইল। ঐ শ্রমণ তাঁহাকে কহিল, "হে আয়ুষ্মান্ গোতম, তোমার চেহারা প্রসন্ন ও দেহকান্তি তেজঃপুর্ণ দেখাইতেছে। তুমি কোন্ আচার্যের শিষ্য?"

ভ.—আমার ধর্মমার্গ আমি নিজেই খুঁজিয়া বাহির করিয়াছি।

উপক.—কিন্তু তুমি 'অরহন্ত' হইয়াছে কি? তোমাকে 'জিন' বলা যাইতে পারিবে কি?

ভ.—হে উপক আমি সর্বপাপজনক মনোবৃত্তি জয় করিয়াছি, অতএব আমি জিন।

বুদ্ধের চেহারায় উপক যে প্রসন্নতা লক্ষ্য করিয়াছিল, তাহা তাঁহার জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল, এইরূপ ধরিয়া লইলে আপত্তির কারণ নাই।

দিনের সাধারণ কাজকর্ম

ভগবান বুদ্ধ প্রভাতে ঘুম হইতে উঠিতেন ও ঐসময় ধ্যান করিতেন, অথবা নিজের বসতিস্থানের আশেপাশে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। তাহার পর, সকালবেলা, তিনি গ্রামে ভিক্ষার জন্য বাহির হইতেন। ভিক্ষাপাত্রে সর্বজাতির লোকেদের নিকট হইতে যে-রাঁধা অন্ন পাইতেন, সেগুলি সব একত্র মিশিয়া যাইত। তিনি তাহা লইয়া, গ্রামের বাহিরে যাইতেন; এবং

কোথাও বসিয়া, তাহা ভোজন করিবার পর, কিছুকাল বিশ্রাম করিতেন, এবং তাহার পর ধ্যানস্থ হইয়া বসিয়া থাকিতেন। সন্ধ্যার সময়, আবার তিনি ভ্রমণে বাহির হইতেন। রাত্রিবেলা, কোথাও কোনো দেবালয়ে, ধর্মশালায় অথবা গাছের নীচে কাটাইতেন।

রাত্রির তিন প্রহরের মধ্যে প্রথম প্রহরে ভগবান বুদ্ধ ধ্যান করিতেন, কিংবা নিজের আবাস-স্থলের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। দ্বিতীয় প্রহরে, নিজের পরনের ভিতরের কাপড়টি চারি ভাঁজ করিয়া মাটিতে পাতিয়া, ও শিয়রে হাত রাখিয়া, ডান পায়ে বাম পা রাখিয়া, ডান কাঁকের উপর, সাবধানতার সহিত ঘুমাইতেন।

সিংহ-শয্যা

বুদ্ধের এই শয়ন প্রণালীটিকে সিংহ-শয্যা বলে। অঙ্গুত্তরনিকারের চতুক্কনিপাতে (সুত্ত ২৪৪) চার প্রকার শয্যা বর্ণিত আছে। ১. প্রেত-শয্যা—ইহা চিত হইয়া যে শয়ন করে এইরূপ ব্যক্তির। ২. কামভোগি-শয্যা—কামভোগে যাহারা আনন্দ পায় এইরকম লোক প্রায়ই বাম কাঁকের উপর কাত হইয়া ঘুমায়, এইজন্য এই শয্যাকে কামোপভোগি-শয্যা বলে। ৩. সিংহ-শয্যা—ডান পায়ের উপর বাম পা কিছু কাত করিয়া রাখিয়া, ও মনে মনে আমি অমুক সময় উঠিব, এইরূপ স্মরণ করিয়া, অত্যন্ত সাবধানতার সহিত ডান কাঁকের উপর কাত হইয়া নিদ্রা যাওয়াকে সিংহ-শয্যা বলে। ৪. তথাগত-শয্যা—অর্থাৎ চারিটি ধ্যানের সমাধি।

ইহাদের মধ্যে ভগবান বুদ্ধ শেষ দুইটি শয্যা পছন্দ করিতেন, অর্থাৎ তিনি রাত্রিবেলা হয় ধ্যান করিতেন, কিংবা রাত্রির দ্বিতীয় প্রহরে এই সিংহ-শয্যা অবলম্বন করিতেন। আবার রাত্রির শেষ প্রহরে, তিনি আবাসস্থলের চারিদিকে ধীরে ধীরে বেড়াইতেন, কিংবা ধ্যান করিতেন।

মিতাহার

ভগবান বুদ্ধের আহার অত্যন্ত নিয়মিত ছিল। খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে তাঁহার কখনো আতিশয্য হইত না, এবং তিনি তাঁহার ভিক্ষুদিগকে বারবার এই উপদেশই দিতেন। ভগবান প্রথম প্রথম রাত্রিবেলা আহার করিতেন, ইহা মজ্ঝিমনিকায়ের (নং ৭০) কীটাগিরিসুত্ত হইতে বুঝিতে পারা যায়। উহাতে ভগবান কহিতেছেন, "হে ভিক্ষুগণ, আমি রাত্রির আহার ছাড়িয়া দিয়াছি, আর ইহাতে আমার শরীরের ব্যাধি ও জড়তা কমিয়া গিয়াছে, শরীরের শক্তি বাড়িয়াছে এবং চিত্তে প্রশান্তভাব আসিয়াছে। হে ভিক্ষুগণ, তোমরাও এইভাবে চলো। তোমরা যদি রাত্রির আহার ছাড়, তাহা হইলে তোমাদের শরীরে রোগ কম হইবে, শরীরের জড়তা কমিবে, শরীরে শক্তি আসিবে ও তোমাদের চিত্ত শান্তিলাভ করিবে।"

ঐ সময় হইতে, ভিক্ষুদের মধ্যে দুপুরবেলা বারোটা বাজার পূর্বে, আহার করার প্রথা আরম্ভ হইয়াছিল, ও বারোটা বাজার পর আহার করা নিষিদ্ধ বলিয়া মানা হইতে থাকিল।

চারিকা

চারিকা মানে ভ্রমণ। ইহা দুই প্রকার—শীঘ্রচারিকা ও সাবকাশ চারিকা। এই সম্বন্ধে অঙ্গুত্তরনিকায়ের পঞ্চকনিপাতে তৃতীয় বগ্‌গের আরম্ভে একটি সুত্ত আছে। তাহা এইরূপ—

ভগবান কহিতেছেন, "হে ভিক্ষুগণ, শীঘ্রচারিকাতে পাঁচটি দোষ আছে। ঐ দোষগুলি কি? পূর্বে যে-ধর্মবাক্য শুনা হয় নাই তাহা শুনিতে পারা যায় না; যাহা শুনা হইয়াছে, তাহার সম্বন্ধে গবেষণা হয় না; কোনো কোনো কথার পূর্ণজ্ঞান হয় না; কখনো কখনো, যে শীঘ্রচারিকা করে, তাহার ভয়ংকর রোগ হয়; আর তাহার বন্ধুলাভ হয় না। হে ভিক্ষুগণ, শীঘ্রচারিকাতে এই পাঁচটি দোষ আছে।

"হে ভিক্ষুগণ, সাবকাশ-চারিকাতে পাঁচটি গুণ আছে। সেইগুলি কি; পূর্বে যে-ধর্মবাক্য শুনা হয় নাই, তাহা শুনিতে পারা যায়; যাহা শুনা হইয়াছে তাহার সম্বন্ধে গবেষণা হয়; কোনো কোনো কথার পূর্ণজ্ঞান হয়; যে এই চারিকা করে, তাহার ভয়ংকর রোগ হয় না; ও তাহার মিত্রলাভ হয়। হে ভিক্ষুগণ, সাবকাশ-চারিকাতে এই পাঁচটি গুণ আছে।"

ভগবান বুদ্ধ যখন বোধিসত্ত্ব ছিলেন, তখন হয়তো তিনি এই অভিজ্ঞতাটুকু অর্জন করিয়াছিলেন; এবং পরে তিনি শিষ্যদিগকে তাঁহার এই অভিজ্ঞতা বলিয়া থাকিবেন। জোরে হাঁটিলে উপকার হয় না, কিন্তু ধীরে হাঁটিলে উপকার হয়, ইহা তাঁহার নিজস্ব অভিজ্ঞতা। এইভাবে ধীরে ধীরে বেড়াইতে বেড়াইতেই, তিনি অন্যান্য শ্রমণদের নিকট হইতে বিবিধ জ্ঞান আহরণ করিয়া, শেষে নিজের নূতন মধ্যমমার্গ আবিষ্কার করিয়াছিলেন।

ভিক্ষুসংঘের সহিত চারিকা

বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হওয়ার পর, ভগবান বুদ্ধ গয়া হইতে কাশী পর্যন্ত ভ্রমণ করেন; এবং সেখানে পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুদিগকে উপদেশ দিয়া, তাঁহার সংঘ স্থাপন করেন। তাহাদিগকে কাশীতে রাখিয়া, ভগবান একাই রাজগৃহে ফিরিয়া গেলেন বলিয়া মহাবগ্‌গে লিখিত আছে। কিন্তু উক্ত পাঁচজন ভিক্ষুই, ঐ চাতুর্মাসের পর, ভগবানের সহিত ছিল, ইহা মানিবার পক্ষে প্রবল প্রমাণ রহিয়াছে। রাজগৃহে সারিপুত্ত ও মোগ্‌গল্লান, এই দুইজন প্রসিদ্ধ পরিব্রাজক, বুদ্ধের শিষ্য হওয়ার পর, বৌদ্ধসংঘের শ্রীবৃদ্ধি আরম্ভ হইয়াছিল; আর তখন হইতে ভগবান বুদ্ধের সহিত প্রায়ই, ছোটো হউক বড়ো হউক, কিয়ৎ-সংখ্যক ভিক্ষু থাকিত, ও এই ভিক্ষুসংঘের সহিত একসঙ্গে তিনি চারিকা করিতেন। ভগবান ভিক্ষুসংঘকে ছাড়িয়া একা ছিলেন, এইরকম প্রসঙ্গ ক্বচিৎই ঘটিত।

ভ্রাম্যমাণ গুরুকুল

বুদ্ধের সময়, সব শ্রমণসংঘ ও তাহাদের নায়করা এইরকমভাবে ভ্রমণ করিত। বুদ্ধের পূর্বে এবং বুদ্ধের সময় ব্রাহ্মণদের গুরুকুল (বিদ্যালয়) ছিল। ওই-সব স্থানে উচ্চশ্রেণীর যুবকরা গিয়া অধ্যয়ন করিত। কিন্তু এই-সব গুরুকুল হইতে জনসমাজের বিশেষ কিছু লাভ হইত

না; ব্রাহ্মণ বেদাধ্যয়ন করিয়া প্রায়ই রাজার আশ্রয় লইত; ক্ষত্রিয় ধনুর্বিদ্যা শিখিয়া, উচ্চশ্রেণীর লোকদের কাজে লাগিত এবং শেষ পর্যন্ত রাজার আশ্রয় পাইবার জন্য চেষ্টা করিত। কিন্তু শ্রমণদের গুরুকুল মোটেই এইরকম ছিল না। তাহারা ভ্রমণ করিতে করিতেই শিক্ষালাভ করিত এবং সর্বসাধারণ লোকের সহিত মিশিয়া তাহাদিগকে ধর্ম-সম্বন্ধে উপদেশ দিত। এইজন্যই, জনসমাজের উপর তাহাদের এত বেশি প্রভাব পড়িয়াছিল।

ভিক্ষুসংঘের নিয়মানুবর্তিতা

ভগবান বুদ্ধের ভিক্ষুসংঘে বেশ নিয়মানুবর্তিতা ছিল। ভিক্ষুরা অনিয়মিতভাবে চলিলে, তাহা বুদ্ধ মোটেই পছন্দ করিতেন না। এই সম্বন্ধে চাতুমসুত্তে (মজ্ঝিমনিকায়, নং ৬৭) যে একটি কাহিনী আছে, তাহা এখানে সংক্ষেপে দেওয়া যোগ্য মনে হইতেছে।

ভগবান ঐ সময় শাক্যদের চাতুমা নামক একটি গ্রামে আমলকী-বনে থাকিতেন। তখন সারিপুত্ত ও মোগ্গল্লান পাঁচশত ভিক্ষু সঙ্গে লইয়া, চাতুমাতে আসিলেন। চাতুমাতে যে-সব ভিক্ষু প্রথম হইতেই ছিল, আর সারিপুত্ত ও মোগ্গল্লানের সহিত যে-সব ভিক্ষু আসিল, তাহাদের পরস্পরের মধ্যে আলাপআলোচনা ও গল্প-গুজব আরম্ভ হইয়া গেল। উঠাবসার জায়গা কোথায়, পাত্র ও চীবর কোথায় রাখা হইবে, ইত্যাদি প্রশ্ন করিতে করিতে, তাহারা খুব হট্টগোল করিতে লাগিল। তখন ভগবান আনন্দকে কহিলেন, "জেলেরা মাছ ধরিবার সময় হৈ-হুল্লোড় করে, এখানে সেইরকম কেন চলিতেছে?"

আনন্দ কহিল, "মহাশয় সারিপুত্ত ও মোগ্গল্লানের সহিত যে-সব ভিক্ষু আসিয়াছে, তাহাদের পরস্পরের মধ্যে আলাপসালাপ হইতেছে। তাহাদের থাকিবার ও পাত্র, চীবর প্রভৃতি রাখিবার জায়গা লইয়া গণ্ডগোল হইতেছে।" ভগবান আনন্দকে পাঠাইয়া, সারিপুত্ত, মোগ্গল্লান ও ওই-সব ভিক্ষুকে ডাকাইয়া আনিলেন, ও তাহাদিগকে পাঠাইয়া, সারিপুত্ত, মোগ্গল্লান ও ওই-সব ভিক্ষুকে ডাকাইয়া আনিলেন, ও তাহাদিগকে এই বলিয়া শাস্তি দিলেন যে, তাহারা যেন তাঁহার নিকট না থাকে, এবং সেখান হইতে চলিয়া যায়। তাহারা সকলেই বিষণ্ণ হইয়া, বুদ্ধকে প্রণাম করতঃ সেখান হইতে চলিয়া যাইবার জন্য রওনা হইল। চাতুমার শাক্যরা ঐ সময় নিজেদের সংস্থাগারে কোনো কাজের জন্য সম্মিলিত হইয়াছিল। যে-সব ভিক্ষু আজই আসিয়াছে, তাহারা, ফিরিয়া যাইতেছে দেখিয়া, শাক্যরা আশ্চর্যান্বিত হইল এবং তাহারা কেন ফিরিয়া যাইতেছে, সে সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিল। ঐ ভিক্ষুরা শাক্যদিগকে কহিল, "ভগবান বুদ্ধ আমাদিগকে শাস্তি দিয়াছেন, এইজন্যই আমরা এখান হইতে চলিয়া যাইতেছি।" তখন চাতুমার শাক্যরা ঐ ভিক্ষুদিগকে সেখানেই থাকিবার জন্য কহিল, এবং ভগবান বুদ্ধকে অনুরোধ করিয়া তাহাদিগকে ক্ষমা করাইল।

ধর্মসম্বন্ধে কথাবার্তা অথবা আর্যমৌন

বুদ্ধের সময় বহু মৌনী সাধু ছিল। মুনি শব্দ হইতেই মৌন শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে। তপস্যার এই-সব কঠোর প্রণালী বুদ্ধ পছন্দ করিতেন না। 'অবিদ্বান ও অশিক্ষিত মানুষ মৌন

অবলম্বন করিয়া মুনি হয় না।'[1] তথাপি তিনি বলিতেন যে কোনো কোনো প্রসঙ্গে মৌন অবলম্বন করা সংগত। অরিয়পরিয়েসন সুত্তে (মজ্ঝিমনিকায়, নং ২৬) ভগবান বলিতেছেন, "হে ভিক্ষুগণ, হয় তোমরা ধর্ম চর্চা করিবে, নয়তো আর্য মৌন অবলম্বন করিবে।"

বুদ্ধের উপদেশের সময়, শ্রোতারা যে শান্ত থাকিত তাহার প্রমাণ

ভগবান বুদ্ধ যখন ভিক্ষুসংঘকে উপদেশ দিতেন, তখন সব ভিক্ষু অত্যন্ত শান্তভাবে বসিয়া থাকিত; মোটেই গোলযোগ হইত না। ইহার একটি উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত দীঘনিকায়ের সামঞ্ঞফলসুত্তে দেখিতে পাওয়া যায়। প্রসঙ্গটি এই—

ভগবান বুদ্ধ রাজগৃহে জীবক কৌমারভৃত্যের আম্রবনে বড়ো একটি ভিক্ষুসংঘের সহিত থাকিতেন। তখন কার্তিকমাসের পূর্ণিমা রাত্রিতে রাজা অজাতশত্রু তাঁহার প্রাসাদে সকলের উপরের তলায় অমাত্যদের সহিত বসিয়া ছিলেন। তিনি হঠাৎ উচ্ছ্বাসের সহিত বলিয়া উঠিলেন, "কত সুন্দর এই রাত্রিটি! এখানে এমন কোনো শ্রমণ কিংবা ব্রাহ্মণ আছেন কি, যিনি তাঁহার উপদেশ দ্বারা আমার চিত্ত প্রসন্ন করিয়া দিবেন?" ঐ সময় পুরণকস্সপ, মক্খলি গোসাল, অজিত কেসকম্বল, পকুধকচ্চায়ন, সঞ্জয় বেলট্ঠপুত্ত এবং নিগণ্ঠ নাথপুত্ত, এই বিখ্যাত শ্রমণরা নিজ নিজ সংঘের সহিত রাজগৃহের আশেপাশে থাকিতেন। অজাতশত্রুর অমাত্যরা একে একে উহাদের প্রশংসা করিয়া, উহাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার জন্য, রাজার মন আকৃষ্ট করিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু অজাতশত্রু কিছু না বলিয়া, চুপ করিয়া রহিলেন।

ঐ সময়, সেখানে জীবক কৌমারভৃত্য উপস্থিত ছিল। তাহাকে অজাতশত্রু কহিলেন, "তুমি কিছু না বলিয়া, বসিয়া আছ যে?"

ইহার পর জীবক কহিল, "মহারাজ, ভগবান বুদ্ধ আমার আম্রবনে বেশ বড়ো ভিক্ষুসংঘের সহিত কিছুকাল যাবৎ আছেন। আমি বলি যে, আজ মহারাজ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করুন। ইহাতে আপনার চিত্ত প্রসন্ন হইবে।" অজাতশত্রু বাহনাদি প্রস্তুত করিবার জন্য জীবককে আজ্ঞা করিলেন। তদনুসারে, জীবক সকল ব্যবস্থা করার পর, রাজা অজাতশত্রু তাঁহার হাতীর পিঠে চড়িয়া এবং তাঁহার অন্তঃপুরের মেয়েদিগকে ভিন্ন ভিন্ন হস্তিনীর উপর বসাইয়া, অনেক লোকজন সঙ্গে লইয়া বুদ্ধ-দর্শনের জন্য রওনা হইলেন।

জীবকের আম্রবনের কাছে আসিয়া অজাতশত্রু কিছু ঘাবড়াইয়া গিয়া জীবককে কহিলেন, "ওহে জীবক, আমাকে কি তুমি প্রতারণা করিতেছ? আমাকে শত্রুর হাতে সমর্পণ করিবার অভিসন্ধি কর নাই তো? এখানে এত বড়ো ভিক্ষুসংঘ আছে বলিয়া তুমি কহিতেছ, কিন্তু হাঁচি, কাশি, কিংবা অন্য কোনো রকমের আওয়াজই যে শুনিতে পাওয়া যায় না!"

জীবক—মহারাজ, ভয় পাইবেন না, ভয় পাইবেন না! আপনাকে প্রতারণা করিতেছি

১. ন মোনেত মুনি হোতি মূলহরূপো অবিন্দযু—ধম্মপদ, ২৬৮

না, কিংবা শত্রুর হাতেও সমর্পণ করিতেছি না। সম্মুখে চলুন, সম্মুখে চলুন। সম্মুখে মণ্ডলমালে[১] আলো জ্বলিতেছে। (অজাতশত্রুর বৈরীরা আলো জ্বালিয়া বসিয়া থাকিবে, ইহা সম্ভবপর নয়, ইহাই এই কথার তাৎপর্য)।

যতদূর হাতিতে চড়িয়া যাওয়া সম্ভবপর ছিল, ততদূর যাওয়ার পর, অজাতশত্রু হাতি হইতে নামিলেন ও জীবকের আম্রবনস্থ মণ্ডলমালের দ্বারে পায়ে হাঁটিয়া গেলেন। সেখানে দাঁড়াইয়া, তিনি জীবককে কহিলেন, "ভগবান কোথায়?"

জীবক—মহারাজ, মণ্ডলমালে মধ্যভাগের থামটির নিকট, পূর্বদিকে মুখ করিয়া ভগবান বসিয়াছেন।

অজাতশত্রু ভগবানের নিকট গিয়া দাঁড়াইলেন ও নীরব ও শান্তবাবে সমাসীন ভিক্ষুসংঘের দিকে তাকাইয়া আবেগের সহিত কহিলেন, "এই সংঘে যে শান্ততা বিরাজ করিতেছে, আমার ছেলে উদয়ভদ্র তাহার সহিত সংযুক্ত হউক! রাজকুমার উদয়ভদ্র এইরূপ শান্তিলাভ করুক!"

ভগবান কহিলেন, "মহারাজ, তুমি তোমার পুত্রস্নেহের উপযুক্ত কথাই বলিয়াছ।"

তাহার পর, অজাতশত্রু ও ভগবানের মধ্যে একটি দীর্ঘ কথোপকথন দেওয়া হইয়াছে। তাহা এখানে বর্ণনা করার কোনো কারণ নাই। যখন ভগবান বুদ্ধ সংঘের সঙ্গে থাকিতেন, তখন ভিক্ষুদের মধ্যে যে কোনোরকম গোলমাল হইত না, শুধু এইটুকু দেখাইবার জন্যই, এই প্রসঙ্গটি এখানে বর্ণনা করিলাম।

ভিক্ষুসংঘের নিয়মানুবর্তিতার প্রভাব

সকালবেলা ভগবান যখন ভিক্ষার জন্য বাহির হইতেন, তখন বিভিন্ন পরিব্রাজকদের আশ্রমগুলিতে যাইতেন। ভগবানকে দেখিয়া, পরিব্রাজকদের নায়করা নিজ নিজ শিষ্যদিগকে বলিতেন, "এই যে শ্রমণ গোতম আসিতেছেন। তাঁহার গোলমাল ভালো লাগে না; অতএব তোমরা জোরে কথাবার্তা না বলিয়া, কিছু শান্ত হইয়া বসো।" এইরূপই একটি প্রসঙ্গের বর্ণনা মজ্ঝিমনিকায়ের মহাসকুলুদায়িসুত্তে (নং ৭৭) আছে। তাহাতে বুদ্ধের দৈনন্দিন কাজের সম্বন্ধে অন্য কিছু কিছু তথ্য, ও তাহার ব্যাখ্যা থাকায়, এখানে উহার সংক্ষিপ্ত আভাস দিতেছি।

ভগবান রাজগৃহে বেণুবনের কলন্দকনিবাপে থাকিতেন। তখন কোনো কোনো বিখ্যাত পরিব্রাজক মোরনিবাপের পরিব্রাজকদের বাগানে অবস্থান করিতেছিলেন। একদিন, সকালবেলা ভগবান রাজগৃহে ভিক্ষা করিবার জন্য রওনা হইলেন। ভিক্ষায় যাইবার ঠিক ঠিক সময় না হওয়ায়, ভগবান ঐ পরিব্রাজকদের আশ্রমের দিকে গেলেন। সেখানে

১. মণ্ডলমাল মানে তাঁবুর আকারের মতো মণ্ডপ, ইহার জিভ চারিদিকের জমি হইতে উঁচু করা হইত।

সকুলুদায়ি[১] নিজের বহু পরিব্রাজকের সহিত আসীন ছিলেন, আর ঐ পরিব্রাজকরা জোরে জোরে রাজকথা, চৌর-কথা, মহামাত্য-কথা, সেনা-কথা, ভয়-কথা, যুদ্ধ-কথা ইত্যাদি বাজে গল্প[২] বলিতেছিল। সকুলুদায়ি আশ্রয় হইতে কিছু দূরে ভগবানকে দেখিতে পাইলেন; এবং তিনি নিজের শিষ্যদিগকে কহিলেন, "বৎসগণ, জোরে কথা বলিয়ো না, গণ্ডগোল করিয়ো না। এই যে শ্রমণ গোতম এখানে আসিতেছেন, তাঁহার আস্তে কথা বলা ভালো লাগে ও তিনি আস্তে কথা বলার প্রশংসা করেন। আমরা গোলমাল না করিলেই, এই সভায় আসা তাঁহার যোগ্য বলিয়া মনে হইবে।"

ঐ পরিব্রাজকরা শান্ত হইল। আর ভগবান যেখানে পরিব্রাজক সকুলুদায়ি ছিলেন, সেখানে আসিলেন। তখন সকুলুদায়ি ভগবানকে কহিলেন, "ভগবান আসুন! ভগবান সুস্বাগত! ভগবান অনেকদিন পর আমাদের সভায় আসিয়াছেন। আপনার জন্য, এই আসন রাখা হইয়ছে; আপনি ইহাতে বসুন।"

ভগবান ঐ আসনে উপবেশন করিলেন। তাঁহার নিকটেই পরিব্রাজক সকুলুদায়ি বসিয়াছিলেন। ভগবান সকুলুদায়িকে কহিলেন, "হে উদায়ি, এখানে তোমাদের মধ্যে কি-সব কথাবার্তা চলিতেছিল?"

উদায়ি—হে ভগবান, আমাদের কথা এখন থাকুক। এইগুলি তেমন কিছু দুর্লভ নয়। কিন্তু আমার একটি কথা মনে পড়িতেছে; কিছুকাল পূর্বে, ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের শ্রমণ ব্রাহ্মণরা একটি কৌতূহলশালাতে[৩] সম্মিলিত হইয়াছিল। সেখানে তাহাদের মধ্যে এই প্রশ্নটি উপস্থিত হইয়াছিল ঃ পূরণকস্‌সপ, মক্‌খলি গোসাল, অজিত কেসকম্বল, পকুধকচ্চায়ন, সঞ্জয় বেলট্‌ঠপুত্ত, নিগণ্ঠ নাথপুত্ত ও শ্রমণ গৌতম, এই ছয়জন বড়ো বড়ো সংঘ-নেতা বর্তমানে বর্ষাকাল কাটাইবার জন্য রাজগৃহের সন্নিকটে অবস্থান করিতেছেন। ইহা অঙ্গমগধ দেশের লোকদের মহাভাগ্য বলিয়া বুঝিতে হইবে! কিন্তু এই নেতাদের মধ্যে, যাঁহাকে স্বীয় শ্রাবকরা যথাযোগ্য সম্মান দেয়, তিনি কে? আর শ্রাবকরা তাহার আশ্রয়ে কিভাবে চলাফেরা করে?"।

তখন কেহ কেহ কহিল, "এই পূরণকস্‌সপ বিখ্যাত সংঘ-নেতা বটে। কিন্তু তাহার শ্রাবকরা তাহার সম্মান রাখে না এবং তাহার আশ্রয়েও থাকিতে চায় না। তাহার অধীনে থাকিলে, শ্রমণদের মধ্যে নানারকম অভাব অভিযোগ উঠে।" এইভাবে, অন্য কোনো কোনো লোক মক্‌খলি গোসাল প্রভৃতি নেতাদের অধীনস্থ শ্রাবকদের মধ্যে যে নানা অভিযোগ থাকে, তাহা বর্ণনা করিল। সর্বশেষে, কেহ কেহ কহিল, "এই শ্রমণ গোতম বিখ্যাত সংঘ-নেতা। তাঁহার শ্রাবকরা তাঁহার যোগ্য মান রাখে ও স্বেচ্ছায় তাঁহার আশ্রয়াধীনে থাকে।"

---

১. সকুল উদায়ি অর্থাৎ কুলীন উদায়ি।

২. তিরচ্ছান কথা। অনিয্যানিকত্তা সগ্‌গ মোক্‌খ মগ্‌গানং তিরচ্ছাবভুতা কথা তি তিরচ্ছান কথা।—অট্‌ঠকথা

৩. বাদবিবাদের জায়গা।

একদিন গোতম এক বড়ো সভায় ধর্মোপদেশ দিতেছিলেন। সেখানে শ্রমণ গোতমের একজন শ্রাবক হঠাৎ কাশিয়া ফেলিল। তাহার হাঁটু টিপিয়া পাশের অন্য একটি শ্রাবক তাহাকে বলিল, "গোলমাল করিয়ো না, আমাদের গুরু যে ধর্মোপদেশ দিতেছেন।" যখন শ্রমণ গোতম শত শত লোকের সভায় ধর্মোপদেশ দেন, তখন তাঁহার শ্রাবকদের মধ্যে একটি কাশি কিংবা হাঁচির শব্দও শুনা যায় না। সকলে অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও সম্মানের সহিত তাঁহার ধর্ম-বিষয়ক উপদেশ শুনিতে উৎসুক থাকে........"

ভগবান—হে উদায়ি, আমার শ্রাবকরা যে আমার প্রতি সম্মানের সহিত ব্যবহার করে, এবং আমার আশ্রয়াধীনে থাকে, ইহার কী কারণ হইতে পারে বলিয়া তোমার মনে হয়?

উদায়ি—আমার ধারণা এই যে, ইহার পাঁচটি কারণ থাকিবে। এই কারণগুলি কি? ১. ভগবান অল্পাহার করেন ও অল্পাহারের গুণগান করেন। ২. তিনি যে-কোনো রকমের চীবরই হউক-না-কেন, তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকেন, এবং ঐরূপ সন্তোষের গুণ গাহিয়া থাকেন। ৩. যেরকম ভিক্ষাই পাওয়া যাউক না, তিনি তাহাতেই সন্তুষ্ট হন এবং ঐরূপ সন্তোষের গুণ বর্ণনা করেন। ৪. থাকিবার জন্য যে-রকম জায়গাই পাওয়া যায়, তাহাতেই তিনি সন্তুষ্ট হন, এবং ঐ সন্তোষের গুণগান করেন। ৫. তিনি নির্জনে থাকেন এবং নির্জন-বাসের গুণগান করেন। এই পাঁচটি কারণে ভগবানের শ্রাবকরা তাঁহার সম্মান রাখে এবং তাঁহার আশ্রয়াধীনে থাকে, আমার এইরূপ মনে হয়।

ভগবান—হে উদায়ি, শ্রমণ গোতম অল্পাহারী ও অল্পাহারের প্রশংসা করেন, শুধু এইজন্যই যদি শ্রাবকরা আমার সম্মান রাখিয়া আমার আশ্রয়াধীনে থাকিত, তাহা হইলে আমার শ্রাবকদের মধ্যে যাহারা আমার অপেক্ষাও অল্পাহার করে, তাহারা আমার আশ্রয়াধীনে থাকিত না।

হে উদায়ি, যে-রকম চীবরই পাওয়া যায় তাহাতেই শ্রমণ গোতম সন্তুষ্ট হয় এবং ঐরূপ সন্তোষের প্রশংসা করে, শুধু এইটুকুর জন্যই যদি শ্রাবকরা আমার সম্মান রাখিয়া আমার আশ্রয়াধীনে থাকিত, তাহা হইলে আমার শ্রাবকদের মধ্যে যাহারা শ্মশান হইতে, আবর্জনার স্তূপ হইতে, কিংবা বাজার হইতে কাপড়ের টুকরা একত্র করিয়া চীবর প্রস্তুত করে ও তাহাই পরিধান করে, তাহারা আমার মান রাখিত না এবং আমার আশ্রয়াধীনেও থাকিত না কারণ, আমি মাঝে মাঝে গৃহস্থদের দেওয়া চীবরও পরিধান করি।

শ্রমণ গোতম যাহাই ভিক্ষা পাওয়া যায়, তাহাতেই সন্তুষ্ট হয় এবং ঐরূপ সন্তোষের গুণগান করে, শুধু এইটুকুর জন্যই যদি শ্রাবকরা আমার মান রাখিয়া আমার আশ্রয়াধীনে থাকিত, তাহা হইলে এই-সব শ্রাবকদের মধ্যে যাহারা শুধু ভিক্ষা অবলম্বন করিয়াই থাকে, ছোটো অথবা বড়ো ঘর বর্জন না করিয়া সব রকম লোকের নিকট হইতেই ভিক্ষা গ্রহণ করে, এবং ঐ ভিক্ষার দ্বারাই উদর-পূরণ করে, তাহারা আমার মান রাখিয়া আমার আশ্রয়াধীনে থাকিত না। কারণ, আমি কখনো কখনো গৃহস্থদের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া ভালো খাদ্যও খাইয়া থাকি।

হে উদায়ি, থাকিবার জন্য যে জায়গাইয়া পাওয়া যায়, শ্রমণ গোতম তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকে এবং ঐ সন্তোষের প্রশংসা করে, শুধু এইটুকুর জন্যই যদি আমার শ্রাবকরা আমার মান রাখিয়া আমার আশ্রয়াধীনে থাকিত, তাহা হইলে উহাদের মধ্যে যাহারা গাছের নীচে অথবা খোলা জায়গায় বাস করে ও আট মাস কোনো আচ্ছাদিত স্থানে যায় না, তাহারা আমার মান রাখিয়া আমার আশ্রয়াধীনে থাকিত না। কারণ, আমি মাঝে মাঝে বড়ো বড়ো বিহারেও কাল যাপন করি।

শ্রমণ গোতম নির্জনে বাস করে, এবং নির্জন বাসের গুণ বর্ণনা করে, যদি শুধু এইটুকুর জন্যই আমার শ্রমণরা আমার মান রাখিয়া আমার আশ্রয়াধীনে থাকিত, তাহা হইলে তাহাদের মধ্যে যাহারা অরণ্যে বাস করে ও শুধু পনেরো দিনে একবার করিয়া প্রাতিমোক্ষের[১] জন্য সংঘে আসে, তাহারা আমার মান রাখিয়া, আমার আশ্রয়াধীনে থাকিত না। কারণ, আমি কখনো কখনো ভিক্ষু, ভিক্ষুণী, উপাসক, উপাসিকা, রাজা, মন্ত্রী, অন্যান্য সংঘের নায়ক ও তাহাদের শ্রাবক, ইহাদের সঙ্গেও সাক্ষাৎ করি।

কিন্তু হে উদায়ি, আমাতে এমন অপর পাঁচটি গুণ রহিয়াছে, যাহার জন্য আমার শ্রাবকরা আমার মান রাখিয়া আমার আশ্রয়াধীনে থাকে। ১. শ্রমণ গৌতম উত্তম শীলবান্। ২. তিনি যথার্থ ধর্মের উপদেশ দেন। ৩. তিনি প্রজ্ঞাবান। এইজন্য আমার শ্রাবকরা আমাকে সম্মান করে এবং আমার আশ্রয়াধীনে থাকে। ৪. তা ছাড়া, আমি আমার শ্রাবকদিগকে চারিটি আর্যসত্য শিক্ষা দিই এবং ৫. আধ্যাত্মিক উন্নতির বিভিন্ন প্রকারগুলি তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিই। এই পাঁচটি গুণের জন্য আমার শ্রাবকরা আমার মান রাখে ও আমার আশ্রয়াধীনে থাকে।

ভিক্ষুসংঘের সহিত থাকাকালীন ভগবানের দৈনিক কার্যাবলী

ভগবান বুদ্ধ তাঁহার সংঘে কিভাবে নিয়মানুবর্তিতা রক্ষা করিতেন, সকল পরিব্রাজকরাই তাহা জানিত। তিনি যখন তাহাদের সভায় যাইতেন, তখন তাহারাও শান্ততার সহিত চলাফেরা করিত। ইহা উপরের সুত্তটি হইতে বুঝিতে পারা যায়। ভগবান বুদ্ধ কখনো কখনো গৃহস্থদের নিমন্ত্রণ ও গৃহস্থদের দেওয়া বস্ত্র গ্রহণ করিতেন; তথাপি অল্পাহার, অন্নবস্ত্রের অনাড়ম্বরত্ব, নির্জনবাসের প্রীতি, এই-সব ব্যাপারে তো তাঁহার খ্যাতি ছিল। তিনি যখন ভিক্ষু-সংঘের সহিত একসঙ্গে ভ্রমণ করিতেন, তখন গ্রামের বাহিরে, কোনো উপবনে, কিংবা এইরকমই অন্য কোনো সুবিধাজনক স্থানে তিনি থাকিতেন। রাত্রিবেলার ধ্যানসমাধি সারিয়া, মধ্যম রাত্রিতে, উপরে বর্ণিত প্রকারে, তিনি সিংহশয্যা অবলম্বন করিতেন; এবং প্রভাতে উঠিয়া, পুনরায় পায়চারি করিতেন, অথবা ধ্যান-সমাধিতে নিমগ্ন থাকিতেন।

---

১. প্রত্যেক পক্ষান্তে নিজেদের দোষ ইত্যাদি বলিবার জন্য সব ভিক্ষু একত্র মিলিত হইত। ইহাকে প্রাতিমোক্ষ বলে।

সকালবেলা, ভগবান ঐ গ্রামে কিংবা শহরে অধিকাংশ সময় একাই ভিক্ষার জন্য বাহির হইতেন। রাস্তায় কিংবা ভিক্ষা করিবার সময়, প্রসঙ্গানুসারে গৃহীদিগকে উপদেশ দিতেন। তিনি সিগালোবাদসুত্তের উপদেশগুলি রাস্তায় চলিবার সময়, আর কসিভারদ্বাজসুত্তে ও এইরূপ কয়েকটি সুত্তের উপদেশগুলি ভিক্ষা করিবার সময় দিয়াছিলেন।

ক্ষুধা-নিবৃত্তির জন্য যেটুকু ভিক্ষা প্রয়োজন, তাহা পাওয়া মাত্রই, ভগবান গ্রামের বাহিরে আসিয়া, কোনো গাছের নীচে, কিংবা এইরকম অন্য কোনো ভালো জায়গায় বসিয়া, সেই ভিক্ষার অন্ন খাইতেন; তাহার পর, বিহারে আসিয়া, কিছুকাল বিশ্রাম করিয়া, ধ্যান-সমাধিতে কিয়ৎকাল অতিবাহিত করিতেন। সন্ধ্যাবেলা, গৃহীরা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য আসিত। তখন তিনি তাহাদের সহিত ধর্ম-সম্বন্ধে আলাপ করিতেন। এইরকম প্রসঙ্গেই সোণদণ্ড, কূটদণ্ড প্রভৃতি ব্রাহ্মণরা বড়ো বড়ো ব্রাহ্মণসমুদায়ের সহিত বুদ্ধকে দেখিতে আসিয়া, তাঁহার সহিত ধর্মসম্বন্ধে চর্চা করিয়াছিলেন—ইহার নিদর্শন দীঘনিকায়ে পাওয়া যায়। যেদিন গৃহস্থরা আসিত না, ঐদিন ভগবান সাধারণত তাঁহার সঙ্গে যে-সব ভিক্ষু থাকিত, তাহাদিগকে ধর্মোপদেশ দিতেন।

আবার দুই-একদিন পর, ভগবান ভ্রমণে বাহির হইতেন, এবং এইভাবে পূর্বদিকে ভাগলপুর, পশ্চিমে কুরুদের কল্মাষদম্য-নামক শহর, উত্তরে হিমালয়, ও দক্ষিণে বিন্ধ্য, এই চতুঃসীমানার মধ্যে, ভিক্ষু-সংঘের সহিত, বৎসরের আট মাস ভ্রমণ করিতে থাকিতেন।

বর্ষাযাপন

ভগবান বুদ্ধ যখন প্রথম উপদেশ দিতে শুরু করিলেন, তখন তাঁহার ভিক্ষুরা বর্ষাকালে কোনো নির্দিষ্ট স্থানে থাকিত না; চারি দিকে ঘুরিয়া-ফিরিয়া, জনসাধারণকে উপদেশ দিত। অন্য সম্প্রদায়ের শ্রমণরা বর্ষাকালে নির্দিষ্ট কোনো-এক জায়গায় থাকিত বলিয়া, সর্বসাধারণ লোকের নিকট বৌদ্ধভিক্ষুদের এই আচরণ ভালো লাগিল না। তাহারা উহাদিগকে তজ্জন্য সমালোচনা করিতে থাকিল; তখন লোকের তুষ্টির জন্য, ভগবান বুদ্ধ এই নিয়ম করিলেন যে, তাঁহার ভিক্ষুরা বর্ষাকালে অন্তত তিনমাস একই জায়গায় অবস্থান করিবে।[১]

মহাবগ্গে বর্ষা-যাপনের যে বর্ণনা আছে, উপরে তাহারই সারমর্ম দেওয়া হইল। কিন্তু এই বর্ণনা যে সর্বাংশেই সত্য, তাহা আমার মনে হয় না। প্রথমত, সব শ্রমণ যে বর্ষাকালে একই জায়গায় থাকিত, ইহা ঠিক নয়; তাহা ছাড়া, ভগবান যে-সব নিয়ম করিতেন, সেইগুলিতে বহু ব্যতিক্রম থাকিত; চোরের কিংবা ঐরূপ অন্য কোনো উপদ্রব হইলে, বর্ষাকালেও ভিক্ষুরা অন্যত্র যাইতে পারিত।

ভগবান বুদ্ধ যখন প্রথম উপদেশ দিতে শুরু করিলেন, তখন তাঁহার তেমন খ্যাতি ছিল না বলিয়া, তাঁহার পক্ষে কিংবা তাঁহার ক্ষুদ্র ভিক্ষুসংঘটির পক্ষে বর্ষাযাপনের জন্য এক জায়গায় থাকা সম্ভবপর ছিল না। যখন তিনি চারি দিকে কিছু খ্যাতি লাভ করিলেন,

---

১. বৌদ্ধসংঘচা পরিচয়, পৃ. ২৪ দ্রষ্টব্য।

তখন অনাথপিণ্ডিক নামক এক শ্রেষ্ঠী শ্রাবস্তীর নিকট জেতবনে তাঁহার জন্য সর্বপ্রথম একটি বড়ো বিহার নির্মাণ করিয়া দেন[১] ও কিছুকাল পর, বিশাখা নামক তাঁহার এক মহিলা-ভক্ত ঐ শহরের নিকটেই পূর্বারাম নামক একটি প্রাসাদ নির্মাণ করিয়া, বৌদ্ধসংঘকে অর্পণ করেন। ভগবান বুদ্ধ তাঁহার শেষ বয়সে অধিকাংশ সময় এই দুই স্থানে বর্ষাকাল কাটাইতেন। অন্যান্য জায়গার ভক্তরা নিমন্ত্রণ করিলে, বর্ষাযাপনের জন্য ঐ-সব স্থানেও যাইতেন বলিয়া অনুমান হয়। বর্ষাকালের জন্য কুটীর তৈয়ার করিয়া, লোকেরা ভিক্ষুদের থাকার ব্যবস্থা করিত। ভগবানের জন্য একটি পৃথক কুটীর থাকিত। উহাকে গন্ধ-কুটীর বলা হইত।

বর্ষাকালে ভগবান যেখানে থাকিতেন, তাহার চারি দিকের ভক্তরা তাঁহার দর্শনের জন্য আসিত, ও তাঁহার ধর্মোপদেশ শুনিত। কিন্তু তাহারা প্রত্যহ বিহারে ভিক্ষা আনিয়া দিত না। ভিক্ষুদিগকে ও ভগবান বুদ্ধকে, তাহাদের রীতি-অনুযায়ী, ভিক্ষায়ও বাহির হইতে হইত; কদাচিৎই গৃহীদের ঘরে তাহাদের নিমন্ত্রণ থাকিত।

রুগ্‌ণ ভিক্ষুদের খবর লওয়া

ভিক্ষুদের মধ্যে কেহ অসুস্থ হইলে ভগবান বুদ্ধ দুপুরের ধ্যান-সমাধি সারিয়া, তাহার খবর লইবার জন্য যাইতেন। একসময়, মহাকাশ্যপ রাজগৃহের পিপ্‌ফলী-গুহাতে অসুস্থ হইয়া পড়েন। তখন ভগবান বেলুবনে বাস করিতেছিলেন; আর সন্ধ্যাবেলা মহাকাশ্যপের খবর লইবার জন্য গিয়াছিলেন বলিয়া বোজ্ঝঙ্গসংযুত্তের চর্তুদশ সুত্তে বর্ণিত আছে; এবং উহারই পঞ্চদশ সুত্তে এইরূপ লিখিত আছে যে, অন্য এক সময়, ভগবান লহামোগ্‌গল্লায়নের খবর লইবার জন্য গিয়াছিলেন। উভয়কেই ভগবান সাতটি বোধ্যঙ্গ স্মরণ করাইয়া দিয়াছিলেন, ও ইহাতে তাহাদের রোগ ভালো হইয়াছিল।

কিছুকালের জন্য নির্জনবাস

ভগবান বুদ্ধ ভ্রমণ করিলেই বা কি, কিংবা বর্ষাকালে এক জায়গায় থাকিলেই বা কি, দুপুরবেলা দুই-এক ঘণ্টা, ও রাত্রিতে প্রথম ও শেষ প্রহরে, অনেকক্ষণ ধ্যানসমাধিতে কাটাইতেন। ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। তাহা ছাড়া, এককালে যখন ভগবান বৈশালীর নিকট মহাবনের কূটাগারশালাতে থাকিতেন, তখন তিনি একাদিক্রমে পনেরো দিন পর্যন্ত নির্জনবাস করিয়াছিলেন। তিনি শুধু একজন ভিক্ষুকে তাঁহার ভিক্ষা লইয়া তাঁহার নিকট আসিবার অনুমতি দিয়াছিলেন। এই কথা আনাপানস্মৃতিসংযুত্তের নবমসুত্তে আছে। এই সংযুত্তেরই একাদশ সুত্তে যে তথ্য আছে, তাহা এই—

একসময়, ভগবান ইচ্ছানঙ্গল গ্রামের নিকট ইচ্ছানঙ্গল বনে বাস করিতেন। সেখানে, ভগবান ভিক্ষুদিগকে কহিলেন, "হে ভিক্ষুগণ, আমি তিন মাস পর্যন্ত নির্জনে থাকিতে চাই।

১. বুদ্ধলীলাসারসংগ্রহ, পৃ. ১৬৭-৭৯ দ্রষ্টব্য।

আমার নিকট খাদ্য আনার জন্য কেবল একজন ভিক্ষু ছাড়া অন্য কেহই আসিবে না।'' ঐ তিন মাস অতিবাহিত হওয়ার পর, ভগবান নির্জনবাস হইতে বাহিরে আসিলেন এবং ভিক্ষুদিগকে কহিলেন, ‘‘যদি অন্য সম্প্রদায়ের পরিব্রাজকরা তোমাদিগকে জিজ্ঞাসা করে যে, এই বর্ষাকালে ভগবান কোন্ ধ্যানসমাধি অভ্যাস করিতেছিলেন, তাহা হইলে তোমরা তাহাদিগকে বলিবে যে, ভগবান আনাপানস্মৃতিসমাধি[১] অভ্যাস করিতেছিলেন।''

উপরের উদ্ধৃত সুত্তটিতেও এইরূপ বলা হইয়াছে যে, ভগবান পনেরো দিন ব্যাপিয়া আনাপানস্মৃতিসমাধি অভ্যাস করিতেছিলেন। এই-সব বর্ণনার শুধু এই উদ্দেশ্য ছিল যে, লোকেরা এই সমাধির গুরুত্ব ভালোভাবে বুঝুক। পনেরো দিন কিংবা তিনমাসও, এই সমাধির ভাবনা করিলে বিরক্তি ধরে না, ও ইহাতে শারীরিক স্বাস্থ্য ভালো থাকে।

অন্য এক প্রসঙ্গে যে ভগবান ভিক্ষুসংঘ ছাড়িয়া একাকী পারিলেয্যয়ক বনে গিয়া অবস্থান করিয়াছিলেন, এই কথা ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে দেওয়া হইয়াছে। ইহা হইতে অনুমান হয় যে, ভগবান মাঝে মাঝে এইরূপ স্থানে গিয়া, যেখানে আশেপাশে তাঁহার কোনো পরিচিত লোক থাকিত না, সেখানে নির্জনে বাস করিতেন। কিন্তু যখন তাঁহার খ্যাতি সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িল, এবং সকলের নিকটেই তিনি পরিচিত হইয়া গেলেন, তখন সংঘে থাকিয়াই, কিছুকাল সংঘ হইতে অলিপ্ত থাকিবার উপক্রম তিনি শুরু করিয়া থাকিবেন। কিন্তু তাঁহার ধর্ম প্রচারের পঁয়তাল্লিশ বৎসরের অবধিতে এইরূপ প্রসঙ্গ সম্ভবত খুব বেশি ঘটে নাই।

আজকাল কায়াকল্পের কথা খুব শুনা যায়। এক কিংবা দেড় মাস কোনো ব্যক্তিকে একই কুঠরিতে বদ্ধ রাখিয়া, নিয়মিত পথ্য ও ঐষধ খাওয়াইয়া রাখা হয়। ইহাতে মানুষ পুনরায় যৌবন লাভ করে বলিয়া মনে করা হয়। অবশ্য এই কায়াকল্পের সহিত ভগবান বুদ্ধের নির্জনবাসের কোনো সম্বন্ধ নাই। কেননা, ভগবান তাঁহার নির্জনবাসের সময়, কোনোরকম ঔষধ সেবন করিতেন না; শুধু আনাপানস্মৃতিসমাধির ভাবনা করিতেন।

বহুকাল নির্জনে বাস করিবার প্রথা সিংহলদ্বীপে, ব্রহ্মদেশে কিংবা শ্যামদেশে কদাচিৎই লক্ষিত হয়। কিন্তু তিব্বতে তাহার প্রচলন আছে। শুধু তাহাই নহে, সেখানকার কোনো কোনো জায়গায়, এই নির্জনবাসের প্রথাটি অতিমাত্রায় পালন করা হয়। কোনো কোনো তিব্বতীয় লামা বছরের পর বছর, কোনো গুহাতে কিংবা ঐরকম অন্য কোনো স্থানে, নিজেকে বন্ধ করিয়া রাখে ও সর্বপ্রকার সিদ্ধিলাভের চেষ্টা করে।

অসুস্থতা

ভগবান বুদ্ধের অসুখবিসুখের কথা খুব কম জায়গাতেই দেখিতে পাওয়া যায়। এক সময়, রাজগৃহের নিকট বেলুবনে তাঁহার অসুখ হইয়াছিল; তখন তাঁহার নির্দেশ অনুসারে মহাচন্দ

১. আন মানে শ্বাস ও আপন মানে প্রশ্বাস। এই দুইটির সাহায্যে যে সমাধি সম্পাদন করা হয়, তাহাকে আনাপানস্মৃতি সমাধি বলে। ইহার বিধি ‘সমাধিমার্গে’ দেওয়া হইয়াছে।
—‘সমাধিমার্গ’, পৃ. ৩৮-৪৮।

তাঁহার নিকট সাতটি বোধ্যঙ্গ আওড়াইলেন; এবং ইহাতে তাঁহার রোগ ভালো হইয়াছিল; এইরূপ বিবরণ বোজ্ঝঙ্গসংযুত্তের যোড়শসুত্তে দেখিতে পাওয়া যায়।

বিনয়পিটকের মহাবগ্গে এইরূপ উল্লেখ আছে যে, একবার ভগবান বুদ্ধ কিছু অসুস্থ হইয়াছিলেন এবং তখন তাঁহাকে জীবক কৌমারভৃত্য কিচু জোলাপ খাইতে দিয়াছিলেন।[১] চুল্লবগ্গে দেবদত্তের গল্প আছে। সে গৃধ্রকূট পর্বতের উপর হইতে ভগবান বুদ্ধের উপর একটি পাথর ফেলিয়াছিল। পাথরটি টুকরা টুকরা হইয়া যায় ও তাহার একটি টুকরা ভগবানের পায়ে লাগে এবং ইহাতে তিনি অসুস্থ হন। দেবদত্ত ভগবানকে হত্যা করিবে, এই ভয়ে কোনো কোনো ভিক্ষু ভগবান যেখানে থাকিতেন, তাহার চারিদিকে পাহারা দিতে আরম্ভ করিল। তাহাদের গতিবিধি লক্ষ্য করিয়া, ভগবান আনন্দকে কহিলেন, "এই ভিক্ষুরা এখানে ঘোরাঘুরি করিতেছে কেন?" আনন্দ উত্তর দিল, "মহাশয়, দেবদত্ত যাহাতে আপনার শরীরে আঘাত করিতে না পারে, সেইজন্য এই ভিক্ষুরা পাহারা দিতেছে!"

ভগবান আনন্দকে দিয়া ঐ ভিক্ষুদিগকে ডাকাইয়া, তাহাদিগকে বলিলেন, "আমার শরীর রক্ষা করিবার জন্য এত যত্ন লইবার কোনো কারণ নাই। আমার শিষ্যরা আমাকে রক্ষা করুক, আমি এইরূপ প্রত্যাশা করি না। সুতরাং তোমরা এখানে পাহারা না দিয়া, নিজ নিজ কাজ করিতে থাকো।"

সুত্তপিটকে বিনয়পিটকস্থ এই গল্পটির কোনো ভিত্তি পাওয়া যায় না। জোলাপের গল্পটি তো একেবারেই সাদাসিধা; আর সম্ভবত দেবদত্তের কাহিনীটি তাহাকে নীচ বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার জন্য লিখিত হইয়াছিল। যদি গল্পটি সত্যও হয়, তথাপি ভগবান যে ঐ সামান্য জখমের জন্য অনেকদিন অসুস্থ ছিলেন, তাহা মনে হয় না। এই-সব ছোটোখাটো অসুস্থতার কথা বাদ দিলে, বুদ্ধত্ব লাভ করার পর, ভগবানের মোটামুটি স্বাস্থ্য ভালোই থাকিত, এইরূপ বলিলে আপত্তির কারণ নাই।

ভালো স্বাস্থ্যের কারণ

ভগবান বুদ্ধ ও তাঁহার শিষ্যরা সব জাতির লোকদের দেওয়া ভিক্ষাই গ্রহণ করিত ও তাহারা দিনে শুধু একবার খাইত। ইহাতে তাহাদের স্বাস্থ্য ভালো থাকিত এবং চেহারা প্রসন্ন দেখাইত। ইহার কারণ নিম্নলিখিত কাল্পনিক কথোপকথনটিতে দেওয়া হইয়াছে।

প্রশ্ন— আরঞ্ঞে বিচরন্তানং সন্তানং ব্রহ্মচারিনং।
একভত্তং ভুঞ্জমানানাং কেন বণ্ণো পসীদতি॥

'বনে থাকে, ব্রহ্মচর্য পালন করে, ও দিনে মাত্র একবার খায়, ইহা সত্ত্বেও, সাধুদের কান্তি কিভাবে প্রসন্ন থাকে?'

উত্তর— অতীতং নানুসোচন্তি নপ্পজপ্পন্তি না গতং।
পচ্চুপন্নেন যাপেন্তি তেন বণ্ণো পসীদতি॥

১. 'বৌদ্ধসংঘাচা পরিচয়' পৃ. ৩৪

'গত জিনিসের জন্য তাহারা শোক করে না, অনাগত জিনিসের জন্য বৃথা জল্পনা করে না, ও বর্তমানকালে সন্তোষের সহিত সময় কাটায়, এইজন্য তাহাদের কান্তি প্রসন্ন থাকে।[1]

শেষ অসুস্থতা

মহাপরিনির্ব্বাণসুত্তে ভগবান বুদ্ধের শেষ ব্যধির বর্ণনা আছে।[2] সেই বছর বর্ষার পূর্বে, ভগবান রাজগৃহে ছিলেন। সেখান হইতে বৃহৎ ভিক্ষুসংঘের সহিত ভ্রমণ করিতে করিতে, তিনি বৈশালীতে আসিলেন। তিনি নিজে উহার নিকটস্থ বেলুবনামক গ্রামে বর্ষা-যাপনের জন্য থাকিয়া গেলেন, আর ভিক্ষুদিগকে তাহাদের সুবিধামত বৈশালীতে আশেপাশে থাকিতে অনুমতি দিলেন। ঐ বর্ষাতে ভগবান অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া পড়েন। কিন্তু তিনি তাঁহার অখণ্ডজ্ঞান শিথিল হইতে দিলেন না। ভিক্ষুসংঘকে শেষবারের জন্য একবার না দেখিয়া পরিনির্বাণ গ্রহণ করা তাঁহার যোগ্য মনে হয় নাই। তদনুসারে তিনি দুঃখসহন করিয়াও, নিজের আয়ু আরো কয়েকদিনের জন্য বাড়াইয়া, এই রোগ হইতে আরোগ্য লাভ করিলেন। তখন আনন্দ তাঁহাকে বলিল, "মহাশয়, আপনি রোগমুক্ত হইয়াছেন দেখিয়া, আমার আনন্দ হইতেছে। আপনার এই অসুস্থতায়, আমি বড়ো দুর্বল বোধ করিতেছি; কি করিব, তাহা ভাবিয়া পাইতেছিলাম না এবং ধর্মোপদেশও ভুলিয়া যাইতেছিলাম। তবু আমি আশা করিতেছিলাম যে, ভিক্ষুসংঘকে শেষ কথা না বলিয়া ভগবান নির্বাণের দিকে যাইবে না।"

ভগবান—হে আনন্দ, ভিক্ষুসংঘ আমার নিকট হইতে কোন জিনিসটি বুঝিয়া লইতে চায়? আমার ধর্ম সম্বন্ধে আমি খোলাখুলিভাবে সকল কথা বলিয়াছি। উহাতে আমি কোনো গুপ্ত রহস্য রাখিয়া দেই নাই। যে ব্যক্তি ভিক্ষুসংঘের অধিনায়ক হইতে চায় ও ভিক্ষুসংঘ তাহাকে আশ্রয় করিয়া থাকুক এইরূপ কামনা করে, সেই ব্যক্তিই ভিক্ষুসংঘকে তাহার শেষ কথা বলিতে পারে। কিন্তু, হে আনন্দ, তথাগত ভিক্ষুসংঘের অধিনায়ক হইতে চায় না, অথবা ভিক্ষুসংঘ তাহার উপর নির্ভর করিয়া থাকুক, এইরূপ ইচ্ছাও পোষণ করে না। এইরকম অবস্থায়, ভিক্ষুসংঘকে তথাগত শেষবারের জন্য কি কথা বলিবে? হে আনন্দ, আমি এখন জরাগ্রস্থ ও বৃদ্ধ হইয়াছি। আমার আশী বৎসর বয়স হইয়াছে। যেমন ভাঙা ঝাঁটায় বাঁশের শলা বাঁধিয়া কোনো রকমে কাজ চালানো হয়, তেমনই আমার শরীর কোনো প্রকারে চলিতেছে। যখন আমি নিরোধসমাধির ভাবনা করি, কেবল তখনই আমার শরীর যা একটু ভালো থাকে। হে আনন্দ, অতএব এখন তোমরা নিজেদের উপরই নির্ভর করো। আত্মাকেই দ্বীপ বানাও। ধর্মকেই দ্বীপ বানাও। আত্মাকেই আশ্রয় করো, ও ধর্মকেই শরণ লও।

অবস্থা এত খারাপ হওয়া সত্ত্বেও, ভগবান বেলুব-গ্রাম হইতে বৈশালীতে ফিরিয়া

১. দেবতাসংযুত্ত বগ্‌গ ১. সুত্ত ১০

২. বুদ্ধলীলাসারসংগ্রহ, পৃ. ২৯২-৩১২

আসিলেন। আনন্দকে পাঠাইয়া, সেখানে তিনি মহাবনের কূটাগারশালাতে ভিক্ষুসংঘকে একত্র করিলেন এবং তাহাদিগকে অনেক উপদেশ দিলেন। তাহার পর, ভিক্ষুসংঘের সহিত ভগবান ভাণ্ডগ্রাম, হস্তিগ্রাম, আম্রগ্রাম, জম্বুগ্রাম, ভোগনগর, ইত্যাদি জায়গায় ভ্রমণ করিতে করিতে, পাবা নামক নগরে আসিয়া চুন্দকর্মকারের আম্রবনে পৌঁছিলেন। চুন্দের গৃহে ভগবান ও ভিক্ষুসংঘের নিমন্ত্রণ ছিল। চুন্দ তাহাদের জন্য যে-সব খাদ্য প্রস্তুত করিয়াছিলেন, উহাদের মধ্যে "শূকরমদ্দব" বলিয়া একটি পদার্থ ছিল।[১] তাহা খাওয়ার পর, ভগবান অতিসার রোগে আক্রান্ত হইলেন। তথাপি রোগের কষ্ট সহ্য করিয়া, ভগবান ককুত্থা ও হিরণ্যবতী এই দুইটি নদী পার হইয়াও কুসিনারা পর্যন্ত গেলেন। সেখানকার মল্লদের শালবনে, সেইদিন, রাত্রিবেলার শেষ প্রহরে, ভগবান বুদ্ধ পরিনির্বাণ লাভ করিলেন।

এইভাবে ভগবান বুদ্ধের অত্যন্ত বোধদায়ক এবং কল্যাণপ্রদ জীবনের অন্ত হইল। তথাপি তাহার সুফল ভিন্ন ভিন্ন রূপে আজ পর্যন্ত ফেলিতেছে, ও এইরূপভাবেই তাহা ভবিষ্যতেও মানবজাতির ইতিহাসে সুফল দিতে থাকিবে।

---

১. পূর্ব পরিচ্ছেদের প্রারম্ভে, এই পদার্থ সম্বন্ধে চর্চা করিয়াছি। পাঠক সেখানে তাহা দেখিবেন।

প্রথম পরিশিষ্ট

গৌতমবুদ্ধের জীবনীর অন্তর্ভুক্ত মহাপদানসুত্তের অংশটুকু

অপদান (সং. অবদান) মানে ভালো জীবনচরিত। অবশ্য, মহাপদান মানে মহৎ লোকদের ভালো জীবন-চরিত। মহাপদানসুত্তের প্রারম্ভে, গোতম বুদ্ধের পূর্বজাত ছয়জন বুদ্ধ এবং গোতম বুদ্ধের জীবন-চরিত সংক্ষেপে দেওয়া হইয়াছে। গৌতম বুদ্ধের পূর্বে বিপস্‌সী, সিখী, বেস্‌সভু, ককুসন্ধ, কোণাগমন ও কস্‌সপ, এই ছয়জন বুদ্ধ হইয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে, প্রথম তিনজন ক্ষত্রিয়, ও বাকী তিনজন ব্রাহ্মণ ছিলেন। এই সুত্তের আরম্ভে, তাঁহাদের গোত্র, আয়ু, তাঁহারা যে-সব বৃক্ষের নীচে বুদ্ধ হইয়াছিলেন সেই বৃক্ষগুলির নাম, তাঁহাদের প্রত্যেকের দুইজন প্রধান শিষ্যের নাম, তাঁহাদের সংঘে কতজন ভিক্ষু ছিল তাহা, এবং তাঁহাদের উপস্থায়ক (সেবক ভিক্ষু), মাতা, পিতা, তৎকালীন রাজা ও রাজধানীর নাম দেওয়া হইয়াছে। তাহার পর, বিপস্‌সী বুদ্ধের জীবন-চরিত বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে। ঐ পৌরাণিক জীবন-চরিতের যে অংশটি গোতম বুদ্ধের জবন-চরিতের সহিত জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহার সংক্ষিপ্ত আভাস এখানে দিতেছি।[১]

১

ভগবান কহিলেন, "হে ভিক্ষুগণ, ইহার পূর্বে একপঞ্চাশতম কল্পে অর্হৎ ও সম্যক্‌সম্বুদ্ধ ভগবান বিপস্‌সী ইহলোকে জন্মগ্রহণ করিলেন। তিনি জাতিতে ক্ষত্রিয় ও গোত্রে কৌণ্ডিন্য ছিলেন। তাঁহার আয়ু আশী হাজার বৎসর ছিল। তিনি পাটলী বৃক্ষের নীচে অভিসম্বুধ হইয়াছিলেন। তাঁহার 'খণ্ড' ও 'তিস্‌স' এই দুইজন, প্রধান শ্রাবক ছিল। তাঁহার তিনটি শিষ্যসংঘ ছিল। প্রথম সংঘে আটষট্টি লক্ষ, দ্বিতীয় সংঘে এক লক্ষ এবং তৃতীয় সংঘে আশী লক্ষ ভিক্ষু ছিল; এবং তাহারা সকলেই ক্ষীণাশ্রব ছিল। অশোক নামক ভিক্ষু তাঁহার প্রধান উপস্থায়ক ছিল; বন্ধুমা নামক রাজা তাঁহার পিতা, ও বন্ধুমতী নামক রানী তাঁহার মাতা ছিলেন, এবং বন্ধুমা রাজার বন্ধুমতী-নামক রাজধানী ছিল।

২

১. আর, হে ভিক্ষুগণ, বিপস্‌সী বোধিসত্ত্ব 'তুষিত দেবলোক' হইঁতে চ্যুত হইয়া, স্মৃতিমান্ ও জাগ্রৎ অবস্থায়, মাতার উদরে প্রবেশ করিয়াছিলেন। ইহা এখানে স্বভাবের নিয়ম।

---

১. এই সবগুলি সুত্তের (মারাঠী) অনুবাদ চিং. বৈ. রাজবাড়ে প্রণীত 'দীঘনিকার', ভাগ ২ (গ্রন্থ ও প্রকাশক মণ্ডলী, নং ৩৮০, ঠাকুরদ্বার রোড, বোম্বাই ২)—ইহাতে আছে।

২. হে ভিক্ষুগণ, যখন বোধিসত্ত্ব 'তুষিত দেবলোক'-হইতে চ্যুত হইয়া মাতার উদরে প্রবেশ করেন, তখন দেব, 'মার', ব্রহ্মা, শ্রমণ, ব্রাহ্মণ ও মনুষ্য দ্বারা পরিপূর্ণ এই পৃথিবীতে যাহা দেবতাদের প্রভাবও অতিক্রম করে, এমন অতিবিশাল ও বিপুল আলোক আবির্ভূত হয়। বিভিন্ন জগতের অন্তবর্তী যে প্রদেশ সর্বদা অন্ধকারময় ও কৃষ্ণবর্ণ থাকে, যেখানে এতবড়ো প্রতাপশীল ও মহান যে চন্দ্রসূর্য, তাহাদেরও প্রভাব পড়ে না, সেখানেও দেবতাদের প্রভাব অতিক্রম করিয়া অপরিমিত ও বিপুল প্রকাশ আবির্ভূত হয়; ঐ প্রকাশে, তত্রত্য প্রাণীরা পরস্পরকে দেখিতে পাইয়া, বুঝিতে পারিল যে, তাহারা নিজেরা ছাড়া, অন্য প্রাণীও সেখানে আছে। এই দশহাজার জগতের সমুদায়টি আন্দোলিত হইয়া উঠে; ও ঐ-সব জগতে যাহা দেবতাদের প্রভাবও অতিক্রম করে, এমন অপরিমিত ও বিপুল প্রকাশ আবির্ভূত হয়। এইরূপ এই স্বভাবের নিয়ম।

৩. হে ভিক্ষুগণ, স্বভাবের নিয়ম এই যে, যখন বোধিসত্ত্ব মাতার উদরে প্রবেশ করেন, তখন যাহাতে মনুষ্য কিংবা মনুষ্যভিন্ন প্রাণী হইতে তাঁহার ও তাঁহার জননীর কোনোরকম পীড়া না হয়, এই উদ্দেশ্যে, চারিজন দেবপুত্র তাঁহাদের সংরক্ষণের জন্য, চারিদিকে অবস্থান করেন।

৪. হে ভিক্ষুগণ, যখন বোধিসত্ত্ব মাতার উদরে প্রবেশ করেন, তখন তাঁহার মাতা স্বাভাবিক ভাবেই শীলবতী হন; প্রাণিহত্যা, চুরি, ব্যভিচার, অসত্যভাষণ ও মদ্যপান হইতে তিনি মুক্ত থাকেন। এইরূপ এই স্বভাবের নিয়ম।

৫. হে ভিক্ষুগণ, যখন বোধিসত্ত্ব মাতার উদরে প্রবেশ করেন, তখন তাঁহার মাতার অন্তঃকরণে পুরুষের সম্বন্ধে কামাসক্তি উৎপন্ন হয় না। আর কোনো পুরুষই কামবিকারযুক্ত চিত্তে বোধিসত্ত্বের মাতার পাশ দিয়া যাইতে সমর্থ হয় না। ইহা স্বভাবের নিয়ম।

৬. হে ভিক্ষুগণ, যখন বোধিসত্ত্ব মাতার উদরে প্রবেশ করেন, তখন তাঁহার মাতা পাঁচটি সুখ প্রাপ্ত হন। ঐ পাঁচটি সুখ প্রাপ্ত হইয়া, তিনি তাহাদিগকে উপভোগ করেন। ইহা স্বভাবের নিয়ম।

৭. হে ভিক্ষুগণ, যখন বোধিসত্ত্ব তাঁহার মাতার উদরে প্রবেশ করেন, তখন তাঁহার মাতার কোনো রোগ হয় না। তিনি সুখী এবং উপদ্রব-রহিত হন, ও নিজের উদরে অবস্থিত সর্বেন্দ্রিয়সম্পন্ন বোধিসত্ত্বকে দেখেন। মনে কর যে, একটি উৎকৃষ্ট অষ্টকোণযুক্ত, মার্জিত, স্বচ্ছ, বিশুদ্ধ ও সর্বাকার পরিপূর্ণ বৈদূর্যমণি সম্মুখে রহিয়াছে, আর তাহাতে নীল, পীত, রক্তবর্ণ অথবা শ্বেতবর্ণ সুতা ঢুকাইয়া দেওয়া হইয়াছে। তখন ঐ মণিটি এবং তাহাতে প্রবিষ্ট সুতাগুলি যেমন কোনো চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তির নিকট স্পষ্ট প্রতিভাত হয়, তেমনই বোধিসত্ত্বের মাতা নিজের উদরস্থ বোধিসত্ত্বকে স্পষ্টভাবে দেখিতে পান। এইরূপ এই স্বভাবের নিয়ম।

৮. হে ভিক্ষুগণ, বোধিসত্ত্ব জন্মগ্রহণ করার সাতদিন পর, তাঁহার মাতা মৃত্যুমুখে পতিত হন ও তুষিত দেবলোকে জন্মগ্রহণ করেন। এইরূপ এই স্বভাবের নিয়ম।

৯. হে ভিক্ষুগণ, অন্যান্য নারীরা যেরকম নবম কিংবা দশম মাসে সন্তান প্রসব করেন, বোধিসত্ত্বের মাতার ঐভাবে প্রসব হয় না। বোধিসত্ত্বের দশমাস পরিপূর্ণ হওয়ার পরই, তিনি সন্তান প্রসব করেন। এইরূপ এই স্বভাবের নিয়ম।

১০. হে ভিক্ষুগণ, অন্যান্য স্ত্রীলোক যে রকম বসা অবস্থায় অথবা শুইয়া থাকিয়া সন্তান প্রসব করেন, বোধিত্ত্বের মাতা সেইভাবে প্রসব করেন না। তিনি দণ্ডায়মান থাকিয়াই, সন্তান প্রসব করেন। এইরূপ এই স্বভাবের নিয়ম।

১১. হে ভিক্ষুগণ, বোধিসত্ত্ব তাঁহার মাতার উদর হইতে বাহিরে আসিলে, প্রথম তাহাকে দেবতারা হাতে তুলিয়া লন, ও তাহার পর মানুষরা তাহাকে তুলিয়া লয়। এইরূপ এই স্বভাবের নিয়ম।

১২. হে ভিক্ষুগণ, বোধিসত্ত্ব যখন মাতার উদর হইতে বাহিরে আসেন, তখন তিনি ভূমিতে পড়িবার পূর্বে, চারিজন দেবপুত্র তাঁহাকে তুলিয়া ধরেন এবং তাঁহার মাতার সম্মুখে তাঁহাকে রাখিয়া কহেন, "হে দেবী, আনন্দকর, তুমি মহান্ পুত্র লাভ করিয়াছ।" এইরূপ এই স্বভাবের নিয়ম।

১৩. হে ভিক্ষুগণ, যখন বোধিসত্ত্ব মাতার উদর হইতে বাহিরে আসেন, তখন তাঁহার শরীরে মাতার উদরের জল, কফ, রক্ত অথবা অন্যান্য অপরিষ্কার পদার্থ মাখানো থাকে না; তিনি শুদ্ধ ও স্বচ্ছ শরীরেই বাহিরে আসেন। হে ভিক্ষুগণ, রেশমীবস্ত্রের উপর বহুমূল্য মণি রাখিলে, ঐ বস্ত্রদ্বারা মণিটির মালিন্য হয় না। কেননা, এই দুইটি পদার্থই শুদ্ধ। তেমনই, যখন বোধিসত্ত্ব মায়ের উদরের বাহিরে আসেন, তখন তিনি শুদ্ধ থাকেন। এইরূপই এই স্বভাবের নিয়ম।

১৪. হে ভিক্ষুগণ, যখন বোধিসত্ত্ব মাতার কুক্ষি হইতে বাহিরে আসেন, তখন অন্তরীক্ষ হইতে একটি শীতল ও আর-একটি উষ্ণ জলধারা নীচে নামিয়া আসে ও বোধিসত্ত্বকে এবং তাহার মাতাকে ধুইয়া দেয়। এইরূপ এই স্বভাবের নিয়ম।

১৫. হে ভিক্ষুগণ, জন্মগ্রহণ করা মাত্র বোধিসত্ত্ব দুই পায়ের উপর সোজা দাঁড়াইয়া, উত্তরদিকে সাত পা চলিয়া যান—ঐ সময় তাঁহার উপর শ্বেতবর্ণ ছত্র ধরা হয়—এবং তিনি সকল দিকে তাকাইয়া গর্জন করিয়া বলিয়া উঠেন, 'আমি এই জগতে সকলের পুরোগামী; আমি জ্যেষ্ঠ, আমি শ্রেষ্ঠ; ইহাই আমার শেষ জন্ম; আর আমার পুনর্জন্ম নাই!' এইরূপ এই স্বভাবের নিয়ম।

১৬. হে ভিক্ষুগণ, বোধিসত্ত্ব যখন মাতার উদর হইতে বাহিরে আসেন, তখন দেব, 'মার', ব্রহ্মা (ইহার পরের কথাগুলি ২ নং কথার মতো)।........

৩

হে ভিক্ষুগণ, বিপস্সীকুমার জন্মাইবার পর, রাজা বন্ধুমাকে জানানো হইল, 'হে মহারাজ, আপনার একটি পুত্র হইয়াছে; আপনি গিয়া তাহাকে দেখুন।' হে ভিক্ষুগণ, রাজা বন্ধুমা বিপস্সীকুমারকে দেখিলেন ও জ্যোতিষী ব্রাহ্মণদিগকে ডাকাইয়া, তাহাদিগকে কুমারের লক্ষণগুলি দেখিতে কহিলেন।

জ্যোতিষীরা কহিল, "হে মহারাজ, আপনি আনন্দ করুন; আপনার একটি মহৎ পুত্র হইল। আপনার কূলে যে এইরূপ পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছে, ইহা আপনার বড়ো ভাগ্য। এই শিশুর শরীরে বত্রিশটি মহাপুরুষের লক্ষণ আছে! এইরূপ মহাপুরুষের দুইটি মাত্র গতি হয়, তৃতীয় গতি হয় না। তিনি যদি গৃহস্থাশ্রমে থাকেন, তাহা হইলে তিনি ধার্মিক ধর্মরাজা, চারিসমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত পৃথিবীর স্বামী, রাজ্যের শান্তি-স্থাপক, সাতটি রত্নসমন্বিত চক্রবর্তী রাজা হন। তাঁহার সাতটি রত্ন এই—চক্ররত্ন, হস্তিরত্ন, অশ্বরত্ন, মণিরত্ন, স্ত্রীরত্ন, গৃহপতিরত্ন ও সপ্তম পরিণায়ক রত্ন।[1] তিনি হাজার হাজার লোকের অপেক্ষা অধিক সাহসী ও বীর, এবং শত্রুসেনার বিমর্দক পুত্রলাভ করেন। ঐ পুত্র সমুদ্র-পর্যন্ত এই পৃথিবী, দণ্ড ও অস্ত্র ব্যবহার না করিয়া, শুধু ধর্ম দ্বারা জয় করিয়া, রাজত্ব করেন। কিন্তু যদি তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, তাহা হইলে, তিনি অর্হন্ ও সম্যক্-সম্বুদ্ধ হন, এবং অবিদ্যার আবরণ দূর করেন।

মহারাজ এই বত্রিশটি লক্ষণ কী, তাহা শুনুন ঃ ১. এই কুমারের পা সুপ্রতিষ্ঠিত; ২. তাহার পায়ের তলায় সহস্র অর, সহস্র নেমি ও সহস্র নাম যুক্ত[2] এবং সর্বাকার-পরিপূর্ণ কয়েকটি চক্র আছে; ৩. তাহার পায়ের গোড়ালি লম্বা; ৪. আঙুল লম্বা; ৫. হাত, পা মৃদু ও কোমল; ৬. ও জালের মতো; ৭. পায়ের পাতা শঙ্কুর মতো বর্তুলাকার; ৮. তাহার জঙ্ঘা হরিণীর জঙ্ঘার মতো; ৯. দণ্ডায়মান থাকিয়া ও না বাঁকিয়া, এই জাতক তাহার করতল দ্বারা নিজের জানুদেশ স্পর্শ ও মর্দন করিতে পারিবে; ১০. তাহার বস্ত্রগুহ্য (পুরুষাঙ্গ) কেশদ্বারা (অগ্রের ত্বক্ দ্বারা) আচ্ছাদিত; ১১. তাহার দেহকান্তি সোনার মতো; ১২. গায়ের চামড়া সূক্ষ্ম (পাতলা) হওয়াতে, তাহার শরীরে ধুলা লাগে না; ১৩. তাহার প্রত্যেক লোমকূপে শুধু একটি করিয়া কেশ গজাইয়াছে; ১৪. তাহার কেশ ঊর্ধ্বাগ্র, নীল, অঞ্জনবর্ণ, কুঞ্চিত ও ডানদিকে বাঁকানো; ১৫. তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি সরল; ১৬. তাহার শরীরের সাতটি ভাগ পুরু ও সুদৃঢ়; ১৭. তাহার শরীরের সম্মুখের অধোভাগ সিংহের সম্মুখভাগের মতো; ১৮. তাহার স্কন্ধদেশ শক্ত ও পুরু; ১৯. এই জাতক বট-বৃক্ষের মতো বর্তুলাকার—তাহার উচ্চতা যতখানি, পরিধিও ততখানি, এবং তাহার পরিধি যতখানি উচ্চতাও ততখানি; ২০. তাহার কাঁধ দুইটি একইভাবে বাঁকানো; ২১. তাহার জিহ্বার গঠন উত্তম; ২২. তাহার চিবুক সিংহের চিবুকের মতো; ২৩. তাহার চল্লিশটি দাঁত; ২৪. ঐ দাঁতগুলি সোজা; ২৫. তাহাদের মধ্যে ফাঁক নাই; ২৬. ঐগুলি খুব সাদা; ২৭. তাহার জিহ্বা লম্বা; ২৮. তিনি ব্রহ্মস্বর এবং করবীক পক্ষীর আওয়াজের মতো তাহার আওয়াজ মধুর; ২৯. তাহার চোখের তারা নীল; ৩০. তাহার চোখের পাতা গোরুর চোখের পাতার মতো; ৩১. তাহার ভ্রূ দুইটির মধ্যভাগে নরম তুলার সূতার মতো সাদা সরু কেশ গজাইয়াছে; ৩২. তাহার মস্তকের আকৃতি উষ্ণীষের মতো (অর্থাৎ মাথার মধ্যভাগ কিছুটা উঁচু)।

---

১. পরিণায়ক মানে প্রধান মন্ত্রী।

২. আর মানে চাকার পাখি; নেমি মানে চাকার প্রান্তভাগ; নাভি মানে চাকার মাঝের অংশ। (বঙ্গানুবাদক)

৪

তাহার পর, হে ভিক্ষুগণ, রাজা বন্ধুমা বিপস্‌সীকুমারের জন্য তিনটি প্রাসাদ নির্মাণ করাইলেন; একটি বর্ষাকালের জন্য, একটি শীতকালের জন্য, ও একটি গ্রীষ্মকালের জন্য; এবং এই প্রসাদগুলিতে পঞ্চেন্দ্রিয়ের সুখজনক সর্ব পদার্থ রাখাইলেন। হে ভিক্ষুগণ, বর্ষাকালের জন্য নির্মিত প্রাসাদটিতে বিপস্‌সীকুমার বর্ষার চারিটি মাস কাটাইতেন, ও তখন সেখানে তাহার চারিদিকে অনবরত শুধু মেয়েরা বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র বাজাইত; আর তিনি কখনো প্রাসাদের নিচে নামিয়া আসিতেন না।

৫

আর, হে ভিক্ষুগণ, শত শত, সহস্র সহস্র বৎসর পর, বিপস্‌সীকুমার তাহার সারথিকে ডাকাইয়া বলিলেন, "সারথি-ভাই ভালো ভালো রথ প্রস্তুত রাখো। প্রকৃতির শোভা দেখিবার জন্য আমরা উদ্যানে যাইব।" সারথি ভ্রমণের জন্য রথ প্রস্তুত রাখিল। বিপস্‌সীকুমার রথে বসিয়া উদ্যানে যাইবার জন্য রওনা হইলেন। পথে তিনি এমন একজন রুগ্ণ ও অতি বৃদ্ধ মানুষ দেখিলেন, যাহার ভগ্ন শরীর কুঁড়েঘরের কড়িকাঠের মতো বাঁকিয়া গিয়াছে, ও যিনি লাঠি ভর দিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে চলেন। তাহাকে দেখিয়া, তিনি সারথিকে কহিলেন, "এই ব্যক্তির এইরকম দুরবস্থা হইয়াছে কেন? তাহার কেশ ও শরীর তো অন্যদের মতো নয়।"

সা.—মহারাজ, তিনি বৃদ্ধ মানুষ।

বি.—ভাই-সারথি, 'বৃদ্ধ' মানে কি?

সা.—বৃদ্ধ মানে 'যে আর বেশিদিন বাঁচিবে না।'

বি.—আমিও এইরকম জরাগ্রস্ত হইব কি?

সা.—মহারাজ, আমরা সকলেই জরাধর্মী।

বি.—তাহা হইলে, হে সারথি, এখন আর উদ্যানের দিকে যাইয়ো না, চলো বাড়ি ফিরিয়া যাই।

সা.—যথা আজ্ঞা, মহারাজ।

এই কথা বলিয়া সারথি অন্তঃপুরের দিকে রথ ফিরাইল। সেখানে বিপস্‌সীকুমার দুঃখী ও উদ্বিগ্ন হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, ধিক্ এই জন্ম, যে-জন্মের জন্য জরা উৎপন্ন হয়!

রাজা বন্ধুমা সারথিকে ডাকিয়া কহিলেন, "কি হে সারথি-ভাই, উদ্যানে কুমারের মন বসিল কি? উদ্যান তাহার ভালো লাগিল কি?"

সা.—না, মহারাজ।

রাজা—কেন? উদ্যানে যাওয়ার সময় সে কী দেখিয়াছিল?

সারথি রাস্তায় যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা বলিল। তখন রাজা বন্ধুমা যাহাতে বিপস্‌সীকুমার সন্ন্যাসী হইয়া না যায়, সেইজন্য তাহার জন্য পঞ্চেন্দ্রিয়ের সুখকর পদার্থ আরো বাড়াইয়া দিলেন। আর বিপস্‌সী ঐ সুখে একেবারে ডুবিয়া গেলেন।

আর, হে ভিক্ষুগণ, শত শত, হাজার হাজার বৎসর পর, বিপস্‌সীকুমার আবার উদ্যানের দিকে যাইবার জন্য রওনা হইলেন। রাস্তায় তিনি এমন অন্য এক ব্যক্তিকে দেখিলেন, যে রুগ্‌ণ পীড়িত ও অত্যন্ত অসুস্থ, যে নিজের মলমূত্রে লুটাইতেছে, যাহাকে অন্য লোকের উঠাইয়া দিতে হয় ও যাহার পরিধেয় কাপড়-চোপড় অন্যকে সামলাইয়া দিতে হয়। তাহাকে দেখিয়া তিনি সারথিকে কহিলেন, 'ইহার কী হইয়াছে? ইহার চোখ বল, কিংবা গলার স্বর বল, কিছুই তো অন্যের মতো নয়!''

সা.—এই ব্যক্তি রুগ্‌ণ।

বি.—'রুগ্‌ণ' মানে কি?

সা.—'রুগ্‌ণ' মানে 'যাহার অবস্থা এই রকম যে, তাহার পক্ষে পূর্বের মতো চলাফেরা করা কঠিন।

বি.—সারথি-ভাই, আমিও কি ইহার মতো ব্যাধিধর্মী?

সা.—মহারাজ, আমরা সকলেই ব্যাধিধর্মী?

বি.—তাহা হইলে এখন আর উদ্যানে যাওয়া নয়; অন্তঃপুরের দিকে রথ ফিরাও।

তদনুসারে সারথি রথ লইয়া অন্তঃপুরের দিকে আসিল; আর সেখানে বিপস্‌সীকুমার দুঃখী ও উদ্বিগ্ন হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, যে-জন্ম দ্বারা ব্যাধি হয়, সেই জন্মকে ধিক্!

সারথির নিকট রাজা বন্ধুমা যখন এই কথা জানিলেন, তখন তিনি বিপস্‌সীকুমারের সুখকর পদার্থসমূহ আরো বাড়াইয়া দিলেন। কেননা, তিনি চাহিতেন যে, কুমার যেন রাজ্য ছাড়িয়া সন্ন্যাসী হইয়া না যান।

আর, হে ভিক্ষুগণ, শত শত, সহস্র সহস্র বৎসর পর, বিপস্‌সীকুমার আগের মতোই প্রস্তুত হইয়া উদ্যানে যাইবার জন্য রওনা হইলেন। পথে তিনি দেখিতে পাইলেন যে, অনেক লোক একত্র জমিয়া একটি নানা রঙের বস্ত্রের পাল্কি প্রস্তুত করিতেছে। তিনি সারথিকে বলিলেন, "এই লোকরা নানা রঙের বস্ত্র দিয়া পাল্কি তৈয়ার করিতেছে কেন?"

সা.—মহারাজ, এখানে এই দেখুন একটি মানুষ মরিয়াছে। (পাল্কিটি তাহার জন্য)

বি.—তাহা হইলে, ঐ মৃত ব্যক্তির কাছে রথ লইয়া যাও।

তদনুসারে, সারথি ঐ দিকে রথ লইয়া গেল। সেই মৃত ব্যক্তিকে দেখিয়া, বিপস্‌সী কহিলেন, "ভাই সারথি, মৃত মানে কি?"

সা.—মৃত ব্যক্তি তাহার মা, বাবা ও অন্য আত্মীয়স্বজনদের নিকট দৃষ্টিগোচর হইবে না। অথবা সেও তাহাদিগকে দেখিতে পাইবে না।

বি.—বন্ধু সারথি, আমিও কি মরণধর্মী? আমিও কি কোনোদিন রাজা, রানী ও আমার অন্যান্য আত্মীয়স্বজনদের নিকট দৃষ্টিগোচর হইব না, আর তাহাদিগকে দেখিতে পাইব না?

সা.—না, মহারাজ।

বি.—তাহা হইলে, এখন আর উদ্যানের দিকে যাওয়া নয়। অন্তঃপুরের দিকে রথ ফিরাও।

তদনুসারের সারথি অন্তঃপুরের দিকে রথ লইয়া গেল। সেখানে, বিপস্‌সীকুমার দুঃখী ও উদ্বিগ্ন হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, যে-জন্ম দ্বারা ব্যাধি ও মরণ হয়, সেই জন্মকে ধিক্‌!

সারথির নিকট হইতে যখন রাজা বন্ধুমা এই খবর পাইলেন, তখন তিনি কুমারের জন্য সুখকর বস্তু আরো বাড়াইয়া দিলেন। ইত্যাদি।

আর, হে ভিক্ষুগণ, শত শত সহস্র সহস্র বৎসর পর, পুনরায় সব-কিছু প্রস্তুত করাইয়া, বিপস্‌সীকুমার সারথির সঙ্গে উদ্যানে যাইবার জন্য রওনা হইলেন। পথে একজন সন্ন্যাসী দেখিয়া, তিনি সারথিকে কহিলেন, "এই ব্যক্তি কে? ইহার মস্তক ও বস্ত্র তো অন্যদের মতো নয়।"

সা.—মহারাজ, এই ব্যক্তি সংসার ছাড়িয়া, প্রব্রজিত (সন্ন্যাসী) হইয়াছে।

বি.—'প্রব্রজিত' মানে কি?

সা.—'প্রব্রজিত' মানে 'যে ব্যক্তি এইরূপ বিশ্বাস করে যে, ধর্মচর্যা (ধর্মের আচরণ) ভালো, সমচর্যা ভালো, কুশলক্রিয়া ভালো, পূণ্যক্রিয়া ভালো। অবিহিংসা ভালো এবং ভূতদয়া ভালো।

বি.—তাহা হইলে, উহার নিকট রথ লইয়া যাও!

তদনুসারে, সারথি প্রব্রজিতের কাছে রথ লইয়া গেল। তখন বিপস্‌সীকুমার তাহাকে কহিলেন, "তুমি কে? তোমার মস্তক ও বস্ত্র তো অন্যদের মতো নয়।"

প্র.—মহারাজ, প্রব্রজিত। ধর্মচর্যা, সমচর্যা, কুশলক্রিয়া, পূণ্যক্রিয়া, অবিহিংসা, ভূতানুকম্পা ভালো, আমি এইরূপ মানি।

"আচ্ছা", এই কথা বলিয়া, বিপস্‌সীকুমার সারথিকে কহিলেন, "ভাই-সারথি তুমি রথ লইয়া অন্তঃপুরের দিকে ফিরিয়া চলো। আমি কেশ, গোঁফ দাড়ি ফেলিয়া, কষায়বস্ত্র ধারণ করিয়া, অনাগারিক (গৃহশূন্য) প্রব্রজ্যা (সন্ন্যাস) গ্রহণ করিব।"

সারথি রথ লইয়া অন্তঃপুরের দিকে গেল! কিন্তু বিপস্‌সীকুমার সেখানেই প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন।

৬

আর, হে ভিক্ষুগণ, যখন বিপস্‌সী বোধিসত্ত্ব নির্জনে বসিয়া ভাবিতেছিলেন, তখন তাঁহার মনে এই চিন্তাটি উদিত হইল যে, 'মানুষের অবস্থা বড়ো খারাপ, তাহারা জন্মগ্রহণ করে, বৃদ্ধ হয় ও মরে; বিচ্যুত হয় ও উৎপন্ন হয়; তবু এই দুঃখ হইতে কিভাবে মুক্ত হওয়া যায়, তাহা জানে না। মানুষ কবে ইহা জানিবে?'

আর, হে ভিক্ষুগণ জরা ও মরণ কিভাবে উৎপন্ন হয়, বিপস্‌সী বোধিসত্ত্ব সে-সম্বন্ধে বিচার করিতে লাগিলেন। তখন তিনি প্রজ্ঞা লাভ করিয়া বুঝিতে পারিলেন যে, জন্ম হইলে মরণ হইবেই। আর জন্ম কেন আসে? ভবের জন্য। ভব কিসের জন্য? উপাদানের জন্য। উপাদান তৃষ্ণার জন্য। তৃষ্ণা বেদনার জন্য, বেদনা স্পর্শের জন্য, স্পর্শ ষড়ায়তনের জন্য,

ষড়ায়তন নামরূপের জন্য, এবং নামরূপ বিজ্ঞানের জন্য উৎপন্ন হয়। বিপস্সী বোধিসত্ত্ব এই কারণ-পরম্পরা, একটির পর একটি, এই নির্দিষ্টক্রমে, জানিলেন। তেমনই জন্ম না থাকিলে, জরা ও মরণ আসে না; ভব না থাকিলে, জন্ম হয় না, ... বিজ্ঞান না থাকিলে নামরূপ হয় না, ইহাও তিনি জানিলেন; আর ইহাতে তাঁহার মনে ধর্ম-চর্চা, ধর্মজ্ঞান, প্রজ্ঞা, বিদ্যা ও আলোক উৎপন্ন হইল।

৭

আর, হে ভিক্ষুগণ, অর্হন্, সম্যক্সম্বুদ্ধ বিপস্সী ভগবানের মনে লোকদিগকে ধর্মোপদেশ দেওয়ার চিন্তা উদিত হইল। কিন্তু তাঁহার মনে হইল যে, এই গম্ভীর, দুর্দর্শ, দুরধিগম্য, শান্ত, প্রণীত (পরিপক্ক?), তর্কের অগম্য, নিপুণ ও শুধু পণ্ডিতের জ্ঞান-যোগ্য ধর্ম আমি প্রাপ্ত হইয়াছি। কিন্তু পৃথিবীর এই জনসাধারণ বিষয়সুখে মগ্ন হইয়া আছে। সর্বদা-আমোদ-প্রমোদে রমমাণ লোকদের পক্ষে এই কারণ-পরম্পরা, এই প্রতীত্য-সমুৎপাদ বুঝিতে পারা কঠিন! সর্ব সংস্কারের প্রশমন, সর্ব উপাধির (ছলনার?) ত্যাগ, তৃষ্ণার ক্ষয়, বিয়োগ (বৈরাগ্য), নিরোধ এবং নির্বাণও তাহাদের নিকট দুর্গম। আমি ধর্ম সম্বন্ধে উপদেশ দিলাম, আর তাহারা বুঝিল না, এইরকম হইলে, শুধু আমারই কষ্ট, আমারই উপদ্রব হইবে।

আর, হে ভিক্ষুগণ, ভগবান বিপস্সীর মনে নিম্নলিখিত অশ্রুতপূর্ব গাথা কয়েকটি হঠাৎ প্রকাশিত হইল—

যাহা আমি প্রয়াস দ্বারা লাভ করিয়াছি, তাহা
অন্যকে বলা ঠিক হইবে না;
রাগ ও দ্বেষের দ্বারা যাহাদের অন্তঃকরণ ভরিয়া আছে,
তাহাদের পক্ষে এই ধর্মের জ্ঞান সহজে হইবার মতো নয়।
যাহা (সংসার) প্রবাহের বিরুদ্ধে যাইতে পারে, যাহা
নিপুণ, গম্ভীর, দুর্দর্শ ও অনুরূপ (সূক্ষ্ম),
এমন যে এই ধর্ম, তাহা অন্ধকার পরিবেষ্টিত ও
কামাসক্ত লোকেরা দেখিতে পাইবে না।

হে ভিক্ষুগণ, এইরকম চিন্তায় অর্হন্ ও সম্য-সম্বুদ্ধ ভগবান বিপস্সীর মন লোকদিগকে ধর্মোপদেশ দেওয়ার দিকে না দিয়া, নির্জনে থাকিবার দিকে গেল। মহাব্রহ্মা এই কথা জানিয়া, নিজের মনে আবেগের সহিত বলিয়া উঠিলেন, "হায় হায়! জগতের সর্বনাশ হইতেছে! কেননা, অর্হন্ ও সম্যক্-সম্বুদ্ধ ভগবান বিপস্সীর মন ধর্মোপদেশ দেওয়ার দিকে না গিয়া, নির্জনে থাকিবার দিকে যাইতেছে!"

তখন, হে ভিক্ষুগণ, যেমন কোনো বলিষ্ঠ পুরুষ তাহার সংকুচিত হাতটি প্রসারিত করে, কিংবা প্রসারিত হাতটি সংকুচিত করে, তেমনই দ্রুতবেগে ঐ মহাব্রহ্মা ব্রহ্মলোক

হইতে অন্তর্ধান করিয়া, ভগবান বিপস্‌সীর নিকট নিজেকে প্রকট করিলেন, এবং নিজের উপবস্ত্রটি এক কাঁধের উপর রাখিয়া, ডান হাঁটু মাটিতে ঠেকাইয়া, হাত জোড় করিয়া ভগবানকে কহিলেন, "হে ভগবান, ধর্মোপদেশ দাও! হে সুগত, ধর্মোপদেশ দাও! এমন কতক জীব আছে, যাহাদের চোখ ধুলায় ভরিয়া যায় নাই; কিন্তু তাহারা ধর্ম কী, তাহা শুনিতে না পাওয়ায়, তাহাদের বিনাশ হইতেছে। আপনি ধর্মসম্বন্ধে জ্ঞানলাভে সমর্থ এইরকম লোক পাইবেন।"

ভগবান বিপস্‌সী নিজের মনের উক্ত চিন্তাটি তিনবার প্রকট করিলেন, আর তাহার পর ব্রহ্মদেব তিনবার ভগবানের নিকট ঐরূপ প্রার্থনা করিলেন। তখন ব্রহ্মদেবের প্রার্থনায় ও প্রাণীদের প্রতি দয়াবশত, ভগবান তাঁহার বুদ্ধনেত্রে জগতের দিকে অবলোকন করিলেন। সেখানে ধুলায় যাহাদের চোখ সামান্য কিছু ভরিয়া আছে, যাহাদের চোখ খুব বেশি ভরিয়া গিয়াছে, যাহাদের ইন্দ্রিয়গুলি তীক্ষ্ণ, যাহাদের ইন্দ্রিয়গুলি মৃদু, যাহাদের চেহারা ভালো, যাহাদের চেহারা খারাপ, যাহাদিগকে বুঝাইয়া দেওয়া সহজ, যাহাদিগকে বুঝাইয়া দেওয়া কঠিন, আর যাহারা পরলোকের ও খারাপ জিনিসের ভয় পোষণ করে, এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন রকমের জীব তিনি দেখিতে পাইলেন। যেমন পদ্মে ভরা সরোবরে, কোনো কোনো পদ্ম জলের নীচেই ডুবিয়া থাকে, কোনো কোনো পদ্ম জলের সমান পর্যন্ত মাথা তুলে, আর কোনো কোনো পদ্ম জলের উর্ধ্বে মাথা তুলিয়া থাকে এবং জল তাহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারে না, তেমনই ভগবান বিপস্‌সী ভিন্ন ভিন্ন রকমের প্রাণী দেখিতে পাইলেন।

আর, হে ভিক্ষুগণ, ভগবান বিপস্‌সীর মনের এই চিন্তাটি জানিতে পারিয়া, ব্রহ্মদেব নিম্নলিখিত গাথাগুলি বলিলেন—

"যেমন কোনো ব্যক্তি পাহাড়ের উপর, পর্বতের মস্তকে দাঁড়াইয়া চারিদিকের লোকজন সব দেখে, তেমনই হে সুমেধ (হে উত্তম বুদ্ধিসম্পন্ন), তুমি ধর্মের প্রাসাদে আরোহণ করিয়া চতুর্দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করতঃ এবং শোক রহিত হইয়া, জন্ম ও জরাদ্বারা পীড়িত এই জনতার দিকে দৃষ্টিপাত করো!

"হে বীর, তুমি উঠ। তুমি যুদ্ধ জয় করিয়াছ। তুমি ঋণমুক্ত সার্থবাহ (পথ প্রদর্শক)। অতএব তুমি পৃথিবীতে বিচরণ করো।"

"হে ভগবান, তুমি ধর্মোপদেশ দাও। বুঝিবার মতো লোক নিশ্চয়ই থাকিবে।"

আর, হে ভিক্ষুগণ, অর্হন্‌ ও সম্যক্‌-সম্বুদ্ধ ভগবান বিপস্‌সী নিম্নলিখিত কয়েকটি গাথাদ্বারা ব্রহ্মদেবকে উত্তর দিলেন।

"তাহাদের জন্য অমরত্বের দ্বার খোলা হইয়াছে। যাহারা শুনিতে চায় তাহারা প্রাণ মন লাগাইয়া শুনুক।

"হে ব্রহ্মদেব, আমার উপদ্রব হইবে এই ভয়ে, আমি এই শ্রেষ্ঠ ও প্রণীত ধর্ম সম্বন্ধে উপদেশ দেই নাই।"

আর, হে ভিক্ষুগণ, ভগবান বিপস্‌সী ধর্মোপদেশ দিবেন বলিয়া কথা দিলেন, মহাব্রহ্মা এই কথা বুঝিতে পারিয়া, ভগবানকে অভিবাদন ও প্রদক্ষিণ করতঃ, সেখানেই অন্তর্হিত হইয়া গেলেন।

এই সাতটি খণ্ডের মধ্যে, তৃতীয় খণ্ডটি সকলের আগে রচিত হইয়া থাকিবে। কেননা, উহা ত্রিপিটকস্থ সর্বপ্রাচীন সুত্তনিপাত গ্রন্থের সেলসুত্তে পাওয়া যায়। এই সুত্তটিই মজ্‌ঝিমনিকায়ে (সংখ্যা ৯২) আছে। তাহার আগের (সংখ্যা ৯১) ব্রহ্মাযুসুত্তে এবং দীঘনিকায়ের অম্বট্‌ঠসুত্তেও ইহার উল্লেখ আছে। বুদ্ধের সময়, ব্রাহ্মণদের এইরূপ ধারণা ছিল যে, এ-সব লক্ষণের খুব গুরুত্ব আছে। সুতরাং বুদ্ধের শরীরে ইহাদের সবগুলি লক্ষণই ছিল, এইরূপ দেখাইবার উদ্দেশ্যে, বুদ্ধের মৃত্যুর একশত দুইশত বৎসর পর, এই সুত্তগুলি রচিত হইয়া থাকিবে; আর তাহারও পর, এইগুলিকে মহাপদানসুত্তে রাখা হইয়া থাকিবে। গোতম বোধিসত্ত্ব যখন বুদ্ধ হইলেন, তখন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতরা তাঁহার শরীরে এই-সব লক্ষণ পাওয়া যায় কিনা, তাহা দেখিত। কিন্তু উপরোক্ত সুত্তগুলিতে এইরূপ দেখানো হইয়াছে যে, বিপস্‌সীকুমারের লক্ষণগুলি তাঁহার জন্মের অতি অল্প পরেই জ্যোতিষীরা দেখিতে পাইয়াছিল। ইহাতে একটি মস্ত বড়ো অসামঞ্জস্য সৃষ্টি হইয়াছে। অসামঞ্জস্যটি এই যে, লক্ষণগুলির মধ্যে, তাঁহার চল্লিশটি দাঁত আছে, দাঁতগুলি সোজা, ইহাদের মধ্যে কোনো ফাঁক নাই, আর তাঁহার চিবাইবার দাঁতগুলির রঙ একেবারে সাদা, এই চারিটি লক্ষণও রহিয়াছে। অর্থাৎ সুত্তের লেখক স্মরণে রাখিতে পারেন নাই যে, জন্ম হওয়া মাত্র শিশুর দাঁত থাকে না।

তাহার পর, দ্বিতীয় খণ্ডটি লেখা হইয়া থাকিবে। উহাতে যে 'স্বভাবের নিয়মের' কথা বলা হইয়াছে, তাহা মজ্‌ঝিমনিকায়ের অচ্ছরিয়-অব্‌ভুতধম্মসুত্তে (সংখ্যা ১২৩) পাওয়া যায়। বোধিসত্ত্বকে বিশেষভাবে গুরুত্ববান পুরুষ বলিয়া দেখাইবার জন্যই ইহা রচিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে এই যে দুইটি কথা আছে যে, তাঁহার মাতা দণ্ডায়মান অবস্থায় তাঁহাকে প্রসব করিয়াছিলেন ও প্রসবের সাতদিন পরেই তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন, সেই কথা দুইটি বাস্তবিকই ঘটিয়া থাকিবে। বাকী সব কবিকল্পনা।

সপ্তম খণ্ডটি তাহার পর, অথবা তাহার কিছু আগে কিংবা পরে, লিখিত হইয়াছিল। এইটি মজ্‌ঝিমনিকায়ের অরিয়পরিয়েসনসুত্তে, নিদানবগ্‌গসংযুক্তে (৬।১) ও মহাবগ্‌গের প্রারম্ভে পাওয়া যায়। ব্রহ্মদেব প্রার্থনা করাতে, বুদ্ধ ধর্মোপদেশ দিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, ইহা দেখাইবার জন্য এই খণ্ডটি লিখিত হইয়াছিল। আমি আমার 'বুদ্ধ, ধর্ম আণি সংঘ' নামক পুস্তকের প্রথম বক্তৃতায় দেখাইয়াছি যে, এইটি মৈত্র, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষা, এই চারিটি মহৎ মনোবৃত্তির সম্বন্ধে একটি রূপক মাত্র।

ইহার পর, তিনটি প্রাসাদের বর্ণনাযুক্ত চতুর্থ খণ্ডটি লিখিত হইয়া থাকিবে। অঙ্গুত্তরনিকায়ের তিকনিপাতে (সুত্ত ৩৮) মজ্‌ঝিমনিকায়ের মাগন্দিয়সুত্তে (সংখ্যা ৫) ইহার উল্লেখ আছে। 'আমি যখন আমার পিতার গৃহে থাকিতাম, তখন আমার বাসের জন্য তিনটি প্রাসাদ ছিল', প্রথমটিতে এইরূপ উল্লেখ আছে। দ্বিতীয়টিতে, 'আমি যৌবনে তিনটি

প্রাসাদে থাকিতাম', শুধু এই কথাই বলা হইয়াছে; কিন্তু 'পিতার' উল্লেখ নাই। শাক্য রাজারা বজ্জীদের মতো ধনী তো ছিলই না; তদুপরি বজ্জীদের তরুণ কুমাররাও এইরকম আরাম ও বিলাসিতায় থাকিত বলিয়া কোথাও প্রমাণ পাওয়া যায় না। বরং তাহারা অত্যন্ত সাদাসিধাভাবে চলিত এবং বিলাসিতার জন্য মোটেই গ্রাহ্য করিত না, এইরূপ বর্ণনা ওপম্যসংযুত্তে (বগ্‌গ ....., সুত্ত ৫) পাওয়া যায়। সেখানে ভগবান কহিতেছেন, "হে ভিক্ষুগণ, আজকাল লিচ্ছবীরা কাঠের বালিশ শিয়রে দেয় ও অত্যন্ত সাবধানতা ও উৎসাহের সহিত সামরিক কসরৎ শিখিতেছে। ইহাতে মগধের রাজা অজাতশত্রু উহাদিগকে আক্রমণ করিতে পারিতেছেন না। কিন্তু ভবিষ্যতে লিচ্ছবীদের স্বভাব কোমল হইবে, এবং তাহাদের হাত-পা নরম হইয়া যাইবে। তখন তাহারা কোমল বিছানায়, তুলার বালিশে মাথা রাখিয়া ঘুমাইবে, এবং রাজা অজাতশত্রু তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে সমর্থ হইবেন।"

বজ্জীদের মতো সম্পন্ন গণরাজারাই যখন এত হিসাব করিয়া চলিতেন, তখন তাহাদের তুলনায় বেশ দরিদ্র শাক্যরাজারা যে বড়ো বড়ো প্রাসাদে সুখে ও আরামে বাস করিত, ইহা সম্ভবপর নয়। স্বয়ং শুদ্ধোদনকে যখন ক্ষেতে গিয়া চাষবাস করিতে হইত তখন তিনি কি করিয়া নিজের ছেলের জন্য তিন তিনটি প্রাসাদ নির্মাণ করিয়া দিবেন? সুতরাং এই প্রাসাদগুলির কাহিনী যে অনেক পরে বুদ্ধের জীবনীতে ঢুকিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই কাহিনীটি কি মহাপদানসুত্ত হইতে লওয়া হইয়াছে, অথবা কোনো ভাবনাপ্রধান ব্যক্তি তাহা বুদ্ধের জীবনীতে স্থান দিয়াছেন, তাহা ঠিক করিয়া বলা সম্ভবপর নয়।

উপরিলিখিত ষষ্ঠ খণ্ডটি নিদানবগ্‌গসংযুত্তের চতুর্থ হইতে আরম্ভ করিয়া ষষ্ঠ পর্যন্ত সুত্তগুলির সহিত হুবহু মিলিয়া যায়। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, এই সুত্তগুলি মহাপদানসুত্ত হইতে গৃহীত হইয়াছে। গোতম বুদ্ধের পূর্বগামী ছয়জন বুদ্ধই বিচার করিতে করিতে এই প্রতীত্যসমুৎপাদের কারণ পরম্পরা যেরকমভাবে আবিষ্কার করিয়াছিলেন, গোতমও তাঁহার বোধিসত্ত্বাবস্থায় ঠিক সেইভাবেই তাহা আবিষ্কার করিয়াছিলেন, এইরূপ নিদানবগ্‌গসংযুত্তের দশম সুত্তে বলা হইয়াছে। কিন্তু মহাবগ্‌গের প্রথমেই এইরূপ উল্লেখ আছে যে, বুদ্ধ হওয়ার পর, গোতমের মনে উক্ত কারণ-পরম্পরার কথা উদিত হইয়াছিল। গোতম বুদ্ধের পরিনির্বাণের দুই-একশত বৎসর পর, এই প্রতীত্যসমুৎপাদ লিখিত হইয়া থাকিবে। দেখিতে দেখিতে স্বয়ং গোতম বুদ্ধের জীবনচরিতেও উহাকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হইল। ইহার ফল শুধু এই হইল যে 'চারি আর্যসত্যের' সাদাসিধা তত্ত্বটি পিছনে পড়িয়া গেল ও তাহার পরিবর্তে প্রতীত্যসমুৎপাদের এই গহনতত্ত্ব অনর্থক বেশি গুরুত্ব লাভ করিল।

উদ্যান যাত্রার বর্ণনাযুক্ত পঞ্চম খণ্ডটি ত্রিপিটক সাহিত্যে আদৌ ঢুকানো হয় নাই। উহা ললিতাবিস্তর, বুদ্ধচরিত ও জাতকের নিদানকথা, এইগুলিতে, ঠিক এখানে যেরকমটি আছে, সেইভাবে, অথবা কিছু অতিরঞ্জনের সহিতই, গৃহীত হইয়াছে। এই শেষের প্রকরণটিতে তো, "ততো বোধিসত্তো সারথিং সম্ম কো নাম এসো পুরিসো কেসা পিস্‌স ন যথা

অঞ্ঞ্ঞেসংতি মহাপদানে আগতনয়েন পুচ্ছিত্বা'', এইরূপ বলা হইয়াছে। ইহা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, এই-সব গ্রন্থের লেখকরা উক্ত গল্পটি মহাপদানসুত্ত হইতেই গ্রহণ করিয়াছেন।

বর্তমান পুস্তকের প্রথম খণ্ডে আমি যেরকম বলিয়াছিলাম, তদনুসারে এই সুত্তের প্রস্তাবনায়, গোতম বুদ্ধের প্রধান শ্রাবক প্রভৃতির নাম দিয়াছি। গোতম বুদ্ধ ক্ষত্রিয় ছিলেন ও তাঁহার পিতার রাজধানী কপিলবস্তু ছিল, এইরূপ বলিয়াছি। তাহা ছাড়া, তাঁহার গোত্র গোতম বলিয়া স্থির করিয়াছি। চতুর্থ পরিচ্ছেদে, এই প্রশ্নটি আলোচনা করিয়া আমি প্রমাণ করিয়াছি যে, শুদ্ধোদন শাক্য কপিলবস্তুতে কখনো থাকিতেন না। শাক্যদের গোত্র ছিল আদিত্য, তবু তাহারা 'শাক্য' নামেই বিশেষভাবে পরিচিত ছিল। তাহা না হইলে, ভিক্ষু বুদ্ধ 'শাক্যপুত্রীয় শ্রমণ', এই নাম লাভ করিতেন না। যদি বুদ্ধের গোত্র গোতম হইত, তাহা হইলে তাঁহাকে 'গোতম অথবা গোতমক শ্রমণ', এইরূপ বলা যাইতে পারিত।

দ্বিতীয় পরিশিষ্ট

বজ্জীদের উন্নতির সাতটি নিয়ম

ভগবান রাজগৃহে গৃধ্রকূট পর্বতের উপর বাস করিতেন। তখন রাজা অজাতশত্রু বজ্জীদের বিরুদ্ধে অভিযান চালাইবার পরিকল্পনা করিতেছিলেন। এই সম্বন্ধে ভগবান বুদ্ধের মত কী, তাহা জানিবার জন্য, তিনি তাহার 'বস্‌সকার' নামক ব্রাহ্মণ অমাত্যকে ভগবানের নিকট পাঠাইলেন। ঐ অমাত্য ভগবানকে অজাত-শত্রুর পরিকল্পনা নিবেদন করিল। তখন আনন্দ ভগবানকে বাতাস করিতেছিল তাহার দিকে তাকাইয়া ভগবান কহিলেন, "হে আনন্দ, তুমি কি এইরূপ শুন নাই যে, বজ্জীরা বারবার সভা করিতেছে ও একত্র হইতেছে?"

আ.—হাঁ মহাশয়, বজ্জীরা বারবার সভা করে ও একত্র হয়, আমি এইরূপ শনিয়াছি।

ভ.—বজ্জীরা কি সকলেই একত্র হয়, সকলেই একসঙ্গে উঠে ও সকলেই মিলিয়া কাজ করে?

আ.—হাঁ মহাশয়, আমি এইরকম শুনিয়াছি।

ভ.—তাহারা নিজে যে আইন করে নাই, সেই আইন নিজেরা করিয়াছে, এইরূপ বলে না কি? অথবা তাহারা যে আইন নিজে করিয়াছে সেই আইন ভঙ্গ করে না কি? বজ্জীরা তাহাদের আইন অনুসারে চলে কি?

আ.—হাঁ মহাশয়, বজ্জীরা আইন অনুযায়ী চলে, আমি এইরূপ শুনিয়াছি।

ভ.—বজ্জীরা তাহাদের বৃদ্ধ রাজনীতিবিদ্‌দিগকে সম্মান করে কি, ও তাহাদের পরামর্শ গ্রহণ করে কি?

আ.—হাঁ মহাশয়, বজ্জীরা বৃদ্ধ রাজনীতিবিদ্‌দিগকে সম্মান করে ও তাহাদের কথা শুনে।

ভ.—তাহারা নিজের দেশের বিবাহিত কিংবা অবিবাহিত স্ত্রীলোকের উপর অত্যাচার করে না কি?

আ.—মহাশয়, বজ্জীদের রাজ্যে স্ত্রীলোকের উপর অত্যাচার হয় না।

ভ.—বজ্জীদের শহরগুলিতে এবং শহরের বাহিরে যে-সব দেবমন্দির আছে, সেগুলির তাহারা যথাযোগ্য যত্ন লয় কি?

আ.—তাহারা নিজেদের মন্দিরগুলির যথাযোগ্য যত্ন লয়, আমি এইরূপ শুনিয়াছি।

ভ.—তাহাদের রাজ্যে যে-সব অর্হৎ আসিয়াছে, তাহারা সুখে থাকুক, এবং যাহারা সেখানে আসে নাই তাহারা বজ্জীদের রাজ্যে উৎসাহিত হউক, এই উদ্দেশ্যে যাহাতে অর্হৎদের কোনোরকম কষ্ট না হয়, তাহার জন্য কি বজ্জীরা ব্যবস্থা করে না?

আ.—হাঁ মহাশয়, অর্হৎদের যাহাতে কোনো কষ্ট না হয়, তাহার জন্য বজ্জীরা যত্নবান থাকে, আমি এইরূপ শুনিয়াছি।

তখন ভগবান বস্‌সকার-অমাত্যকে কহিলেন, "হে ব্রাহ্মণ, আমি যখন এককালে বৈশালীতে থাকিতাম, তখন বজ্জীদিগকে উন্নতির এই সাতটি নিয়ম পালন করিতে উপদেশ দিয়াছিলাম। যতদিন পর্যন্ত তাহারা এই নিয়মগুলি অনুসরণ করিয়া চলিবে, ততদিন পর্যন্ত তাহাদের উন্নতিই হইবে, অবনতি হইবে না"।

বস্‌সকার কহিলেন, "হে গোতম, এইগুলির মধ্যে যদি একটি নিয়মও বজ্জীরা পালন করে, তাহা হইলেও তাহাদের উন্নতি হইবে, অবনতি হইবে না। তবে যদি তাহারা সাতটি নিয়মই পালন করে, তাহা হইলে যে তাহাদের উন্নতি হইবে, ইহা বলাই নিষ্প্রয়োজন"।

সাতটি নিয়মের উপর টীকা

এই সাতটি নিয়মের উপরে বুদ্ধঘোষাচার্য যে অট্‌ঠ কথা (টীকা) লিখিয়াছে, তাহার আভাস নীচে দিতেছি—

১. বারবার একত্র হয়। কাল সম্মিলিত হইয়াছিলাম, পরশু সম্মিলিত হইয়াছিলাম, সুতরাং আজ আবার কেন একত্র হওয়া, এইরূপ না কহিয়া একত্র মিলিত হয়। এইভাবে একত্র না হইলে, চারিদিক হইতে যে-সব খবর আসে, তাহা জানা যায় না। অমুক গ্রামের কিংবা শহরের সীমানা লইয়া যে-বিবাদ উপস্থিত হইয়াছিল, অথবা চোররা যে বিদ্রোহ করিতেছে, এই-সব সংবাদ পাওয়া যায় না। রাজ্যের শাসনকর্তারা সাবধান নয়, ইহা বুঝিতে পারিয়া, চোররাও লুণ্ঠনকার্যে ব্যাপৃত হয়। এইভাবে শাসকদের অবনতি ঘটে। বারবার একত্র মিলিত হইলে, (রাজ্যের) সব খবর তৎক্ষণাৎ কানে পৌঁছায়, এবং (প্রয়োজন হইলে) সৈন্য পাঠাইয়া একটা কিছু ব্যবস্থা করা যায়। রাজ্য-কর্তারা সাবধান আছেন, এই কথা জানিয়া, চোররা আর দল বাঁধিয়া থাকে না, দল ভাঙিয়া নানা দিকে পলাইয়া যায়। এইভাবে, রাজ্য-কর্তাদের উন্নতি হয়।

২. সমগ্র একত্র হয়, ইত্যাদি। আজ কিছু কাজ আছে, কিংবা কোনো মঙ্গলকার্য আছে, এইরূপ বলিয়া কর্তব্য না এড়াইয়া, ঢাকের আওয়াজ কানে আসিবামাত্র, সকলে একত্র হয়। একত্র হওয়ার পর, বিচারপূর্বক সর্বকার্যের সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত না করিয়া যদি লোকেরা সভা ছাড়িয়া যাইতে আরম্ভ করে, তাহা হইলে উহাকে 'সমগ্র উঠে' এইরূপ বলা চলে না। তাহারা ঐরকম কিছু না করিয়া, সর্বকার্য সম্পন্ন করিয়া, সকলে একত্রে উঠে, সমগ্রভাবে নিজেদের কাজ করে, অর্থাৎ তাহাদের মধ্যে যদি কোনো এক রাজার কিছু করণীয় থাকে, তাহা হইলে অন্য সব রাজা তাহাকে সাহায্য করিতে যায়। অথবা অন্য রাজ্য হইতে কোনো অতিথি আসিলে, তাহার প্রতি আদর আতিথ্য দেখাইবার জন সকলেই উপস্থিত থাকে।

৩. যে-সব নিয়ম করা হয় নাই, ইত্যাদি। অর্থাৎ যে শুল্ক, কর প্রভৃতি পূর্বে নির্ধারিত হয় নাই, তাহা তাহারা আদায় করে না, পূর্বে যেরূপ নির্ধারিত হইয়াছে, সেইরূপই আদায় করে। যে আইন করা হইয়াছে, তাহা ভঙ্গ করে না, আইন অনুসারে চলে! অর্থাৎ যদি কাহাকেও চোর বলিয়া ধরিয়া আনা হয়, তাহা হইলে অনুসন্ধান না করিয়া, তাহাকে শাস্তি দেওয়া হয় না। শাসনকর্তারা এইভাবে না চলিলে, লোকেদের উপর উপদ্রব হয়; এবং তখন তাহারা সীমান্তদেশে গিয়া নিজেরা বিদ্রোহী হয়, অথবা বিদ্রোহীদের দলে যোগদান করে, ও রাজ্যের উপর আক্রমণ করে। এইভাবে, রাজ্য-কর্তাদের অবনতি হয়। আইন অনুসারে চলিলে সময়মতো কর আদায় হয়, রাজকোষের শ্রীবৃদ্ধি হয় ও তাহাতে সৈন্যদের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যয়ের ও নিজেদের ব্যক্তিগত খরচের সুব্যবস্থা হয়।

৪. "বজ্জীদের আইন", ইহার অর্থ এই ঃ যদি কাহাকেও চোর বলিয়া ধরিয়া আনা হইত, তাহা হইলে বজ্জী-রাজারা তাহাকে তৎক্ষণাৎ শাস্তি না দিয়া, প্রথম তাহাকে 'বিনিশ্চয় অমাত্যের' নিকট সমর্পণ করিতেন। এই কর্মচারী সেই ব্যক্তি চোর কিনা, তৎসম্বন্ধে নিখুঁতভাবে অনুসন্ধান করিয়া যদি দেখিতেন যে, সে চোর নয়, তাহা হইলে তাহাকে ছাড়িয়া দিতেন; ও যদি দেখিতেন যে, সে চোর তাহা হইলে তাহার সম্বন্ধে নিজে কোনো মত না দিয়া, 'ব্যবহারিকের' হাতে তাহাকে ছাড়িয়া দিতেন; তিনিও ঐরূপ অনুসন্ধান করিয়া, যদি দেখিতেন যে, সে চোর নয়, তাহা হইলে তাহাকে ছাড়িয়া দিতেন, ও চোর হইলে, তাহাকে 'অন্তঃকারিক' নামক অপর একজন কর্মচারীর হাতে সমর্পণ করিতেন। তিনিও অনুসন্ধান করিয়া যদি বুঝিতেন যে, সে চোর নয়, তাহা হইলে তাহাকে ছাড়িয়া দিতেন, আর চোর বলিয়া বুঝিলে 'অষ্টকুলিকের' হাতে ছাড়িয়া দিতেন। তিনিও আবার আগের মতোই অনুসন্ধান করিয়া, তাহাকে চোর বলিয়া নির্ধারণ করিলে, সেনাপতির হাতে, সেনাপতি উপরাজার হাতে, আর উপরাজা রাজার হাতে তাহাকে সমর্পণ করিতেন। ঐ ব্যক্তি চোর না হইলে, রাজা তাহাকে ছাড়িয়া দিতেন; কিন্তু সে চোর বলিয়া সাব্যস্ত হইলে, তিনি কাহাকেও দিয়া প্রবেণীপুস্তক (আইনগ্রন্থ) পড়াইতেন। ঐ পুস্তকে অমুক দুষ্কর্মের জন্য অমুক শাস্তি, এইভাবে বিভিন্ন দোষের বিভিন্ন শাস্তিগুলি লেখা থাকিত। এই

আইন গ্রন্থ অনুসরণ করিয়া, রাজা ঐ চোরকে শাস্তি দিতেন। বজ্জীদের উক্ত প্রাচীন আইন এইরূপ ঃ

৫. নিজেদের মধ্যে বৃদ্ধ রাজনীতিজ্ঞ ব্যক্তিদের সম্মান না রাখিলে ও বারবার তাহাদের কাছে না গেলে, তাহাদের পরামর্শ পাওয়া যাইবে না এবং তাহাতে রাজ্য-কর্তাদের অবনতি হইবে। কিন্তু যাহারা বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিদের পরামর্শ লয়, তাহারা অমুক প্রসঙ্গে কিভাবে চলিতে হইবে, তাহা ঠিক ঠিক বুঝিতে পারে ও তাহাতে উহাদের উন্নতি হয়।

৬. বিবাহিত কিংবা অবিবাহিত স্ত্রীলোকের উপর অত্যাচার করিলে, রাজ্যের লোকেরা অসন্তুষ্ট হয়। আমরা যে-সব মেয়েকে ছোটো হইতে বড়ো করিয়াছি, তাহাদিগকে এই রাজ্য-কর্তারা জোর করিয়া নিজেদের গৃহে লইয়া যায়, এইরূপ কহিয়া, লোকরা দেশের সীমান্তে গিয়া নিজেরা বিদ্রোহ করে কিংবা অন্য বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগ দেয় ও এই রাজ্যের উপর আক্রমণ করে। মেয়েদের উপর অত্যাচার না হইলে, ও রাজ্য-কর্তারা তাহাদের রক্ষণ করিলে, লোক নিশ্চিন্তভাবে নিজ নিজ কাজ করে, ও তাহাতে রাজ্যের ধনসম্পত্তি বৃদ্ধি পায়!

৬. মন্দিরের যথাযোগ্য তত্ত্বাবধান করিলে, দেবতারা রাজ্যের রক্ষণ করেন।

৭. অর্হৎদের কোনোরকম কষ্ট হইতে দেয় না। অর্থাৎ তাহারা যেখানে থাকেন, তাহার আশেপাশে যাহাতে কেহ গাছপালা কাটিয়া না ফেলে, অথবা জাল ছড়াইয়া হরিণ না ধরে, দিঘিতে মাছ না মারে, এই সম্বন্ধে যত্ন লয়।

অট্ঠকথাতে বজ্জীদের আইনকানুন সম্বন্ধে কিছু বিস্তৃত টীকা আছে। চোরকে ধরিলে, তাহার সম্বন্ধে ক্রমান্বয়ে নিম্নলিখিত সাতশ্রেণীর কর্মচারীরা অনুসন্ধান করিতেন— 'বিনিশ্চয়মহামাত্য', 'ব্যবহারিক', 'অন্তঃকারিক', 'অষ্টকুলিক', 'সেনাপতি', 'উপরাজা' এবং 'রাজা'। ইহাদের মধ্যে অষ্টকুলিক মানে বর্তমানের জুরীর মতো একটা কিছু ছিল কিনা, বলা যায় না। অন্যান্য কর্মচারীদের পদমর্যাদা ও অধিকার কী ছিল, তাহাও বুঝা যায় না। 'রাজা' মানে গণরাজাদের অধ্যক্ষ। এই অধ্যক্ষ কত বছরের জন্য তাহার এই পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিতেন, এই সম্বন্ধে কোনো খবর কোথাও পাওয়া যায় না। বজ্জীদের আইনকানুন পুস্তকে লিখিয়া রাখা হইত। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় এই যে, ঐ পুস্তক বর্তমানে একেবারে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। গ্রীকদের মতো আমাদের পূর্বপুরুষদের যদি শাসনপদ্ধতি সম্বন্ধে প্রীতি থাকিত, তাহা হইলে এই গণরাজাদের ইতিহাস বিলুপ্তপ্রায় হইয়া যাইত না।

স্ত্রীলোকের উপর অত্যাচার না হয়, এই বিষয়ে বজ্জীরা সাবধানতা অবলম্বন করিত— এই কথাটির গুরুত্ব আছে। ইহা হইতে এইরূপ অনুমান করিলে আপত্তির কারণ নাই যে, যখন গণরাজারা উচ্ছৃঙ্খলভাবে চলিতে লাগিল, তখন গরিবদের স্ত্রীলোকের উপর অত্যাচার আরম্ভ হইয়াছিল। ইহাতে সর্বসাধারণ লোকের নিকট সার্বভৌম রাজতন্ত্র ভালো লাগিতে থাকিল। সার্বভৌম মহারাজা, খুব বেশি হয় তো নিজের শহরের কয়েকটি মেয়েকে তাহার অন্তঃপুরে রাখিয়া দিতেন; কিন্তু এই গণরাজারা সমস্ত দেশময় ছড়াইয়া থাকিতে, ইহাদের

অত্যাচার হইতে রেহাই পাওয়া কোনো গ্রামের মেয়েদের পক্ষেই সম্ভবপর ছিল না। এইজন্য জনসাধারণ স্বেচ্ছায় ও আনন্দে একচ্ছত্র রাজতন্ত্র গ্রহণ করিয়া থাকিবে।

একবার যখন এই রাজারা উচ্ছৃঙ্খলভাবে চলিতে আরম্ভ করে তখন তাহাদের মধ্যে ভেদ ও বিদ্বেষ উৎপন্ন হওয়া স্বাভাবিক। বস্‌সকার নামক ব্রাহ্মণ বজ্জী গণরাজাদের মধ্যে জেদ ও অনৈক্য উৎপন্ন করিয়াছিল, এবং ইহাতে অজাতশত্রুর পক্ষে তাহাদিগকে পরাজিত করা সহজ হইয়াছিল। বজ্জীদের গণরাজ্য লুপ্ত হওয়ার পর, অল্পকালের মধ্যেই গণরাজ্যও লুপ্ত হইয়া থাকিবে। এইভাবে প্রাচীন গণমূলক রাজ্যগুলির নাশ হইয়াছিল। শুধু তাহাদের রাজ্যশাসন-পদ্ধতি ও আইনকানুন সম্বন্ধে সামান্য কিছু খবর আজ বৌদ্ধ সাহিত্যে অবশিষ্ট রহিয়াছে।

বৌদ্ধ সংঘ একত্র মিলিত হইয়া সংঘ-কার্য করিবে, এই যে নিয়ম বিনয়পিটকে দেওয়া আছে, তাহা হইতে, বজ্জী প্রভৃতি গণরাজারা কিভাবে একত্র মিলিত হইয়া, সভার কাজকর্ম করিত, তাহা অনুমান করা যায়।

তৃতীয় পরিশিষ্ট

অশোকের ভাব্রূশিলালিপি ও তাহাতে লিখিত সূত্রসমূহ

ভাব্রূ নামক জায়গাটি জয়পুর রাজ্যের একটি পার্বত্য অঞ্চলে অবস্থিত। সেখানকার ভিক্ষুসংঘ রাজা অশোকের নিকট বাণী চাওয়াতে, অশোক এই বাণীটি পাঠাইয়াছিলেন ও তিনি তাহা একটি পাথরে উৎকীর্ণ করাইয়া থাকিবেন। অশোক এইরকম বাণী বারবার নানা জায়গায় পাঠাইয়া থাকিবেন। কিন্তু ইহাদের মধ্যে, যেগুলি তাঁহার নিকট গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া মনে হইত, সেইগুলিই তিনি প্রস্তরে কিংবা প্রস্তরস্তম্ভে উৎকীর্ণ করাইতেন। এই শিলালিপিতে লিখিত সূত্রগুলি মগধদেশের বৌদ্ধরা পড়িবেন, এইরূপ বাণী অশোক মুখে কিংবা পত্রদ্বারা নিশ্চয়ই পাঠাইয়া থাকিবেন; কিন্তু তাহা পাথরে উৎকীর্ণ করান নাই। কেন-না, আশেপাশের সংঘগুলি কী করে, কী পড়ে, এই সম্বন্ধে তিনি বারবার খবর লইতেন। এই কাজের জন্য তিনি নিজস্ব কর্মচারী নিযুক্ত করিয়াছিলেন; কিন্তু রাজপুতনার মতো দূরদেশ হইতে খবর আসিতে বিলম্ব হইত। এইজন্য সেখানে এইরূপ একটি শিলালিপি রাখা অশোকের যোগ্য কাজ বলিয়া মনে হইয়া থাকিবে। আমার জ্ঞানমত আমি এই শিলালিপির অনুবাদ নীচে দিতেছি।

ভাব্রূ শিলালিপির অনুবাদ

"প্রিয়দর্শী মগধরাজ সংঘকে অভিবাদন করিয়া, সংঘের সুস্থতা ও সুখাবস্থান সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতেছেন। হে মহাশয়গণ, বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘ সম্বন্ধে আমার কতখানি শ্রদ্ধা ও ভক্তি আছে, তাহা আপনারা জানেন। ভগবান বুদ্ধের প্রত্যেকটি বচন এক-একটি সুভাষিত।

কিন্তু হে মহাশয়গণ. আমি যে এখানে কিছু লিখিতেছি, তাহা শুধু এইজন্য যে, সদ্ধর্ম চিরস্থায়ী হউক (ইহাই আমার কামনা); ও ঐ উদ্দেশ্যে, কিছু বলা আমার উচিত বলিয়া মনে হইতেছে। হে মহাশয়গণ, এইগুলি ধর্মপর্যায় (সূত্র)—বিনয়সমুকসে, অলিয়বসানি, অনাগতভয়ানি, মুণিগাথা, মোনেয়সূতে, উপতিসপসিনে এবং মিথ্যা কথা বলার সম্বন্ধে ভগবান বুদ্ধ রাহুলকে উপদেশ দেওয়ার সময় যে ভাষণ দিয়াছিলেন, তাহা। হে মহাশয়গণ, এই সূত্রগুলির সম্বন্ধে আমার ইচ্ছা এই যে, এইগুলি বহু ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী শুনিবে ও পাঠ করিবে, এবং তেমনই উপাসক-উপাসিকারাও শুনিবে এবং পাঠ করিবে। হে মহাশয়গণ, এই লিপিটি আমি পাথরে উৎকীর্ণ করাইয়াছি, কারণ, আমার ইচ্ছা এই যে, আমার অভিহিত (বাণী সকল লোকে) জানুক।"

উপরিউক্ত সাতটি সুত্তের মধ্যে প্রথমটি হইতেছে বিনয়সমুৎকর্ষ অথবা ধর্মচক্রপ্রবর্তন। ইহার মোটামুটি বিবরণ পঞ্চম পরিচ্ছেদেই দিয়াছি (প্রথম ভাগ পৃ. ১৩৬-১৩৮)। বাকি সুত্তগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ ক্রমশঃ দিতেছি।

অলিয়বসানি কিংবা অরিয়বংশসুত্ত

এই সুত্তটি অঙ্গুত্তরনিপাতের চতুক্কনিপাতে পাওয়া যায়। মোটামুটিভাবে তাহা এইরূপ—

হে ভিক্ষুগণ. এই চারটি আর্যবংশ শ্রেষ্ঠ ও বহু প্রাচীন। এই বংশগুলি প্রাচীন, ও এইগুলিতে কোনো সঙ্কর হয় নাই, (এখনও) হয় না, এবং (পরেও) হইবে না। ইহাদিগকে কোনো শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ দোষ দেয় না। ঐ চারিটি কি?

এখানে ভিক্ষু যে-রকম চীবর (বস্ত্র) পায়, তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকে; ঐরূপ সন্তোষের প্রশংসা করে, চীবরের জন্য কোনো রকম মর্যাদার হানিকর আচরণ করে না, চীবর না পাইলে সে ব্যস্ত হয় না; তাহাতে মত্ত ও আসক্ত হয় না; চীবরের দোষ জানিয়া, সে শুধু মুক্তির জন্য তাহা ব্যবহার করে; এবং ঐ প্রকার সন্তোষ থাকাতে, সে আত্মস্তুতি ও পরিনিন্দা করে না। যে এইরূপ সন্তোষে দক্ষ, সাবধান, বুদ্ধিমান্ ও স্মৃতিমান্ থাকে; হে ভিক্ষুগণ, তাহাকেই প্রাচীন শ্রেষ্ঠ আর্যবংশের অনুসরণকারী ভিক্ষু কহে।

হে ভিক্ষুগণ; আবার কোনো ভিক্ষু যে রকম ভিক্ষা পায়, তাহাতে সন্তুষ্ট থাকে; এইরূপ সন্তুষ্টির প্রশংসা করে; ভিক্ষার জন্য অযোগ্য আচরণ করে না; ভিক্ষা না পাইলে ব্যস্ত হয় না; পাইলে তাহাতে লোভ না করিয়া, আসক্ত না হইয়া, খাদ্যের দোষ জানিয়া, শুধু মুক্তির জন্য খাদ্য গ্রহণ করে; ও ঐ প্রকার সন্তোষ থাকাতে, সে আত্মস্তুতি ও পরনিন্দা করে না। যে এইপ্রকার সন্তোষে দক্ষ, সাবধান, বুদ্ধিমান্ ও স্মৃতিমান্, হে ভিক্ষুগণ, তাহাকেই প্রাচীন ও শ্রেষ্ঠ আর্যবংশের অনুসরণকারী ভিক্ষু কহে।

পুনরায়, হে ভিক্ষুগণ, যে কোনো রকম থাকিবার জায়গাতেই ভিক্ষু সন্তুষ্ট হয়, ঐরকম সন্তোষের প্রশংসা করে, থাকিবার জায়গার জন্য অযোগ্য আচরণ না পাইলে তাহাতে লোভ না করিয়া, মত্ত না হইয়া, আসক্ত না হইয়া; থাকিবার জায়গার দোষ জানিয়া কেবল

মুক্তির জন্য তাহা ব্যরহার করে; এবং তাহার ঐপ্রকার সন্তোষ থাকাতে, সে আত্মস্তুতি ও পরনিন্দা করে না। যে এইপ্রকার সন্তোষে দক্ষ, সাবধান, বুদ্ধিমান্ ও স্মৃতিমান্ হয়, তাহাকেই প্রাচীন ও শ্রেষ্ঠ আর্যবংশের অনুসরণকারী ভিক্ষু কহে।

পুনরায়, হে ভিক্ষুগণ, কোনো ভিক্ষু সমাধি ভাবনায় আনন্দ পায়, ভাবনায় রত হয়, ক্লেশ (অর্থাৎ অবিদ্যাদি দোষ) নষ্ট করিতে আনন্দ পায়, ক্লেশ নষ্ট করার কাজে রত থাকে, ও এইরূপ ভাবনার আনন্দ উপলব্ধি করাতে সে আত্মস্তুতি ও পরনিন্দা করে না। যে ঐ আনন্দে দক্ষ, সাবধান, বুদ্ধিমান্ ও স্মৃতিমান্ হয়, তাহাকেই প্রাচীন ও শ্রেষ্ঠ আর্যবংশের পরম্পরার অনুসরণকারী ভিক্ষু কহে।

হে ভিক্ষুগণ, ইহাই ঐ চারিটি আর্যবংশ......ইহাদিগকে কোনো শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ দোষ দেয় নাই।*

'হে ভিক্ষুগণ, এই চারিটি আর্যবংশ দ্বারা যে ভিক্ষু সমন্বিত, সে যদি পূর্বদিকে যায়, তাহা হইলে সে অরতিকে জয় করে, অরতি তাহাকে জয় করে না.....পশ্চিম.....উত্তর... দক্ষিণদিকে যায়, তাহা হইলে সে অরতিকে জয় করে, অরতি তাহাকে জয় করে না। এরকম কেন? কারণ, ধীর ব্যক্তি অরতির উপর ও রতির উপর জয়লাভ করে।

অরতি ধীর ব্যক্তির বিজয়ী নয়। অরতি ধীর ব্যক্তির উপর জয় লাভ করিতে পারে না। অরতির বিজয়ী হইতেছে ধীর ব্যক্তি, সে অরতির উপর বিজয় লাভ করে।

সর্ব কর্মের পরিত্যাগী ও রাগদ্বেষাদির নিরসনকারী ঐ ধীর ব্যক্তিকে কে বাধা দিবে? ঐ ব্যক্তি অতি উৎকৃষ্ট স্বর্ণমুদ্রার মতো; তাহাকে কে দোষ দিবে? দেবতারাও তাহার প্রশংসা করেন।

অনাগত ভয়ানি

এই সুত্তটি অঙ্গুত্তরনিকারের পঞ্চকনিপাতে পাওয়া যায়। সংক্ষেপে তাহা এইরূপ—

হে ভিক্ষুগণ, যদি কোনো ভিক্ষু অপ্রাপ্ত পদের প্রাপ্তির জন্য, যাহা জানা হয় নাই, তাহা জানিবার জন্য, যাহার সাক্ষাৎকার ঘটে নাই, তাহার সাক্ষাৎকারের জন্য, অপ্রমত্ত ভাবে উদ্যম ও মনোযোগের সহিত চেষ্টা করে, তাহা হইলে তাহার পক্ষে (অর্থাৎ তাহার কৃতকার্যতার জন্য) পাঁচটি অনাগত ভয়ের জ্ঞান পর্যাপ্ত হইবে। এই পাঁচটি কি?

হে ভিক্ষুগণ, এখানে ভিক্ষু এইরূপ চিন্তা করে যে, আমি বর্তমানে তরুণ ও যৌবনসম্পন্ন; কিন্তু এমন এক কাল আসিবে, যখন এই শরীর জরাগ্রস্ত হইবে। বৃদ্ধ ও জরাজীর্ণ ব্যক্তির পক্ষে, বুদ্ধের ধর্ম মনন করা সহজ নয়, বনে নির্জনে থাকা সহজ নয়। ঐ অবাঞ্ছিত, অপ্রিয় দশা আসিবার পূর্বেই, যদি আমি অপ্রাপ্ত পদের প্রাপ্তির জন্য, যাহা জানা হয় নাই, তাহা

* ব্রাহ্মণরা প্রাচীন বংশপরম্পরাকে খুব গুরুত্ব দিত; কিন্তু ঐ পরম্পরা আসলে গুরুত্বপূর্ণ নয়, বরং এই সুত্তে বর্ণিত আর্যবংশ-পরম্পরাই গুরুত্বপূর্ণ, ইহাকে শ্রমণ ও ব্রাহ্মণরা দোষ দিতে পারে না, ইহাই উপরি লিখিত কথাগুলির ধর্ন্যর্থ।

জানিবার জন্য, যাহার সাক্ষাৎকার ঘটে নাই, তাহার সাক্ষাৎকারের জন্য প্রযত্ন করি, তাহা হইলেই ভালো! কারণ ইহাতে বার্ধক্যেও আমি সুখে থাকিতে পারিব।' এই প্রথম অনাগত ভয়ের দ্রষ্টার পক্ষে ...... মনোযোগের সহিত চেষ্টা করিবার জন্য পর্যাপ্ত হইবে।

পুনরায়, হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু এইরূপ বিচার করে, 'বর্তমানে আমি সুস্থ আছি, আমার জঠরাগ্নি ভালো, এবং কাজকর্মের অনুকুল। কিন্তু এই রকম এক সময় আসে, যখন এই শরীর ব্যাধিগ্রস্থ হয়। ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তির পক্ষে বুদ্ধের ধর্ম মনন করা সহজ নয়, অরণ্যে নির্জনবাস করাও সহজ নয়। যাহাতে রুগ্নাবস্থাতেও আমি সুখে থাকিতে পারি, তাহার জন্য ঐ অনাকাঙ্ক্ষিত ও অপ্রিয় অবস্থা আসার পূর্বেই, আমার......চেষ্টা করা ভালো!' এই দ্বিতীয় অনাগত ভয়ের দ্রষ্টার পক্ষে......মনোযোগের সহিত চেষ্টা করিবার জন্য পর্যাপ্ত হইবে।

পুনরায়, হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু এইরূপ বিচার করে, 'বর্তমানে ভিক্ষা সুলভ, অর্থাৎ সহজে ভিক্ষা পাওয়া যায় ভিক্ষার দ্বারা জীবিকানির্বাহ করা সহজ। কিন্তু এমন এক সময় আসে যে, তখন দুর্ভিক্ষ হয়, ধান্য উৎপন্ন হয় না, ভিক্ষা পাওয়া কঠিন হয়, ভিক্ষাদ্বারা জীবিকানির্বাহ করা সহজ নয়। এইরূপ দুর্ভিক্ষে লোকেরা যেখানে ভিক্ষা সুলভ, সেখানে চলিয়া যায়। সেখানে লোকের ভিড় হয়। এইরূপ স্থানে, বুদ্ধের ধর্ম মনন করা সহজ নয়, বনে নির্জনে থাকা সহজ নয়। যাহাতে দুর্ভিক্ষেও আমি সুখে থাকিতে পারি, তাহার জন্য ঐ অবাঞ্ছিত ও অপ্রিয় অবস্থা আসিবার পূর্বেই .... আমার চেষ্টা করা ভালো!' এই তৃতীয় অনাগত ভয়ের দ্রষ্টার পক্ষে ..... মনোযোগের সহিত চেষ্টা করিবার জন্য পর্যাপ্ত হইবে।

পুনরায়, হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু এইরূপ বিচার করে, 'বর্তমানে লোক আনন্দিত মনে পরস্পরের সহিত ঝগড়া না করিয়া দুধ ও জলের মতো মিত্রতার সহিত পরস্পরের প্রতি প্রেমদৃষ্টি রাখিয়া চলে। কিন্তু এমন এক কাল আসে যে, তখন কোনো ভয়ংকর বিদ্রোহ দেখা দেয়, লোকেরা জিনিসপত্র সঙ্গে লইয়া গাড়িতে করিয়া কিংবা পায়ে হাঁটিয়া, যেখানে-সেখানে ছুটিয়া পালায়। এইরূপ সংকটের সময়, যেখানে সুরক্ষিত স্থান পাওয়া যায়, লোকেরা সেখানে গিয়া সমবেত হয়। সেখানে লোকের ভিড় হয়। ঐরূপ স্থানে বুদ্ধের ধর্ম মনন করা সহজ-সাধ্য নয়, বনে নির্জন বাসাও সহজ-সাধ্য নয়। যাহাতে ঐরূপ সংকটেও আমি সুখে থাকিতে পারি, তাহার জন্য, ঐ অবাঞ্ছিত ও অপ্রিয় অবস্থা হওয়ার পূর্বেই ..... চেষ্টা করা ভালো!' এই চতুর্থ অনাগত ভয়ের দ্রষ্টা ভিক্ষুর পক্ষে ..... মনোযোগের সহিত চেষ্টা করিবার জন্য পর্যাপ্ত হইবে।

পুনরায়, হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু এইরূপ বিচার করে, 'বর্তমানে সংঘটি 'সমগ্র' ও 'সংবিদিত' এবং বিবাদ না করিয়া একই আদর্শে চলিয়াছে। কিন্তু এমন এক সময় আসে যে, তখন সংঘে ভেদ ও অনৈক্যের সৃষ্টি হয়। সংঘে দলাদলি আরম্ভ হইলে, বুদ্ধের ধর্ম মনন করা সহজ-সাধ্য নয়, বনে নির্জনবাসও সহজসাধ্য নায়। যাহাতে ঐ প্রতিকূল অবস্থাতেও আমি

সুখে থাকিতে পারি, তাহার জন্য ঐ অবাঞ্ছিত ও অপ্রিয় অবস্থা আসিবার পূর্বেই....চেষ্টা করা ভালো।' এই পঞ্চম অনাগত ভয়ের দ্রষ্টা ভিক্ষুর পক্ষে.....মনোযোগের সহিত চেষ্টা করিবার জন্য পর্যাপ্ত হইবে।

হে ভিক্ষুগণ, এই পাঁচটি অনাগত ভয়ের দ্রষ্টা ভিক্ষুর পক্ষে অপ্রাপ্ত পদের প্রাপ্তির জন্য, যাহা জানা হয় নাই, তাহা জানার জন্য, যাহার সহিত সাক্ষাৎকার হয় নাই, তাহার সাক্ষাৎকারের জন্য, অভ্রান্তভাবে উদ্যম ও মনোযোগের সহিত চেষ্টা করিবার জন্য পর্যাপ্ত হইবে।

মুনিগাথা

এইটি 'মুনিসুত্ত' নামে সুত্তনিপাতে পাওয়া যায়। উহার অনুবাদ এইরূপ—

স্নেহবশত ভয় উৎপন্ন হয়, ও গৃহ হইতে মল উৎপন্ন হয়; এইজন্য অনাগারিকতা ও নিঃস্নেহতাই মুনির তত্ত্বজ্ঞান বলিয়া বুঝিবে॥ ১

মনের যে দোষ উৎপন্ন হইয়াছে, তাহার উচ্ছেদ করিয়া যে-ব্যক্তি উহা পুনরায় বাড়িতে দেয় না, ও তাহার সম্বন্ধে মনে কোনো স্নেহ পোষণ করে না, সেইরূপ নির্জনবাসী ব্যক্তিকে মুনি কহে। ঐ মহর্ষি শান্তিপদ দর্শন করিয়াছেন॥ ২

পদার্থ-সমূহ ও তাহাদের বীজ জানিয়া,[১] যে ব্যক্তি উহাদিগকে স্নেহ (আর্দ্রতা) দেয় না, তিনি বাস্তবিক জন্মক্ষয়ান্তদর্শী মুনি। তিনি তর্ক পরিত্যাগ করিয়া নামাভিধান (জন্ম) প্রাপ্ত হন না॥ ৩

যে-ব্যক্তি সর্ব অভিনিবেশের কথা জানে ও উহাদের মধ্যে একটিরও বাসনা পোষণ করে না, সেই বীততৃষ্ণ, নির্লোভ মুনি কখনো অস্থির হন না; কারণ তিনি (এই সবের) পরপারে চলিয়া যান॥ ৪

যে-ব্যক্তি সব-কিছু জয় করিয়াছেন, সব-কিছু জানিয়াছেন, যিনি সুবুদ্ধি, যিনি সর্ব পদার্থ হইতে অলিপ্ত থাকেন, যিনি সর্বত্যাগী ও যিনি তৃষ্ণার ক্ষয়ের দ্বারা মুক্ত হইয়াছেন, তাঁহাকে সুজ্ঞ লোকেরা মুনি কহে॥ ৫

প্রজ্ঞা যাঁহার বল, যিনি শীলসম্পন্ন ও ব্রতসম্পন্ন, সমাহিত, ধ্যানরত, স্মৃতিমান্, সঙ্গ হইতে মুক্ত, যিনি কাঠিন্যরহিত ও অনাশ্রব, তাঁহাকে সুজ্ঞ লোকেরা মুনি কহে॥ ৬

যিনি একাকী থাকেন, যিনি অপ্রমত্ত, মুনি, নিন্দা ও স্তুতিতে অবিচলিত, সিংহের মতো আওয়াজ শুনিয়াও যিনি ঘাবড়ান না, যিনি বায়ুর মতো কখনো জালে বদ্ধ হন না, জলের পদ্মের মতো যিনি অলিপ্ত থাকেন, যিনি অন্যের নেতা, কিন্তু যাঁহার কোনো নেতা নাই, এইরূপ ব্যক্তিকে সুজ্ঞ লোকেরা মুনি কহে॥ ৭

---

১. পালি শব্দটি হইতেছে 'পমার'। টীকাকার ইহার অর্থ করিয়াছেন 'হিংসত্বা বাধিত্বা'। কিন্তু প্র-পূর্বক মা ধাতুর অর্থ হইতেছে 'মাপা', অথবা যথার্থভাবে জানা।

নিজের সম্বন্ধে লোকেরা যাহা ইচ্ছা তাহা বলিলেও, যিনি (নদীর) ঘাটের স্তম্ভের[১] মতো স্থির থাকেন, যিনি বীতরাগ ও সুসমাহিতেন্দ্রিয়; তাঁহাকে সুজ্ঞ লোকেরা মুনি কহে॥ ৮

যে স্থিতাত্মা মাকুর[২] মতো সরলভাবে (সংসারে) চলেন, যিনি পাপ কর্ম ঘৃণা করেন, বিষম ও সমের পরীক্ষা করেন, তাঁহাকে সুজ্ঞ লোকেরা মুনি কহে॥ ৯

অল্পবয়স্ক বা মধ্যমবয়স্ক যে সংযতাত্মা মুনি পাপ করেন না, যে মতাত্মা কখনো রাগ করেন না ও অন্য কাহাকেও রাগান না, তাহাকে সুজ্ঞ লোকেরা মুনি কহে॥ ১০

যিনি অপরের দেওয়া অন্নের দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করেন, যিনি রাঁধা অন্ন হইতে (গৃহীর ভোজনের) আরম্ভে, মধ্যে অথবা শেষে দেওয়া ভিক্ষা পাইয়া, স্তুতি কিংবা নিন্দা করেন না, তাঁহাকে সুজ্ঞ লোকেরা মুনি কহে॥ ১১

যে মুনি স্ত্রীসঙ্গ হইতে বিরত থাকেন, যৌবনেও যিনি কোথাও বাঁধা পড়েন না, যিনি মদ-প্রমাদ হইতে বিরত, যিনি মুক্ত, তাঁহাকে সুজ্ঞ লোকেরা মুনি কহে॥ ১২

যিনি ইহলোক জানিয়া, পরমার্থ দর্শন করিয়াছেন, যিনি নদী ও সমুদ্র পার হইয়া, তাদৃগ্‌ভাব লাভ করিয়াছেন, যিনি বন্ধনসমূহ (গ্রন্থি) ছিন্ন করিয়াছেন, যিনি অনাশ্রিত ও অনাশ্রব, তাঁহাকে সুজ্ঞ লোকেরা মুনি কহে॥ ১৩

স্ত্রীর ভরণপোষণকারী গৃহী ও মমত্বহীন মুনি, এই দুইজনের জীবনধারণের প্রণালী ও স্বভাব অত্যন্ত ভিন্ন। কারণ, যাহাতে প্রাণিহত্যা না ঘটে, সেইজন্য, গৃহী সংযম পালন করে না; কিন্তু মুনি সর্বদাই প্রাণিদের রক্ষণ করেন॥ ১৪

যেমন আকাশে উড্ডীয়মান নীলকণ্ঠ ময়ূর হংসের বেগে চলিতে পারে না, তেমনই গৃহস্থও বনে নির্জন ধ্যানকারী ভিক্ষু মুনির অনুকরণ করিতে সমর্থ হয় না॥ ১৫

মোনেয্যসুত্ত

এইটি 'নালকসুত্ত' এই নামে সুত্তনিপাতে পাওয়া যায়। ইহাতে কুড়িটি প্রাস্তাবিক গাথা আছে। উহাদের অনুবাদ এখানে দিতেছি না। যাহারা ইহা জানিতে উৎসুক তাহারা ১৯৩৭ সনের 'বিবিধজ্ঞানবিস্তারের' সংখ্যাগুলি দেখিবেন। উহাতে প্রাস্তাবিক গাথা-সহ এই সুত্তগুলির অনুবাদ দিয়াছি। নালক ছিল অসিত ঋষির ভাগিনেয়। তাহার বয়স যখন অল্প, তখন গোতম বোধিসত্ত্ব জন্মিয়াছিলেন। অসিত ঋষি বোধিসত্ত্বের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে গণনা করিয়া এইরূপ বলিয়াছিলেন যে, তিনি খুব বড় মুনি হইবেন। আর তিনি নালককে গোতমবুদ্ধের অনুসরণ করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। নালক মামার কথায় শ্রদ্ধা রাখিয়া, গোতম বোধিসত্ত্বের

১. নদীর ঘাটে চতুষ্কোণ কিংবা অষ্টকোণ স্তম্ভ বাঁধা হইত। স্নান করিবার সময় সর্ব জাতির লোকেরা ইহাতে তাহাদের পিঠ ঘষিত।

২. মাকু যেমন টানা ও প'ড়েন সুতার মধ্যে দিয়া সরলভাবে চলিয়া যায় ও সুতার মধ্যে আটকাইয়া থাকে না, তিনি ঐরূপ সরলভাবে চলেন।

বুদ্ধত্ব লাভ পর্যন্ত, তাপস হইয়া রহিল; আর গোতম যখন বুদ্ধত্ব লাভ করিলেন, তখন তাঁহার নিকট আসিয়া তাঁহাকে মৌনেয় সম্বন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। ঐ প্রশ্ন হইতে এই সুত্তের আরম্ভ।

(তুমি শ্রেষ্ঠ মুনি হইবে) অসিতের এই বচন যে যথার্থ, তাহা আমি জানিয়াছি। আর তাই যিনি সর্ববস্তুর পরপারে গিয়াছেন, সেই গোতমকে আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি॥ ১

হে মুনি, যে ব্যক্তি গৃহত্যাগ করিয়া ভিক্ষাদ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে, তাহার পক্ষে শ্রেষ্ঠ পদ যে-মৌনেয়, তাহা কী, ইহা আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি। আপনি আমাকে তাহা বলুন॥ ২

মৌনেয় কী, তাহা আমি তোমাকে বলিতেছি—ভগবান এইরূপ কহিলেন—উহা দুষ্কর ও দুরভিসম্ভব। তথাপি আমি তোমাকে তাহা বলিতেছি। সাবধানভাবে চলিবে ও দৃঢ় থাকিবে (অর্থাৎ সংকল্প দৃঢ় রাখিবে)॥ ৩

গ্রামে কেহ নিন্দা করিলে, কিংবা স্তুতি করিলে, সকলের সম্বন্ধেই সমানভাব পোষণ করিবে। মনে মনেই ক্রোধ সংবরণ করিবে, শান্ত ও নিরহংকার হইবে॥ ৪

দাবাগ্নির শিখার মতো গ্রামে গ্রামে স্ত্রীলোকেরা চলাফেরা করে। তাহারা মুনিকে ভুলায়। যাহাতে তাহারা তোমাকে মোহে না ফেলে, এইজন্য তুমি সাবধান থাকিবে॥ ৫

ছোট বড় (সর্বপ্রকার) কামোপভোগ পরিত্যাগ করিয়া, স্ত্রীসঙ্গ হইতে বিরত হও। স্থাবর ও জঙ্গম প্রাণীদিগের বিরোধিতা করিয়ো না ও তাহাদের প্রতি আসক্তি পরিত্যাগ করো॥ ৬

যেমন আমি, তেমনই ইহা, ও যেমন তাহা, তেমনই আমি, এইভাবে নিজের দৃষ্টান্ত দ্বারা (অন্যের ব্যথার কথা) জানিয়া, কাহাকেও মারিবে না ও মারাইবে না॥ ৭

যে-ইচ্ছা ও লোভে সর্বসাধারণ লোক বদ্ধ হয়, সেই ইচ্ছা ও লোভ ত্যাগ করিয়া, চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তি এই নরক অতিক্রম করিয়া, (তাহার) পরপারে চলিয়া যাইবে॥ ৮

পেট ভরিয়া খাইবে না, মিতাহারী, অল্পেচ্ছ অলোলুপ হইবে। ঐ ব্যক্তিই ইচ্ছা ত্যাগ করিয়া তৃপ্ত, অনিচ্ছ ও শান্ত হয়॥ ৯

মুনি ভিক্ষা করার পর, বনে আসিবে—এবং সেখানে গাছের নীচে আসনে উপবেশন করিবে॥ ১০

ঐ ধ্যানরত ধীর পুরুষ বনে আনন্দে আছে, এইরূপ মানিবে। সে গাছের নীচে বসিয়া, মনকে সন্তুষ্ট রাখিয়া ধ্যান করিবে॥ ১১

তাহার পর, রাত্রি শেষ হইয়া গেলে, সে গ্রামে আসিবে। সেখানে কাহারও নিমন্ত্রণ পাইলে, কিংবা কেহ সাক্ষাৎ করিতে আসিলে, সে উল্লসিত হইবে না॥ ১২

মুনি গ্রামের কুটুম্বদের সহিত খুব বেশি মেলামেশা করিবে না, ভিক্ষা সম্বন্ধে কিছু বলিবে না ও সূচক শব্দ উচ্চারণ করিবে না॥ ১৩

ভিক্ষা পাইলেও ভালো, না পাইলেও ভালো। দুই অবস্থাতেই সে সমভাব রাখে ও (নিজের থাকিবার) গাছের নীচে চলিয়া আসে॥ ১৪

হাতের ভিক্ষাপাত্র লইয়া চলিবার সময়, সে বোবা না হইয়াও, বোবার মতো আচরণ করিবে, ও অল্প যাহা কিছু ভিক্ষা পাওয়া যায়, তাহা ঘৃণা করিবে না এবং দাতাকেও অসম্মান করিবে না॥ ১৫

শ্রমণ (বুদ্ধ) হীনমার্গ কী ও উত্তম মার্গ কী, তাহা স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন। সংসারের পরপারে কেহ দুইবার যায় না, তথাপি জ্ঞান যে একই রকমের হয়, তাহা নহে॥ ১৬

যে-ভিক্ষুর আসক্তি নাই, যিনি সংসার-স্রোত রোধ করিয়াছেন এবং যিনি কৃত্য ও অকৃত্য হইতে মুক্ত হইয়াছেন, তাহার পরিদাহ থাকে না॥ ১৭

ভগবান কহিলেন—আমি তোমাকে মৌনেয় কহিতেছি, যে ক্ষুরধারার উপর হইতে মধু চাটিয়া খাইতেছে, এমন মানুষের মতো সাবধান থাকিবে; তালুতে জিহ্বা লাগাইয়াও খাওয়া-দাওয়াতে সংযম অবলম্বন করিবে॥ ১৮

সাবধান-চিত্ত হইবে, কিন্তু বেশি চিন্তাও করিবে না। হীন চিন্তা হইতে বিমুক্ত, অনাশ্রিত ও ব্রহ্মচর্য-পরায়ণ হইবে॥ ১৯

নির্জনে থাকার ও শ্রমণোপাসনার (ধ্যান-চিন্তনের) অভিরুচি রাখিবে। একাকী বাস করাকেই মৌন কহে। যদি একাকী থাকিতে তুমি আনন্দ পাইতে আরম্ভ কর, ২০

তাহা হইলে তুমি ধ্যানরত, কামত্যাগী ধীর ব্যক্তিদের বচন শুনিয়া দশদিক আলোকিত করিবে। তবু (ঐ পদপ্রাপ্ত হইলেও) আমার শ্রাবকরা হ্রী (পাপ-লজ্জা) ও শ্রদ্ধা বাড়াইবে॥ ২১

তাহা নদীর উপমাদ্বারা বুঝিতে হইবে। প্রস্রবণ জলপ্রপাতের উপর দিয়া, ও পাথরের ভিতর দিয়া, খুব আওয়াজ করিয়া বহিতে থাকে; কিন্তু বড়ো নদী শান্ত ধীরভাবে বহিয়া যায়॥ ২২

যাহা চঞ্চল, তাহা আওয়াজ করে, কিন্তু যাহা গম্ভীর তাহা শান্ত। মূঢ় ব্যক্তি অর্ধপূর্ণ ঘটের ন্যায় আওয়াজ করে; কিন্তু সুজ্ঞ ব্যক্তি গভীর হ্রদের মতো শান্ত॥ ২৩

শ্রমণ (বুদ্ধ) যে অনেক কথা বলেন, তাহা যোগ্য এবং উপযুক্ত, এইরূপ জানিয়াই বলেন। জানিয়া বুঝিয়াই, তিনি ধর্মোপদেশ দেন এবং জানিয়া বুঝিয়াই তিনি অনেক কথা বলেন॥ ২৪

কিন্তু যে-সংযতাত্মা জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও অনেক বলেন না, সেই মুনি মৌনের যোগ্য; মৌন কী, তাহা ঐ মুনি জানিয়াছেন॥ ২৫

উপতিসপসিনে

এইটি 'সারিপুত্তসুত্ত' নামে সুত্তনিপাতে পাওয়া যায়। অট্‌ঠকথাতে ইহাকে 'থেরপঞ্‌হ' এইরূপই বলা হইয়াছে। ইহা হইতে মনে হয় যে, ইহাকে সারিপুত্তপঞ্‌হ কিংবা উপতিস্‌সপঞ্‌হ এইরূপও বলা হইয়া থাকিবে। ইহার অনুবাদ এইরূপ—

আয়ুষ্মান্ সারিপুত্ত কহিলেন—এইরূপ মধুর ভাষী, সন্তুষ্ট[১] ও সংঘের নেতা ও শিক্ষক আমি ইতঃপূর্বে দেখি নাই, অথবা শুনি নাই॥ ১

দেবতাগণের সহিত বিশ্বজগতের লোকেরা এইরূপ সর্বতমোগুণ নাশক ও শ্রমণধর্মরত চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তি শুধু একজনই দেখিতে পায়॥ ২

অনাশ্রিত ও অদাম্ভিক যে-বুদ্ধপদ, তাহা লাভ করিয়াছেন যে-সংঘনায়ক, তাঁহার নিকট বহু বদ্ধ মানুষের মঙ্গল-কামনায়, আমি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছি॥ ৩

সংসারে বিরক্ত হইয়া, গাছের নীচে, শ্মশানে কিংবা পর্বতের গুহায় যে-ভিক্ষু নির্জনবাস যাপন করে, তাঁহার, ৪

এইরূপ সেই ভালো বা মন্দ স্থলে, কিসের ভয়? ঐ নিঃশব্দ প্রদেশে, সেই ভিক্ষুর কোন্ কোন্ ভয়ে ভীত না হওয়া উচিত? ৫

অমৃতের দিকে যাওয়ার জন্য, সুদূরের প্রবাসী যে-ভিক্ষু, তাহার কোন্ কোন্ বিঘ্ন সহন করা প্রয়োজন? ৬

দৃঢ়নিশ্চয়ী ভিক্ষুর বাণী কি রকম হওয়া উচিত? তাহার চলাফেরা কি রকম হইবে? আর তাহার শীল ও ব্রত কি প্রকার থাকা উচিত? ৭

স্বর্ণকার যেমন আগুনে রুপা গলাইয়া, রুপার অবিশুদ্ধ ভাগ বাহির করে, তেমনই সমাহিত, সাবধান ও স্মৃতিমান্ ভিক্ষু কোন্ পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া নিজের মলিনতা জ্বালিয়া ফেলিবে? ৮

ভগবান কহিলেন, হে সারিপুত্ত, সংসারে বিরক্ত হইয়া যে সম্বোধি-পরায়ণ ভিক্ষু নির্জনবাস যাপন করে, তাহার যাহা কর্তব্য বলিয়া আমার মনে হয়, তাহা আমি তোমাকে বলিতেছি॥ ৯

নির্জননিবাসী, স্মৃতিমান্ ধীর ভিক্ষুর এই পাঁচটি ভয়ে ভীত হওয়া উচিত নয়। মশার কামড়, সাপ, মানুষের উপদ্রব, চতুষ্পদ, ১০

এবং পরমধর্মীয় লোককে ভয় করিবে না। পরমধর্মীয় লোকদের বহু ভীষণ কৃত্য দেখিয়াও, তাহাদিগকে ভয় করিবে না আর সেই কুশলান্বেষণকারী ভিক্ষু অন্যান্য বিঘ্নও সহন করিবে॥ ১১

(সেই ভিক্ষু) রোগ ও ক্ষুধা হইতে যে-দুঃখ উৎপন্ন হয়, তাহা, এবং শীত ও গ্রীষ্ম সহন করিবে। ঐ সব বিঘ্ন নানাবিধ বাধা উৎপন্ন করিলেও, (সেই ভিক্ষু) অনাগরিক থাকিয়া, নিজের উৎসাহ ও মনের বল দৃঢ় করিবে॥ ১২

সে চুরি করিবে না, মিথ্যা বলিবে না, চরাচর প্রাণীদের উপর মৈত্রী-ভাবনা করিবে ও মনের কলুষ 'মার' হইতে আসিয়াছে, ইহা জানিয়া, তাহা দূর করিবে॥ ১৩

---

১. মূলে 'সন্তুষ্ট' শব্দের জায়গায় 'তুসিতো' আছে। কিন্তু অট্‌ঠকথাতে 'তুসিতা' এইরূপ পাঠ আছে ও 'তুষিত দেবলোক হইতে ইহলোকে আসিয়াছে', এইরূপ অর্থ করা হইয়াছে।

যে ক্রোধ ও অতি মানের বশবর্তী হইবে না। উহাদের মূল ও ডালপালা খুঁড়িয়া ফেলিয়া দিবে, ও নিশ্চিতভাবে উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়া প্রিয় ও অপ্রিয় সহন করিবে॥ ১৪

কল্যাণপ্রিয় মানুষ প্রজ্ঞাকে গুরুত্ববান্ মনে করিয়া, ঐ সব বিঘ্ন সহন করিবে; নির্জন-বাসে অসন্তোষ হইলে, তাহা সহন করিবে এবং চারিটি শোকদায়ক জিনিসও সহন করিবে॥ ১৫

(সেইগুলি এই—) আমি আজ কি খাইব? ও কোথায় খাইব? গত রাত্রিতে ঘুম না হওয়ায় কষ্ট হইয়াছে। আজ কোথায় ঘুমাইব? অনাগরিক শৈক্ষী দ্বারা (সেক দ্বারা) এই (চারিটি) বিতর্ক ত্যাগ করিবে॥ ১৬

সময় সময়, অন্ন ও বস্ত্র পাইলে, তাহাতে (যোগ্য) পরিমাণ রক্ষা করিবে। অল্পে সন্তোষ মানিবে। এই সব পদার্থ হইতে যে-ভিক্ষু নিজের মনকে রক্ষা করে, এবং গ্রামে গিয়া সংযমের সহিত চলাফেরা করে, সেই ভিক্ষু যদিও অন্যে তাহার রাগ হইতে পারে এমন কাজ করে, তথাপি তাহার প্রতি কঠোর কথা বলিবে না॥ ১৭

সে নিজের দৃষ্টি পায়ের কাছে রাখিবে, চঞ্চলভাবে চলাফেরা করিবে না, ধ্যানরত ও জাগ্রৎ থাকিবে, উপেক্ষা বৃত্তি অবলম্বন করিয়া চিত্ত একাগ্র করিবে, তর্ক ও চাঞ্চল্য নাশ করিবে॥ ১৮

ঐ স্মৃতিমান্ ব্যক্তি, যে তাহার দোষ দেখাইয়া দেয়, তাহাকেও অভিনন্দন করিবে, সব্রহ্মচারীদের সম্বন্ধে মনে কঠোরভাব পোষণ করিবে না, প্রসঙ্গানুসারে ভালো শব্দই বলিবে এবং লোকেদের বাদবিবাদে ঢুকিবার ইচ্ছা করিবে না॥ ১৯

তাহার পর, ঐ স্মৃতিমান্ ব্যক্তি জগতের পাঁচটি রজোগুণ ত্যাগ করিতে শিখিবেন। (অর্থাৎ) রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস ও স্পর্স (এই পাঁচটি রজের) লোভ তিনি পোষণ করিবেন না॥ ২০

এই পদার্থগুলির পশ্চাতে ধাবিত হওয়ার অভ্যাস ছাড়িয়া দিয়া, সেই স্মৃতিমান্, বিমুক্তচিত্ত, মাঝে মাঝে সদ্ধর্মের চিন্তনকারী, ও একাগ্রচিত্ত ভিক্ষু অন্ধকার বিনাশ করিতে সমর্থ হইবেন (ভগবান) এইরূপ কহিলেন॥ ২১

রাহুলোবাদ সুত্ত

ইহাকে চুলরাহুলোবাদ এবং অম্বলট্‌ঠিকরাহুলোবাদ এইরূপও কহে। এইটি মজ্ঝিমনিকায়ে আছে। উহার সংক্ষিপ্ত আভাস এখানে দেওয়া হইতেছে—

একসময়, ভগবান বুদ্ধ রাজগৃহের নিকট বেণুবনে থাকিতেন ও রাহুল অম্বলট্‌ঠিকা[1] নামক জায়গায় থাকিত। একদিন সন্ধ্যার সময়, ভগবান ধ্যান-সমাধি শেষ করিয়া, রাহুল

১. অট্‌ঠকথাতে বলা হইয়াছে যে, ইহা একটি প্রাসাদের নাম। কিন্তু তাহা সম্ভবপর বলিয়া মনে হয় না। উহা রাজগৃহের নিকটস্থ একটি গ্রামের নাম বলিয়া মনে হয়।

যেখানে থাকিত, সেখানে গেলেন। রাহুল ভগবানকে দূর হইতে দেখিয়া তাঁহার জন্য আসন পাতিয়া দিল ও পা ধুইবার জন্য জল আনিয়া রাখিল। ভগবান আসিলেন ও সেই আসনে বসিয়া, তিনি পা ধুইলেন। রাহুল ভগবানকে প্রণাম করিয়া এক পাশে বসিল।

ভগবান যে-পাত্রে পা ধুইলেন, তাহাতে অল্প কিছু জল রাখিয়া দিলেন, ও রাহুলকে কহিলেন, "হে রাহুল, তুমি এই অল্প জলটুকু দেখিতে পাইতেছ কি?"

রাহুল উত্তর দিল, "হাঁ, মহাশয়।"

"হে রাহুল, যাহাদের মিথ্যা কথা বলিতে লজ্জা হয় না, তাহাদের শ্রমণতা এই জলের মতোই অকিঞ্চিৎকর।"

তাহার পর, ঐ জলটুকু ফেলিয়া দিয়া, ভগবান কহিলেন, "হে রাহুল, তুমি কি ঐ ফেলিয়া-দেওয়া জলটুকু দেখিতেছ না?"

রাহুল উত্তর দিল, "হাঁ, মহাশয়।"

"হে রাহুল, যাহাদের মিথ্যা বলিতে লজ্জা বোধ হয় না, তাহাদের শ্রমণতা এই জলের মতোই ত্যাজ্য।"

তাহার পর, ভগবান ঐ পাত্রটি উপুড় করিয়া কহিলেন, "হে রাহুল, যাহাদের মিথ্যা বলিতে লজ্জা বোধ হয় না, তাহাদের শ্রমণতা এই পাত্রটির মতো উপুড় বলিয়া বুঝিতে হইবে।"

তাহার পর, পাত্রটি চিত করিয়া, ভগবান কহিলেন, "হে রাহুল, এই রিক্ত পাত্রটি তুমি দেখিতেছ না কি?

রাহুল উত্তর দিল, "হাঁ মহাশয়"।

"হে রাহুল, যাহাদের মিথ্যা বলিতে লজাবোধ হয় না, তাহাদের শ্রমণতা এই পাত্রটির মতো রিক্ত।"

"হে রাহুল, যুদ্ধের জন্য সজ্জিত বৃহৎ রাজহস্তী পায়ের দ্বারা যুদ্ধ করে, মাথা দিয়া যুদ্ধ করে, কান দিয়া যুদ্ধ করে[১], দাঁত দিয়া যুদ্ধ করে, লেজ দিয়া যুদ্ধ করে[১], কিন্তু শুধু শুঁড়টি বাঁচাইয়া চলে। তখন মাহুতের মনে হয় যে, এতবড় এই রাজার হাতিটা যে তাহার সব অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দিয়া যুদ্ধ করে, কিন্তু শুঁড়টি বাঁচাইয়া রাখে, ইহার অর্থ এই যে, যুদ্ধে জয়লাভ করিবার জন্য, সে প্রাণ অর্পণ করে নাই। যদি ঐ হাতি অন্যান্য অবয়বের মতো শুঁড়টিও সম্পূর্ণরূপে যুদ্ধে ব্যবহার করে, তাহা হইলে মাহুত বুঝে যে, হাতি সংগ্রামবিজয়ের জন্য নিজের জীবন অর্পণ করিয়াছে, এখন উহাতে আর কোনোরকমের ন্যূনতা রহিল না। তেমনই, যাহাদের মিথ্যাকথা বলিতে লজ্জাবোধ হয় না, তাহারা কোনো পাপই ছাড়ে নাই,

১. কান দিয়া বাণ বাঁচাইবার কাজ করে, লেজে-বাঁধা পাথর কিংবা লোহার ডাণ্ডা দিয়া ভাঙিয়া-চুরমার করে, অট্‌ঠকথাতে এইরূপ অর্থ করা হইয়াছে।

আমি এইরূপ বলি[১]। সুতরাং, হে রাহুল, ঠাট্টাতেও মিথ্যা বলিবে না, এই নিয়মটি অভ্যাস করো।

"হে রাহুল, আরশির উপযোগিতা কি?"

রাহুল উত্তর দিল, "মহাশয়, প্রত্যবেক্ষণ (নিরীক্ষণ) করিবার জন্য (তাহা ব্যবহৃত হয়)।"

"তেমনই, হে রাহুল, বারবার প্রত্যবেক্ষণ (ঠিক ঠিক ভাবে বিচার) করিয়া শরীর মন ও বচনে কর্ম করিবে।

"হে রাহুল, যখন তুমি শরীর, বাক্ বা মনে কোনো কাজ করিতে চাও, তখন প্রথম তাহা প্রত্যবেক্ষণ করিয়ো এবং যদি বুঝিতে পার যে, ঐ কর্ম আত্মপর সকলেরই মঙ্গলের অন্তরায়, এবং পরিণামে দুঃখজনক, তাহা হইলে তাহা আদৌ করিবে না। কিন্তু যদি তাহা আত্মপর কাহারও মঙ্গলের অন্তরায় নয়, এবং পরিণামে সুখদায়ক বলিয়া বুঝিতে পার, তাহা হইলে উহা করিবে।

"কায়, বচন অথবা মনে কোনো কর্ম আরম্ভ করিলেও, তাহা প্রত্যবেক্ষণ করিয়ো, এবং যদি দেখিতে পাও যে, উহা আত্মপর সকলের মঙ্গলের পরিপন্থী ও পরিণামে দুঃখজনক, তাহা হইলে তখন তখনই উহা ছাড়িয়া দিবে। কিন্তু যদি দেখিতে পাও যে, উহা আত্মপর-হিতের পরিপন্থী নয়, ও পরিণামে সুখজনক, তাহা হইলে উহা বারবার করিয়া যাও।"

"শরীর, বাক্ অথবা মনে কোনো কর্ম করার পরও, তুমি উহা প্রত্যবেক্ষণ করিয়ো, এবং যদি দেখিতে পাও যে ঐ কর্ম আত্মপর-হিতের পরিপন্থী ও পরিণামে দুঃখজনক, তাহা হইলে তুমি তোমার শিক্ষকের নিকট কিংবা বিদ্বান্ সব্রহ্মচারীদের নিকট সেই পাপের কথা প্রকাশ করিয়ো (স্বীকার করিয়ো), এবং পুনরায় যাহাতে তোমার হাতে ঐরূপ কর্ম না হয়; তাহার জন্য যত্ন লইয়ো। যদি ঐ কর্মটি মানসিক হয়, তাহা হইলে তাহার জন্য অনুতাপ করিয়ো, লজ্জিত হইয়ো ও পুনরায় এইরূপ চিন্তা মনে আসিতে দিয়ো না। কিন্তু যদি দেখিতে পাও যে, কায়, বাক্ অথবা মনে যে-কর্ম করা হইয়াছে, তাহা আত্মপর-হিতের পরিপন্থী নয়, ও পরিণামে সুখজনক, তাহা হইলে আনন্দিত মনে ঐ কর্ম বারবার করিতে শিক্ষা করো।

"হে রাহুল, যে-সব শ্রমণ ব্রাহ্মণ অতীতকালে স্বীয় কায়িক, বাচনিক ও মানসিক কর্ম পরিশুদ্ধ করিয়াছে, তাহারা বারবার প্রত্যবেক্ষণ করিয়াই তাহাদের ঐ কর্ম পরিশুদ্ধ করিয়াছে। ভীবষ্যৎকালে যে-সব শ্রমণব্রাহ্মণ এইরূপ কর্ম পরিশুদ্ধ করিবে, তাহারাও তাহা বারবার প্রত্যবেক্ষণ করিয়াই পরিশুদ্ধ করিবে। বর্তমানকালে যে-সব শ্রমণব্রাহ্মণ এইরূপ কর্ম পরিশুদ্ধ করে, তাহারা বারবার প্রত্যবেক্ষণ করিয়াই এই কর্মগুলি পরিশুদ্ধ করে। অতএব, হে রাহুল, বারবার প্রত্যবেক্ষণ করিয়া, তুমি তোমার শারীরিক, বাচনিক ও মানসিক কর্ম পরিশুদ্ধ করিতে শেখ।"

---

১. যদি শ্রমণ অসত্য-ভাষণ দোষটি রাখিয়া, অন্যান্য পাপ ত্যাগ করে, তাহা হইলে সে প্রকৃত যোদ্ধা নয়; সে শ্রমণ-ধর্মে নিজের জীবন উৎসর্গ করে নাই।

ভগবান এইরূপ কহিলেন। আয়ুষ্মান্ রাহুল আনন্দিত মনে ভগবানের এই ভাষণের অভিনন্দন করিল।

এই সাতটি সুত্তের মধ্যে সুত্তনিপাতের অন্তর্গত মুনিগাথা, নালকসুত্ত ও সারিপুত্তসুত্ত এই তিনটি পদ্যে, ও বাকী চারিটি গদ্যে রচিত। গদ্যসুত্তগুলিতে খুব পুনরুক্তি দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা তৎকালীন সাহিত্যের একটি পদ্ধতি বলিয়া বুঝিতে হইবে। কেননা, জৈনদের সূত্রে এবং কোনো কোনো স্থলে উপনিষদ্গুলিতেও এইরূপ পুনরুক্তি আছে। কিন্তু ত্রিপিটকে এই পুনরুক্তির রকমটি এইরূপ যে, পাঠকের মনে হয় যেন সব-কিছুই আগের মতো হইবে, অথচ কোনো কোনো গুরুত্বপূর্ণ নূতনকথা ঐ পুনরুক্তিগুলির মধ্যে রাখিয়া দেওয়া হয়। ইহাতে পাঠকের মনোযোগ তাহার দিকে আকৃষ্ট হয় না। উদাহরণস্বরূপ, এই রাহুলোবাদসুত্তে কায়িক, বাচনিক ও মানসিক কর্মের প্রত্যবেক্ষণে একই রকম কথা বারবার আসিয়াছে; কিন্তু কায়িক ও বাচনিক অকুশলকর্ম করিলে, শিক্ষকের নিকট কিংবা বিদ্বান্ সব্রহ্মচারীদের নিকট তাহা প্রকাশ করিবে ও ঐরূপ কর্ম পুনরায় হইতে দিবে না, এইরূপ বলা হইয়াছে। মানসিক অকুশল কর্মের বেলা, এই নিয়মটি প্রয়োগ করা হইল না। কেননা, বিনয়পিটকে শুধু কায়িক ও বাচনিক দোষগুলিরই আবিষ্কারাদি (পাপদেশনা ইত্যাদি) প্রায়শ্চিত্ত বিহিত হইয়াছে, মনোদোষের জন্য প্রায়শ্চিত্তের বিধান নাই। তাহার জন্য প্রায়শ্চিত্ত করার অর্থ তাহার জন্য অনুতাপ ও লজ্জা বোধ করা, এবং ঐরূপ অকুশল চিন্তা পুনরায় মনে না আনা। কায়িক ও বাচনিক অকুশলকর্ম এবং মানসিক অকুশলকর্ম; এই দুইটির মধ্যে এই যে পার্থক্য নির্দেশ করা হইল, তাহা রাহুলোবাদসুত্ত। উপরি-উপরি পড়িয়া গেলে লক্ষ্য করার কথা নয়।

অশোকের সময় এই সুত্তগুলির সবগুলিই কি এইরূপ ছিল, না আরও সংক্ষিপ্ত ছিল, তাহা বলিতে পারা কঠিন। সুত্তগুলি সংক্ষিপ্ত হইয়া থাকিলেও, উহাদের সারভূত তথ্য এইরূপই ছিল, ইহাতে সন্দেহ নাই। সুত্তপিটকের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন সুত্তগুলি চিনিবার কাজে, এই সাতটি সুত্ত খুব উপযোগী।